কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ খণ্ড। } বৈশাখ, ১৩১৯ সাল। { ১ম সংখ্যা।

সব্জী চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শাক ও মসলা

কপি, সালগম, মূলা, বীট প্রভৃতি সব্জী চাষ সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু এই সমুদয় সব্জীর সহিত শাকাদির চাষও একান্ত আবশ্যক। কারণ দেখা যায় যে, আমরা যাবতীয় ব্যঞ্জনাদির সঙ্গে শাক ভাজা কিম্বা অন্যান্য তরকারির সহিত শাক বা মসলা না ব্যবহার করিলে আমাদের ব্যঞ্জন সম্পূর্ণ হইল বলিয়া মনে করি না। শাক সকল নিরতিশয় মুখরোচক। উপাদেয় ব্যঞ্জনাদির সহিত শাকের—হয় শাক ভাজা, না হয় চাটনি, অথবা দুইই না থাকিলে আহার সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন হইল না। সেই জন্য কোন বাগানে সব্জী চাষ আরম্ভ করিলে শাক ও মসলার চাষ করিতেই হইবে।

বাঙলা দেশে আমরা হলুদ, লঙ্কা, জিরামরিচ প্রভৃতিকে মসলা নাম দিয়া থাকি। এই সকল দ্রব্য ব্যঞ্জন সুঘ্রাণ ও সুতার করিবার জন্য ব্যবহার করা হয়। মার্জোরাম, সেজ, ল্যাভেণ্ডার, টাইম, প্রভৃতি বিলাতি মসলার পাতা, সেলেরি, স্পাইনাক প্রভৃতি শাকের পাতা এবং ধনে সুলফা শাকের পাতাও তরকারি সুঘ্রাণ করিবার নিমিত্ত ব্যবহার করা হইয়া থাকে। চুকা-পালঙ, সুলফা, ধনে, পুদিনার চাটনির বোধ হয় বাঙলার সকলেই রসাস্বাদন করিয়াছেন এবং শাকাদির চাষের জন্য অন্যান্য তরকারির প্রাচুর্য্য সত্বেও ভারতবাসী কিম্বা পাশ্চাত্য দেশবাসী সকলেই সমুৎসুক। শাক কিম্বা মসলার চাষ সহজেই হয়, উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ইহাদিগকে সহজেই উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

পার্শলি

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ

মৃত্তিকা—উর্ব্বরা-শক্তি-বিশিষ্ট শক্ত দোয়াঁস মাটি। অন্যান্য প্রকার দোয়াঁস মৃত্তিকাতেও জন্মে। চাষের জমি অল্পাধিক ছায়াযুক্ত স্থানে হইলে ভাল হয়।

সার—মিশ্র-সার অথবা গোবর-সার।

বপনাদি প্রণালী—চাষের জমিতে বীজ বপন করিলে সুবিধা হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে কিছু বেশী সময় লাগে। বপন করিবার পূর্ব্বে জলে তিন বা চারি ঘণ্টা রাখিয়া—পরে শুষ্ক ছাই বা বালির সহিত মিশ্রিত করিয়া বীজ বপন করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়। বীজ অঙ্কুরিত হইতে সচরাচর দশ পনর দিবসেরও অধিক সময় লাগিতে পারে।

চাষের জমি—সারাদি সাহায্যে প্রস্তুত হইলে—একফুট অন্তর লাইন কাটিয়া সেই লাইনে বা সারিতে বীজ খুব পাতলা করিয়া বপন করিতে হয়। পরে চারা নির্গত হইয়া—নাড়িয়া বসাইবার মত সমর্থ বোধ হইলে—তিন বা চারি ইঞ্চি পৃথক প্রত্যেক চারাটী রাখিয়া—অপরগুলি অন্য স্থানে ঐরূপ পৃথক ভাবে লাইন-বন্দী রোপণ করিতে হয়।

অবশিষ্ট কার্য্য—যথারীতি জল সিঞ্চন ও ক্ষেত্রোৎপন্ন আগাছা উত্তোলন করিতে হয়। গাছে ফুল আসিবার পূর্ব্বেই ব্যবহার করা উচিত।

বিশেষ কথা—পার্শলি শাকজাতীয় বিলাতী সজ্‌জী বিশেষ।

বীজের পরিমাণ—প্রতি একরে ২ আউন্স।

সেলিরী

বপনের সময়—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক

মৃত্তিকা—সারযুক্ত হাল্কা দোয়াঁস মাটি।

সার—যে কোনরূপ প্রচলিত সার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বপনাদি প্রণালী ও জল সেচন—বর্ষা থাকিতে থাকিতে বীজ বপন করিলে বীজ ফেলিবার টবে বা তদনুরূপ অন্য কোন পাত্রে বীজ বপন করিতে হয়। বীজ বপনের পর বৃষ্টিপাত হইলে, বীজের পাত্র বৃষ্টিবিহীন স্থানে তুলিয়া রাখিতে হইবে; অথবা অন্য কোনরূপে বৃষ্টির জল হইতে বীজ বা চারা রক্ষা করিতে হয়। বৃষ্টি থামিয়া যাইলে, বীজের টব বা পাত্র যথাস্থানে রাখিয়া দিতে হইবে, কিম্বা আবরণ উন্মোচন করিতে হইবে। টবের মাটি বিশেষ সারযুক্ত ও ধূলির ন্যায় চূর্ণ বা

ঢেলাবিহীন হওয়া আবশ্যক। নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রথমকালেই সেলিরী বীজ বপন করিলে—চারা উৎপন্ন হইতে অনেক সময় লাগে। এ সময়ে বীজ অঙ্কুরিত হইতে একমাস হইতে দেড়মাস পর্য্যন্ত সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যবর্ত্তী কালে চারা উৎপন্ন হইতে এতাধিক সময় লাগে না। আর টব নাড়ানাড়ি বা আবৃত করা প্রভৃতি অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। কারণ, এ সময়ে বীজ হাপরে ফেলিয়া, চারা উৎপন্ন করিয়া লইতে হয়।

বীজ বপন করিয়া হাত দিয়া উপরিস্থিত মাটি অল্লাধিক চাপিয়া দিতে হয়। চারা সকল নির্গত হইলে, বাঁধাকপি-প্রবন্ধোল্লিখিত প্রণালী অনুযায়ী ক্রমশঃ রৌদ্রতাপ সহনশীল করিয়া লইতে হইবে। এইরূপে নবোৎপন্ন চারাগুলি বর্দ্ধিত হইয়া, কিছু সতেজ ও সমর্থ বা শক্ত হইলে, হাপরের ন্যায় প্রস্তুত অন্য জমিতে প্রত্যেকটী ছয় হইতে আট ইঞ্চি পৃথক রোপণ করিতে হয়। এইখানে চারা সকল চারি বা পাঁচ ইঞ্চি বড় হইলে, চাষের জমিতে রোপণ করিতে হইবে। বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইয়া চাষের জমির উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সেলিরীর বীজ ও চারা "বাঁধাকপি"র ন্যায়, যথাসময়ে রৌদ্রতাপ ও বারিপাত হইতে—যে রক্ষা করিতে হইবে, এবং আবশ্যকানুযায়ী জলসেচন করিতে হইবে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

চাষের জমি সার দিয়া রীতিমত প্রস্তুত করিতে হয়। নয় ইঞ্চি গভীর, বার ইঞ্চি প্রশস্ত, লম্বা নালা কাটিতে হইবে। সেই নালা বা গর্ত্তস্থিত মাটির সহিত যথোপযুক্ত সার বিশেষরূপে মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। এইরূপ নালা সারি সারি তিন ফুট অন্তর সারাদি সংযোগে প্রস্তুত করিয়া—প্রত্যেক চারা আট ইঞ্চি পৃথক রোপণ করিয়া দিতে হইবে। চারা পুতিয়া, মূলদেশের মাটি চাপিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

চাষের জমিতে চারা এক হাত বা তদনুরূপ দীর্ঘ হইলে, গাছের গোড়ায় পার্শ্ব হইতে অল্লাধিক পরিমাণে মাটি টানিয়া দিতে হয়। আরও দুই বা তিনবার এইরূপে গাছের মূলদেশে মাটি দিতে হয়। চাষের জমি "যো" থাকিতে থাকিতে মাটি দেওয়া কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। গাছের ভিতরে বা অন্তরে কোন রকমে মাটি নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রবেশ-লাভ না করে—সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যথাবশ্যক জল সেচন করিতে হইবে, এবং মধ্যে মধ্যে তরল সার প্রয়োগ করিতে পারিলে ভাল হয়।

বিশেষ কথা—সেলিরী সুঘ্রাণযুক্ত বিলাতী সব্জী বিশেষ। শাঁসযুক্ত ডাঁটা আহার্য্য। ইহা হজমীকারক।

বীজের পরিমাণ—এক একরে ২ আউন্স।

সেলেরী সম্বন্ধে বিশেষ কথা—সেলেরীর শাঁসযুক্ত ডাঁটা আহার্য্য তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কিন্তু ডাঁটা কোমল থাকিলে তবে খাইতে ভাল লাগে, কঠিন হইয়া

গেলে ভাল লাগিবে না। কোমল রাখিতে হইলে প্রত্যেক চারা একটি আবরণে আবৃত করিতে হয়। ঐ আবরণের জন্য শুষ্ক কলা বাসনা, গুপারি গাছের বাক্‌লা কিম্বা বাঁশের কোড়ের বাক্‌লা, ব্যবহার করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক চারা গোড়া হইতে উপর পর্য্যন্ত উক্ত রূপ বাক্‌লা দিয়া জড়াইয়া সুতা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। সেলেরী চাষের ইহাই একটি প্রধান কৌশল।

বিলাতী মসলা

বপনের সময়—কার্ত্তিক

টাইম—বীজ ফেলিবার টবে বীজ বপন করিতে হয়। অল্প ছায়াবিশিষ্ট স্থানে (গাছের তলায়) টব রাখিতে পারিলে ভাল হয়। মৃত্তিকা—অর্দ্ধেক পাতা সার ও অর্দ্ধেক পরিমাণ সাধারণ মাটি মিশ্রিত করিয়া—সেই মিশ্রিত মাটিদ্বারা টব পূর্ণ করিতে হয়। সামান্য পরিমাণে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। গাছ বড় হইলে অন্য বড় টবে রোপণ করিয়া দিতে হয়।

সেজ—ছায়াবিহীন স্থানে ইহার গাছ করিতে হয়। টবে বা জমিতে ইহার চাষ হইতে পারে। মৃত্তিকা—হাল্কা দোয়াঁস মাটি। পাতা সার মিশ্রিত করিয়া দিলেও চলে। চারা ও গাছ প্রস্তুত সাধারণ ভাবে করিতে হয়। নূতনত্ব কিছুই নাই।

মার্জ্জোরাম—ইত্যাদি বিলাতী মসলা গাছ পাতার সদ্গন্ধের নিমিত্ত চাষ করা হইয়া থাকে। তরি তরকারী ইহার পাতার সাহায্যে সুঘ্রাণযুক্ত হয়।

বাম—ইহাও একটি বিলাতী মসলা। ইহার শুষ্ক পাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া অরের সময় সাহেবেরা ব্যবহার করেন। এদেশে ভাদ্রমাসে বীজ বপন করা হয়।

ল্যাভেণ্ডার—ল্যাভেণ্ডারের পাতার গন্ধই ইহার মাধুর্য্য রক্ষা করিতেছে। শীতকালে ইহার বীজ বপন করা হয়।

রোজ মেরী—ইহার গন্ধও মনোহর। ক্ষেতের ধারে ধারে সরু কেয়ারি করিয়া গাছ করিলে বেশ সুন্দর দেখায়।

গাঁদা—ইহাও মসলার মধ্যে স্থান পাইতে পারে, কারণ ইহা খাদ্যের মধ্যে গণ্য না হইলেও ইহার পাতা ঔষধে ব্যবহার হয়।

পিপার মেণ্ট

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক মাস

ইহা একপ্রকার মসলা জাতীয় শাক। গাছগুলি দেখিতে ঠিক পুদিনার মত রোপণ প্রণালীও ঠিক পুদিনার মত, ডগা কাটিয়া হাপরে ৭।৮ ইঞ্চ অন্তর লাগাইয়া মধ্যে মধ্যে জল দিলে ৩.৪ দিনে গাছগুলি লাগিয়া যাইবে তাহার পর একবার নিড়াইয়া ঘাস ইত্যাদি বাছিয়া একবার সার দিলেই হইল। কিন্তু বীজ বপন করিতে হইলে উক্ত আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে মাটী আল্লা করিয়া ধুলির ন্যায় চূর্ণ করতঃ বীজ ছড়াইতে হয়, ৩'৪ দিনের মধ্যে চারা বাহির হইবে। ঐ চারাগুলি ৪।৫ ইঞ্চি বড় হইলে নাড়িয়া ৭।৮ ইঞ্চি অন্তর এক একটি বসাইয়া আবশ্যক মত জল সিঞ্চন ও মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাট নাই পুরাতন গোবর সারই ইহার একমাত্র সার ইহার শুষ্ক পাতার চূর্ণ হইতে পিপার মেণ্ট তৈয়ার হয় পিপার মেণ্ট ঔষধ রূপে ব্যবহার হয়। পুদিনার মত চাট্‌নিতে দেওয়া হয় কেহ পানের সহিত ইহার পাতা ব্যবহার করিয়া থাকে।

পিড়িং শাক

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক

মৃত্তিকা—হাল্কা দোয়াঁস মাটি ইহার উপযুক্ত।

পাট বা হাপরের মাটি আল্লা অর্থাৎ গুঁড়া করিয়া বীজ ছড়াইতে হয়—বীজ বুনিবার পর আবশ্যক মত জল দিলেই ৩।৪ দিনের মধ্যে চারা বাহির হইবে। চারাগুলি একটু বড় হইলে, গোড়া একবার নিড়ানিদ্বারা ঘাস উঠাইয়া মাটি আল্লা করিয়া দিতে হইবে। গাছগুলি একটু বড় ঝাড়যুক্ত হইলে ইহার শাক কাটিয়া লইতে হয়।

বীজের পরিমাণ—কাঠা প্রতি (৭২০ বর্গ ফিট) ২ তোলা।

মেথী শাক

বপনের সময়—আশ্বিন মাসের শেষ কিম্বা বর্ষা থামিয়া গেলে ইহার চাষ করিতে হয়।

চাষ প্রণালী—পিড়িং শাকের মত। ইহাও কাটিয়া লইতে হয়—খাইতে মন্দ নহে। ইহার ছোট ছোট বীজ তরকারিতে সুগন্ধ করিবার জন্য ব্যবহার হয়। কাঠা প্রতি (৭২০ বর্গ ফিট) ৫ তোলা বীজ লাগে।

শুলফা শাক

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক

ইহার গন্ধ অতি মনোহর পশ্চিম দেশবাসী মাড়ওয়ারিগণ ও মুসলমানগণ ইহার শাক অত্যন্ত ভালবাসে। সকল তরকারি ও শাকে গন্ধ করিবার জন্য ইহার পাতা ব্যবহার করে।

রোপণ প্রণালী—ছোট ছোট চৌকা বা হাপর করিয়া বীজ ছড়াইতে হয়, নাড়িয়া পুতিবার আবশ্যক হয় না।

বীজ—কাঠা প্রতি (৭২০ বর্গ ফিট) এক আউন্স বা ২॥ তোলা লাগে।

ধনিয়া

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক

ইহা এক প্রকার গন্ধযুক্ত শাক। মুসলমানগণ ইহার গন্ধ পছন্দ করে, তরকারি ও মাংসের সহিত ইহার পাতা ব্যবহার করে কিম্বা শাকের ন্যায়ও ইহার গাছ কাটিয়া ব্যবহার করে, কখন কখন অন্য শাকের সহিত মিলাইয়া এই শাক ব্যবহার করা হয়।

রোপণ প্রণালী—শুলফা শাকের ন্যায়। সামান্যভাবে শাকের জন্য চাষ করিলে ১ কাঠায় (৭২০ বর্গ ফিট) ১০ তোলা বীজের আবশ্যক। শাকের জন্য ধনের চাষ ব্যতীত বিস্তৃত ক্ষেতে ধনের চাষ হয়। নানাপ্রকার ব্যঞ্জনাদিতে, চাট্‌নি বা আচারে শুক ধনে চূর্ণ বা ভাজা ধনে চূর্ণ বা ধনে বাটিয়া ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এক একর জমিতে চাষের জন্য ১২ সের ধনের আবশ্যক। প্রতি একরে ১০ মণ ধনে জন্মে।

ডেঙ্গ শাক

বপনের সময়—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ

ইহার বপন প্রণালী চাপানটের ন্যায়—কেবল একটু বড় হইলে চৌকা হইতে উঠাইয়া ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হয়। রোপণ করিবার প্রণালী—এক হাত অন্তর সোজা লাইন করিয়া বসাইতে হয়, ইহা খাইতে অতি মিষ্ট লাগে। ডেঙ্গ অনেক জাতীয়—তন্মধ্যে শাদা কাটোয়ার ডাঁটা ও লাল আলমপুরি অতি উৎকৃষ্ট, শাদা পল্লনটে ও এক জাতীয় ডেঙ্গ—ইহার ডগা কাটিয়া শাক খাওয়া যায়, পরে ডেঙ্গর ন্যায় ডাঁটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বীজ বপন—বিঘা প্রতি এক ছটাক লাগে।

মৃত্তিকা—হাল্কা দোয়াঁস মাটি ইহার উপযুক্ত। বর্দ্ধমানের কাঁকর ওয়ালা মাটিতে, ইহা বেশ মিষ্ট হয়—গোবর সার দিলে ইহার খুব বড় ঝাড় হয়, কিন্তু তত

সুস্বাদু হয় না। পতিত উচ্চ জমি হইলে ভাল হয়—কলিকাতায় এক একটি বড় ঝাড় দুই পয়সায় বিক্রয় হয়। বেশ লাভজনক চাষ—অল্পদিনে তৈয়ারি হয়।

চাঁপানটে শাক

বপনের সময়—ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত

ইহাকে কেহ কেহ চাওলাই, চামরাই শাক বলিয়া থাকেন। বপনের সময় ফাল্গুন, চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত যে কোন সময় হইতে পারে, কেবল বর্ষার সময় ও শীতকালে হয় না। শীতকালে (আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে) কনকানটে, খসল্লা-নটে ও লাল চাঁপানটে বপন করিতে হয়। ইহা খাইতে অতি সুস্বাদু ভাজা চড়চড়ি ইত্যাদি নানা রকমে খাওয়া যায়।

বপন প্রণালী—চৌকার মাটি আল্গা করিয়া বীজ ছড়াইলেই ৩।৪ দিনে চারা বাহির হয়, কিন্তু রীতিমত জল দেওয়া চাই। মাটি শুখাইয়া গেলে চারা বাহির হইতে বিলম্ব হইবে ও লাল পিপড়া ইহার বীজ বহন করিয়া লইয়া যায়। গাছগুলি বড় হইলে একবার নিড়াইয়া ঘাস বাছিয়া দেওয়া আবশ্যক।

মৃত্তিকা—হাল্কা দোয়াঁস মাটি ইহার উপযুক্ত।

সার—পুরাতন গোবর সার ভিন্ন অন্য কোন সারের আবশ্যক হয় না। পতিত জমিতে কোন সারের আবশ্যক হয় না, গাছগুলি একটু বড় হইলে ডগা কাটিয়া লইতে হয়, যত কাটা যায়, ইহা তত ঝাড়যুক্ত হইতে থাকে।

বীজের পরিমাণ—কাঠা প্রতি এক আউন্স বীজ লাগে। খুব ঘন হইলে কতক-গুলি উঠাইয়া পাতলা করিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা ঝাড় বড় হইবার ব্যাঘাত জন্মে।

পুদিনা

ইহা এক প্রকার মসলা জাতীয় শাক। অনেকে ইহার চাট্নী তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করেন ইহার চাট্নি অত্যন্ত হজমী—বর্ষার পর ইহার কাটীং ছাপরে বসাইতে হয়—কিম্বা বীজ বপন করিতে হয়, কাঠা প্রতি ১ তোলা বীজ লাগে। বাঙলাদেশে ইহার বীজ হয় না। আমাদের দেশে ইহার অধিক ব্যবহার দেখা যায় না, পশ্চিম দেশীয় হিন্দু মুসলমান সকলেরই নিকট ইহা প্রিয়। চাষের প্রণালী দোয়াঁস মাটি আল্গা করিয়া খুব মিহি গুঁড়া করিয়া বীজ ছড়াইতে হয়। পুরাতন গোবর সার ইহার উৎকৃষ্ট সার—গাছ বড় হইলে মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া ঘাস বাছিয়া দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন কাজ নাই।

পুঁই শাক

বপনের সময়—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ

দোয়াঁস মাটী ইহার উপযুক্ত গোবর সার কিম্বা সরিষার খৈল পচাইয়া মাটী তৈয়ার করিয়া বীজ বপন করিতে হয় মাটী যত আল্গা হইবে গাছ তত মোটা হইবে এক একটি মোটা গাছ গোড়া শুদ্ধ তুলিয়া বাজারে বিক্রয় হয় অথবা মাচায় তুলিয়া দিয়া ডগা কাটিয়া বিক্রয় করিতেও পারা যায় আশ্বিন মাসে ইহার ফুল ধরে তাহাকে মিটুলি বলে ঐ ফুল ভাঙ্গিয়া চাষিরা বিক্রয় করে প্রথমতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে ঘন গাছগুলি তুলিয়া বিক্রয় করিতে করিতে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা মাচায় উঠাইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই পুষ্করিণীর পাড়ে পাঁক মাটির উপর পুঁয়ের লতার ঝাড় দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রধান শাকগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ গুলি ব্যতীত পাট শাক, বেথুয়া শাক, জলজ কলমী, হিংচা, শুষনী প্রভৃতি শাকাদিও শাক বর্গের অন্তর্গত।

পাট—শাকের জন্য স্বতন্ত্র কেহ আর পাটের চাষ করে না। বিস্তৃত পাটক্ষেত হইতে কচিকচি মিঠা পাটের ডগা কাটা বাজারে বিক্রয়ার্থ আনিত হয়। সখ করিয়া শাকের জন্য চাষ করিতে হইলে অন্যান্য শাক বীজের ন্যায় কেয়ারিতে বীজ ছড়াইতে হয়। চাষের প্রণালী ডেঙ্গো প্রভৃতি চাষের অনুরূপ।

বেথুয়া—ইহার চাষ অতি সহজ। জমি আল্গা করিয়া কোপাইয়া বীজ ছড়াইয়া দিলেই হইল। জল সেচনের ব্যবস্থা থাকিলে বেশ ভাল হয়। কুলের সহিত ইহার অম্ল বা চাট্‌নি অতি সুন্দর হয়।

কলমী—জলজ কনভলভিউলস জাতীয় লতা, ইহার সুন্দর ফুল হয়। হিংচা, শুষনী ও কলমী এই জলজ লতাগুলির ডগা শাকের জন্য আদরের সহিত ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার স্নিগ্ধত্বগুণ আছে। হিংচা ধাতু পুষ্টিকারক, কলমী রক্ত পরিষ্কারকারক, এবং শুষনী শাকের ব্যবহারে অনিদ্রা রোগ মোচন হয়।

ব্রাহ্মী—এই শাক বনজ। ইহার কেহ চাষ করে না আয়ুর্ব্বেদে ইহার বহুগুণ বর্ণিত আছে। এই শাক ব্যবহারে মেধা বৃদ্ধি হয়। ব্রাহ্মী, পুনর্ণবা থানকুনী প্রভৃতি অনেক শাক বনেই জন্মায় কিন্তু ইহাদের ব্যবহারে বহুগুণ দর্শে। বাগানের মধ্যে খানা ডোবা থাকিলে তাহাতে জলজ কলমী আদি লতা ও আশে পাশে এক কোণে পাট, বেথুয়া, ব্রাহ্মী, পুনর্ণবা প্রভৃতি জন্মাইতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কল্যাণ হয়।

সার

কৃষি-কুশল—শ্রীযুৎ রাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নাইট্রোজান প্রধান বিশেষ সার

সোরা—খনিজ সার, ইহাতে উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সকল পদার্থ পাওয়া যায় না, একারণ ইহা বিশেষ সারের মধ্যে গণনীয়। সোরায় প্রচুর পরিমাণে সোরাজান বিদ্যমান আছে। সোরায় সোরাজান ও ক্ষার এই দুইটী পদার্থ থাকায়, জমির পক্ষে বিশেষ উপকারী। সোরায় সোরাজান ও ক্ষার যে প্রকার অবস্থায় থাকে, তাহা সহজেই উদ্ভিদের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। গোবর সারে, গলিত উদ্ভিদে অথবা খইলে সোরাজান যে অবস্থায় থাকে, তাহা রূপান্তরিত হইয়া সোরার আকারে পরিণত না হইলে, উদ্ভিদ তাহা মূল দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারে না। সোরার সোরাজান সেরূপ নহে, সোরা মাটিতে দিবামাত্র তাহা জলে গলিয়া উদ্ভিদের খাদ্য রূপে উদ্ভিদ্‌দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। একারণ জমিতে সোরা দিলে সঙ্গে সঙ্গে ফল লাভ করিতে পারা যায়। অল্প সময়ের মধ্যে ফল লাভ করিতে হইলে, গোবর সার প্রভৃতি সার না দিয়া সোরা দিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। সোরায় যত শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়, অন্য সারে তাহা পাওয়া যায় না। বেলে জমি অপেক্ষা এঁটেল জমিতে সোরা দিলে অধিক ফল লাভ করা যায়। বেলে জমিতে সোরা দিবার পর অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইলে, তাহা জলে ধৌত হইয়া যায়। এঁটেল জমিতে সোরা দিবার পর অধিক পরিমাণ বৃষ্টি হইলেও এঁটেল মাটির এরূপ শক্তি আছে, যদ্দ্বারা সোরা ধৌত হইয়া যাইতে দেয় না। তৃণ জাতীয় ফসলের পক্ষে সোরা বিশেষ উপকারী।

সোরা মৃত্তিকা হইতেই উৎপন্ন হয়। যে মৃত্তিকায় গলিত জন্তু ও গলিত উদ্ভিদ অধিক পরিমাণে থাকে, সেই মৃত্তিকা হইতেই সোরা উৎপন্ন হয়। জল, বায়ু, তাপ প্রভাবে ও মৃত্তিকা সংযোগে গলিত জন্তু ও গলিত উদ্ভিদ রূপান্তরিত হইয়া সোরায় পরিণত হয়। সোরা ফসল দিবার পূর্ব্বে না দিয়া, ফসল দিবার পর ছড়াইয়া দেওয়া উচিত। প্রতি বিঘায় একমণ সোরা জমির সর্ব্বত্র সমভাবে ছড়ান আবশ্যক। ইহার সহিত গোবর, হাড়চূর্ণ প্রভৃতি মিশাইয়া দিলে জমির তেজ স্থায়ী ভাবে বর্দ্ধিত হয়।

চূণ—মৃত্তিকার একটি বিশেষ সার

চূণ ;—উদ্ভিদের পোষণ জন্য ইহা নিতান্ত আবশ্যক। জমির মৃত্তিকায় চূণের অংশ না থাকিলে কোনও উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না। কিন্তু ইহা স্বভাবতঃ জমিতে থাকে, ইহার জন্য কৃষককে বিশেষ যত্ন করিতে হয় না। একবার জমিতে চূণ দিলে আর ৮।১০ বৎসর দিবার প্রয়োজন হয় না। ইহা ব্যতীত চূণের আরো কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে। ইহা জমিতে দিলে পোকা নষ্ট হইয়া যায়। যে জমিতে পোকার উপদ্রব, সে জমিতে ভাটী হইতে টাট্‌কা চূণ নামাইয়া দিলে, তাহার পোকা মরিয়া যায়। যে জমিতে জল বসে, সে জমিতে চূণ দিলে জল বসা দোষ দুরীভূত হয়। যে জমিতে আগাছার উপদ্রব অধিক ও যে জমির মৃত্তিকা আটাল, সে জমিতে চূণ দিলে ঐ সকল দোষ দুর হয়।

গলিত উদ্ভিদাদি জমিতে অধিক পরিমাণে থাকিলে, তাহার তেজের বৃদ্ধি হয়, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যে জমিতে ইহার অংশ অত্যধিক, তাহা অনুর্ব্বরা তাহাতে প্রায় কোন ফসলই ভাল হয় না। ঐরূপ জমিতে চূণ দিলে ঐ সকল দোষ দুরীভূত হইয়া জমি উর্ব্বর হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যে জমিতে আটাল মাটির ভাগ অধিক, তাহাতে ক্ষার প্রভৃতি তেজস্কর পদার্থ এরূপ আবদ্ধ অবস্থায় থাকে, যে তাহাতে উদ্ভিদের কোন উপকারই হয় না। সেই জমিতে চূণ দিলে, চূণের তেজে আবদ্ধ ক্ষার প্রভৃতি তেজস্কর পদার্থ মুক্ত হইয়া জমির তেজ বৃদ্ধি করে। চূণ যোগ করিলে জমির মৃত্তিকাস্থ গলিত উদ্ভিদ দেহের সোরাজানময় পদার্থ শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়া সোরার আকারে পরিণত হয়।

ঘণ ঘণ চূণ দিলে জমি শীঘ্র অনুর্ব্বরা হইয়া উঠে। জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিবার চূণের নিজের বিশেষ শক্তি নাই। চূণের তেজে আবদ্ধ সোরাজানাদি উপাদান শীঘ্র রূপান্তরিত হইয়া উদ্ভিদের পোষণোপযোগী পদার্থে পরিণত হয়। যত দিন পর্য্যন্ত জমিতে আবদ্ধ সোরাজানাদি উপাদান বর্ত্তমান থাকে, তত দিন পর্য্যন্ত চূণের দ্বারা জমির উপকার হয়। প্রথম প্রথম জমিতে চূণ দিলে জমির তেজের বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সে তেজ অধিক দিন থাকে না। চূণের সহিত সার না দিলে জমি শীঘ্র নিস্তেজ হইয়া উঠে। গোবরের সহিত চূণ মিশ্রিত করিয়া জমিতে দিলে গোবরের তেজ নষ্ট হইয়া যায়। প্রতি বিঘায় ২।৩ মণ চূণ দিলেই চলিতে পারে।

ভস্ম—বিশেষ সার

উদ্ভিদের দেহ পচাইলে উৎকৃষ্ট সার উৎপন্ন হয়, কিন্তু উদ্ভিদ দেহ পোড়াইয়া ভস্মে পরিণত করিলে, তাহার আর সেরূপ তেজ থাকে না। উদ্ভিদ ভস্ম পটাশ সারের কার্য্য করে কিন্তু গলিত উদ্ভিদ মাত্রেই সাধারণ সারের মধ্যে গণ্য এবং ভস্ম বিশেষ সার।

যে চারিটি বিশেষ সার উদ্ভিদের খাদ্য, পটাস তাহার মধ্যে একটি। খণিজ পটাস সাররূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে খরচ অনেক হওয়ার সম্ভাবনা, সেইজন্য গাছ পালা লতা পাতা পুড়াইয়া যে ছাই পাওয়া যায় তাহাই পটাস সাররূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। কলার বাসনা, তামাক ও গোবরের ছাইয়েতে অধিক মাত্রায় পটাস আছে।

কয়েকটি বিশিষ্ট সার—

মনুষ্যের মল মূত্র উৎকৃষ্ট সার। ইহাতে উদ্ভিদের পুষ্টিসাধনোপযোগী সমস্ত উপাদানই বিদ্যমান আছে। সুতরাং মনুষ্যের মল মূত্রকেও সাধারণ সার রূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

অধুনা গো, মহিষ প্রভৃতি পশুর শিং, খুর, শুষ্ক মৎস্য এবং চামড়ার কারখানার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চর্ম্মখণ্ড ছাগাদি পশুর রক্ত সাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এ প্রদেশের অনেক কৃষক ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া জমির উর্ব্বরতা শক্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য ক্রমশঃ আগ্রহান্বিত হইতেছে।

পক্ষী বিষ্ঠাও উৎকৃষ্ট সার। ইহাতে উদ্ভিদের সকল অভাব পূরণ হইয়া থাকে। আমেরিকায় 'গুয়ানো' নামক একপ্রকার পক্ষীর বিষ্ঠা উৎকৃষ্ট সার। বিলাত প্রভৃতি স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে সোরাজান ও হাড়জান থাকায় জমির বিলক্ষণ তেজের বৃদ্ধি হয়। সম্প্রতি এদেশেও গুয়ানো পক্ষীর বিষ্ঠা সাররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

উদ্ভিদকে খাইতে না দিলে উদ্ভিদ বাঁচিবে না, উপযুক্ত বা পর্য্যাপ্ত আহার না দিলে উদ্ভিদ আশানুরূপ পরিপুষ্ট হইবে না। জীবজন্তুর মত যতটুকু তাহারা আহার করিতে পারে, যতটুকু খাইয়া হজম করিতে পারে ততটুকু আহার দেওয়াই বিধি। যদি আমরা উদ্ভিদের অন্য আহারের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বাড়াইতে পারিতাম তাহা হইলে আমরা কখন কখন অতি বৃহৎ রকমের গাছ পালা জন্মাইতে পারিতাম, কিন্তু বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের হ্রাস বৃদ্ধি করা মানুষের সাধ্যায়ত্ব নহে। দেখা গিয়াছে যে উদ্ভিদগণ অধিক মাত্রায় কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস পাইলে অধিক পরিমাণে অন্য আহার্য্য গুলি হজম করিতে পারে। এক্ষণে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস বাড়াইবার উপায় কি দেখিতে হইবে।

পাথুরে কয়লা বা চুণা পাথর পুড়াইলে কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস উৎপাদন করা যাইতে পারে। খোলা স্থানে উক্ত গ্যাস ইতঃস্তুতঃ বিস্তৃত হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। বৃক্ষ লতার সাক্ষাত কোন উপকারে আসে না। কাঁচের ঘর করিয়া তাহার মধ্যে উক্ত গ্যাস চালাইয়া দিলে এবং উদ্ভিদগণের অন্য আহার

বাড়াইয়া দিলে গাছের অধিক মাত্রায় বাড় হয় এবং ফল, ফুলও অধিক হয়। ঘরটিতে অন্য আচ্ছাদন থাকিলে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না সুতরাং কাঁচের অচ্ছাদন হওয়াই কর্ত্তব্য।

ইউরোপ ও এমেরিকায় এই বিষয়ের পরীক্ষায় নানাপ্রকার নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতেছে। ইহা দেখা যাইতেছে—যে বীয়ার কিম্বা অন্য কোন মদ্য খাইতে দিলে মানুষে অধিক মাত্রায় খাদ্য বস্তু হজম করিতে পারে। সেই রকম গাছ ঘরের মধ্যে তরল কার্ব্বনিক এসিড ছড়াইলে বৃক্ষ লতাদিও অধিক মাত্রায় খাদ্য পরিপাক করিতে পারে। খাদ্য পরিপাক হইলে প্রাণীগণের অস্থি, মজ্জা, মাংস, ত্বর্ক বৃদ্ধির ন্যায় বৃক্ষাদির দারু, ত্বক, পত্র, পুষ্প, ফল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। মার্ব্বল কিম্বা চূণা পাথরের উপর সালফুরিক বা মিউরিয়েটিক দ্রাবক প্রয়োগ করিয়া গাছের ঘরের কার্ব্বনিক এসিড গ্যাসের বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছে। কার্ব্বনিক এসিডের মাত্রা ঠিক করিয়া লইয়া ইচ্ছামত ফল ফুল উৎপন্ন করা এক্ষণে অসম্ভব নহে।

রাত্রে সূর্য্যালোক পাওয়া যায় না—রাত্রে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জমির নীচে ও উপরে বৈদ্যুতিক তার খাটাইয়া উদ্ভিদের শস্য উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা হইতেছে। লণ্ডনের কোন কৃষিতত্ত্ববিদ দেখিয়াছেন যে, বৈদ্যুতিক তার সাহায্যে উদ্ভিদগণ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অধিক আহার্য্য হজম করিতে সমর্থ হয়, উদ্ভিদের ফল ও ফুলের গুণ ও মাত্রা বৃদ্ধি হয়। উদ্ভিদগণ এমতাবস্থায় পোকার আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। ব্যয় নিতান্ত অধিক নহে, এই হেতু ইহা বিশেষ কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। একটি দশ অশ্বান কল সাহায্যে ২০০০ একর ক্ষেতে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালান যাইতে পারে।

জার্ম্মান পণ্ডিতগণ বৈদ্যুতিক প্রবাহ সাহায্যে চাষ করিয়া দেখিয়াছেন যে, বার্লির গাছ ও শস্যের মাত্রা শতকরা ৩২ ভাগ, আলু ২৪ ভাগ, বৈজ ৪৩ ভাগ, ষ্ট্রবেরী ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রকার চাষে তামাকের পাতার খুব উৎকৃষ্ট রঙ দাঁড়াইয়াছে, ২৬ ভাগ পাতায় বাড় হইয়াছে, বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হইয়াছে।

লণ্ডন সহরের একজন রাসায়নিক পণ্ডিত সূর্য্যালোকের পরিবর্ত্তে বড় আতসি কাঁচযুক্ত ল্যানটান ব্যবহার করিয়া অত্যাশ্চর্য্য ফল পাইয়াছেন। দুইটি আলোর মধ্যে কাঁচের বর্ত্তুলাকার পাত্রে জল রাখিয়া ল্যানটানের রশ্মী কতকটা মৃদু করিয়া লইয়াছেন, যেমন সূর্য্য রশ্মি বায়ুমণ্ডের মধ্য দিয়া আসিবার সময় মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। ইহাদের চেষ্টা অমানুষিক, অপূর্ব্ব ও অতুলনীয়। কিন্তু আমাদের দেশে এই সকল কথা আলোচনায় কিছু লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের চাষীগণ মোটামুটি কাজগুলি করিতে চায় না, জমিতে সার দিবার ভাবনা খুব কমই ভাবে,

শস্যের মাত্রা বাড়াইবার চেষ্টা খুবই কম, মামুলি চেষ্টা যাহা কিছু হয় তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করে। তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইবার এখানে কেহ নাই। এখানে তাহাদের জমির মাটি, জমিতে সেচ দিবার জল, ও তাহাদের সেবাদির খাদ্য, জমিতে দিবার সার ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিয়া একটা ভাল মন্দ বিচার করিয়া দিবার কোন বন্দোবস্ত এদেশে অদ্যাপি হইল না। আমাদের অসাড় দেহে কে যে প্রাণ সঞ্চার করিবে তাহা এখনও আমরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছি না।

কৃষি ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বেঙ্গল স্যানিটারি বোর্ডের ইঞ্জিনিয়ার

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত

বঙ্গদেশের ভূমি উর্ব্বরা। ভারতের উচ্চ ভূমি ধুইয়া বর্ষার জল প্রতিবর্ষে পলি দ্বারা বঙ্গদেশকে উর্ব্বরতা দান করিতেছে। উচ্চ ভূমির যে মৃত্তিকা বর্ষার জলে গলিয়া যায়, তাই বাহিত হইয়া সাগর উপকূলে উর্ব্বর ভূমি সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক নিয়মবশে বঙ্গদেশের বারিপাতও অত্যধিক। কাজেই বঙ্গভূমি শস্যশালিনী। তাই বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং বঙ্গেদেশের উন্নতি প্রধানতঃ কৃষি সাপেক্ষ। আমরা আজকাল শিল্প বাণিজ্যের জন্য আন্দোলন করিতেছি, কিন্তু প্রথমতঃ কৃষির উন্নতি না করিলে অন্য কোন চেষ্টা সফল হইবে না। কারণ প্রথমে খাদ্যের যোগাড় করা উচিত। প্রথমে দেখিতে হইবে যাহাতে বাঙ্গালার সাধারণ লোক খাইতে পায়। প্রথমে মোটা ভাত। তাহার পর দেখিতে হইবে মোটা কাপড়। আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান দেশ, সুতরাং পোষাকের জন্য বিশেষ খরচ করিতে হয় না। মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়া জীবনের মহত্তর কার্য্যে ব্রতী হওয়াই এ দেশের সনাতন পদ্ধতি। তাহার পর যদি সময় ও সুবিধা ঘটে, তাহা হইলে ব্যক্তি বিশেষ যে সূক্ষ্ম শিল্প ও ললিত কলা বিদ্যার কল্যাণে সৌন্দর্য্য প্রয়াসী মানব বৃত্তিগুলিকে সুহর্ষিত করিবে না তাহার কোন কথা নাই।

তখন আপনিই সুকুমার ভাব রাশি আসিয়া জাতির মুখশ্রীতে লাবণ্য দান করিবে। ওসব সময়ের অবশ্যম্ভাবী ফল। চিরকালই উহা ঘটিয়া থাকে তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা না করিয়া প্রথমে কৃষির দিকে মন দেওয়া উচিত। ইচ্ছা শক্তি ভিন্ন কোন কাজ হয় না। জগতে যত কাজ হইতে দেখা যায়, তাহার

পশ্চাতে ইচ্ছা-শক্তি থাকে। ইচ্ছা-শক্তি কি? কোন একটী কার্য্য সাধনের জন্য চিন্তাস্রোত একমুখী করা।

একই বিষয়ে অনবরত চিন্তা প্রযুক্ত করিলে, একটী প্রবল শক্তি প্রবুদ্ধ হয়, সেই শক্তি ক্রমে এত বেগবতী হয় যে অসাধ্য সাধন করিয়া ফেলে। ইহাকেই ইচ্ছা-শক্তি বলিতে হইবে। এইরূপে যদি অনেকগুলি লোকের মধ্যে প্রবল ইচ্ছা শক্তি প্রবুদ্ধ হয়, তবে দেশের মহান কার্য্য সাধিত হইতে পারে। প্রথমে দেশের অনেক লোককে কৃষি সম্বন্ধে ভাবিতে হইবে এবং দেশের লোকের ভিতর এই ভাবনার প্রেরণা দিতে হইবে।

এটা বৈজ্ঞানিক যুগ। বিজ্ঞানের অনেক সহায় আমরা পাইয়াছি এবং পাইতেছি। এই ভাব-প্রেরণের কতকগুলি বৈজ্ঞানিক কল আছে। যথা, সংবাদ পত্র, বক্তৃতা পুস্তক প্রভৃতি। অনেকে বলেন বেশী কথার প্রয়োজন নাই. সেটা ভুল। তাঁহারা তলাইয়া বুঝেন না। একা বড় কার্য্য করা যায় না, অনেক লোকের দ্বারা বড় কার্য্য করিতে হয়। সকলের ভিতর চিন্তা স্রোত চালাইয়া দিতে হইলে প্রথমতঃ কথার বিশেষ দরকার। মানুষ মূক যন্ত্র নহে, মানুষ কথা কহিতে ভালবাসে। মানুষের ভাষা আছে, মানুষের ভাষার মধ্যে মানুস আপনাকে ধরা দিয়াছে। মানব-মধ্যে মানব-জাতির কর্ম্ম নিহিত রহিয়াছে। তাই আমরা ইচ্ছা করিয়াছি কৃষি সম্বন্ধে কিছু বাক্য খরচ করিব।

কৃষি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে এবং অনেকে অনেক কথা বলিতেছে। কিন্তু সব কথা এক বিষয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিব না। প্রথমতঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সাহায্যে কি প্রকারে কৃষি সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে;

প্রথমে বলিয়াছি বঙ্গদেশ কৃষির বড়ই উপযোগী, কিন্তু তথাপি পাশ্চত্য দেশের ন্যায় জমি প্রতি উৎপন্ন শস্যের হার বাড়াইতে পারা যায় নাই। আমাদের প্রাকৃতিক সুবিধা আছে কিন্তু প্রকৃতিকে খাটাইয়া লইতে আমরা পারিতেছি না। বিজ্ঞান জানিলে প্রকৃতিকে কি করিয়া খাটাইয়া কাজ লওয়া যায়, তাহা বুঝা যায়।

আমাদের দেশে জমি হইতে অধিকতর শস্য উৎপন্ন না হওয়ায় দুইটী বিশেষ করণের উল্লেখ করিতেছি। প্রথম কারণ কৃষিকার্য্য গরীব লোকের হাতে, দ্বিতীয় কারণ শিক্ষিত লোক কৃষকের পশ্চাতে দাঁড়ায় না।

এই দুইটী অসুবিধা দূর করিবার জন্য দেশে অনেক চেষ্টা চলিতেছে৭ গবর্ণমেণ্টও অনেক চেষ্টা করিতেছেন। দেশের সুধীগণ কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন এবং শিক্ষিত যুবকগণকে কৃষি শিক্ষার্থ বিদেশে পাঠাইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ ব্যাঙ্ক খুলিতে সাহায্য করিতেছেন এবং কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করিতেছেন। তাহাতে বহুল উপকার হইবে। কিন্তু আপাততঃ এই অভাব দূর করিয়া এখনই কতকগুলি লোককে অপেক্ষাকৃত অল্প অথচ উপস্থিত কিছু করিতে আমরা আহ্বান করিতেছি।

পাশ্চাত্য চাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে "ফারমার" বলিয়া একশ্রেণীর লোক আছে। তাহারা আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোক অপেক্ষা সম্পন্ন ব্যক্তি। তাহারা কৃষি-বিজ্ঞান জানে; গৃহপালিত জীবজন্তু পোষে, অল্প জমিজমা রাখে। কৃষি ও পশুপালন সম্বন্ধে সংবাদ পত্র ও পুস্তকাদি এবং ঐ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সমস্ত খবর রাখে। সে দেশের নিম্ন শ্রেণীর লোক আমাদের দেশের মত শান্ত নহে, তাহারা উশৃঙ্খল ও ভীষণ। এই ফারমারেরা তাহাদিগকে শাসনে রাখিয়া পূর্ণমাত্রায় খাটাইয়া লইতে পারে। তাহার মজুরি পূরা দেয় এবং কখনও বাকি রাখে না। হাতে টাকা না থাকিলেও ইহারা ব্যাঙ্ক হইতে অথবা অধিক সুদে টাকা ধার করিয়া তৎক্ষণাৎ লোকজনের মাহিয়ানা চুকাইয়া দেয়। ইহারা অন্তরে নীতিজ্ঞ না হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে সুনীতি রক্ষা করে, কারণ ইহারা খুব কাজের লোক এবং পসার (credit) বা সুনামের মূল্য বুঝে। সুনাম যে তাহার স্বার্থরক্ষার পক্ষে বড় বেশী রকম সহায়, তাহা তাহারা বেশ বুঝে।

ইংলণ্ডের অনেক পাদরী সম্প্রদায় ফারমার। অনেকে ক্লব প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে কৃষি, পশুপালন ও ঐ সম্বন্ধে রাজনীতি আলোচনা করে। ঐ দেশের সমস্ত লোকই স্বাধীন। সুতরাং তাহারা যে আলোচনা ও আন্দোলন করে তাহার পশ্চাতে একটা প্রাণশক্তি ক্রীড়া করে। মনে করুন উহারা স্ব স্ব স্বার্থ-রক্ষার্থ একটী সমিতি গঠন করিয়া তাহাতে সম্মিলিত হইয়াছে। সেই সমিতির একটা জ্বলন্ত উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত সভ্য একান্তে কার্য্য করে এবং এক স্বার্থ বিশিষ্ট সমস্ত লোক তাহাতে যোগ দেয় এবং যতক্ষণ না উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, প্রাণপণে চেষ্টা করে। ঐ সমিতি হয়তো অনেক শ্রমশীল (Labourite) মেম্বরের সাহায্য পাইয়াছে। উচ্চতম রাজনীতি ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত উহার যোগ রহিয়াছে।

স্বাধীন দেশে একটা প্রকাণ্ড সজীব শরীর তুল্য। উহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত শিরায় শিরায় যোগ আছে। উহার মন, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এক সুত্রে গ্রথিত।

আমাদের দেশে অনেক কার্য্যের সূচনা হয়, কিন্তু শেষে হয় না। আমাদের মধ্যে উদ্যোগী লোক কম। অধিকাংশ লোকই পরনির্ভরশীল। উহা বহুকালের অধীনতার ফলে মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। দুই একটী উদ্যোগী লোক কোন সৎকার্য্যের সূচনা করিল, কিন্তু পরে দুই একটী লোকের সহযোগিতার অভাবে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ

অধিকন্তু বৈরীতার জন্য অবশেষে কাজটী পণ্ড হইল। অনেক সময় এই বৈরীতা অজ্ঞতা ও হিংসার ফল। কিন্তু হে ভারতীয় উদ্যোগী পুরুষ সিংহগণ! তোমরা তো ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া কামনার জন্য কাজ করিবে না। সৎকর্ম্ম তোমার ধ্যান, ভাষা, ও কর্ম্ম, তোমার ত্রিশ কোটী নারায়নের পূজা। যত অজ্ঞ বৈরীতা চূর্ণ করিয়া, পদদলিত করিয়া মহান কর্ত্তব্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই তো তোমার পুরুষত্ব।

কৃষি কার্য্যের জন্য, কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য এবং কৃষক কুলের পশ্চাত শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দাঁড় করাইবার জন্য বোধ হয় আমাদিগকে আর অকৃতকার্য্য হইতে হইবে না। কারণ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটীর প্রতিষ্ঠাকার্য্যে গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং ব্রতী এবং নিম্নশ্রেণীকে সাহায্য করিতে শিক্ষিত সম্প্রদায় একান্ত তৎপর। রাজশক্তি ও শিক্ষিত প্রজাশক্তি, কৃষককুলের অনুকূল।

এখন একটা কথা আসিতেছে! ঐ যে পাশ্চাত্য দেশের ফারমারের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ঐরূপ দেশী ধরণের ফারমার অনেকগুলি হইতে পারে না কি? যাহারা কেবলমাত্র কৃষিই জীবিকা এবং পল্লীই তাহাদের কর্ম্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। যাহারা সমস্ত ঐশ্বর্য্য উৎপন্নের উপর এবং জীবনের মহত্তর কর্ম্ম পল্লীভূমির উপর সম্পাদন করিতে পারে। যাহারা পল্লীবাস হইতে ভারতীয় স্বকীয় রীতি নীতি, সভ্যতা এবং শিক্ষা দেশময় ছড়াইয়া দিতে পারে। নিজের শিক্ষা, দীক্ষা ও আদর্শ নিজ কর্ম্মদ্বারা অভিব্যক্ত করিতে পারে। এইরূপ কতকগুলি শিক্ষিত, চরিত্রবান এবং সম্পন্ন লোক কৃষকগণকে কাজে লাগান, ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সহায়তায় কার্য্যকারিতার স্রোত আনয়ন করুন। (ক্রমশঃ)

সরকারী কৃষি সংবাদ।

আনারসের ব্যবহার

আনারস ভারতে অনেক স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। কিন্তু অনেক আনারসই বুনো, খাইলে মুখ কুট কুট করে এবং খাইতে সুমিষ্টও নহে। ভাল আনারসের চাষ করিবার চেষ্টা এদেশে নাই। অতএব এস্থলে এমেরিকাতে কি প্রকারে বুনো আনারসও খাইবার উপযুক্ত করা হয় জানিয়া রাখায় লাভ হইতে পারে। আনারসের খোলা ফেলিয়া দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সেগুলি কিয়ৎ পরিমাণে শুকাইয়া লইতে হয়, পরে চিনি মাখাইয়া আবার শুকাইতে হয়। প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ চিনি আনারস খণ্ডগুলির গায় টানিয়া যায়। আনারসের টুকরাগুলি অল্প অল্প সরস থাকিবে অথচ এমন শুক্না হইবে যে, টুকরাগুলি কেহ কাহার

গায়ে লাগিবে না। এইরূপে প্রস্তুত টুকরা গুলি বায়ুবদ্ধ কাঁচের বা টীনের জারে বদ্ধ করিয়া রাখিলে সহজে খারাপ হইবে না। এইরূপ আনারস স্বাদ ও গন্ধে ভাল টাট্‌কা আনারসেরই মত, ইহা খাইতে সুমিষ্ট ও অধিকতর মুখরোচক।

এমেরিকানগণ আনারস খোলা বাতাসে, রৌদ্রে শুকান ভাল বিবেচনা করে না তাহারা ষ্টীম সাহায্যে শুকাইয়া লয়। যখন টুকরাগুলি শতকরা অবস্থানুযায়ী ৬৫ হইতে ৭৫ ভাগ ওজনে কম হইল তখনই ঠিক তৈয়ারি হইল বলিয়া তাহারা মনে করে। তৎপরে তাহাতে চিনি মাখান হয়। চিনি মাখাইবার কালে যে তরল রস বাহির হয় তাহাও অতি উপাদেয় এবং তাহাও বাজারে বিক্রয় হইতে পারে। অনেকে আনারসের রসই ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক, আনারসের টাট্‌কা টুকরা চিবাইয়া খাইতে ভাল বাসেন না। এমেরিকানগণ এই রস বেচিয়াই তাহাদের আনারস সংরক্ষণের খরচা তুলিয়া লয়। আনারসের ভালরূপে আবাদ করিয়া উৎকৃষ্ট আনারস উৎপন্ন করিতে পারিলে তো কথাই নাই, কিন্তু যদি বুনো আনারস এইরূপে ব্যবহারের মত করা যায় তবে কত লাভ হইতে পারে তাহা ভাবিবার জিনিষ। এমেরিকায় যেখানে ভাল আনারস জন্মে তথায় আমাদের দেশের অনেক আনারস মানুষের খাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না. এরূপ আনারস তাহারা গবাদি পশুকে খাওয়াইয়া থাকে।

গমের চাষ—১৯১১-১২

বিহার, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হাজারীবাগ ও পালামৌতে প্রধানতঃ গমের আবাদ হইয়া থাকে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বেশ বৃষ্টি হওয়ায়, বপনের সুবিধা হইয়াছিল। সারণ, চম্পারণ ও দারবঙ্গে কিছু বেশী বৃষ্টি হওয়ায় বিলম্বে বপন কার্য্য শেষ হয়। অগ্রহায়ণে মন্দ বৃষ্টি হয় নাই। তবে বিহারে ও ভাগপুরে একটু বেশী ও উজিরপুর ও নিম্ন বঙ্গে একটু কম হয়। ডিসেম্বরে বৃষ্টি আদৌ হয় নাই। মাঘ মাসে হইয়াছিল। মোটের উপর ফসল আশাজনক বলিয়া প্রকাশ। বর্ত্তমান বর্ষে ১৩৪০১০০ একর জমিতে গমের চাষ করা হইয়াছে।

বসন্ত কালের তৈল বীজের আবাদ—

বিহার, প্রেসিডেন্সি ও ছোটনাগপুর বিভাগেই তৈল বীজ অধিকমাত্রায় উৎপন্ন হয়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে যথেষ্ট বৃষ্টি হওয়ায় বীজ বপনের সুবিধা হইয়াছে। বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, যশোহর, দ্বারভাঙ্গা ও পূর্ণিয়া জেলায় কিছু দেরিতে বীজ বপন করা হইয়াছিল, অগ্রহায়ণে সমস্ত প্রদেশে প্রায় স্বাভাবিক মত বৃষ্টি হইয়াছিল, শুধু বিহারে ও ছোটনাগপুরে একটু বেশী এবং নিম্ন বঙ্গে ও উড়িষ্যায় একটু কম হইয়াছিল। চম্পারণ ব্যতীত আর সবস্থানে মাঘ মাসে সামান্য কম হইয়াছিল।

বিভিন্ন জাতীয় তৈল বীজ (তিল ব্যতীত) ২১৩৭৪০০ একর জমিতে বপন করা হইয়াছে। গত বৎসর হইতে বেশী জমিতে বপন করা হইয়াছে।

হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ—১৯১১

বিগতবর্ষে নিম্ন বঙ্গে কোন কোন জেলায় জুন মাসে কিছু কম বৃষ্টি হইয়াছিল। জুলাই মাসেও প্রচুর বৃষ্টি না হওয়ায় ধান রোপণ কার্য্য বিলম্বে শেষ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আগষ্ট মাসে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় রোপণ কার্য্যের সন্তোষজনক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ধান পাকিবার সময়ে বৃষ্টিপাতে শস্যের অত্যন্ত উপকার হইয়াছে। ১৯৫৫৪৯০০ একর জমিতে ধান্য রোপণ ও বপন করা হইয়াছিল, তাহাতে ২১৫৬০৩০০০ হন্দর ধান্য হইয়াছে তৎপূর্ব্ব বৎসর ২৫৪৫৫০৪০০ হন্দর ধান্য হইয়াছিল। এক মণ চৌদ্দ সেরে এক হন্দর।
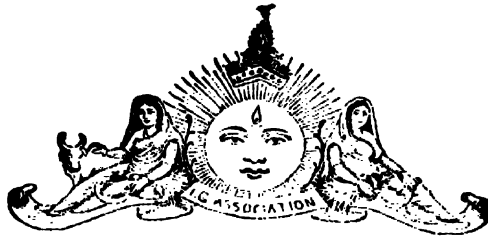
বৈশাখ, ১৩১৯ সাল।

কৃষকের কথা (১৩১৯)

পুরাকালে ঋষিদের যুগে ভারতে কৃষির প্রাধান্য ছিল, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ কৃষিকার্য্য পরিচালনা করিতেন, মধ্যযুগে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের চাকচিক্যে এবং পরদেশীয় সভ্যতার মোহে মধ্যবিত্ত ও ধনাঢ্য অনেকেই কৃষিকার্য্য ঘৃণ্য বলিয়া মনে করিলেন। ভারতের কৃষি নিরক্ষর ইতর লোকের হাতে ন্যস্ত হইল। বর্ত্তমানে ঢেউ অনেকটা ফিরিয়াছে, ইতর ভদ্র অনেকেই এখন ভারতের কৃষির কথা ভাবিতেছেন। তাঁহারা এমেরিকা, জার্ম্মনি, জাপান প্রভৃতি মহাদেশের কৃষির উন্নতি দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, ঐ সকল মহাদেশের মহা কর্ম্মীগণ কৃষির যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাঁরা একটা যব বা একটা গম হইতে ১০০০ সহস্র যব বা গম উৎপন্ন করিতে পারিতেছেন, যে বীট হইতে শতকরা ৫ ভাগ মাত্র চিনি পাওয়া যাইত, সেই বীট হইতে এখন শতকরা ৮০ ভাগ চিনি উৎপন্ন হইতেছে, একক্ষেত্র হইতে বৎসরের ভিতর ছয়টি শস্য উৎপাদিত হইতেছে, অতি সামান্য মাত্রায় নাইট্রোজেন জনিত জীবানুজ সার প্রয়োগে অকেজো জমি হইতে শত শত গুণ ফসল মিলিতেছে, যে পরিমাণ জমিতে আগে একটন বা ২৭ মণ টমাটো জন্মিত তাহাতে এখন ১০ টন বা ২৭০ মণ টমাটো জন্মিতেছে, বিজ্ঞান সম্মত কৃষি পর্য্যালোচনা করিয়া এমেরিকানগণ এক একটা পেঁপে ১০ সের, একটা বেগুন ৬ সের, একটা কুমড়া একমণ দশ সের, একটা তরমুজ একমণের উপর, একটা ফুলকপি দশসের, একটা বাঁধাকপি ত্রিশসের ওজনের ফলাইতে পারিতেছেন। তাঁহাদের উদ্যোগ আছে, প্রাণের চেষ্টা আছে। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের প্রাণ উন্নতির দিকে ধাইতেছে বটে কিন্তু আমাদের চেষ্টা কোথায়। ঐ সকল মহাদেশে সস্তায় রাসায়ণিক পরীক্ষাগার,—যেখানে সেখানে অগণিত কৃষি বিদ্যালয়।

আমাদের দেশের জল হাওয়া মাটি স্বভাবতঃ কৃষির অনুকূল; সেই বলে আমরা এখনও আমাদের অস্তিত্ব রাখিতে পারিয়াছি কিন্তু এই বিজ্ঞানের যুগে এই ঘোরতর জীবন সংগ্রামের কালে, আমাদিগকেও বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হইবে। দেশের লোকের মতি গতি কতকটা সেই দিকে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু এ দেশে যাঁহাদের টাকা আছে তাঁহারা টাকা সংগোপনে রাখিতে চেষ্টা করেন, টাকার অল্প সুদেই সন্তুষ্ট, টাকা দিয়া টাকা রোজগার করিতে চান না বা যাহাতে নিজের রোজগারের পথ উন্মুক্ত হয় তাহাও ভাবেন না। এইত আমাদের দেশের ধনীগণের দোষ, এইত তাঁহাদের স্বভাবজ কৃপণতা উন্নতির পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দ্বিতীয় কথা আমরা স্বভাবতঃই অলস, এদেশে এমন কর্ম্মী কয়জন আছেন যাঁহার উদ্যোগে দেশ মাতিয়া উঠিবে এবং দেশে দেশে পল্লিতে পল্লিতে নূতন প্রথায় নূতন আয়োজনে চাষীদের সঙ্গে লইয়া কৃষির পরিচালনা আরম্ভ হইবে, কৃষক বালকদিগের মধ্যে অভিনব কৃষি প্রথার শিক্ষা বিস্তার করা হইবে। গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগে কৃষিকলেজ স্থাপিত হইতেছে কিন্তু এত বড় মহাদেশের মত একটা দেশে এবং এই ৩৪ কোটি লোকের জন্য সে আয়োজন অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। যখন গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপামর সাধারণ প্রজার প্রাণে প্রাণে কৃষির উন্নতির সুর বাজিয়া উঠিবে তখনই ভারতের কৃষির উন্নতি হইবে, তাহার আগে নহে। পুষায় তত্ত্বানুসন্ধানাগারে কীটতত্ত্বের আলোচনা হওয়ায় ভারতের চাষী এখন ভাবিতে শিখিতেছে যে ফসলে পোকা লাগিলে কেবলমাত্র শাঁক ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা মানিয়া নিরস্ত না হইয়া কিছু না কিছু প্রতিকারের উপায় করা যাইতে পারে। ভারতের রেশমী কাপড়ের মত রেশমী কাপড় কোথাও জন্মিত না, রেশম চাষের উন্নতি করিয়া নষ্ট শিল্পের উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে, পাট ও অন্যান্য সূত্র উৎপাদনকারী গাছ গাছড়ার আবাদের উন্নতি করিয়া ভাল ভাল আঁশ উৎপন্ন করিবার জন্য সরকারী বিশেষজ্ঞগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদের সাধু চেষ্টা কত কালে সফল হইবে তাহা বলা যায় না। এদেশের ধনীগণ, এদেশের জমিদারগণ তাঁহাদের বিলাস বসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সঞ্চিতার্থ বিনা সঙ্কোচে কাজে লাগাইতে প্রস্তুত হইয়া গভর্ণমেণ্টের সহিত যোগদান না করিলে একা গভর্ণমেণ্ট কি করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট প্রদেশে প্রদেশে কৃষি-সমিতি করিয়া ধনাঢ্য প্রজাগণের হৃদয়ে কৃষির উন্নতি বাসনা উদ্দীপিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এখন আমাদের ভাবিবার সময় আসিয়াছে যে, আলস্যে বৃথা জাগিয়া ঘুমাইলে কে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে।

ভারতীয় কৃষি সমিতি আজ ষোল বৎসর হইল এই ভারতীয় কৃষির উন্নতির বাসনা সাধারণের মনে জাগাইয়া দিবার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার

চেষ্টা দ্বারা যতদুর সম্ভব কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ইহার অন্যতম চেষ্টার ফল "কৃষক" প্রচার। গভর্ণমেণ্ট ইহার সাধু চেষ্টায় উৎসাহদান করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট বহু সংখ্যক "কৃষক পত্র" গ্রহণ করিয়া উপযুক্ত স্থানে বিলি করিতেছেন। কৃষকের আদর দিন দিন বাড়িতেছে দেখিয়া ইহার প্রবর্ত্তকগণ সকলেই আশান্বিত হইয়াছেন। কৃষকের গ্রাহক এখন সাধারণ চাষী, কৃষকের গ্রাহক এখন ধনাঢ্য জমিদার। কৃষক এখন বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। কৃষকে কীটতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, রেশম তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত এম, এম, দে, রসায়ন তত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী, সাধারণ কৃষিকার্য্যাভিজ্ঞ জাপান প্রত্যাগত শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার প্রমুখ ব্যক্তিগণ লিখিতেছেন। কৃষক যখন মহামান্য শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিমতে এবং মহারাজা কুচবিহার ও বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সন্তান শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হইতেছে তখন কৃষকের উন্নতি হইবে এইরূপ আশা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় না।

ভারতীয় কৃষি-সমিতি এই সমস্ত গণ্য মান্য ব্যক্তিগণের সহায়তায় কতিপয় ব্যবহারিক কৃষি পুস্তক প্রণয়নে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই সমিতিতে যাবতীয় কৃষি পুস্তক পাইবার পক্ষে সুবিধা হইয়াছে।

ভারতীয় কৃষি-সমিতির অল্পে অল্পে কার্য্যকারিতায় প্রসার বাড়িতেছে। তাঁহাদের চেষ্টায় এক্ষণে তাঁহাদের কৃষিক্ষেত্রের আশে পাশে ২৪ পরগণার দক্ষিণাংশে আলু চাষ সাধারণ কৃষকের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে। কোন কোন চাষী আলুর ক্ষেতে বর্দ্দো মিশ্রণ ব্যবহার করিয়া আলুর চাষে লাভবান হইতে পারিয়াছেন। উক্ত সমিতি বুঝিয়াছেন ও অনেককে বুঝাইতে পারিয়াছেন যে ভদ্রচাষীর পক্ষে কলা বাগান ও পেঁপে বাগান করা বিশেষ লাভজনক। কলা এবং পেঁপে গাছে পাঁকমাটি ও প্রচুর পরিমাণে ছাই দিতে পারিলে প্রত্যেক কলা ঝাড় এবং একটা পেঁপে গাছ হইতে বৎসরে এক টাকা লাভ হওয়া বিচিত্র নহে। পেঁপের চারাগুলি চারি পাঁচ ফিট বড় হইলে তাহার ডগাটি ভাঙ্গিয়া দিয়া গাছটি একটু খর্ব্বাকৃতি এবং ঝাড়বান করিয়া লইতে পারিলে ফল অধিক হয়। নিম্ন বঙ্গের রসা মাটিতে গাছ খুব ধাড়িয়া যায়। গাছের তেজ একটু কমাইয়া রাখা উচিত। উক্ত সমিতি উদ্যানতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে কালজামের গুলকলম, কাঁটালের জোড় কলম, এবং গোঁড়া লেবুর সহিত বাতাবীর চোক কলম করিতে পারিয়াছেন, তাহার ফলাফল লইয়া তিন বৎসর ধরিয়া আলোচনা হইতেছে আমরা এতৎসম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

এক্ষণে আমরা আবার বলিতে চাই যে ভারতীয় কৃষির উন্নতির বাসনা সাধারণের মধ্যে জাগিয়া না উঠিলে কৃষির কোন কাজে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করা

কঠিন। গভর্ণমেন্ট বর্ত্তমান বর্ষে কৃষির উন্নতির জন্য ২০ লক্ষ টাকা খরচ করিবেন কিন্তু তাহাতে কতটুকু উন্নতি হওয়া সম্ভব, আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা যে আমাদের দেশের ধনী ও জমিদারগণ গভর্ণমেন্টের সহিত একযোগে কৃষকের উন্নতিকল্পে অগ্রসর হন।

সবুজ সার

আমাদের দেশের চাষের উন্নতি সম্বন্ধে যত কথা জানিতে পাওয়া যাইতেছে, তন্মধ্যে দুইটী প্রধান। এই দুইটীর বিষয় সকলেই জানে। এই দুইটীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে, সামান্য কৃষক হইতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক পর্য্যন্ত বিধিমতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহার ফলও সাধারণে অবগত আছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ইহার প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যকারিতার কথা সাধারণ কৃষকের গোচর রাখা উচিত। এই দুইটী বিষয়ের প্রথমটী জলের ব্যবস্থা; দ্বিতীয়টী সার।

জল যেমন জমিকে সরস রাখে, সেইরূপ এক রকম সার আছে, যাহা জমিকে সরস রাখিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে, তাহা সবুজ সার। সরস কাঁচা পাতা, লতা, বা প্রশাখা দ্বারা এই কার্য্য হয় বলিয়া ইহাকে সবুজ সার বলিলে মন্দ হয় না। আমাদের দেশে সবুজ সার বলিয়া একটা কবিত্বপূর্ণ নাম করণ প্রচলিত না থাকিলেও ইহার ব্যবহার বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের পল্লীভাষায় সার বলিয়া উহার নাম করণ না হওয়াতে ঐ শ্রেণীর বহু সারের কার্য্যকারিতা এতাবৎ-কাল আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই।

আমরা জানি আমাদের পাড়াগাঁয়ের পিঁপুল ক্ষেতে ছায়ার জন্য ধনিচা বলিয়া এক ক্ষুদ্র গাছের বীজ লাগান হয়। গাছগুলি শীঘ্র বড় হইয়া জমিকে ছায়া দান করে। জয়ন্তি বা জন্তি ফুলের গাছও ঐরূপে লাগাইতে দেখিয়াছি। পূর্ব্বে জানিতাম না, যে শুধু ছায়া দান করা ইহাদের একমাত্র কার্য্য নয়। বৎসরের শেষে ইহার পত্র ও ছোট ডাল দ্বারা জমিকে উর্ব্বরা রাখা, ইহাদের অন্যতম কার্য্য। কিছু দিন পূর্ব্বে পরলোকগত মিঃ এন, জি, মুখার্জ্জি মহাশয় শিবপুর কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্রে ধনিচা পত্রের সারের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া বিশেষ ফল দেখাইয়াছিলেন। ধনিচা গাছ তিনি তিন কাজে লাগাইয়াছিলেন। (১) পশুর খাদ্য, (২) সবুজ সার, (৩) পানের বরজের ঠেকা। নীলকর সাহেবেরা এদেশে সবুজ সারের ব্যবহার অনেক দিন হইতে করিয়া আসিতেছে।

সম্প্রতি পুষা কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে শণের সবুজ সারের দ্বারা অতি উত্তম তামাকুর ফলন হইয়াছে। শণের বৈজ্ঞানিক নাম (Crotalaria jumucca)। ইহার চাষ

এরূপ সময় করা আবশ্যক যে বর্ষার সময় ইহা প্রচুর রস পায় ও শীঘ্র বড়িয়া উঠে এবং পরে জমিতে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

বিহার অঞ্চলে ইহা অতি সুলভ সার বলিয়া প্রচলিত হইতেছে। ইহার জন্য জমিতে বিশেষ কোন চাষ দিতে হয় না। ইহা এত শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, এবং ইহার মূল এত দ্রুত মাটীর নীচে যায় যে, পরে জল না পাইলেও ইহার কোন ক্ষতি হয় না।

পরীক্ষাক্ষেত্রে বর্ষার প্রথমে শুষ্ক পতিত জমির উপর শণ বপন করা হয়। ইহাতে উক্ত জমিতে পরবর্ত্তী বারিপাত হইতে বিশেষভাবে রস সঞ্চিত রাখিয়াছিল, এবং জমি বিশেষ ভাবে উর্ব্বরতা লাভ করিয়াছিল। প্রতি বিঘায় প্রায় /৯ নয় সের বীজ বপন করা হয়। বীজগুলি ছড়াইয়া মাটী মই সমান করিয়া দেওয়া হয়। এক জোড়া বলদে বিলাতী লাঙ্গল দ্বারা এক প্রকার জমি চাষ করা গিয়াছিল। শণ গাছ প্রথমে জড়াইয়া লইয়া লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করা হইয়াছিল। আষাড়, শ্রাবণের মধ্যভাগে কর্ষণ করিয়া ৩৪ সপ্তাহে উহা পচিয়া মৃত্তিকায় মিশ্রিত হইয়াছিল। আশ্বিন মাসের শেষে উহাতে তামাক বুনান হয়। সময়ে বৃষ্টি না হইলে কিছু জল সেচন প্রথমে আবশ্যক। পাশা পাশি দুই জমিতে দুই প্রকার সবুজ সারের সাহায্যে, তামাকু লাগান হয়। প্রথমটী শণের সবুজ সার, দ্বিতীয়টী পুরাতন তামাকের পাতার সার। আশ্বিন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দুই জমির চারাই লাগান হইয়াছিল এবং কার্ত্তিক মাসের প্রথমে শণ সার ব্যবহৃত জমিতে উৎকৃষ্ট তামাকের ফলন দেখা গেল। ঐ সময় দুই জমিরই কঠোশ্রাক লওয়া হয় এবং তাহার বিবরণ প্রচারিত করা হইয়াছে। বিহারের অনেক স্থানে মতিহারী তামাকের চাষ হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে তামাকের পাতা কাটিয়া রাখিয়া জমিতে সার রূপে ব্যবহার করা হইত। কিন্তু এই ঘন শণের সবুজ সার ব্যবহৃত হইলে ভাল তামাকের উৎপন্ন বিলক্ষণ বাড়িবে।

১৯০৯ সালে পুষা পরীক্ষাক্ষেত্রে শণের সবুজ সারের যে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহাতে কোন ফল পাওয়া যায় নাই। ঐ পরীক্ষাও তামাকুক্ষেতে করা হইয়াছিল। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে উপরোক্ত সবুজ সারের প্রয়োগে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠিক সময়ে বপনাদি না হইলে উল্টা ফলই ঘটিয়া থাকে। দুই জমিতে একই প্রকার তামাকু লাগান হইয়াছিল। কেবল সময়ের ইতর বিশেষ রক্ষা হইয়াছিল। একটীতে আশ্বিনের শেষে অপরটীতে কার্ত্তিকের মধ্যভাগে বুনানীর কার্য্য করা হয়। তাহাতে ফসলের আশ্চর্য্য প্রভেদ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

প্রথমটীর বাড় অত্যধিক এবং দ্বিতীয়টীর বাড় নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছিল। তাহাতে কিছু তাপের ন্যূনাধিক্যের কার্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে জমিতে চাষ দিবার অধিক বিলম্বে শণ বুনিলে শণ ভাল হয় না।

শণের সবুজ সার দিয়া কি প্রকারে তামাকের জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে পারা যায়, তাহা এদেশে সকলেই একবার নিজ নিজ ক্ষেতে পরীক্ষা করিতে পারেন। যাঁহারা ভাল তামাকু লাগাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা পুষা পরীক্ষা ক্ষেত্রের সুপ্রথাটী, যাহাতে উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। তামাকের চাষের যতপ্রকার সংবাদ জানা গিয়াছে, আমরা পরে তাহার বিবরণ সাধারণকে গোচর করিতে চেষ্টা করিব। এখন ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে উল্লিখিত নানা জাতীয় সারের মধ্যে সবুজ সার একটী উৎকৃষ্ট সুলভ সার।

পত্রাদি

বেগুয়ার মোহান ও কৃষিকার্য্যের অবনতি।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ, কেশবপুর, পোঃ মলয়পুর, (হুগলী)।

দামোদর নদের তীরবর্ত্তী 'বেগুয়ার মোহান' নামক স্থানের নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে এই 'মোহানটী' ভয়ঙ্কর প্রবল হইয়া কত কৃষীবল প্রজার যে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই স্থান হইতে 'বানসেন' নামে একটী নদী উৎপন্ন হইয়া ভাগিরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উহার উভয় তীরবর্ত্তী স্থানের প্রায় সকল লোকেই কৃষিজীবি। কয়েক বৎসর হইতে এই নদীটী অত্যন্ত প্রবল হইয়া কৃষিকার্য্যের অভাবনীয় অনিষ্ট সংঘটন করিতেছে। বাস্তবিক ঐ সকল স্থানে কৃষিকর্ম্ম যেন একরূপ জুয়া খেলার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে ; শস্য উৎপন্ন হওয়া বা না হওয়া যেন অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। বর্ষা আরম্ভের পূর্ব্ব হইতে কৃষক প্রচণ্ড রৌদ্রে পুড়িয়া কায়ক্লেশে জমিতে লাঙ্গল দিল, বীজ বপন করিল। তাহার পর বর্ষা আরম্ভ হইলে বৃষ্টি, বজ্রাঘাত তুচ্ছজ্ঞান করিয়া জমির পাইট করিয়া ধান্য রোপণ করিল। প্রথম বর্ষায় শস্য সতেজে বাড়িতে লাগিল ; কৃষকের আর আনন্দ ধরে না ! সে মনে মনে কত আশা পোষণ করিতে লাগিল—মহাজনের দেনা শোধ দিবে, 'বাড়ীদারের' ধান্য পরিশোধ করিবে, জমিদারের বাকি বকেয়া মিটাইয়া দিবে, নিজের পারিবারিক অভাব মোচন করিবে ; সেই ক্ষুদ্র এক খণ্ড ভূমির উপর হর্ষোৎফুল্ললোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া সে কালনেমির লঙ্কা ভাগের ন্যায় মনে মনে এককালে কত হিসাবই না ঠিক দিয়া রাখিল !

এমন সময় হঠাৎ এক দিন নদীতে বন্যা আসিয়া চারিদিক ডুবাইয়া দিল। কৃষকের দুর্দ্দশা দেখে কে? তাহার বিপদের উপর বিপদ! সে জলমগ্ন শস্যের—তাহার ভাবী আশা ভরসার—শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিবে, না আপনার ঘর-বাড়ী সামলাইবে? তাহার উপর হয়ত আবার কাহারও গৃহে অন্ন নাই, কাহারও গৃহে গরুবাছুরের খোরাকের অভাব; বিপদের উপর বিপদ আর কাহাকে বলে? আহা! হতভাগ্য কৃষকগণ সে সময়ে যে কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়।

বন্যার জল প্রায় দুই তিন দিন স্থায়ী হয়। তাহাতে কতক শস্য হাজিয়া যায়, কতক কর্দ্দমাক্ত হইয়া নির্জীবের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে। তাহাতেও কৃষক আশা ছাড়ে না—নষ্ট শস্যের স্থানে পুনর্বায় নূতন বীজ আনিয়া রোপণ করে। কিন্তু তাহা হইলেও কি হয়? পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভাবে বন্যার জলে বিধ্বস্ত হইয়া সে শস্যের আর কিছুই থাকে না। জলাভূমি হইলে ত আর কথাই নাই, পৌষ মাসে কাস্তে হাতে লইয়া কৃষককে আর সে দিক দিয়াও যাইতে হয় না। অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে দুই একগাছা খড় দাঁড়াইয়া থাকে।

তবে সব বৎসর সমান যায় না। দৈবাৎ কোন বৎসর বন্যার প্রাদুর্ভাব কম হইলে অল্পবিস্তর শস্য জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সেও না হওয়ার মধ্যে; কারণ সে শস্য প্রায় কৃষকের গৃহে উঠে না; জমিদারের খাজনা ও মহাজনের দেনা চুকাইতেই তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। রবিশস্যের এমন বিশেষ কিছু লাভ নাই, যদ্বারা এই ধান্যের অজন্মাজনিত ক্ষতির পূরণ হইতে পারে। চাকর ও কৃষাণের উপর নির্ভরশীল ভদ্র সন্তানগণকে এইরূপ কৃষিকর্ম্ম পরিচালনায় বড়ই নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত অনেক ভদ্রলোক স্বাধীন জীবিকার পক্ষপাতী হইয়াও কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক চাকুরির চেষ্টায় বাহির হইতেছেন। কৃষকেরাও আপন আপন কার্য্যে বিরক্ত ও বীতরাগ হইয়া দিন দিন যেন অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের দেশে ধান্যই প্রধান শস্য; প্রতি বৎসর বন্যার জলে যদি তাহা এইরূপে বিনষ্ট হয়, তবে দরিদ্র কৃষকগণের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। ভূমিতে শস্যোৎপাদিকা শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকিতেও যে তাহাতে ফসল উৎপন্ন হয় না, ইহা কি কম দুঃখের কথা।

একবার শুনিয়াছিলাম 'বেগুয়ার মোহানাটী' বাঁধিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু এ কথার সত্যাসত্য এ পর্য্যন্ত অবগত হওয়া যায় নাই। যদি প্রজাবৎসল গভর্ণমেণ্ট সত্যসত্যই এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে দরিদ্র প্রজাবর্গের কি পরিমিত উপকার সাধিত হয় তাহা বর্ণনাতীত।

কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর বাহাদুর, গত ২২শে এপ্রিল তারিখে শ্রীমাধবগঞ্জ কৃষি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যান। বেলা ৮॥০ টার সময় হইতে চুয়াডাঙ্গাস্থ ডেপুটী সাহেব, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ, স্কুল সেক্রেটারী ও সুপারিনটেন্ডেন্ট মুন্সিগঞ্জ ষ্টেশনে ৮টী ঘোড়া, পাল্কী, বাহক ইত্যাদি সহ উপস্থিত থাকেন। কিন্তু ডিরেক্টর বাহাদুর ট্রেণ হইতে অবতরণ করতঃ উপস্থিত ভদ্র মহোদয়গণ সহ সদালাপ করিতে করিতে ২॥০ মাইল পদব্রজে যাইয়া স্কুলে উপনীত হন। এই ২॥০ মাইল মাঠের পথে ইক্ষু ও অন্যান্য চাষ যাহা হইয়াছে ও হইতেছে তদ্‌সম্বন্ধে স্কুল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট কৃষিবিদ্‌ পণ্ডিত যামিনী বাবু ডিরেক্টর বাহাদুরকে সম্যকরূপে বুঝাইয়া দেন। স্কুল প্রাঙ্গনে ২০০ শত লোক সমবেত হন। ঐ অঞ্চলের কৃষকগণ ডিরেক্টর সাহেবকে একটী অভিনন্দন দে সাহেব বাহাদুর তদুত্তরে কৃষকগণকে আশা দেন, স্কুল দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া স্কুল প্রতিষ্ঠাতা রাধামাধব দাস মোহন্তকে ধন্যবাদ দিয়া, স্কুলের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পুনরায় পদব্রজে মুন্সিগঞ্জে যাইয়া ট্রেণে কলিকাতায় রওনা হন। চুয়াডাঙ্গা মহকুমাস্থ সকল ব্যক্তিগণ তজ্জন্য সাহেব বাহাদুরকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

উক্ত স্কুলের—সেক্রেটারি শ্রীরাধামাধব দাস মহন্ত।

১। বঙ্গদেশীয় কৃষকগণকে নব প্রণালীতে কৃষিশিক্ষা দিবার জন্য চুয়াডাঙ্গা শ্রীমাধবগঞ্জে চারুচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

২। উক্ত স্কুলে উন্নত প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা দিবার জন্য ১ম ও ২য় বর্ষে সাধারণ কৃষিশিক্ষা দেওয়া হইবে।

৩। যে সকল ছাত্রগণ মাইনর ছাত্রবৃত্তি ও এণ্ট্রেন্স ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে সেই সকল ছাত্রগণকে ভর্ত্তি করা হইবে। প্রবেশ ফিঃ ১৲ এক টাকা।

৪। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রগণকে মাসিক ২৲ দুই টাকা হিসাবে বেতন দিতে হইবে।

৫। স্কুলে মৃত্তিকাতত্ত্ব, সারতত্ত্ব, শস্যতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, কৃষিরসায়ন, শস্যের রোগ নির্ণয় ও নিদান, কীটতত্ত্ব, পশুপালন, পশুচিকিৎসা, পশু-উৎপাদন, বাঙ্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, জ্যামিতি ও পরিমিতি, বীজগণিত, ইংরাজী পাঠ ইচ্ছুক ছাত্রগণকে ইংলিশ লিটারেচার ও গ্রামার পড়ান হইবে ও যে সকল ছাত্রগণ ইংরাজি শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইবে। তজ্জন্য স্বতন্ত্র ফিঃ দিতে হইবে না।

৬। বিদেশী হিন্দু মুসলমান ছাত্রগণের থাকিবার স্থান (বোর্ডিং) চাকর এবং পাচক সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইবে। খোরাকী নিজ নিজ ব্যয়ে বহন করিতে হইবে। ব্যয় সংক্ষেপ জন্য কমিটী দৃষ্টি রাখিবেন, ৫৲ পাঁচ টাকার অধিক ব্যয়ের সম্ভাবনা নাই।

৭। যাহারা চাউল, দাইল প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিবে বিনা ব্যয়ে তাহাদিগের বাসস্থান দেওয়া হইবে।

৮। ছাত্রদিগকে কার্য্যকরী শিক্ষা দানের জন্য স্কুল সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র রাখা হইবে।

৯। স্কুলে একজন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কৃষিবিদ্ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, হেডমাষ্টার, সেকেণ্ড মাষ্টার, হেড পণ্ডিত রাখা হইবে।

১০। ঐ বিদ্যালয়ে নৈশ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বেতনদানে অপারগ হইলে তাহাদের নিকট হইতে শস্যাদি গ্রহণ করা যাইবে।

১১। আবশ্যকতা অনুসারে ম্যানেজিং কমিটি নিয়মাবলী পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিতে পারিবেন।

সার-সংগ্রহ

প্রাচীন ভারতে দুগ্ধাদি গব্য

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত লিখিত

প্রাচীনকালে গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ।

প্রাচীন ভারতে এক একটী গাভী কি পরিমাণ দুগ্ধ দিত, তাহা নিশ্চয় করিয়া নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। যাহারা বিলাতী প্রণালীমতে গোপালন এবং গব্য ব্যবসায় চালনা করে, তাহাদের গোশালার প্রত্যেক গাভীর দৈনিক, অন্ততঃ সাপ্তাহিক, একটী দুগ্ধ-তালিকা থাকে। এরূপ দুগ্ধ-তালিকা রাখিবার প্রথা যদিও সে কালে প্রচলিত ছিল না তথাপি এ কথা নিশ্চয় যে বংশাদি এবং আহারাদি ভেদে তখনও গাভীগণের দুগ্ধের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইত। গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক উপকথা প্রচলিত আছে। গোবংশের বিখ্যাত মাতা সুরভি সম্বন্ধে রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, রাবণ বরুণালয়ে তাহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে সুরভির স্তন হইতে অবিরাম দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে, এবং সেই ক্ষরিত দুগ্ধ মিলিত হইয়া ক্ষীরোদসাগরের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাভারতে বশিষ্ঠের নন্দিনী নামক হোমধেনুর বর্ণনা আছে, তাহাও প্রায় তদ্রূপ। নন্দিনী সুরভিরই অবতার। সেই নন্দিনার বর্ণনা দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্যাসাদি ঋষিগণ অতি সূক্ষ্মভাবে অভিনিবেশ পূর্ব্বক গাভীর গুণাগুণ আলোচনা করিতেন।

উধোদেশ (উলান) বিস্তৃত, দোহন করিতেও আরাম, গাত্রচর্ম্ম সুখস্পর্শ, খুর উৎকৃষ্ট, সেই গাভী মঙ্গলস্বরূপা, সর্ব্বগুণযুক্তা এবং সুশীলা। যে ভাগ্যবান মানব এ গাভীর ক্ষীর পান করে, সে স্থিরযৌবন লাভ করিয়া দশ হাজার বৎসর জীবিত থাকে। যাহা হউক এ সকল উপকথা মাত্র। অমরকোষে আমরা একটী শব্দ পাইতেছি "দ্রোণক্ষীরা" বা "দ্রোণদুঘা"। দ্রোণ অর্থে অর্দ্ধমণ বুঝায়। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে বেশী দুধের গাভীর আজকাল দেশে যেরূপ "অত্যন্তাভাব" পুরাকালে সেরূপ ছিল না। শাস্ত্রে স্থানে স্থানে সেকালের সাধারণ গাভীদিগের

যে বর্ণনা পাঠ করা যায়, একজন অভিজ্ঞ গোপালক তদ্দৃষ্টে তাহাদের দুগ্ধেরও পরিমাণ সম্বন্ধে নিশ্চয়তার সহিত অনুমান করিতে পারেন। আজকালের বঙ্গদেশীয় সাধারণ গাভী পানাইলে, বাছুর যখন তাহার দুগ্ধ পান করে, পাঠক লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, সেই হতভাগ্য বাছুরের মুখ বহিয়া এক ফোঁটাও দুগ্ধের ফেনা মাটিতে পড়ে না; আবার ৫।৭ সের দুধ দেয় এরূপ একটী নাগরা গাই পানাইয়া, বাছুরকে যখন দুধ খাইতে দেয়, পাঠক লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, তখন বাছুরের মুখ বহিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধফেন মাটিতে পড়ে। ১০।১২ সের দুধ দেয় এরূপ গাভীর বাছুরের মুখ দিয়া ঐরূপ অবস্থাতে প্রচুর পরিমাণ দুগ্ধফেন বহিতে থাকে। পুরাকালে পরীক্ষিত রাজা মৃগয়া করিয়া, ক্লান্ত শরীরে মৌনব্রতাবলম্বী ঋষিবর শমীকের নিকট উপস্থিত হইয়া, ক্রোধভরে ঋষির গলায় মৃতসর্প ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। সেই সময়ে ঋষিবর বাছুরের মুখনিঃসৃত বহুল পরিমাণ দুগ্ধফেন পান করিয়া তনুরক্ষা করিতেছিলেন। ঋষিবর ধৌম্যের শিষ্য উপমন্যুও ঐরূপে বৎসমুখনিঃসৃত দুগ্ধফেন পান করিয়া শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, আর্য্যভারতে অনেক গাভীই ১০।১২ সের দুধ দিত। আইন-আকবরী পাঠে আমরা জানিতেছি যে, আকবর বাদসাহের সময়ে বঙ্গদেশ উৎকৃষ্ট গাভীর জন্য বিখ্যাত ছিল এবং অনেক বঙ্গীয় গোমাতা দৈনিক আধমণ করিয়া দুধ দিত।

দুগ্ধের গুণ

প্রাচীনভারতে দুগ্ধ একটী প্রধান খাদ্য মধ্যে পরিগণিত ছিল এবং শাস্ত্রকারগণ নানাস্থানে দুগ্ধের অশেষ গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। "অমৃতং বৈ গবাং ক্ষীরম্ ইত্যাহ ত্রিদশাধিপঃ।" ৫ অ, ১০১ অনুশাসন—শান্তিপর্ব্ব। অত্রিসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে যে কপিলা গাভী দোহন করিয়া তাহার ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলে চণ্ডালও শুদ্ধিলাভ করে। স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার পর্ব্বত-বিহারকালে তিনি ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া অনেক উপকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি দৈনিক দশ সের দুগ্ধ পান করিতেন। রাজা রামমোহন রায় দৈনিক বার সের দুগ্ধ সেবন করিতেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মত এই যে, সুস্থ গাভীর দুগ্ধ উলান পরিষ্কার করিয়া পরিষ্কৃত পাত্রে পরিষ্কৃত হস্তে সতর্কতার সহিত দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিলে জ্বাল দেওয়া দুধ অপেক্ষা সমধিক লঘুপাক এবং পুষ্টিকর।

আয়ুর্ব্বেদ মতে দুগ্ধের গুণ

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আমাদের কোন অধিকার নাই। তথাপি গ্রন্থাদি পাঠে আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা অতিশয় মূল্যবান। সুশ্রুতাদি দুগ্ধ এবং অপরাপর গব্য দ্রব্যের এতদূর অনুশীলন করিয়াছিলেন যে আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকও তাঁহাদের নিকটে অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। আমরা সংক্ষেপে নিম্নে তাহার সারাংশ উল্লেখ করিতেছি। ভাবপ্রকাশ গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ড দ্বিতীয় ভাগে দেখা যায় দুগ্ধ সুমধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তনাশক এবং মলনিঃসারক, সদ্য শুক্রকারক, শীতল এবং শরীরের হিতকর, জীবনীশক্তি এবং বল ও

মেধাবর্দ্ধক। (২) বাল্যকালে ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, পরে বলকারক ও বীর্য্যপ্রদ। বৃদ্ধবয়সে রাত্রিতে দুগ্ধ পানে অনেক দোষ দূর হয়। অতএব সর্ব্বকালেই দুগ্ধ সেবন করিবে। সূর্য্যোদয়ের প্রহরেক পরে দুগ্ধ সেবন করিতে হয়। বালবৎসা কিম্বা মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষকারক। বকনাগাভীর দুগ্ধ ত্রিদোষ-নাশক, তৃপ্তিদায়ক ও বলকারক। প্রভাতকালের দুগ্ধ সন্ধ্যাকালের দুগ্ধ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরুপাক এবং শীতল। সন্ধ্যাকালের দুগ্ধ প্রাভাতিক দুগ্ধ অপেক্ষা লঘুপাক এবং বাত ও কফনাশক কারণ দিবাকালে গরু সূর্য্যালোক ও বায়ু সেবন করিতে পারে এবং বিচরণ দ্বারা ব্যায়ামলাভ হয়। আহার ও গোচারণের স্থান অনুসারে দুগ্ধের গুণের তারতম্য দৃষ্ট হয়। জাঙ্গল, অনুপ বা জলাভূমি এবং পর্ব্বত এই তিনের মধ্যে বিচরণকারী গাভীর দুগ্ধ ক্রমানুসারে অধিকতর গুরুপাক। দুগ্ধের মধ্যে ঘৃতের ভাগেরও আহার অনুসারে তারতম্য হয়। স্বল্পাহার দিলে গাভীর যে দুধ হয়, তাহা গুরুপাক এবং কফকারক কিন্তু বলকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক। ইহা সুস্থ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। পলাল, তৃণ এবং কার্পাস বীজ আহার করিলে যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা রোগীদিগের উপকারী। ইক্ষু এবং মাসকলাইপত্র ভক্ষণে উৎপন্ন দুগ্ধ এবং ঊর্দ্ধশৃঙ্গযুক্ত গাভীর দুগ্ধ পক্কই হউক আর অপক্কই হউক উপকারী। বর্ণ বিশেষে দুগ্ধের গুণ বিশেষ দৃষ্ট হয়। যথা কৃষ্ণবর্ণ গাভীর দুগ্ধ বাতনাশক এবং অধিকতর উপকারী। পীতবর্ণ গাভীর দুগ্ধ পিত্তবাতহারক। শুক্লবর্ণ গাভীর দুগ্ধ গুরুপাক এবং শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। রক্তবর্ণ অথবা বিচিত্রবর্ণ গাভীর দুগ্ধ বাতহারক। ধারোষ্ণ গোদুগ্ধ অমৃত তুল্য। "ধারোষ্ণ দুগ্ধং অমৃততুল্যং।" ধারোষ্ণ দুগ্ধ বলকারক, লঘু, শীতল এবং অমৃত সমান ক্ষুধাবর্দ্ধক, ত্রিদোষঘ্ন, কিন্তু সেই দুগ্ধধারা শীতল হইলে পরিত্যাগ করিবে। গরুর দুগ্ধ ধারোষ্ণই প্রশস্ত, ধারা-শীতল মহিষের দুগ্ধ প্রশস্ত। পক্ক ও উষ্ণ মেষদুগ্ধ পথ্য এবং পক্কশীতল ছাগদুগ্ধ পথ্য। পক্ক, অপক্ক, পর্য্যুসিত ইত্যাদি অবস্থাভেদে দুগ্ধের গুণভেদ দৃষ্ট হয়। যথা পর্য্যুসিত দুগ্ধ গুরুপাক এবং কষ্টদায়ক। অপক্ক দুগ্ধ শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর এবং গুরুপাক। পক্ক উষ্ণ দুগ্ধ কফ এবং বায়ুনাশক। পক্ক ঠাণ্ডা দুগ্ধ পিত্তনাশক। লবণযুক্ত দুগ্ধ এবং নষ্ট দুগ্ধ পরিত্যজ্য। বিবর্ণ, বিরস, দুর্গন্ধ, অম্ল, এবং গ্রথিত (ছানাইল) দুগ্ধ পরিত্যাগ করিবে। অম্ল ও লবণযুক্ত দুগ্ধ কুষ্ঠাদি রোগ উৎপাদক। দুগ্ধান্ন বা পায়সাদি চক্ষুর হিতকর, বলকারী, পিত্তনাশক এবং ত্রিদোষনাশক। দুগ্ধান্নগুণাঃ—"চক্ষুর্হিতত্বং বলকারিত্বং পিত্তনাশিত্বং রসায়নঞ্চ।" চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ উপকারী—"ক্ষীরং সশর্করং পথ্যং।" গরম না করিয়া দুগ্ধ সেবন নিষেধ। এবং উষ্ণ দুগ্ধও লবণ যোগ করিয়া সেবন করিবে না। "ক্ষীরং ন ভুঞ্জীত কদাপ্যতপ্তং তপ্তঞ্চ নৈতৎ লবণেন সার্দ্ধং।" ঘন দুগ্ধ স্নিগ্ধ এবং শীতল, সর্ব্বদা সেবন করিবে না। কারণ তাহাতে ভাল শরীরেও ক্ষুধামান্দ্য হয় এবং মন্দাগ্নি থাকিলে ক্ষুধা একেবারেই নষ্ট হয়। "স্নিগ্ধং শীতং গুরুক্ষীরং সর্ব্বকালে ন সেবয়েৎ। দীপ্তাগ্নিং কুরুতে মন্দং মন্দাগ্নিং নষ্টমেবচ।" সুশ্রুতাদি গোদুগ্ধের সহিত মহিষ ও ছাগদুগ্ধের তুলনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহা আমাদের বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। তাঁহারা গোদুগ্ধের বিশেষ গুণ এইরূপে উল্লেখ করিতেছেন। গব্য দুগ্ধ সুরস এবং সহজপাচ্য, শীতল শুক্রবৃদ্ধিকারক, স্নিগ্ধ এবং বাতপিত্ত ও কফনাশক। শরীরস্থ ধাতুসকলের কিঞ্চিৎ ক্লেদকারক এবং গুরুপাক। গোদুগ্ধ সেবনে জরা এবং সমস্ত রোগের শান্তি হয়।

মহিষের দুগ্ধ গোদুগ্ধ হইতে অধিকতর মধুর এবং মাখনযুক্ত, শুক্রকারক এবং গুরুপাক, নিদ্রাকারী, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক এবং অতিশয় শীতল। ছাগদুগ্ধ কষায়, মধুর, শীতল, ধারক, এবং সহজপাচ্য, রক্তপিত্তদোষ এবং অতিসারনাশক, ক্ষয়কাশ এবং জ্বরনাশক। ছাগ ক্ষুদ্রকায়, কটুতিক্তাদিভোজী, অল্পাম্বুপায়ী এবং সর্ব্বদা ব্যায়ামনিরত। এইজন্য ছাগদুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক।

প্রাচীন মতে দধির গুণ।

প্রাচীন আর্য্যগণ যেরূপ দুগ্ধ সেবন করিতেন, তাঁহারা দধি এবং ঘি মাখনও সেইরূপ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। "দধি দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে, দধি দ্বারা স্বস্তিবাচন করিবে, দধি দান করিবে, দধি ভোজন করিবে।" "ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে, ঘৃত দ্বারা স্বস্তিবাচন করিবে, ঘৃত লাভ করিলেই তাঁহা ভোজন করিবে।" প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দধি এবং মাখনের দৃষ্টান্তই অত্যন্ত প্রচলিত। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি বলিতেছেন "হে সৌম্য দধি মন্থন করিলে তাহার সূক্ষ্মতর অংশ সকল উপরে ভাসিয়া উঠে, তাহারই নাম সর্পী বা মাখন।" ইহাতে দেখা যায় তাঁহারা সচরাচরই দধি ব্যবহার করিতেন এবং তাহা মন্থন করিয়া মাখন উঠাইতেন, এবং সেই মথিত দধি যাহাকে আমরা মাটা বা ঘোল নামে অভিহিত করি তাহাও তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট যাহা নূতন আবিষ্কার, প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে তাহা সুপরিচিত ছিল। দধি সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিতেছেন যে দধি বাতপিত্তনাশক, রুচিকর, ক্ষুধা, এবং বলবৃদ্ধিকারক। আধুনিক বিজ্ঞানও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে দধি শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। যে বীজাণু দুগ্ধ মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া তাহাকে দধিরূপে পরিণত করে (Bactirium acidi lactici) বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে তাহার একটী অপূর্ব্ব শক্তি এই যে তদ্দ্বারা নানা প্রকার রোগাদির বীজাণু বিনষ্ট হয়। এই কারণে পাশ্চত্য জগতেও আজ কাল দধির বিশেষ আদর দৃষ্ট হইতেছে। এ বিষয়ে ভারত পাশ্চত্য জগতেরও গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছে বলিতে হইবে। ইহা এ দেশের একটী বিশেষ গৌরবের কথা।

প্রাচীন মতে ঘৃত মাখনাদির গুণ।

দধির ন্যায় ঘৃতও প্রাচীন আর্য্যদিগের অতি সমাদরের বস্তু ছিল। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে "আজ্য বা গলিত ঘৃত দেবগণের প্রিয় বস্তু। ঘৃত (ঘনীভূত) মনুষ্যগণের, আয়ুত বা ঈষৎ গলিত ঘৃত পিতৃগণের এবং নবনী গর্ভস্থ শিশুগণের প্রিয় বস্তু।" ঘৃত ও নবনীত সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিতেছেন "সদ্যজাত নবনীত লঘুপাক, সুকুমার, ধারক, ঈষদম্ল, শীতল, পবিত্র, ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, তৃপ্তিকর, সংগ্রাহী, বায়ুপিত্তনাশক, শুক্রকর ও জ্বালানিবারক, বলকর, পুষ্টিকর, পিপাসা-নিবারক, বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। দুগ্ধ হইতে উত্থিত নবনীত উৎকৃষ্ট মাধুর্য্যযুক্ত, অতি শীতল, সৌন্দর্য্যবৃদ্ধিকারক, চক্ষুর উপকারী, বলকারক, শুক্রকর, স্নিগ্ধ, রুচিকর, মধুর, রক্তপিত্তের উপকারী এবং গুরুপাক (৩০)।

ঘৃতের গুণ সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিতেছেন—"ঘৃত ধৈর্য্যদায়ক, শীতবীর্য্য, মৃদুমধুর, ঈষৎ সর্দ্দিকারক, এবং লাবণ্যদায়ক। স্মৃতি-মতি-মেধা-কান্তি-স্বরলাবণ্য-সৌকুমার্য্য-

শক্তি-তেজ এবং বলবৃদ্ধিকারক। আয়ুর্বর্দ্ধক, শুক্রকারক, পবিত্র, বয়স্থাপক, গুরুপাক, চক্ষের উপকারী, শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর। গব্যঘৃত সকলের শ্রেষ্ঠ, চক্ষুর বিশেষ উপকারী, এবং বলবর্দ্ধক।

অপরাপর গব্য খাদ্য।

উপরের লিখিত ভিন্ন অপরাপর গব্য দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যাহা জানা যায় তাহারও আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। দধির সর (মালাই) গুরুপাক, শুক্রকর, বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফকারক। সর-রহিত দধি অর্থাৎ মাখন টানা দুধের দধি—রুক্ষ, ধারক, বাতনাশক, ক্ষুধাকারক, লঘুতর, রুচিকর। শরৎ, গ্রীষ্ম এবং বসন্ত কালে সেই দধি সেবন অনেক সময়ে অনিষ্টকারী হয়। হেমন্তে, শীতে, এবং বর্ষাকালে সেই দধি প্রশস্ত। মস্তু অর্থাৎ দধি ছাঁকিলে যে জলীয়ভাগ থাকে—তাহা তৃষ্ণা এবং ক্লান্তিনিবারক মধুর, কফ ও বায়ুনাশক, আনন্দদায়ক, প্রীতিকর, মলনিবারক, এবং বলদায়ক। মস্তু বা দধি ছাঁকা জলের গুণ সুশ্রুত বলিতেছেন—ভালরূপে দধি ছাঁকিয়া যে জল হয়, তাহা রুচিকর, পক্ক দুগ্ধ হইতে জাত মস্তু অধিক গুণশালী, তাহা বাত পিত্তের উপকারী, ধাতু, অগ্নি ও বলের বর্দ্ধক। তক্র—মাঠা বা ঘোল—অম্লমধুর, ধারক, বীর্য্যকারক, লঘুপাক, রুক্ষ, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, প্রীতিকর এবং মূত্রকৃচ্ছ্রের নাশক। দধি মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া অর্দ্ধেক জলযোগ করিলে তাহার নাম তক্র। তাহা স্বাদু অম্ল ও রসযুক্ত। মথিত মাখন ও জলরহিত দধির নাম ঘোল। ক্ষত স্থানে, দুর্ব্বল শরীরে কিম্বা শরীর উষ্ণ থাকিলে, তক্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। শীতকালে অগ্নিমান্দ্য হইলে কফ বা বায়ু জনিত রোগে তক্র ব্যবহার প্রশস্ত। বাতরোগে সৈন্ধবযুক্ত অম্ল তক্র, এবং পিত্তরোগে চিনিযুক্ত তক্র প্রশস্ত। দধিপিণ্ড ক্ষীরসার, কিনাট ইত্যাদি—দধি তক্র কিম্বা নষ্ট দুগ্ধ পরিষ্কার বস্ত্রে বাঁধিয়া দ্রব ভাগ বাহির করিয়া দিলে যাহা থাকে তাহার নাম পিণ্ড। তাহা বলবীর্য্যবর্দ্ধক ও পুষ্টিকারক, গুরুপাক, শ্লেষ্মাবর্দ্ধক, প্রীতিকর, বাতপিত্তনাশক। ক্ষুধা প্রবল হইলে কিম্বা অনিদ্রা হইলে ইহা উপকারী। মোরট বা ক্ষীরি অর্থাৎ প্রসবের সাতদিন মধ্যে যে দুগ্ধ হয় (colostrum)—তাহাতে মুখশোষ, তৃষ্ণাদাহ, এবং রক্তপিত্তজনিত জ্বর নষ্ট করে। তাহা লঘুপাক, বলকারক এবং চিনিযুক্ত হইলে রুচিকর। সন্তানিকা বা দুধের সর—ইহা গুরুপাক, শীতল, বীর্য্যকর, পিত্তরক্ত ও বায়ুরোগনাশক, তৃপ্তিকর, স্নিগ্ধ এবং কফনাশক। মথিত দুগ্ধ—দণ্ডমথিত গোদুগ্ধ এবং ছাগদুগ্ধ ঈষৎ উষ্ণ থাকিতেই পান করিবে। ইহা লঘুপাক, বীর্য্যকর, জ্বরনাশক, এবং বাতপিত্তকফনাশক। দুগ্ধফেন সদ্যদুগ্ধ, ফেন ত্রিদোষ নাশক, রুচিকর এবং বলবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক, লঘুপাক, এবং পথ্য। অতিসারে, অগ্নিমান্দ্যে, জ্বরকালে এবং অজীর্ণে ইহা বিশেষ উপকারী।

(প্রবাসী)।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

কৃষিক্ষেত্র।—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউশ ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন ভাঁটি বান্ধিয়া দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ।—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মুলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চারা তৈয়ার করিতে হইবে।

ফুল বাগিচা।—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূল গুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্ব কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরান্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুলবীজ বপনেরও এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের ধাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কিন্তু ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ খণ্ড। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ সাল। { ২য় সংখ্যা।

সব্জী চাষ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিদল রবিশস্য (LEGUMINOSÆ CROPS)

মটর, মুগ, মসুর, অরহর, সিম এমন কি মাটকড়াই, ধঞ্চে, শন প্রভৃতিও লেগুমিনোসি উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। যে সকল শস্যের শুঁটি হয় এবং যাহার বীজ হইতে ডাউল তৈয়ারী হয় তাহাই এই শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছে। দ্বিদল হইতেই দাউল কথার উৎপত্তি। এই শ্রেণীতে অনেকগুলি শস্য আছে সকলগুলির আলোচনা করিবার স্থান বর্ত্তমানে এ পুস্তকে হইবে না। সব্জী বাগানে উৎপন্ন করিবার উপযুক্ত মটর, সীম, প্রভৃতির আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রস্তাবনার শেষ করিব। দোয়াঁস মাটিতেই ইহাদের চাষ ভাল হয়। শুঁটিধারী শস্যের জন্য নাইট্রোজেন সারের বিশেষ আবশ্যক হয় না। হাড়ের গুঁড়া ও পটাস প্রয়োগ করিলে এই প্রকার শস্যে বিশেষ উপকার হয়। পুরাতন গোবর, ছাই ও তাহার সহিত চূণ মিশ্রিত মিশ্রসার প্রয়োগ করিলে ফলন খুব ভাল হইতে পারে।

কেবলমাত্র গোবর সার প্রয়োগ করিলে গাছের খুব বৃদ্ধি হয় কিন্তু ফলন তাদৃশ অধিক হয় না, ইহার একমাত্র কারণ যে গোবরে নাইট্রোজেনের মাত্রা অধিক, তাহার ফলে লতাপাতারই খুব বাড় হয়। গোবর কিন্তু সাধারণ সার, ইহাতে ফস্ফরিক এ্যাসিডও আছে। এই জন্য অন্য সারের সহিত মিলাইয়া গোবর প্রয়োগে খুব উপকার হয়।

বিলাতী মটর

বপনের সময়—আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ

বিলাতী মটর।

শুঁটী সাধারণ দেশী মটর অপেক্ষা প্রায় চারিগুণ বড়, খাইতে সুমিষ্ট, খোসা সমেত খাইতেও নরম, বীজ কাঁচা অবস্থায় কুলের আঁটির মত।

মৃত্তিকা—সারযুক্ত হাল্কা দোয়াঁস মাটি বিলাতী মটরের উপযোগী। যে কোন প্রকার সব্জীচাষ করা হউক না কেন, জমি লাঙ্গলাদি দিয়া উত্তমরূপ প্রস্তুত করা হইলে, ফসলের ফলন বেশী পরিমাণে হইবে সন্দেহ নাই। অতএব যখন যে কোন প্রকার চাষের আবশ্যক, মৃত্তিকা যতদূর পারা যায় ধূলির ন্যায় (ঢেলা বিহীন) করিবার নিমিত্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সার—যে কোন প্রকার পুরাতন গোবর সারের সহিত অল্পাধিক পরিমাণে হাড় চূর্ণ ও ছাই মিশ্রিত করিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। কেবলমাত্র পুরাতন গোবর সারও দেওয়া যাইতে পারে। নূতন সার (অর্থাৎ যাহা সম্পূর্ণরূপে সারে পরিণত হয় নাই) প্রয়োগ করা উচিত নয়।

বপন প্রণালী—সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া. মৃত্তিকা রীতিমত প্রস্তুত হইলে, প্রস্থে দুই ফুট, গভীর দুই তিন ইঞ্চি ও আবশ্যকানুযায়ী দীর্ঘ গর্ত্ত বা নালা কাটিতে হইবে। প্রত্যেক নালা পার্শ্ববর্ত্তী নালা হইতে মটর গাছের ছোট ও বড় হিসাবে তিন ফুট হইতে ছয় ফুট পর্য্যন্ত অন্তর থাকিবে। এইরূপে নালা প্রস্তুত হইলে, প্রতি নালার মধ্যস্থলে দেড় ফুট অন্তর দুই ইঞ্চি গভীর দুইটি লাইন কাটিয়া তাহাতে মটর বীজ বসাইতে হইবে। প্রত্যেক খোপে দুই দুইটি করিয়া প্রত্যেক বীজটা এক ইঞ্চি পৃথক বসাইবে। একটী খোপের অন্তর আর একটী হইতে ৬ ইঞ্চি হওয়া চাই। দুই ইঞ্চি মাটি চাপা দিতে হয়। বীজ বপন করিয়া যাহাতে কাট-বিড়াল, পাখী প্রভৃতি বীজ খাইয়া না ফেলে সে বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে।

জলসিঞ্চন—মাটি শুষ্ক থাকিলে বীজ বপন করিয়াই জল দিতে হইবে। জলসিঞ্চন ব্যাপার পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কেবলমাত্র মটর সম্বন্ধে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, মটর গাছে বেশী জল দিবার আবশ্যক করে না। ইহা অনেকটা "তাত" (জলাভাব) সহ্য করিতে পারে।

অবশিষ্ট কার্য্য—গাছ বড় হইলে যষ্টি বা শাখা প্রশাখা গাছের অবলম্বনস্বরূপ ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে পুতিয়া দিতে হয়। ক্ষেত্রে আগাছা জন্মিলে তুলিয়া ফেলাও গাছের মূলদেশে পার্শ্ব হইতে টানিয়া সামান্য মাটি চাপা দেওয়া ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই করিতে হয় না।

বিশেষ কার্য্য—বড় মটরশুঁটি উৎপন্ন করিবার ইচ্ছা হইলে গাছে অল্পবিস্তর ফুল ধরিলে গাছের অগ্রভাগ (ডগা) অঙ্গুলি দ্বারা ছিঁড়িয়া দিতে হয়।

বীজের পরিমাণ—প্রতি একরে ৫ সের বীজ বপনের আবশ্যক হয়। সখের জন্য চাষ করিলে, পাতলা বীজ বপন করাই ভাল। দেশী ও ওলন্দা মটর ছড়াইয়া বোনা হয়। ইহাতে বীজ কিছু অধিক আবশ্যক হয়। কারণ এরূপ বুনিলে অনেক বীজ নষ্ট হয়

দেশী মটর বা কলাই শুঁটী

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক

সুচাষে দেশী মটরের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে দেখুন

কৃষকগণ ধান বা পাটের বিস্তৃত এঁটেল দোয়াঁশ ক্ষেত্রে যে মটর চাষ করিয়া থাকে এঁটেল মাটির গুণে তাহাতে উৎপন্ন মটরগুলি একটু শক্ত হয়। ঐ মটর শুষ্ক করিয়া দাউলরূপে ব্যবহৃত হয়। এরূপ ক্ষেতের দাউল রন্ধনেও সহজে সুসিদ্ধ হয় না। কিন্তু বাগানের দোয়াঁস মাটীতে যে মটর চাষ হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত নরম এই জন্য ইহার শুঁটী কাঁচা অবস্থায় তরকারিতে ব্যবহৃত হয় কিম্বা দাউল

করিলেও উৎকৃষ্ট হয় ও শীঘ্র গলিয়া যায়। বাগানে চাষ করিবার জন্য দেশী মটর যাহা সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান—পাটনাই শাদা, লাল ও কোঁকড়ান ওলন্দা ও দেশী সবুজ—ইহার মধ্যে ওলন্দা মটরই উৎকৃষ্ট। ইহার বীজ কোঁকড়ান ও শুঁটী অত্যন্ত নরম—ইহার শুঁটী খোলাসুদ্ধ তরকারিতে দিলে গলিয়া যায়—ইহা প্রায় বিলাতী মটরের সমতুল্য। ছাই মিশ্রিত পুরাতন গোবর-সারই ইহার উৎকৃষ্ট সার। বিঘাপ্রতি দশ সের বীজ লাগে।

রোপণ প্রণালী—বিলাতির অনুরূপ কিম্বা হাতে ছড়াইয়া বোনা হয়।

মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া ঘাস বাছিয়া দেওয়া ও আবশ্যকমত জল সেচন ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য নাই।

বিলাতী সীম—ব্রড্ বীন্

বপনের সময়—আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ

মৃত্তিকা—অল্পাধিক কঠিন দোয়াঁস মাটি। হাল্‌কা মাটি উপযুক্তরূপ সার সংযুক্ত হইলে ব্রড বীনের উপযোগী হয়।

সার—সার পুরাতন গোবর-সার মৃত্তিকার সহিত বিশেষরূপে মিশ্রিত করিয়া ধূলিবৎ করিতে হইবে। গোবরসারের সহিত কিছু হাড়ের গুঁড়া ও ছাই মিশাইলে ভাল হয়।

বপন প্রণালী—প্রস্থে দুই ফুট, গভীর তিন ইঞ্চি, আবশ্যকানুযায়ী লম্বা নালা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রত্যেক সারি ৫ ফুট অন্তর থাকিবে। নালার মধ্যস্থলে এক ফুট অন্তর দুই বা তিন ইঞ্চি গভীর দুইটী লাইন কাটিয়া তাহাতে ছয় ইঞ্চি পৃথক এক একটী ব্রড্ বীনের বীজ বসাইয়া প্রায় তিন ইঞ্চি মাটি চাপা দিতে হয়।

জলসিঞ্চনের ও অবশিষ্ট কার্য্য—গাছগুলি এক ফুট দীর্ঘ হইলে দুই নালার মধ্যস্থিত উচ্চ জমি হইতে কোদালি দ্বারা মাটি কাটিয়া গাছের গোড়ায় দিতে হইবে। এইরূপে গাছের মূলদেশ (যাহা পূর্ব্বে নিম্ন ছিল) পার্শ্বস্থিত জমি অপেক্ষা উচ্চ করিয়া লইতে হইবে এবং এক্ষণে ঐ উচ্চ জমি নালায় পরিণত হওয়ায় এই নালা দিয়া গাছে জল দিবার পূর্ব্বমত সুবিধা রহিল। পূর্ব্বে যেরূপ নির্ম্মিত নালা (যাহাতে বীজ বপন করা হইয়াছিল) দিয়া জল সিঞ্চন করা হইত এক্ষণে এই নূতন নালায় সেই কার্য্য হইবে। জল সিঞ্চনের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

বিশেষ কার্য্য—গাছগুলি তিন ফুট দীর্ঘ হইলে অথবা রীতিমত ফুল ধরিলে শাখার অগ্রভাগ (ডগা) ছিঁড়িয়া দিতে হইবে। নচেৎ সীম ধরিবে না। অন্য বিলাতী সীম গাছের অগ্রভাগ ছিন্ন করিতে হয় না।

বীজের পরিমাণ—প্রতি একরে ৪॥০ সের হইতে ৫ সের পর্য্যন্ত।

আমাদের দেশী মাখম সীমও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার গাছ খুব বড় হয় ও অনেকদুর লতাইয়া যায় সুতরাং ইহা খুব ফাঁক করিয়া বপন করা শ্রেয়ঃ। ১২টি গাছ জন্মাইতে পারিলে এক বিঘা জমি জুড়িয়া যায়।

বিলাতী সীম—রাণার বীন্

বপনের সময়—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক

ফরাস বীন (লতানিয়া)

বপন প্রণালী—এক লাইন করিয়া বীজ বসাইলে প্রত্যেক লাইন প্রস্থে এক ফুট, গভীর দুই বা তিন ইঞ্চি এবং চারি ফুট অন্তর হইবে। ডবল বা দুই লাইন করিয়া বীজ বসাইলে প্রত্যেক নালাটি প্রস্থে দুই ফুট এবং ছয় ফুট অন্তর কাটিতে হইবে। গাছ বড় হইলে যষ্টি বা শাখা-প্রশাখা গাছের অবলম্বন স্বরূপ ক্ষেতের মধ্যে মধ্যে পুতিয়া দিতে হয়।

মৃত্তিকা, সার, জলসিঞ্চন ও অবশিষ্ট কার্য্য—ব্রড্ বীন্ চাষের ন্যায়।

বীজের পরিমাণ—একর প্রতি ২০ সের হইতে ২৫ সের।

বিলাতী সীম—ফ্রেঞ্চ বা ফরাস্ বীন্

বপনের সময়—ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক

ফরাসী বুস বীন

গাছ অধিক বাড়ে না, বেশ ঝাড় বাঁধে ও কেমন থোবা থোবা ফল হয় দেখুন।

মৃত্তিকা—হাল্কা সারযুক্ত দোয়াঁস মাটি। জমী অল্প ছায়াযুক্ত হইলে ভাল হয়। বেশী ছায়াযুক্ত হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না।

সার—পুরাতন গোবর-সার—অথবা যে কোন প্রকার পুরাতন সার মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে।

বপন প্রণালী—প্রস্থে এক ফুট, গভীর দুই ইঞ্চি, দেড় ফুট অন্তর সারি সারি নালা বা গর্ত্ত করিতে হয়। প্রতি নালায় নয় ইঞ্চি পৃথক দুই লাইন কাটিয়া—তাহাতে তিন ইঞ্চি অন্তর বীজ বসাইয়া এক ইঞ্চি মাটি দিতে হইবে।

অবশিষ্ট কার্য্য—মধ্যে মধ্যে গাছের গোড়ার মাটি সঞ্চালিত করিয়া ("নিড়ানি" যন্ত্রদ্বারা উস্কে বা খুসিয়া) দেওয়া, এবং আগাছা জন্মাইলে তুলিয়া ফেলা ও সময় মত জল দেওয়া ভিন্ন বিশেষ আর কিছু করিতে হয় না।

বীজের পরিমাণ—একর প্রতি ২০ সের হইতে ২৫ সের।

দেশী সীম

বপনের সময়—আষাঢ়, শ্রাবণ

ইহার লতা খুব দীর্ঘ হয়—উদ্যানের পার্শ্বে ইহার মাচা করিয়া তাহাতে বা বাগানের বেড়াতে কিম্বা পালা পুতিয়া উঠাইয়া দিতে হয়। সীম দেশী অনেকপ্রকার, তন্মধ্যে আলতাপাটী, পাথুরে শাদা, বাঘনোখা, গাংদাড়া, ঘৃতকাঞ্চন, মাখম, কামরাঙ্গা এই গুলি প্রধান ও খাইতে ভাল। মাখম সীম বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিতে হয়, বর্ষার সময় ফল ধরিতে আরম্ভ হয়, অন্য গুলি শীতকালে ফল ধরে। দোয়াঁশ মাটী কিম্বা শুষ্ক পাঁক মাটীতে ইহার গাছ ভাল হয়।

সার—পুরাতন গোবর সার ইহার প্রধান সার।

বপন প্রণালী—বীজ গুলিকে পূর্ব্ব রাত্রে ভিজাইয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। এক একটি মাদায় ৩।৪টি বীজ বপন করিতে হয়। বিঘাপ্রতি অর্দ্ধ সের কিম্বা তিন পোয়া বীজ লাগে।

মান্দ্রাজে এণ্ডির চাষ

পুষা কলেজের সহকারী রেশমতত্ত্ববিদ্
শ্রীমন্মথনাথ দে লিখিত

মে কিম্বা জুন মাসে বিঘাপ্রতি ৮।১০ গাড়ী গোময় সার প্রয়োগ করিয়া অথবা ক্ষেত্রে কিছুকাল দুই এক পাল ছাগল ভেড়া বাঁধিয়া রাখিয়া (উহাদের মল ও মূত্র সারের কাজ করিবে) ক্ষেত্রটি দুই তিন বার চষিতে হয়। জুন মাসের শেষে কিম্বা জুলাই মাসের প্রথম ভাগে, দুই এক পসলা বৃষ্টি পড়িয়া মাটি বেশ নরম হইলে পুনরায় একবার লাঙ্গল দিয়া মই দিতে হয়; তৎপর একটী লাঙ্গলের পশ্চাতে পশ্চাতে এক ফুট অন্তর এক একটী করিয়া বীজ ফেলিয়া যাইতে হইবে; প্রতি সারি ২½ ফিট বা তিন ফিট হইলে গাছগুলি ঘন হইবার কোনও আশঙ্কা থাকে না। কেহ কেহ বা একটী বীজের পরিবর্ত্তে দুইটী করিয়া বীজ পুতিয়া থাকে; পরে গাছগুলি গজাইলে উঠাইয়া ফেলিয়া দেয়। বীজ পোতা শেষ হইলে মই দ্বারা সব বীজগুলি ঢাকিয়া মাটী চৌরস করা হয়। একটী করিয়া বীজ পুতিলে বিঘা প্রতি /৫ ও /৬ সেরে যথেষ্ট হয় কিন্তু ২টী করিয়া বুনিলে ।০, ।২ সের লাগিয়া থাকে।

গোদাবরী তীরবর্ত্তী প্রদেশে কোনও বিশেষ সারের প্রয়োজন হয় না; ঐ প্রদেশে চাষীরা নদীর তীরবর্ত্তী পলিপড়া জমীতে সাধারণতঃ এণ্ডির চাষ করিয়া থাকে; এণ্ডি ক্রমান্বয়ে দুই বৎসর এক জমীতে চাষ করা হয় না, কারণ ইহা অতিরিক্ত মাত্রায় মাটীর সার ভাগ শোষণ করতঃ জমী অনুর্ব্বরা করিয়া ফেলে; প্রতি বৎসর এণ্ডি চাষের জন্য জমী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মনোনীত করিয়া পুরাতন এড়ির ক্ষেতে অন্য কোনও ফসল বোনাই শ্রেয়ঃ।

কোন কোন স্থানে জমী উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে ২ কিম্বা ৩ হাত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিয়া বীজ বপন করা হইয়া থাকে; তৎপরে একটু জল দিয়া গর্ত্তটী ঢাকিয়া দেওয়া হয়; এই প্রকার রোপণ প্রণালীই উৎকৃষ্ট বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

প্রকৃতপক্ষে এণ্ডির ক্ষেতে জল দিবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন হয় না; সাধারণতঃ এক সপ্তাহের মধ্যেই গাছ উঠিয়া থাকে; এক মাস বা দেড় মাস পরে ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করিবার জন্য ২ বার লাঙ্গল দিয়া চষা হয় (inter culture); গাছেতে কোনও প্রকার অনিষ্টকারী পোকা দৃষ্ট হইলে, পাতাতে ছাই ছিটাইয়া দেওয়া হয় অথবা শুয়া কীটগুলি (বিছা জাতীয়) মাটীতে পুতিয়া ফেলা

হয় অথবা পোড়াইয়া ফেলা হয়। চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম মাসে অর্থাৎ নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে ফুল হয় ও ষষ্ঠ মাসে বীজ কোষ হইয়া থাকে এবং সপ্তম মাসে বীজ কোষগুলি পাকিয়া ফাটিতে থাকে; তখন ঐগুলি আহরণ করা হয়, সব বীজকোষ গুলি একদিনে পক্ক করিয়া না পাকার হেতু ক্রমান্বয়ে ২ মাস পর্য্যন্ত প্রতি দশ, বার দিন অন্তর বীজ সংগ্রহ করা হয়; যে থোবাতে একটী বীজ কোষ ফাটা দেখা যায় ঐ থোবায় সকল কোষ গুলিই তোলা হইয়া থাকে। থোবা গুলি রৌদ্রে বেশ শুকাইয়া গেলে এক হাত পরিমাণ লম্বা ও অর্দ্ধহাত পরিমাণ চৌড়া একটী কাঠ দ্বারা থোবা গুলি মাড়া হয়। ইহাতে কোষ হইতে বীজ গুলি বাহির হইয়া থাকে; তৎপরে কুলোর বাতাস দিয়া খোসা গুলি পৃথক করা হয়; অনেক বীজ খোসার মধ্যে থাকিলে পুনরায় ঐ গুলিকে রৌদ্রে শুকাইয়া ঐ কাঠ দ্বারা মাড়া হয় ও কুলোর দ্বারা খোসাগুলি পৃথক করা হয়; ক্রমান্বয়ে ৩ ৪ বার এরূপ করিলে শুধু বীজগুলি থাকিয়া যাইবে। পর বৎসরের জন্য বীজ উত্তমরূপ শুকাইয়া তৎপরে মৃত্তিকার পাত্রে মুখ বন্ধ করিয়া অনাতপ ও অন্ধকার স্থানে রাখিয়া দেওয়া হয়; বর্ষাকালে বীজগুলি ২।১ বার রৌদ্রে শুকাইতে পারিলে ভাল হয়। ভাল পাকা, সতেজ ও রোগ শূন্য গাছের কোষ গুলিই বীজের জন্য রাখা কর্ত্তব্য। বাকী গুলি তৈল ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

যুক্তপ্রদেশে এণ্ডির চাষ

প্রায় সকল প্রকার মাটীতেই এণ্ডির গাছ জন্মিয়া থাকে কিন্তু বালুকা মিশ্রিত পাঁক মাটীতেই (alluvial soil) ইহার আবাদ করা শ্রেয়ঃ; কর্দ্দম বহুল জমীতে এই গাছ ভাল জন্মায় না; নূতন আবাদী জমীতেও ইহা বেশ জন্মায়। এই অঞ্চলে অন্যান্য শস্যের সহিতও ইহার আবাদ হইয়া থাকে; কখন কখন ক্ষেত্রের চারিধারে অন্যান্য ফসলকে বাতাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য বোনা হয়; ইক্ষুর সহিত এপ্রিল ও মার্চ্চ মাসে ও দ্বিতীয় বার জুন বা জুলাই মাসে বর্ষারম্ভে সাধারণতঃ এড়ি বীজ বোনা হয়। বীজগুলি জলে ১২ ঘণ্টা আন্দাজ ভিজাইয়া রাখিয়া ২ হাত অন্তর ক্ষেতে বোনা হয়; এতদঞ্চলে এক বিঘা জমীতে /৩, /৪ সেরের বেশী বীজ বপন করা হয় না। নিড়ানী ও জঙ্গল পরিষ্কার ভিন্ন ইহার আর কোনও বিশেষ যত্ন লইবার প্রয়োজন হয় না; লাঙ্গলের পিছনে পিছনে ১৮ ইঞ্চি ব্যবধানে কিছু সারের সহিত বীজগুলি বোনা হইয়া থাকে; মার্চ্চ বা এপ্রিল মাসে বুনিলে নভেম্বর কিম্বা ডিসেম্বর মাসেই বীজ পাকিতে আরম্ভ হয় এবং যে পর্য্যন্ত বীজ কোষগুলি সংগৃহীত হইয়া থাকে; জুলাই মাসের বীজ হইতে যে গাছ হয় ঐ বীজ কোষগুলি এপ্রিল মাসে পাকিতে আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ এক বৎসরের বেশী এড়ির গাছ এক জমীতে রাখা হয় না; এক বৎসরের বেশী গাছ হইতে বীজের পরিমাণ কম হয় ও বীজগুলিও তেমন ভাল

হয় না; পাতার পরিমাণও কম হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন স্থানে উপযুক্ত চাষ কারকিৎ ও সার প্রয়োগ করিয়া এক জমীতেই ৪।৫ বৎসর পর্য্যন্ত এণ্ডির গাছ রাখিতে দেখা যায়। একটী বর্দ্ধিষ্ণু গাছ হইতে প্রায় আট কিম্বা দশ সের বীজ পাওয়া যায়, কিন্তু ক্ষেতের চারিধারে যে সব গাছ পোতা হয় তাহা হইতে আধ সের হইতে এক সেরের বেশী বীজ পাওয়া যায় না; এণ্ডির ক্ষেতের গাছ হইতে—ঘন গাছ হইলে—আরও কম বীজ উৎপন্ন হয়; কারণ গাছ গুলি ঘন ঘন থাকাতে বাতাস ও আলোক অভাবে গাছের বৃদ্ধির ও পরিপোষণের অন্তরায় হয় সুতরাং ফুল ফল কম হইয়া থাকে।

পুষাতে এণ্ডির চাষ

পুষাতে এণ্ডির পোকা পালন করিবার জন্যই এণ্ডির চাষ হইয়া থাকে; সুতরাং যাহাতে ভাল ও বেশী পাতা পাওয়া যায় এখানে তাহার চেষ্টাই করা হয়। জমী তিন, চারি বার লাঙ্গল দিয়া জুন মাসের শেষে দুই একবার বেশ বৃষ্টি হইলে পর এণ্ডির বীজ ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি ব্যবধানে সারি করিয়া লাঙ্গলের পিছনে পিছনে দুই ফিট অন্তর দুইটী করিয়া বীজ পোতা হয়; তৎপরে মই বা হেন্দা দিয়া ক্ষেতের মাটী বরাবর বা চৌরস করিয়া দেওয়া হয়; গাছগুলি ১½ ফিট আন্দাজ বড় হইলে একবার লাঙ্গল দিয়া মাটী আল্গা করিয়া আগাছাগুলি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়; ২ ফিট বা ২½ ফিট আন্দাজ বড় হইলে প্রত্যেক সারির গাছগুলি ২ হাত আন্দাজ ব্যবধানে রাখিয়া বাকীগুলি উঠাইয়া ফেলা হয় (ঐ পাতা গুলি অনায়াসে পলুকে খাওয়ান যাইতে পারে); গাছগুলি ৪ ফিট আন্দাজ বড় হইলে উহাদিগকে ঝোঁপ গাছে পরিণত করিবার জন্য মাথার ডগাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়; ইহাতে গাছগুলি ঊর্দ্ধে না বাড়িয়া, চারি ধারে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে; একবার ডগা ভাঙ্গিবার পর কখনও বা গাছগুলি পুনরায় লম্বা হইতে থাকিলে আর একবার ডগা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে পাতা ও বীজ তুলিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়া থাকে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাস হইতেই এই গাছ হইতে পাতা সংগ্রহ করা যাইতে পারে; নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে একবার কোদালি দিয়া গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া মাটী আল্গা করিয়া দেওয়া হয়। এখন হইতেই বৃক্ষগুলির পুষ্পোদ্গম হইতে থাকে ও ২।৩ মাসের মধ্যেই থোবার বীজ পাকিতে আরম্ভ হয়; প্রতি থোবার বীজ কোষ পাকা দেখা দিলে সমস্ত থোবাটী সংগ্রহ করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হয় ও পূর্ব্ববর্ণিত রূপে খোসা ছাড়ান হয় ও পর বৎসরের জন্য বীজ রক্ষিত হইয়া থাকে। ফেব্রুয়ারী বা মার্চ্চ মাসে গাছগুলিকে ৩ ফিট আন্দাজ রাখিয়া ছাঁটিয়া দিলে জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত পুনরায় পাতা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

বার মাস এণ্ডি পলু পুষিতে হইলে বর্ষাশেষে অক্টোবর মাসেও বীজ পোতা আবশ্যক নতুবা এপ্রিল মে ও জুন মাসে পাতার অভাব হওয়ার সম্ভব; অক্টোবর মাসে বীজ পুতিলে ডিসেম্বর কিম্বা জানুয়ারীতে একবার নিড়ান দরকার এবং মার্চ্চ মাসে ডগাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা উচিত; বর্ষাকালে এই গাছ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পাতা পাওয়া যায়; নভেম্বর কিম্বা ডিসেম্বর মাসে বীজ কোষগুলি পাকিতে থাকে; এই গাছ হইতে বীজের পরিমাণ কম হয়; বীজ সংগ্রহ করার পর এই গাছগুলিকে ছাঁটিয়া ফেলা হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি ৴৪, ৴৫ সের আন্দাজ বীজ পুতিতে হয়। বীজ সংগ্রহ হইবার পর বৃক্ষ গুলিকে উঠাইয়া ফেলা যাইতে পারে।

কোনও কোনও স্থানে এণ্ডি গাছ ২ বৎসরের বেশী রাখিয়া থাকে; উহাতে পাতার ও বীজের ফলন তেমন বেশী হয় না; দুই বৎসরের বেশী একই ক্ষেত্রে গাছ রাখিতে হইলে বিঘা প্রতি ১২ গাড়ী গোময় সার প্রয়োগ করা উচিত ও মধ্যে মধ্যে জমী ভাল করিয়া নিড়ান প্রয়োজন। বিঘা প্রতি বৎসরে ৪৴ মণ বীজ ও ৩০৴ মণ পাতা অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে।

এক বিঘা জমী চাষ করিতে হইলে নিম্ন লিখিত রূপে খরচ হওয়া সম্ভব:—

৩টী হাল	...	...	১৲
৴৩½ বীজ	...	...	।৴০
বোনার খরচ	...	...	।৴০
২ বার নিড়ান	...	...	।৴০
ঘন গাছগুলি পাতলা করিবার খরচ		...	।৴০
ডগা ভাঙ্গিবার খরচ	...	...	।০
বীজ কোষ সঞ্চয়	...	...	।৶০
বীজ প্রস্তুত করণ	...	...	৸০
জমীর খাজনা	...	...	২৲
			৫॥৶০

স্থান বিশেষে পারিশ্রমিকের হার ও জমীর খাজনা কিছু কম বেশীও হইতে পারে। নূতন জমীতে অথবা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এণ্ডি বুনিলে প্রথমে বেশী খরচ হয় কিন্তু ইহাতে পাতার পরিমাণ ও বীজের পরিমাণ অনেক বেশী হয়।

প্রবন্ধে ইংরাজি মাসের উল্লেখ আছে। বাঙলা মাসের হিসাব ধরিতে গেলে ১৫ই এপ্রিল হইতে পর মাসের ১৫ই পর্য্যন্ত বৈশাখ মাস এবং এইরূপ জ্যৈষ্ঠ ও অন্য বাঙলা মাস ঠিক করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আলুর চাষ

যশোহর নিবাসী কৃষি কার্য্যাভিজ্ঞ
শ্রীযুৎ যামিনীরঞ্জন মজুমদার লিখিত

১৩১৭ সালের চ্যাটার্জ্জি, মজুমদার কোম্পানির য়াড়েন্দা কৃষিক্ষেত্রে নিম্নলিখিত রূপে আলুর চাষ করিয়া যেরূপ ফললাভ হইয়াছিল, তাহার বিবরণী।

আলু নানাবিধ, তন্মধ্যে গোল আলু বা বিলাতী আলু, যাহা সর্ব্ব প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যে স্বভাবতঃই উৎপন্ন হইত। অনধিক দুই শত বৎসরের মধ্যে পেরু ও ভার্জ্জিনিয়া হইতে যাহা এদেশে আনীত হইয়াছে। ইহা এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে একটী প্রধান লাভজনক শস্যের ও পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। সেই হেতু অনেকের মন এক্ষণে আলু চাষে আকৃষ্ট হইতেছে; সেই আলু লইয়াই আমরা চাষ করিয়াছি; কিন্তু তথাপি বঙ্গদেশে অতি অল্প স্থানেই আলুর আবাদ হইতেছে, যাহা কিছু হয় তন্মধ্যে গঙ্গার পশ্চিম পারেই অধিক। পূর্ব্ব পারে নদীয়া ও ২৪ পরগণার কয়েকখানি গ্রাম ভিন্ন আর কোথাও ইহার চাষ হয় না। এই প্রকার লাভজনক ও প্রয়োজনীয় শস্যের চাষ প্রতিগ্রামে হওয়া উচিত। কিন্তু কৃষকগণ নূতন কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত নয় এবং তাহাদের সংস্কার যে আমাদের দেশে আলু হয় না। এই ভ্রম যাহাতে দূর হইয়া, তাহাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয় তাহা সমাজের শিক্ষিত জনসাধারণের দেখা কর্ত্তব্য। প্রাচ্য কৃষি-বিজ্ঞান সাহায্যে ও আমার নিজের অভিজ্ঞতায়, আলু সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

স্থান বা জমি নির্ব্বাচন

আমি বারম্বার আলু চাষ করিয়া বুঝিয়াছি যে, কঠিন জমিতে আলুর আবাদ হয় না এবং লৌহ বা পাথর সংযুক্ত মৃত্তিকাও আলুর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সূক্ষ্ম বালুকাযুক্ত দোয়াঁস হাল্কা মৃত্তিকা আলুর আবাদের পক্ষে প্রশস্ত।

জমি এরূপ হইবে যেন তাহাতে জল বাধিলে অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে না পারে, জল বাধিলে আলু পচিয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে ঢালু জমি মনোনীত করা বিধেয় নয়। আবার জমি একেবারে শুষ্ক হইলে, জল দেওয়া যাইতে পারে, এমন ভূমি নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত; সুতরাং জমির নিকট নদী, পুষ্করিণী, খাল ও বিল কিম্বা ইন্দারা থাকা আবশ্যক। আবার এমন সরস জমিও আছে যে সেচের জলের বিশেষ আবশ্যক হয় না। বিনা জলে যশোহর জেলার

মধ্যে কালিয়া, লোহাগড়া প্রভৃতি থানার অধীন অনেক স্থানে আলুর চাষ হইতে পারে।

সময় নির্ব্বাচন

জমি হইতে ভাদুই ফসল উঠিয়া গেলে অর্থাৎ আউশ ধান, পাট, শণ ইত্যাদি কাটা হইলে, জমিতে সেই সময় হইতে ঘন ঘন চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। বর্ষা অন্তে আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের শেষ পর্য্যন্ত আলু রোপণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ভাদ্র মাস হইতে জমি প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত। নতুবা জমিতে সময়মত সার দেওয়ার ব্যাঘাত হয়।

সার—কৃষি রসায়ন মতে বিঘা প্রতি—

নাইট্রোজেন	... ...	১০ হইতে ২০ পাউণ্ড
পটাস্	... ...	৩০ ,, ৬০ ,,
গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক এ্যাসিড	...	১০ ,, ৩০ ,,

কৃষকগণের ব্যবহার উপযোগী সারের নাম ও পরিমাণ।

১।	অস্থিচূর্ণ	... ...	বিঘা প্রতি=২/ মণ।
২।	রেড়ির খৈল	... ...	,, ,, =৩/ মণ।
৩।	ছাই	... ...	,, ,, =৫/ মণ।
৪।	গোবর সার	... ...	,, ,, =১০০/ মণ।

১। অস্থিচূর্ণ সার। এই সার আলুর পক্ষে বিশেষ উপকারী হইলেও সকল স্থানে ইহা পাওয়া যায় না। হাড়ের গুঁড়া মাটীর সহিত মিলিত হইয়া কার্য্যকারী হইতে বিলম্ব হয়। যাঁহারা এই সার ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন বর্ষার সময় বা পূর্ব্বে, উক্ত সার ক্ষেতে ছড়াইয়া দেন। বর্ষার জল পাইয়া উক্ত সার পচিলে গাছের গ্রহণোপযোগী খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সার যে পর্য্যন্ত দ্রবীভূত না হয় সে পর্য্যন্ত ইহার কোন উপকারিতা নাই।

২। রেড়ির খৈল সার। ভূমিতে যত পরিমাণ সার দিতে হইবে, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ সার, আলু বসাইবার সময় এবং অবশিষ্ট সার, ভাটি দিবার সময় দিতে হইবে।

৩। ছাই সার। দুই বার ভূমি কর্ষণের পর ছাই সার দিয়া, আবার চাষ করিতে হয়, ছাই সার বেশী হইলে আলুতে পোকা ধরিবে না ও আলু পচিবে না।

৪। গোবর সার। আলুর ফসলে কখনই তাজা গোবর দেওয়া উচিত নয়। লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বেই এই সার জমিতে ছড়াইয়া দিতে হয়। পুরাতন গোবর ভিন্ন আলুর জমিতে সদ্য গোবর ব্যবহার করা উচিত নহে। কারণ সদ্য গোবর সারের উত্তাপে আলুর গাছগুলি মরিয়া যায়, এবং ক্ষেত্রে নানাবিধ আগাছা জন্মিয়া ফসলের অনিষ্ট করে।

এই চারি প্রকার সার ব্যতীত উদ্ভিদ পত্রও একটী বিশেষ সার, একারণ অনেকে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে জমিতে ধঞ্চে ও কালকাসুন্দে প্রভৃতি বপন করিয়া থাকে, পত্র বিশিষ্ট এক হাত লম্বা গাছ হইলে ঐ গাছ সমেত জমি চাষ করিয়া থাকেন। ইহাও একটী সুন্দর প্রণালী। মাটিতে সার দিবামাত্র উদ্ভিদগণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, সার মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া যতক্ষণ না সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মাংশে পরিণত হয়, এবং যতক্ষণ না উহার রস মাটির সহিত মিশ্রিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্ভিদগণ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না।

৫। চাষ—লাঙ্গল দিবার সময় যাহাতে ভূমি গভীররূপে কর্ষিত হয় এবং মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণ হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ফসল আবাদ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বে ভূমি কর্ষণ করিলে সকল জমিতে উত্তাপ পায় ও পোকা, পিপীলিকা দ্বারা, শস্যের অনিষ্টকারী কীট ও পোকা নষ্ট করিবার সুবিধা হয়, অধিকন্তু বায়ু সংযোগে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি পায়। ভূমি শুষ্ক হইলে বা ঢেলা থাকিলে লাঙ্গল দিবার পূর্ব্বে একবার জল সেচন করা উচিত। অতিরিক্ত জল থাকিলে একবার লাঙ্গল দিয়া জমি চষিয়া মৃত্তিকা শুকাইয়া লইতে হয়। প্রত্যেকবার কর্ষণ করিবার পর জমিতে মই দিতে হয়, তাহা হইলে ঢেলা গুলি ভাঙ্গিয়া যায় ও জমি সমতল হইয়া থাকে। জমিতে অধিক আবর্জ্জনা থাকিলে লাঙ্গল ও মই দিবার পর একবার বিদে বা আঁচড়া দিলে জমি হইতে সকল আবর্জ্জনা বাহির হইয়া যায় এবং তৎপর আলু রোপণের উপযুক্ত হয়। আমার বিশ্বাস আলুর জমি চষা অপেক্ষা কোপান ভাল। খরচ কুলাইলে সমস্ত জমিটি দুই কোপ অর্থাৎ দুই ফিট গভীর করিয়া কোপাইয়া লইতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়।

৬। বীজ আলু—ছোট ছোট আলু হইলে একটা করিয়া পোতা যাইতে পারে, কিন্তু বড় আলু হইলে, তাহাতে যতগুলি অঙ্কুর বাহির হইবে ততগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ছাই মাখাইয়া এক দিন রাখিয়া রোপণ করিতে হয়। কৃষি-বিজ্ঞানে বীজ আলু গুলিকে ৬ পাউণ্ড বা তিন সের সল্‌ফেট অব্ এমোনিয়া, তিন সের নাইট্রেট অব্ পটাস বা সোরা, চৌদ্দ সের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিয়া রোপণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রতি বিঘায় ২/ মণ হইতে ৩/ মণ বীজের আবশ্যক। ৯৮ ভাগ জলে দুই ভাগ সালফিউরিক এ্যাসিড মিশ্রিত করিয়া আলুগুলিকে ১০।১২ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রোপণ করিলে সেই বীজে কখনই পোকা ধরিবে না বা তাহা কখনই পচিবে না।

রোপণ বা বপন প্রণালী

অঙ্কুরিত গোটা বা কাটা বীজগুলি ১॥০ হাত অন্তর পিলী বা জুলি করিয়া, জুলির ভিতর এক বিঘত অন্তর রোপণ করিবে। রোপণ সময়ে গমের বিচালী

খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া মাটীর সহিত মিশ্রিত করিয়া বা বিছাইয়া, রোপণ করিলে মাটী আল্গা থাকে ইহাতে আলুর আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মাটী কঠিন হইলে আলুর চারা বাড়িতে না পারিয়া আকার বিকৃত হইয়া যায় ও গাছের তেজ হ্রাস হইয়া থাকে। গমের বিচালী দিবার কারণ এই যে ইহাতে সহজে উই বা কীট লাগিতে পারে না কিন্তু ধানের বিচালির এই গুণ নাই, উহাতে সহজেই পোকা লাগে। যেখানে গমের বিচালী নাই তথায় বীজে অল্প পরিমাণে ছাই মিশাইলেই চলিবে। আলু রোপণের পর ১০।১১ দিনের মধ্যে চারা বাহির হউক আর নাই হউক একবার জল দেওয়া প্রয়োজন। মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইলে, কোদালী দ্বারা কোপাইয়া আল্গা করিয়া দিতে হইবে। অঙ্কুর সকল বর্দ্ধিত হইয়া ৫ ইঞ্চি লম্বা হইলে পার্শ্বের পিলি হইতে চূর্ণ মাটী আনিয়া ৩ ইঞ্চি পুরু করিয়া ঢাকিয়া দিতে হইবে। এই সময় গাছের গোড়ায় খৈল সার দিতে হয়। গাছ বড় হইলে এই প্রকার মাটী দিতে দিতে গাছের গোড়ায় পিলি হইবে দুই ধার খাদ বা নীচু হইবে আবশ্যক হইলে, তাহার এক জুলী বা গর্ত্তে জল সেচন করিলে যেন সকল জুলীতে জল যায় এই প্রকারে জুলী তৈয়ারী করিতে হইবে।

আলুতে জল সেচন মাসে দুই বারের অতিরিক্ত করিবার দরকার হয় না। মধুমতী প্রভৃতি নদীর ধারে আলুতে জল না দিলেও চলিবে।

৮। আলু সংগ্রহের কাল—সাধারণতঃ কৃষকেরা গাছ মরিয়া যাইবার পূর্ব্বে আলু তুলিয়া থাকে এইরূপ তুলিতে হইলে লৌহাস্ত্রে না তুলিয়া পৌষ মাসের প্রথমে কোন কাঠির দ্বারা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সকল আলু তুলিয়া লইতে হয়। কেবল মটরের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলুগুলি রাখিয়া দিবে তৎপরে আলু গাছের গোড়াকে ঈষৎ হেলাইয়া পুনর্ব্বার গোড়ায় মাটী ও সার দিয়া পিলি বাঁধিয়া দিবে, তাহাতে পুনরায় গাছ সতেজ হইয়া আলু হইবে। কিন্তু গাছ মরিয়া গেলে যদি মাঘ, ফাল্গুনে আলু তোলা হয় তাহা হইলে সেই আলু ওজনে বেশী হয় এবং আস্বাদনও অতি উত্তম হইয়া থাকে।

(কীট বা পোকা নিবারণ)

নূতন চূণ	...	...	।০ সের
তুঁতে	...	...	।০ সের
গুড়	...	...	।০ সের
জল	...	...	৩।৫ সের

পৃথক জলের সহিত চূণ ও পৃথক জলের সহিত তুঁতে ও পৃথক জলের সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া তৎপরে সমস্ত মিশ্রিত ঔষধগুলি একত্র করিতে হইবে, পরে পিচকারীর দ্বারা গাছে ও ক্ষেত্রে দিতে হইবে এই প্রকারে ক্ষেত্রে ঔষধ দিলে পোকা নষ্ট হয় ও আলু বড় হয়।

সরকারী কৃষি সংবাদ

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম কৃষি-বিভাগ হইতে প্রচারিত

শীষ কাটা লেদা পোকা

ইহা এই প্রদেশের শীতকালের ধানের একটী বিশেষ অনিষ্টকারী পোকা। গত দুই বৎসরের মধ্যে আমরা এই পোকায় ধান অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া অনেক রিপোর্ট নিম্নলিখিত জেলাগুলি হইতে পাইয়াছি:—ঢাকা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, শিলচর, শিবসাগর এবং গারোহিল। অতএব স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই পোকা এই প্রদেশে বিস্তৃতভাবে আছে।

২। বর্ণনা ও জীবন বৃত্তান্ত—

এই পোকার প্রজাপতি লম্বায় প্রায় ১ ইঞ্চ (৪ যবের সমান), ইহার রঙ অনেকটা ছাইয়ের মত ("ফসলে পোকা" পুস্তকে ২য় চিত্র পটের ১১ চিত্র দেখ)। স্ত্রী প্রজাপতি গুটান ধানের পাতা কিংবা পাতার খোলের মধ্যে সারি ভাবে ডিম পাড়ে। তিন চারি দিন পরে ডিম ফুটিয়া ছোট কীড়া বাহির হয়। ছোট কীড়াগুলি দিনের বেলায় গুটান পাতার মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রিতে পাতা খায়। কীড়াগুলি যখন বড় হয় তখন দিনে তাহারা মাটীর নীচে এবং গাছের গোড়ার পাতার মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং যখন ধানের ছরা বা শীষ হয় তখন রাত্রে গাছে উঠিয়া ছরা কাটিয়া দেয়।

ডিম ফুটার পর ২৮ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে কীড়াগুলি পূর্ণবয়স্ক হয়, তখন ইহারা লম্বায় প্রায় ১¼ ইঞ্চ (৫ যবের সমান) হয় এবং ইহার রঙ প্রায় প্রজাপতির রঙের ন্যায় হয় (চিত্র ১২)। তখন ইহারা মাটীর মধ্যে কিংবা গাছের গোড়ায় পুত্তলি (গুটী) আকার ধারণ করে এবং প্রায় ১৪ দিনের মধ্যে প্রজাপতি বাহির হয়।

আষাঢ় মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত এই পোকার বংশ বৃদ্ধি হয়। যে ধান খেতে জল থাকে ইহা সে ধান প্রায় আক্রমণ করে না কিন্তু যে মাঠ হইতে জল ছাড়িয়া দেওয়া হয় অথবা যে মাঠ শুকাইয়া যায় সেই সব খেতে ইহা বিশেষ অনিষ্ট করে।

৩। নিবারণের উপায় এবং প্রতিকার—

পোকা যখন খেতে ছড়াইয়া পড়ে তখন প্রতিকার করা বড়ই কঠিন। যখন ছোট কীড়াগুলিকে পাতার উপরে থাকিয়া খাইতে দেখা যায় তখন কাপড়ের থলে ক্ষেতের উপর টানিয়া পোকা ধরিয়া মারা যাইতে পারে। থলের মুখটা ৬ হাত লম্বা ও ২ হাত চওড়া করিয়া এই মাপের একটী বাঁশের ক্রেমে বাঁধিয়া দিতে হইবে। দুই জন লোক উপরের বাঁশ ধরিয়া খেতের উপরে টানিবে। থলের বিশেষ বিবরণ বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ কৃত 'ফসলের পোকা' নামক পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠা দেখ। যখন পোকার প্রথম বংশ পুত্তলি হইবার জন্ত মাটীর মধ্যে যায় তখন সম্ভব হইলে খেতে জল ঢুকাইয়া দিবে। তাহা হইলে পুত্তলিগুলি মরিয়া যাইবে এবং আর অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

যদি সর্ব্বত্র ধান কাটার পরই খেত চষিয়া দিবে, তবে পুত্তলিগুলি মাটীর উপর উঠিবে এবং পাখীরা উহাদিগকে খাইয়া ফেলিবে। এরূপ করিলে আগামী বৎসরের শস্য আক্রমণ করিবার আশঙ্কা কম হইবে।

দেখা গিয়াছে বগাঝুল, দুধ কলম প্রভৃতি ধান (অর্থাৎ যে ধানের আগে শুঙা আছে) ইহা আক্রমণ করে না। অতএব যে জায়গায় বৎসর বৎসর এই পোকা লাগে সে জায়গায় এইরূপ শুঙায়ালা ধান লাগান আবশ্যক।

এই পোকা ভুট্টা ও জোয়ারও আক্রমণ করে।

[অন্য এক প্রকার লেদা পোকাও শীতকালের ধান আক্রমণ করে। ইহা দেখিতে প্রায় একরূপই, উপরোক্ত উপায়গুলি এই পোকার জন্যও অবলম্বন করা যাইতে পারে।]

পঞ্জাবে নীলের চাষ—১৯১১

৪৫৪০০ একর জমিতে নীলের আধিক্য বশতঃ মুলতানে অধিক জমিতে ও স্বল্পতা নিবন্ধন মোজাফর গড়ে ও দেরাগাজী খাঁতে অল্প জমিতে চাষ করা হইয়াছিল।

জলবায়ুর অবস্থা ভাল ছিল না, বলিয়া শস্যের উৎপত্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল। দেরা গাজী খাঁতে জুলাই মাসে ও মোজাফর গড়ে অক্টোবরের প্রারম্ভে এবং মুলতানে সেপ্টেম্বরে বপনকার্য্য আরম্ভ হয়।

১। পঞ্জাবে তুলার চাষ—১৯১১

১৯১১ সালে ১৪৪১৪০০ একর জমিতে তুলার চাষ করা হইয়াছিল। তুলার মূল্যাধিক্য বশতঃ এবং বর্ষারম্ভে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে কিছু বৃষ্টি কম হওয়ায় এতদঞ্চলে তুলার আবাদ বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ, অধিক বৃষ্টিতে তুলার চাষের ক্ষতি হইয়া থাকে। যেখানে সেচন জলের সুবিধা আছে, তথায় আবাদের মাত্রা বাড়িয়াছে। দিল্লী বিভাগে যেখানে সেচের জলের সুবিধা নাই, বপনকালে বৃষ্টির স্বল্পতা নিবন্ধন. তুলার আবাদের আয়তনের হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অন্যান্য বিভাগে বর্ষা সময় মত আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়াই জলসিক্ত প্রদেশ আবাদ আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সমগ্র বিভাগে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ২২০৮৬৩ বেল। শস্যের আরম্ভ কালে আবহাওয়া শস্যের পক্ষে ভাল ছিল না। শুষ্ক বায়ুর জন্য অনেক তুলার চারা শুকাইয়া যায় এবং পোকায়ও বীজ কোষ ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিল।

২। বাঙলায় তুলার চাষ—১৯১১

বাঙলার মধ্যে রাঁচী, সাঁওতাল পরগণা, আঙ্গুল, মানভূম ও সিংভূম জেলায় তুলার চাষ করা হয়। এই সমস্ত স্থানের মধ্যে রাঁচীতেই তুলার আবাদের পরিমাণ অধিক। সমগ্র বাঙলায় উৎপন্ন তুলার প্রায় অর্দ্ধেক এই স্থানেই জন্মায়। এই সকল জেলার জলবায়ুর অবস্থা মন্দ ছিল না। পাটনা, দ্বারবঙ্গে বৃষ্টির আধিক্যবশতঃ তুলা চাষে একটু ক্ষতি হইয়াছে।

মোটের উপর ৬০১৩৭ একর জমিতে জলদা তুলার চাষ করা হইয়াছে। উৎপন্ন জলদী তুলার পরিমাণ ১১২০০ বেল।

দেশীয় রাজাগণের রাজ্যে তুলার আবাদ ধরিয়া সমগ্র বঙ্গে নাবী তুলা ৯,৬৬০ বেল এবং জলদী তুলা ১১,৭৬০ বেল উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়।
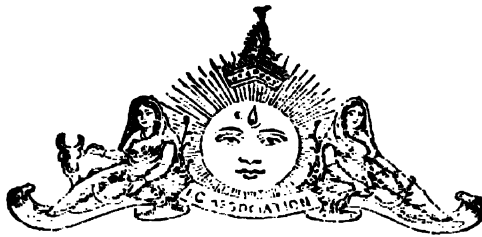
জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ সাল।

ভারতীয় কৃষি সমিতির কার্য্য

এই ক্ষুদ্র সমিতির ক্ষুদ্র চেষ্টায় ভারতীয় কৃষি সম্বন্ধীয় মহত্তর কোন ব্যাপার সংসাধিত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা সুযুক্তি নহে। গাছ, লতা, পাতা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে করিতে যখন যাহা জানা যায় তাহা সাধারণকে জানাইয়া রাখা ভাল! একটী কাজের সুচনা একজন করে তার পর কার্য্য সমাপন ভিন্ন লোকে, একজনে বা পাঁচ জনে করে।

ইতি পূর্ব্বে কেবলমাত্র বিদেশ হইতেই কপি প্রভৃতি বীজ আসিত। সালগম ও সালগমের বীজ পাটনা দেশে জন্মিত। ক্রমশঃ পাটনাবাসীগণ ফুলকপির বীজ তৈয়ারি করিতে শিখিল, ভিচের অ. ামজয়েণ্ট ফুলকপি হইতে পাটনা ফুলকপির জন্ম। পাটনায় যদি বা ফুলকপি বীজ জন্মিল তথাপি বাঙলার লোকের ধারণা যে, বাঙলায় ফুলকপি বীজ উৎপন্ন হইবে না। বাস্তবিক বাঙলার রসামাটিতে রসা জল হাওয়ায় ফুলকপি বীজ জন্মান কঠিন। আমরা এক্ষণে কয়েক বৎসর ধরিয়া বিশেষ যত্ন করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ফুল কপি বীজ উৎপন্ন করিতে পারিতেছি। বাঁধাকপির বীজও জন্মিতেছে কিন্তু তাহা সব বৎসর ভাল হইবে, নিঃসঙ্কোচে একথা এখনও বলা যায় না। বাঙলার বর্ষা যায় যায় করিয়া যায় না, শীত দেরীতে পড়ে এবং দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়। সেইজন্য অন্যান্য কপির বীজ ভাল রকম জন্মে না; কিন্তু ইহা চেষ্টার অসাধ্য নহে।

এমেরিকা হইতে আমরা ১২ পাউণ্ড বা ৬ সেরী বেগুনের বীজ আনাই কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে রঙপুরের বেগুনও খুব বড়। কাশীর নিকট রামনগরের বেগুন তুলনায় নিতান্ত ছোট নহে। আমরা দুই জায়গা হইতে বীজ আনাইয়াছি। চারা করিয়া বড় বেগুন ফলাইয়াছি এবং ঐ সকল তাজা গাছের বড় বেগুন হইতে আরও বড় বেগুন উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ আরও দুই চারি বৎসর

করিতে পারিলে বোধ হয় এমেরিকার বেগুনকে ছাপাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা এদেশে বড় বেগুণ প্রচলিত করিবার আর একটা সহজ উপায় আছে। এমেরিকার বীজ হইতে এদেশে বেগুন বীজ উৎপন্ন করা। আমরা কয়েক বৎসর হইতে তাহাই করিয়া আসিতেছি। কিন্তু বড় বেগুন বড় বেগুন করিয়া একেবারে লাফালাফি করা ঠিক নহে। বড় বেগুন ফলে কম। কাশীর বেগুন কাশীতে যেমন ফলে এখানে তেমন ফলে না। রঙপুরের পলিমাটিতে রঙপুরের বেগুন যেমন ফলে এখানে আসিয়া তেমনটি হয় না, ক্রমশঃ খারাপ হইয়া যায়। বাঙলায় কিন্তু বাঙলার মুক্তকেশী বেগুনের মত কোনটা ফলে না। একটা গাছে বৎসরে ওজনে এমেরিকার বেগুন অপেক্ষা অধিক ফলিবে। বাঙলার দোয়াঁস জমিতে শুক্‌না পাঁক ছড়াইয়া এবং গাছ ফলিতে আরম্ভ করিলে একবার চষিয়া খৈল দিয়া তাতে বাতে চাষ করিতে পারিলে চাষীর ঘরে প্রত্যেক গাছ হইতে খরচ বাদে এক আনা হিসাবে লাভ আসিবে।

আলু চাষে সকল চাষীই প্রায় রেড়ীর খৈল ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু আমরা চারি পাঁচ বৎসর ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছি যে, আলু চাষের ক্ষেতটিতে প্রথমতঃ পুরাতন গোবর ও পাতা পচা ও ছাই মিশ্রিত গোয়ালের আবর্জ্জনাদি প্রদান করিয়া রিতিমত চাষ দিয়া আলু বসাইবার সময় যদি বিঘা প্রতি অন্ততঃ ৬/ মণ শরিষার খৈল দেওয়া যায় তাহা হইলে প্রতি বিঘায় ১৭/ কিম্বা ১৮/ মণ অধিক আলু জন্মিবে। সারের খরচ বিঘায় ১৫৲ টাকা অধিক হইলেও অনেক লাভ হইয়া থাকে। আমরা দেখিয়াছি যে ২৪ পরগণার দক্ষিণভাগে নৈনিতাল অপেক্ষা দার্জ্জিলিঙ ফলে অধিক এবং ফজনে পাটনা ও দার্জ্জিঙ প্রায় সমান।

ফলের বাগানে আমাদের আরব্ধ কার্য্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই। আমরা কাঁঠালের জোড় কলম করিতে পারিয়াছি, কলমগুলি বেশ বাড়িতেছে। কিন্তু যত দিন না সেগুলিতে ফল ধরিতেছে ততদিন বলিতে পারা যাইবে না যে কলম করিয়া কি লাভ হইল। খুব সরু রোদ পিঠে ডালের কাঁটাল লইয়া আমরা তিন বৎসরে কাঁটাল ফলাইতে পারিয়াছি।

এইরূপে খুব বুড়া কাকিনা গাছের নারিকেল চারা বসাইয়া তিন বৎসরে নারিকেল ফলাইতে পারা গিয়াছে। নারিকেল চারা পুষ্করিণীর পাঁক মাটির উপর বসাইলে খুব তেজে বাড়িতে থাকে। দুইটি গাছ একরূপ মাটিতে বসাইয়া দেখা গিয়াছে যে পুরাতন গাছের চারাটি ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক গাছের চারাটির এখনও ফল ধরিবার বিলম্ব আছে। নারিকেল গাছে পুষ্করিণীর ঝাঁজি, পানা ও তাহার সহিত পুরাতন পাঁক মাটি দিতে পারিলে গাছ খুব সতেজে বাড়িতে থাকে।

আনারস গাছের পাতায় কাঁটা থাকার দরুণ আনারসের ক্ষেতে কারঞ্চিৎ মেরামত করিবার বড় অসুবিধা ঘটে। এই কারণে আমরা ক্রমাগত অল্প কাঁটাযুক্ত আনারস গাছ বাছাই করিতে করিতে আমরা আমাদের বাঙলায় আনারসের কাঁটা অনেকটা কমাইতে পারিয়াছি কিন্তু ফলতঃ এখনও ইহা একবারে কাঁটাশুন্য হয় নাই। বিগত বর্ষে আমরা আসামে কাঁটাশুন্য আনারসের খবর পাইয়া তথা হইতে ঐ জাতীয় আনারস গাছ আনাইয়াছি। সেই গাছে এখনও ফল হয় নাই বা তাহার বংশ বৃদ্ধির লক্ষণ এখনও দেখা যাইতেছে না।

লাভ জনক সার—মূল ধন অধিক খরচ করিতে পারিলে এবং মূল ধনের অপব্যয় না হইলে অধিক লাভ সুনিশ্চিত। টাকার পর টাকা বিছাইয়া রেল লাইন তৈয়ারি হইতেছে এবং লাইন শেষ হইতে না হইতে জলস্রোতের ন্যায় টাকা আসিয়া ঘরে ঢুকিতেছে। কৃষির ফল এত আশু না হইলেও এবং বাণিজ্যের মত এতটা না হইলেও লাভ বড় সামান্য নহে। আমরা এখন সব্জী ক্ষেতের কথাই ধরি—কপি, সালগম প্রভৃতি ক্ষেতে নাইট্রোজেন, পটাস ও ফস্ফরিক অম্ল ও চূণের প্রয়োজন। ভারতের মৃত্তিকায় প্রায় সর্ব্বত্র চূণের অসদ্ভাব নাই। যদি আমরা প্রতি বিঘায় নাইট্রোজেনের জন্য পুরাতন গোবর সার ১০০ মণ ও খৈল দুই মণ, পটাসের জন্য ছাই না দিয়া খনিজ সল্‌ফেট কিম্বা মিউরিয়েট অব পটাস ৫০ পাউণ্ড এবং জমিটি যদি অন্ততঃ দুই ফিট গভীর করিয়া কোপান থাকে এবং জল সেচনের সুবন্দোবস্ত থাকে তাহা হইলে এত খরচ সত্ত্বেও খরচ উঠিয়া বিঘায় ১০০৲ টাকা লাভ হওয়া বিচিত্র নহে। আমরা দেখিয়াছি খুব অধ্যবসায় সহকারে চাষ করিতে পারিলে কৃষিতেও টাকায় টাকা লাভ হয়।

কিন্তু কৃষি কার্য্যে খুব সাবধানতা আবশ্যক। দৈব প্রতিকূল হইলে তোমার শত চেষ্টা বিফল হইবে। তুমি চেষ্টা করিলে হয়তঃ অনাবৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পার কিন্তু অতি বৃষ্টিতে রক্ষা নাই। তুমি চেষ্টা করিয়া তোমার নিজের ক্ষেতের পোকা নিবারণ করিতে পার কিন্তু পাশের কৃষাণ পোকা নিবারণে উদ্যোগী না হইলে তোমার চেষ্টাও বিফল হইবে।

কৃষি-যন্ত্র—আমরা কৃষকের গ্রাহকগণের নিকট হইতে উন্নত প্রণালীর কৃষিযন্ত্র সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান পত্র পাইয়া থাকি এবং তাঁহাদিগকে সময়োচিত যথাযথ উত্তর দিয়াও থাকি। আমরা এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই যে, ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙলাদেশে আজও ইঞ্জিন পরিচালিত কলের লাঙ্গল চাইবার সময় আসে নাই ; এদেশে যৌথ মূলধনে অদ্যাপিও কৃষি কার্য্য চালনা হইতেছে না। এদেশের বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এখনও এমন বিস্তৃত ক্ষেত্র রচিত হয় নাই যেখানে কলের লাঙ্গল চালাইলে ব্যয়ের অনুপাতে লাভ

অধিক হইতে পারে। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই স্থানীয় দেশী লাঙ্গল ব্যবহৃত হইতেছে। কোথাও কোথাও শিবপুর লাঙ্গল, এবং তাহার অনুকরণে কাঠের রাজেশ্বর লাঙ্গল, কিম্বা হিন্দুস্থান রাজা লাঙ্গল ব্যবহার করা হইয়াছে। এই সকল লাঙ্গলের মধ্যে আমরা শিবপুর ও হিন্দুস্থান ব্যবহার করিয়াছি। এই লাঙ্গল চালাইবার জন্য বলবান বলদের প্রয়োজন বা মহিষের প্রয়োজন। শুক্না জমিতে এই সকল লাঙ্গল চলে ভাল এবং স্থানীয় দেশী যে কোন লাঙ্গল অপেক্ষা গভীর কর্ষণ হয়। কিন্তু বাঙলার অনেক কাদা জলের ক্ষেতে ধান্যাদি চাষের জন্য এই সকল লাঙ্গল কোন কাজেরই নহে। আমরা দেখিয়াছি স্থানীয় দেশী লাঙ্গলের একটু অদল বদল করিয়া লইলে এবং প্রত্যেক লাঙ্গলের সঙ্গে মাটি উল্টাইবার একটু ব্যবস্থা থাকিলে মন্দ হয় না। আমরা সেই রকম লাঙ্গলই পছন্দ করি এবং আমাদের কার্য্যের জন্য সেই প্রকার লাঙ্গলই তৈয়ারি করাইয়াছি। বীজ বুনিবার জন্য বিলাতী ড্রীল লাঙ্গলের অনেক দাম কিন্তু আমরা যদি দেশী লাঙ্গলের সহিত টিনের বা বাঁশের চোঙা দিয়া বীজ বুনিবার লাঙ্গল তৈয়ারি করিয়া লইতে পারি তবে অনেক সস্তায় কাজ সারা যায়। এরূপ লাঙ্গলের ব্যবহার পশ্চিমে আছে।

উপরে যে সকল লাঙ্গলের উল্লেখ আছে সেগুলির অধিক দামের জন্যও সাধারণ চাষীগণের পক্ষে ব্যবহার অসাধ্য। এক মেষ্টন লাঙ্গল দামে খুব কম, খুব হাল্কা, মেরামত কার্য্য সহজে হয়। সেইজন্য আমরা মেষ্টন লাঙ্গল ব্যবহারের পক্ষপাতী। ইহার দাম ৪।০ টাকা মাত্র। বিলাতী লাঙ্গল বা কোদালের মধ্যে আমরা "প্লানেট জুনিয়ার হ্যাণ্ড হো" লাঙ্গল ব্যবহার করিয়াছি। এইটি বিশেষ কার্য্যোপযোগী। ফলের বাগান, কলা বাগান ও কপি প্রভৃতি সব্জী ক্ষেত যাহার লাইন বন্দি করিয়া চাষ হয় তাহার মাঝে মাঝে কারকিৎ মেরামত করিতে হইলে ইহা বিশেষ কাজের যন্ত্র। সাধারণ কোদাল দ্বারা একার্য্য সারিতে হইলে অনেক অধিক খরচ পড়ে। ভুট্টা ছাড়ান, বৃক্ষ লতার আঁশ তোলা যন্ত্র, গম, যৈ, যব, আখ কাটা ও আলু তোলা যন্ত্রগুলির দাম অধিক, সেইজন্য ঐ সকল যন্ত্রের বিষয় আমরা পরীক্ষা করিবার সুবিধা পাই নাই এবং ক্ষেতটি অতি বিস্তৃত না হইলে এই সকল যন্ত্র ব্যবহারের কোন উপযোগিতাও দেখা যায় না।

জল তোলা যন্ত্রের দাম কম না হইলেও বাধ্য হইয়া ইহার জন্য চাষীগণকে আগ্রহ করিতে হয়। জল, দশ বা বার কিম্বা তাহার কম নীচে থাকিলে সাধারণ সিউনি, ঢেপুলা, ডোঙ্গা কিম্বা বাল্তি কল ব্যবহার করাই ভাল। অধিক নীচে হইতে জল উঠাইবার জন্য আমরা ফোর্স বা পিচকারী পাম্প ব্যবহার করিয়াছি। ইহা ব্যবহারে কিন্তু খুঁটি নাটি অনেক এবং একবার বিগ্ড়াইলে শীঘ্র ঠিক করা

কঠিন। বিশিষ্ট কারখানা মিস্ত্রির আবশ্যক। এই প্রকার পাম্প অপেক্ষা যুক্ত প্রদেশের শিকল পাম্প ভাল। ইহাদ্বারা মানুষ কিম্বা বলদ দ্বারা চাকা ঘুরাইয়া জল তোলা যায়। এই পাম্প সাহায্যে এক ঘণ্টায় ১৫০০ শত গ্যালন জল ২০ ফিট ঊর্দ্ধে উঠান যায়। দাম ৭০৲ টাকার মধ্যে। ইহা মেরামত সহজে হয়। ঘণ্টায় ১০,০০০ গ্যালন জল উঠান যায় এমন পম্পের দাম ১৩০০ টাকা। যুক্ত প্রদেশের কৃষি বিভাগকে পত্রাদি লিখিলে এই পাম্প সম্বন্ধে খবর জানিতে পারা যায়।

ভারতীয় কৃষির উন্নতি

কৃষি বিশেষজ্ঞের অভিমত

পুনা কৃষি-কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ম্যান স্যহেব এদেশের কৃষিকার্য্যে কি করিয়া উন্নত প্রকৃতির ব্যবস্থা প্রচলন করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে নিজ অভিজ্ঞতার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তদ্দ্বারা কি উপকার পাইতে পারি, তাহাই আলোচনা করা যাইবে। প্রথমতঃ তাঁহার অভিমত দ্বারা, কৃষি প্রচলনে ব্রতী সরকারী কর্ম্মচারীগণেরই বিশেষ উপকার হওয়ার কথা। কারণ, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহাদেরই জন্য। কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীগণের কার্য্য পদ্ধতির দোষগুণ, সুবিধা অসুবিধা, এবং উহার নিবারণের উপায়ের কথা, সাধারণ কৃষক সম্প্রদায়কে মুখ্যভাবে বিশেষ উপকার করিবে না। কিন্তু দেশের লোকের এবং বিশেষভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জানা উচিত, কি ভাবে সরকারী কর্ম্মচারীগণ এই ভারতীয় জটিল কৃষি-সমস্যার মীমাংসা করিতে বদ্ধপরিকর, এবং তাহাদের কার্য্যাবলী কোন্ স্থানে কার্য্যকর, এবং কোন্ স্থানে নিস্ফল হইতেছে। সরকারী কার্য্য পরিচালনের পরীক্ষকের প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখা, জনসাধারণের অধিকার আছে বলিয়া বলিতেছি না, পরন্তু গরীবের পক্ষে বড়লোকের কাজ দেখিয়া, অভিজ্ঞতালাভ করা মন্দ নয়। অবশ্য, নানারূপ খরচ আড়ম্বর করিয়া অর্থশালী ব্যক্তি যে লাভ করেন, গরীব তাহা শিখিলেও অর্থাভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না, কিন্তু অর্থ ব্যয় অনর্থক হইলে, তৎসম্বন্ধে সাবধান হইতে পারে। আর পরে, লাভপ্রদ ব্যয়বহুল কার্য্যকে কতকটা নিজের উপযোগী করিয়া লইয়া, কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে।

যাহা হউক, কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া, বিশেষজ্ঞের মতগুলি নিম্নে সঙ্কলিত করা গেল। প্রবন্ধান্তরে তাহার সম্যক আলোচনা করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

১। এদেশের কৃষিকার্য্য, ছোট ছোট জমি লইয়া চাষ করিতে পারে, এইরূপ গরীব লোকের হাতে এবং ঐ সকল চাষী সম্প্রদায়, সমাজের নিম্নস্তরের লোক, এবং উহাদিগকে সমাজের উন্নত জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখাতে, উহারা ক্রমোন্নতিশীল সম্প্রদায় হইতে পারে না। তাহারা উন্নতির সংস্পর্শে আসিতে পারে না। কেবলমাত্র তাহাই নহে, পরন্তু তাহারা উন্নতি বিধায়িনী জ্ঞানের সংস্পর্শ পায় না।

২। তদ্ভিন্ন এদেশের কৃষকেরা গোঁড়া রক্ষণশীল সম্প্রদায় নহে। বাস্তবিক কোন বিষয়ে উৎকর্ষ দেখিলে তাহারা গ্রহণ করিতে পারে, কুসংস্কারে একান্ত আবিষ্ট থাকে না।

৩। এ দেশের কৃষকেরা বড়ই গরীব। নিজের টাকাতো নাই, মহাজন, জমিদার ও উৎপীড়কের প্রাপ্য দিয়া, তাহাদের সম্বৎসরের খরচ, সকল সময়ে কুলায় না; বস্তুতঃ তাহাদিগকে পরের মুখাপেক্ষা করিতে হয়। তাহারা অল্প সুদে টাকা পায় না। শত করা ২৫৲ টাকা হইতে ৭৫৲ পর্য্যন্ত সুদ দেয়। তাহাদের নিকট ঠকাইয়া লইবার লোক অনেক। সুতরাং সরকারের কথাতেও তাহারা, অন্যকে রীতিমত উপকার লাভ করিতে না দেখা পর্য্যন্ত আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। ইহা স্বাভাবিক, গভর্ণমেণ্ট দর্শিত সুন্দর কৃষি পদ্ধতিগুলি এবং তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়াও, ইহারা ঐগুলিকে বড় লোকের ব্যবস্থা এবং অধিক বেতন ভোগী কর্ম্মচারীগণের সুব্যবস্থার ফল বলিয়া, গণ্য করে। তৎসম্বন্ধে কোন উচ্চাভিলাষ পোষণ করে না।

৪। শত করা ১০৲ হইতে ২০৲ পর্য্যন্ত লাভকেও উহারা লাভ বলিয়া গণ্য করে না, যেহেতু মহাজনের সুদ বাদে তাহার কোনও লাভ থাকে না।

৫। অনেক সময় বৈঠক বা সমিতির কার্য্য ও পুস্তিকা প্রচারিত কৃষিতত্ত্ব, উহারা হুজুগ বলিয়া মনে করে। কিন্তু উহাদের নিজ ক্ষেত্রে যুক্তিগুলি প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে পারে।

৬। অনেক সময় কৃষকেরা উপদেষ্টার সত্যতার উপর সন্দিহান। কারণ, তাহাদের নিজ অবস্থা ঋণ জালে আবদ্ধ থাকা হেতু বিপদ সঙ্কুল।

৭। কোন কৃষি পদ্ধতি ও কৃষি সরঞ্জাম, স্থানীয় অবস্থার উপযোগী কি না; বিচার না করিয়া তৎসম্বন্ধে প্রচার করাতে, এত বদনাম রটিয়া যায় যে, উহা বড়ই উপহাস্য হইয়া পড়ে। তাহাতে সরকারী কার্য্যের বড়ই ক্ষতি হয় এবং সহজ বিশ্বাসী প্রজার কাছে, কৃষির উন্নতি সুদূর পরাহত হইয়া পড়ে।

৮। অনেক সময় কৃষকের প্রকৃত অভাব না বুঝিয়া, আমরা কাল্পনিক অভাবের নিবারণ করিতে যাই। কৃষকের জলের অভাব, কিন্তু তাহার নিকট

অস্থিচূর্ণ সারের উপকারিতা ও উপযোগীতা বুঝাইতে গেলে তাহার বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক।

৯। তজ্জন্য স্থানীয় কৃষি সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব সংগ্রহ ও তাহার উন্নতি করিয়া কৃষককুলকে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদের প্রকৃত অভাব জানিতে হইবে এবং কেবল মাত্র সেই অভাবের নিরাকরণ দ্বারা তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে, প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিলে, বিশেষতঃ তাহাদের জমি তাহাদেরই একজনের দ্বারা উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে চাষ করিয়া তাহার ফল দেখাইলে, তাহা বিজ্ঞাপিত করিতে হইবে না। কৃষকেরা নিজেই তাহার উপকারিতা বুঝিয়া, আপনার উন্নতির পথ আপনিই প্রসারিত করিবে।

পত্রাদি

ঘোরতর পরিবর্ত্তনের যুগে কৃষকের অনেক পাঠক ক্রমাগত উন্নত কৃষি-যন্ত্রাদির খোজ লইতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে যথাযথ উত্তর প্রদানে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে সাধারণের অবগতির জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কৃষি ডিরেক্টর মিঃ হার্ট সাহেব কৃত কৃষিযন্ত্র সম্বন্ধে অভিমত এখানে সন্নিবেশিত করা যুক্তযুক্ত বলিয়া মনে করি। তিনি কতিপয় লাঙ্গল ও কোদালির লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। প্লানেট জুনিয়ার হ্যাণ্ডহো, টরণরেষ্ট লাঙ্গল এবং হিন্দুস্থান লাঙ্গল ও কলিকাতায় বরণ কোম্পানি দ্বারা প্রেরিত কয়েকখানি মেষ্টন লাঙ্গল, জল উত্তোলন জন্য চেন পম্প, আখমাড়া কল তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। টরণ রেষ্ট লাঙ্গলের এক পাশে ফলার কিছু উপরে পাখা আছে, তাহার সাহায্যে চাষকালে মাটি উল্টাইয়া পড়ে। ইহা খুব ভারি, দাম অধিক—২৭৲ টাকা, একজোড়া খুব জোরাল বলদ বা মহিষ না হইলে টানিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে মাটি ৪ হইতে ৮ ইঞ্চি গভীর কর্ষণ করা যায়। সাধারণ দেশী কোদাল দ্বারা কোপান অপেক্ষা ইহাতে অবশ্য ভাল কাজ হয়। নূতন জমি আবাদ করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। দাম অধিক হেতু সাধারণে ব্যবহার করিতে না পারিলেও ধনাঢ্য চাষিরা ব্যবহার করিতে পারেন। মেষ্টন লাঙ্গল ইহা অপেক্ষা খুব ছোট, দাম ৪।• টাকা মাত্র, ইহাতে দেশী লাঙ্গল অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত কিছু ভাল চাষ হয়। দামে সাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত। একটী তুঁতের ক্ষেতে প্লানেট জুনিয়ার হাত কোদালীর পরীক্ষা হইয়াছিল। ইহা একপ্রকার চাকা সংযুক্ত কোদালী। চাকাঠেলিয়া লইয়া গেলে কয়েক খানি কোদাল চলিতে থাকে, কোদালগুলি এরূপভাবে গাঁথা ও জমি কোপান হইতে

থাকে। ইহাতে মাটি খোঁড়া, আল্গা করা, আগাছা সাফ করা কাজ বেশ হয়। আখ, আলু, তুঁত, তামাক যাহা লাইনবন্দী আবাদ করা হয়, তাহার মধ্যে কোপাই-বার জন্য এই যন্ত্রটি বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে হয়। সাধারণ কোদাল, খুরপি বা নিড়ানি অপেক্ষা ইহা দ্বারা অল্প সময়ে কম খরচে, সহজে কাজ হয়। তুঁতের ক্ষেতে গাছের মাঝে মাঝে সর্ব্বদাই পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়। হার্ট সাহেব বলেন এই কার্য্যের জন্য ইহার প্রয়োজনীয়তা বেশ বুঝা যায়। মালদার কোন একটি ভদ্রলোক ইহা বহুদিন ব্যবহার করিয়া ইহা যে কার্য্যকরী তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। দাম ১৭৷৷০ টাকা।

ভারতীয় কার্পাস সূত্র—ভারতীয় কার্পাস সূত্র চীন ও জাপানে প্রচুর পরিমাণে কাট্‌তি হইত। কিন্তু এক্ষণে জাপান ও চীনবাসীগণ স্বদেশে সূত্র উৎপন্ন করিতেছেন। জাপান স্বদেশে ব্যবহারোপযোগী সূত্র উৎপন্ন করিতেছে এবং চীনে চালান দিতেছে। গত বৎসরে ৩৯ হাজার ১৬ পিকুল সূত্র সংহাই বন্দরে প্রেরণ করিয়াছিল। সকল দেশই আত্মনির্ভরশীল হইতেছে। ভারতীয় কলওয়ালাগণ সূত্র রপ্তানি করিয়া দুই পয়সা রোজগার করিতে-ছিলেন, কিন্তু এখন সে পথও বন্ধ হইবার আশঙ্কা জন্মিয়াছে। এ অবস্থায় ভারতবাসী যদি স্বদেশজাত সূত্র ও স্বদেশী সূত্রে প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহার না করেন, তাহা হইলে ভারতীয় কল সমূহের অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িবে। চীন ও জাপান স্থূল সূত্রে প্রস্তুত কাপড় ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, জাতীয় উন্নতি বিধানের জন্য তাহারা সূক্ষ্মসূত্রের বিলাসিতা ত্যাগ করিয়াছে। ভারতবাসীরও এক্ষণে ইহাই কর্ত্তব্য।

রপ্তানী শুল্ক—ব্রহ্মদেশের ছোট লাট ব্রহ্ম হইতে রপ্তানী চাউলের উপর শুল্ক ধার্য্য করিয়াছেন,—ইতিপূর্ব্বে এইরূপ একটা সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। বিলাতে পার্লামেণ্টের কমন সভায় স্যার জন জার্ডিন সাহেব এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। মণ্টেগ সাহেব উত্তর দিয়াছেন,—"ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমতি না লইয়া ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট এরূপ শুল্ক বসাইতে পারেন না; তবে, ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের এরূপ প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা যথাবিধি বিচার আলোচনাই করিব।" এই শুল্কের কথায় ব্রহ্মের রেঙ্গুণ প্রভৃতি সহরে একাধিক প্রতিবাদসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এইবার এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কিরূপ সিদ্ধান্ত হয়, দেখা যাউক।

মৃত্তিকার উৎপত্তি ও তাহাতে বৃক্ষাদির খাদ্য—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বলেন, বায়ু, বৃষ্টি, রৌদ্র ও শীত সংযোগে প্রস্তর হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইতেছে। আবার সেই মৃত্তিকার উপর নানাবিধ উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু জন্মিয়া মরিয়া যাইতেছে। তাহাদের দেহ পচিয়া ও মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া মৃত্তিকাকে চাষ আবাদের উপযুক্ত করিতেছে। প্রথমে পার্ব্বত্যদেশে মাটির সৃষ্টি হয়, পরে নদী দ্বারা তাহা নানাস্থানে চালিত হইয়া থাকে। মৃত্তিকার সহিত নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত আছে। তাহার মধ্যে ছয়টী উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। যথা, নাইট্রোজেন, ফস্ফরাস্, ক্যাল্সিয়ম্, পটাসিয়ম্, লৌহ ও গন্ধক। যাহা হইতে সোরা জন্মে, তাহার নাম নাইট্রোজেন্; যাহা হইতে জীব জন্তুর হাড় জন্মে, তাহার নাম ফস্ফরাস্; যাহা হইতে চুণ জন্মে, তাহার নাম ক্যাল্সিয়ম্; এবং যাহা হইতে ক্ষার জন্মে তাহার নাম পটাসিয়ম্। উদ্ভিদের এই ছয় প্রকার খাদ্যের মধ্যে নাইট্রোজেন্ প্রধান। এইজন্য উদ্ভিদেরা অধিকন্তু মাটি ও বাতাস, এই উভয় হইতেই নাইট্রোজেন্ পাইয়া থাকে।

গবাদির গণনা—গভর্ণমেণ্টের আদেশে প্রত্যেক গ্রামে—প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহপালিত গবাদির গণনা হইয়াছে,—সঙ্গে সঙ্গে কোন্ গ্রামে গোচর ভূমি কত,—তাহারও পরিমাণ-নির্দ্দেশের ব্যবস্থা হইয়াছে। পঞ্চায়েত-প্রেসিডেণ্ট এবং পুলীশ-দারোগারা এই গণনার ভার পাইয়াছেন। এই গণনার রিপোর্ট-ফল জানিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত হইয়া রহিলাম। কোন্ গ্রামে পুকুরের সংখ্যা কত,—কয়টা পুকুরই বা জলশূন্য, আর কয়টা পুকুরই বা জলপূর্ণ;—ইহারও তদন্তের ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়, কারণ অনেক সময় খাদ্য ও পানীয় এই দুই অভাবে অনেক গবাদি পশু প্রাণত্যাগ করে।

সার-সংগ্রহ

ভারতে গো-জাতির অবনতি

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল লিখিত

আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যে গোজাতির বিশেষ আবশ্যকতার কথা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কেবল কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত যে গোজাতির আবশ্যক তাহা নহে, গাভীর দুগ্ধ হইতে আমাদের জীবন রক্ষার উপায় হয়।

বাঙ্গালা দেশে গোজাতির যে অতি অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতেছেন। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান তাহা সন্দর্শন করিতেছেন। বলিষ্ঠ বলদ আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়—সোন্‌পুরের, হরিহরছত্রের মেলা, গয়ার চৈত্রসংক্রান্তির মেলা, বহরমপুরের মেলা, চিৎপুরের হাটই আমাদের বলদ প্রাপ্তির স্থান, কিন্তু ঐ সকল স্থান বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া বাঙ্গালী কৃষকেরা সহজে উহা সংগ্রহ করিতে পারে না। বলিষ্ঠ বলদের অভাবে আমাদের অবনতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের সে দধি ক্ষীর মাখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘাটালের সে মাখন ঘৃতের আর আমদানী নাই, সহৃদয় পাঠক ইহার অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? কেন ।০ চারি আনা সের দাম দিয়াও জলমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতেছেন? আজ যে বাজারের ঘৃত দেখিতেছেন, উহার সহিত বাদামের তৈল, আলু বা কলার ক্বাথ, মৃত জন্তুর চর্ব্বি প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া পশ্চিমাঞ্চল হইতে ব্যবসায়ীরা এদেশে আনাইয়া প্রচুর লাভবান হইতেছে। এসব কেন? বঙ্গে গাভীর অভাব নিবন্ধন দুগ্ধের অল্পতা ঘৃত কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গে আজ গোজাতির এ অবনতি কেন হইল? বাঙ্গালী হিন্দুগণের গোয়ালে আজ দুগ্ধবতী গাভীর অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে কেন? ইহা কি কেহ চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন? ভেজাল দুগ্ধ ঘৃত পানাহার করিয়া বাঙ্গালী রুগ্ন, ক্লিষ্ট, শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, গৃহস্থ গাভীর চারিটী বাঁটের মধ্যে দুইটী বাঁট গো-বৎসের জন্য পৃথক রাখিয়া দুইটীর দুগ্ধ মাত্র গৃহস্থের সমস্ত পরিবারের জন্য দোহন করিয়া লইতেন। গাভী প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দান করিত। এখন বঙ্গে সে নিয়মের কথা গল্পমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাজপুতনায় এখনও এই প্রথা কিয়ৎপরিমাণে আছে।

আমরা এখন লেখা পড়া শিখিয়া কেবল চাকুরীর জন্য লালায়িত হই। আমরা সে পরাশর বাক্য ভুলিয়া পরসেবায় আত্মহারা হইয়াছি, চাষের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখি না, কাজেই বলিষ্ঠ বলদের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা এখন এমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি যে, উৎকৃষ্ট দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতির জন্য আমরা কিছু মাত্র উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছি না।

গো জাতির অবনতির কারণ কি?

(১) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব (২) গো-জাতির স্বাস্থ্য-রক্ষায় অমনোযোগিতা (৩) অবাধ গোহত্যা (৪) সাধারণের মধ্যে কৃষককুলের জাতীয় নিঃস্বতা কৃষির অবনতি।

আমাদের দেশে গোচারণভূমি থাকিত। এখন আর তাহা নাই। জমিদারগণ সেই গোচারণভূমি আর রাখে না; প্রজাবিলি করিয়া দেওয়ায় গোচারণ ভূমি চাষ করা হইতেছে। কাজেই গোজাতির প্রচুর কাঁচা ঘাস খাওয়ার পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। আমেরিকা মহাদেশে ঘাসের চাষ করা হয়। সেই ঘাস খাইয়া গরু বিশেষ উন্নতি লাভ করে। সাধারণ লোকে গরুর তেমন যত্ন করে না। গরুর কোনও রূপে স্বাস্থ্য হানি ঘটিলে তাহার প্রতীকার হয় না। মফঃস্বলে উপযুক্ত পশুচিকিৎসক নাই। আজকাল যাহারা গরুর চিকিৎসা করে তাহাদের উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করা যায় না। তখন আমাদের দেশে ধর্ম্মের ষাঁড় অবাধে চরিয়া বেড়াইত, কিন্তু এখন আর ষাঁড় সেরূপ যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে না। মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিতে কতকগুলি ষাঁড় ধরিয়া বলদের ন্যায় গাড়ী টানা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বলিষ্ঠ ষাঁড়ের অভাবে গাভী আর বলিষ্ঠ বৎস প্রসব করিতেছে না। বিভিন্ন দেশ হইতে ষাঁড় সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে গোজাতির অসাধারণ উন্নতি হইতেছে।

বর্ত্তমানে এদেশে যেরূপ অবাধে গোহত্যা সাধিত হইতেছে তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। এদেশে যেরূপ কসাই-হস্তে গোহত্যা হইতেছে, তাহার প্রতিবিধান কল্পে কোন উপায় করা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে দুগ্ধবতী গাভী অথবা গোবৎস কখনও হত্যা করা হয় না। সেখানে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে সকল প্রকার গরুই কসাই-হস্তে ছুরিকা রঞ্জিত করিয়া দেশের প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিয়া—আমাদের ভবিষ্যৎ ঘোর তিমিরাবৃত করিবার উপক্রম করিয়াছে। দয়ালু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিলে উপায়ান্তর নাই।

কৃষিকার্য্যের অবনতি ও গোজাতির অবনতি একই সূত্রে গ্রথিত। কৃষিকার্য্যের অবনতি ঘটিলে দেশের শুভ সম্পাদিত হইতে পারে না। গাভীর অবনতিতে দুগ্ধের অভাবে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইতেছে। দুগ্ধের অভাবে ঘৃত উৎপন্ন হইতেছে না। ঘৃতের অভাবে এদেশে জনসাধারণের যে ভয়াবহ দুর্গতি হইতেছে, তাহা প্রগাঢ় দুঃখের অবসাদে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি না জানি না। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা কৃষককুলের প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিপাত করেন না, চাষা ইত্যাদি অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া থাকেন। কৃষককুলের নিঃস্বতা, অভাব, অভিযোগ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেখেন না,—তাঁহাদের এই অমনোযোগিতাই কৃষির, কৃষককুলের এবং সঙ্গে সঙ্গে গোজাতির অবনতির সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় যুবক আমেরিকা জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে কৃষিবিষয়ক শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া এই সমস্ত লক্ষ্য রাখিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। 'ঢাকা হইতে কৃষিসম্পদ

নামক যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে উহাদ্বারা তাহারা তাঁহাদের লব্ধ জ্ঞানের প্রচার করিতেছেন। আশা করি, বঙ্গীয় কৃষককুল উক্ত পত্রিকার উপদেশ লইবেন এবং আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যেন তাঁহারা গোজাতির উন্নতি সাধনার্থ বিশেষ আগ্রহ সহকারে চেষ্টা করেন। পর প্রবন্ধে গোসেবা, পালন ও উন্নতি সাধনের উপায় সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিব।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগ।—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ, বিলাতি বেগুন, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পালম্ শাক, টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আল্গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল, প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন—ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল.

পিচ, নানা প্রকার লেবু, গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের মোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ায় মাটি খোঁড়া উচিত এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচুড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছ গুলি দস্তুর মত গজাইয়া উঠিবে।

শস্যক্ষেত্রে—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণবঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং এখন সব্জী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপি চারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইশুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কস্মকোম্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ খণ্ড। } আষাঢ়, ১৩১৯ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

মৎস্যের চাষ

আধুনিক ভারতবর্ষের প্রায় অধিকাংশ লোকেই মাছ কিম্বা মাংসভোজী। তাঁহারা মাছ মাংস ব্যতীত আহার করিতে পারে না। মৎস্য এক্ষণে একটি প্রধান খাদ্য বলিয়া গণ্য এই কারণে মৎস্যের বংশ বৃদ্ধির উপায় চিন্তা করা আবশ্যক হইয়া পড়িতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে সামান্য মূল্যে অনেক মৎস্য পাওয়া যাইত এখন আর তাহা মিলে না। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, লোক সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে যাঁহারা মৎস্য খাইতেন না, আজকাল তাঁহাদেরও মৎস্য বিনা উপায় নাই। যে কোন ক্রিয়া কর্ম্মেই হউক না কেন মৎস্যের বিশেষ প্রয়োজন। মৎস্য ব্যতীরেকে তাঁহাদের আহারাদি সুবিধা ও তৃপ্তিজনক হয় না। বাঙলায় জলাভূমি ক্রমশঃ ভরাট হইয়া আসিতেছে, খাল বিল মজিয়া যাইতেছে, নদীর মুখে বাঁধ পড়িয়া নদীর অল্প জল হইয়া আসিতেছে, নানা কারণে সেচের জলের ব্যয় হেতু নদী প্রবাহ কমিয়া আসিতেছে এইজন্য মৎস্য পূর্ব্বের ন্যায় আর অধিক জন্মাইতেছে না। এই সকল কারণের জন্য মৎস্য দিন দিন দুর্ম্মূল্য হইতেছে, দেশে (পল্লীগ্রামে) একরূপ পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। যাহা পাওয়া যায়, তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে ক্রয় করা অসাধ্য। অসময়ে ও অযথা মৎস্যের পোণা নষ্ট করা হয় বলিয়াও মৎস্যের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে—ধীবরেরা যে পরিমাণে মৎস্য ধরে তাহা বেশী পয়সার লোভে সহরে প্রেরিত হয়, এবং সেই লোভে পড়িয়াই ছোট বড় যাহা পাওয়া যায় সবই মারে; এবং সকল রকম মৎস্য মারিবার জন্য বিভিন্ন রকম জাল প্রস্তুত করিয়াছে। উহাদিগেরই বা দোষ কি? যখন বড় বড় মহারথীগণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করেন না, কিসে দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে, তাহা একটু চিন্তা করেন না; ধীবরের পক্ষে

ও কাজটা তত অপরাধ বা অন্যায় বলিয়া বোধ হয় না। প্রায়ই দেখা যায় যে, মৎস্যের অভাব হওয়াতে ধীবরদের ব্যবসাটাকে অন্য লোকে একরূপ কাড়িয়া লইবার মত করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা নিজেদের মৎস্যের অভাব হইলে ছিপ বা জাল হস্তে নদীর দিকে অগ্রসর হন। ইহাতে পাঠক বলিতে পারেন যে, তাহাতে আর অপমান কি? মান অপমানের ভয় নাই; এখানে আমাদের প্রধান লক্ষ্য এই যে সকলেই যদি ঐরূপ জেলেদের কার্য্য ভাগাভাগি করিয়া লন, তবে মৎস্যের ব্যবসায়গত প্রাণ জেলেদের জীবন ধারণের কি উপায় হইবে। এইরূপে একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জীবিকা উপায়ের ব্যবস্থার ভার অন্য সমাজের উপর আসিয়া পড়ে।

যাহা হউক ধীবরগণকে রক্ষার পূর্ব্বে মাছ রক্ষার কথা আগে ভাবিতে হইবে। মাছের পোণা বা ডিম নষ্টের গতি প্রতিরোধ করা নিতান্ত সহজ নহে। বর্ষারম্ভে মৎস্যগণ স্রোতের জলে যে ডিম ছাড়ে তাহাই স্রোতের জলে চারিদিকে ভাসিয়া যায়, খালে, বিলে যাইয়া সেই সমুদয় ডিম্বাণু বর্দ্ধিত হয়, লোকে তাহা ধরিয়া পুষ্করিণী, দীঘি আদি জলাশয়ে মাছের আবাদ করে। ডিম ধরিবার নিষেধ বিধি করিয়া দিলে পুষ্করিণী আদি জলাশয়ে মাছের আবাদ বন্ধ হইয়া যাইবে! সাধারণের দৃষ্টি পড়িলে, সকল লোক মনোযোগ করিলে কোন না কোন উপায় হওয়া সম্ভব। নিতান্ত শিশু মাছ যদি ক্রয় করিবার খরিদ্দার না থাকে, যদি তাহা অকারণে নষ্ট করা ঘৃণিত বলিয়া মনে করা হয়, তবে পোণা নষ্ট হওয়া কিয়ৎপরিমাণে রহিত হইতে পারে। নষ্ট হইয়াও যাহা থাকে তাহাও অনেক। মাছের আবাদের রীতিমত চারিদিকে ব্যবস্থা হইলে মৎস্য একেবারে দুর্ল্লভ হইবে না এরূপ আশা করা যায়! বড় জলাশয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এই ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ইহাও জানিয়া রাখিতে হইবে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশেই মৎস্যের আবাদ অধিক, বঙ্গদেশেই নদ নদী, খাল বিল ও ডোবা ইত্যাদি অধিক। এই সকল স্থানে মৎস্য অধিক পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। নানা প্রকার পাটা, শেওলা ও অন্যান্য প্রকার পচা লতা পাতা খাইয়া মৎস্যকুল বাঁচিয়া থাকে। মৎস্য নির্জ্জনস্থানে ডিম্ব প্রসব করিলে যে সকল ছোট ছোট পোণা হয় সেই সকল পোণা পরিণামে এক একটা প্রকাণ্ড মৎস্য হয় এবং তাহার এক একটা মাছেই কতলোকের আহারের সুবিধা হয়। ছোট একটীতে তাহা হয় না। পরন্তু ডিম্বাণুগুলি একটু উপকারেও লাগে না। সেই জন্য বলি যে ছোট ছোট মৎস্য বা ডিম্বাণু নষ্ট না করা আমাদের উচিত। কিন্তু এ কথা শুনেই বা কে আর বোঝেই বা কে?

আমরা দেখিতে পাই যে জাহাজ ষ্টীমার প্রভৃতি যে নদীতে চলে, সে নদীতে মৎস্য বেশী জন্মে না। বাস্তবিক জাহাজের চাকার ছপ ছপ শব্দে মৎস্য সকল

ভয়ে কম্পিত হয় এবং দুর্ব্বল মৎস্য সকল (যাহারা সম্প্রতি ডিম্বাণু প্রসব করিয়াছে) জলমধ্যে ঘূর্ণায়মান জাহাজের চাকার ঘূর্ণাবর্ত্তে আসিয়া পড়িয়া চক্রের ঘর্ষণে মরিয়া যায়। পূর্ব্বে যশোহর, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে নদ নদীতে যেরূপ মৎস্য মিলিত আজকাল তাহার সিকি অংশ মিলে কি না সন্দেহ।

যাহাতে দেশে মৎস্যের আমদানী বেশী হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এদেশীয় ধীবরগণ ছোট পোণা ধরিয়া পুষ্করিণী বা অন্য কোন জলাশয়ে রাখে। যদি তাহাদিগকে উপযুক্ত শেওলা, ঘাস, লতাপাতা ইত্যাদি খাদ্য দেওয়া যায় তাহা হইলে সে সকল বড় হইয়া বংশবৃদ্ধি করে। পুষ্করিণী আদিতে ডিম ছাড়িলে এক সপ্তাহ মধ্যে ডিম ফুটিয়া উঠে তখন পোণার খাবার জন্য ময়দা, চাউলের গুঁড়া, ছাতু প্রভৃতি প্রদান করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু আমরা আলস্য বশতঃ এতটা যত্ন করি না। পোণাগুলি কিঞ্চিৎ বড় হইলে এক পুকুর হইতে অন্য পুকুরে নাড়ানাড়ি করিলে পোণা শীঘ্র বাড়িয়া যায়। এতদ্ব্যতীত চীনদেশীয় ধীবরদের উপায় অবলম্বন করিলে অনেক লাভ হয়। তাহারা হংস, মুরগী প্রভৃতির ডিম্ব সকলের এক পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া কুসুম ও লালা বাহির করিয়া লয়। এবং তাহার পরিবর্ত্তে নবজাত আঠার ন্যায় মাছের ডিমে পূর্ণ করিয়া বন্ধ করে। পরে হংস বা মুরগীর তায়ে রাখিয়া দেয়। এবং বড় হইলে তন্মধ্যস্থ ডিম্বাণুগুলিকে তপ্ত জল পাত্রে রাখিলে পোণা মাছ হয়। এবং উপযুক্ত হইলে পুষ্করিণী বা জলাশয়ান্তরে রাখা হয়।

আমরা এতক্ষণ কেবল পোণার খাদ্যের কথা বলিয়াছি বড় মাছেরও আহার যোগান কর্ত্তব্য।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জন্তু সকল যেমন একমাত্র বায়ুর সাহায্যে জীবন ধারণ করিতে পারে না, মাছেরাও সেই রকম কেবলমাত্র জল খাইয়া বাঁচিতে পারে না; বায়ু ও জলের সঙ্গে খাদ্যেরও প্রয়োজন। রাসায়নিক বিশ্লেষণে অবধারিত হইয়াছে যে মাছে ২০ ভাগ নাইট্রোজেন, ৮৷৷০ ভাগ ফস্ফরিক অম্ল ও ৪৷৷০ ভাগ ক্ষার এবং তৈলজ পদার্থ শতকরা ১৯ ভাগ থাকে। অতএব মৎস্যশরীর গঠনকার্য্যে এই কয়টি পদার্থের আবশ্যক। পুকুর, খাল, বিল, নদী প্রভৃতি জলাশয়ে যে সকল পচা পাতা, শেওলা, দাম এবং অন্যান্য প্রাণীসমূহের মলমূত্রাদি পড়ে বা থাকে, তাহাতে নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক অম্ল ও ক্ষার থাকে। ঐ সকল দ্রব্য আহার করায় মাছের শরীর পোষণ হয় ও মাছ বাড়িতে থাকে। খাদ্যহীন বিশুদ্ধ জল খাইয়া মাছ বাঁচিতে বা বড় হইতে পারে না।

জলজ উদ্ভিদ ও অন্য আবর্জ্জনাজনিত সার পদার্থ ভিন্ন খৈল, পশুপক্ষী প্রভৃতির মলমূত্র, গলিত উদ্ভিদ ও জীবদেহ, ভাত, ডাল প্রভৃতি মৎস্যের খাদ্যরূপে ব্যবহার করিলে মাছের আবাদ ভাল মত হয়। কার্পাসের খৈল দ্বারা মাছের অধিকতর

পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। মৎস্যের পক্ষে গোময় একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য। মাছের পোণার পক্ষে শামুক ও গেঁড়ি (গুগলি) বিশেষ উপযোগী গোশালায় বা সহর বাজারের নর্দামা বাহিত সারে মাছের উপকার হয় কিন্তু ঐরূপ ময়লা জল স্নান পানের জলাশয়ে পড়িতে দেওয়া বিধেয় নহে। ধোবাকে কাপড় কাচিতে দিলেও উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। জমিতে যেমন সার দিয়া শস্যের খাদ্য সংস্থান করিয়া দিতে হয়, জলাশয়েও সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে মৎস্যের খাদ্য যোগাইলে সহজে মাছের আবাদ নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে।

আমাদের পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে শোল, লেঠা, কই, মৌরলা, পুটী, খরশলা প্রভৃতি মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পুষ্করিণীতেই ডিম প্রসব করে। কিন্তু রোহিত, মিরগাল, কাতলা, বাটা প্রভৃতি মাছ কিম্বা ইলিশ, ভেটকি প্রভৃতি মাছ স্রোতের জল কিম্বা বড় বড় খাল, বিল না হইলে ডিম ছাড়ে না। রোহিত, কাতলা প্রভৃতি মাছ ডিম প্রসবের সময় স্রোতের উর্দ্ধদিকে গমন করিতে থাকে। ডিম ছাড়িবার সময় পুং মাছগুলিও স্ত্রীমৎস্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। স্ত্রীমৎস্যেরা ডিম ছাড়িবার পরই পুং মৎস্যগুলি ডিম্বাণুগুলির উপর একপ্রকার রস বমন করিয়া দেয়। এই নিষেক ক্রিয়াদ্বারা ডিম্বাণুগুলি সঞ্জীবিত হয়। কি প্রাণীজগতে কিম্বা উদ্ভিদজগতে জীবাণুর সহিত স্ত্রী ও পুং বীর্য্যের সংযোগ একান্ত আবশ্যক। আমরা মাছের পেটে ডিম দেখিয়াছি, দুইটি কোয়া ডিম্বাণু কেমন ঘন সম্বদ্ধ। প্রসবের পরও তাহারা দৃঢ় সংযুক্ত থাকে। অতঃপর পুং মাছের দ্বারা নিষিক্ত শুক্র সংযোগে আরও দৃঢ় হয়। ঐ সকল ডিমের কোয়া স্রোত মধ্যস্থিত প্রস্তর বা মাটিতে সংলগ্ন হইয়া কিছুকাল থাকে স্রোতের জলের আলোড়নে উহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। ডিম সঞ্জীবিত হইবার পর ফুটোন্মুখ হইলে আপনি ডিম্বাণুগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও ভাসিয়া যায়। জেলেরা সূক্ষ্ম জালে এই ডিম ধরিয়া পুকুরে, ও খাল বিলের জলে মাছের আবাদ করে।

মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ফ্রান্সিস্ বলিয়াছেন যে পোণা রক্ষার জন্য প্রতিদিন প্রত্যূষে ও সায়ংকালে তিন কিম্বা চারি কৌটা পারমাঙ্গানেট অব লাইম দিলে জল একটু মিষ্ট হয় এবং উহাদ্বারা অক্সিজেন উৎপন্ন হইয়া পোণা মাছের পুষ্টি সাধন করে।

মৎস্যের কিছুই নষ্ট হয় না, ইহার প্রত্যেক অংশই কাজে লাগে। মৎস্য খাইলে মস্তিষ্কের মগজ ও ঘিলু পরিষ্কার করে, চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি করে। মৎস্যের তৈলে ঔষধ প্রস্তুত হয়। তাহাতে কাশ সর্দ্দি প্রভৃতি আরাম হইয়া থাকে। মাছের আঁইস, কাঁটা ইত্যাদি পচাইলে উৎকৃষ্ট সার হয়। ঐ সার কোন চারা গাছের মূলে পুতিলে যত শীঘ্র গাছ বড় হইয়া তাহাতে ফল ধারণ করে, এমন আর অন্য কোন সারে হয় না এবং সে ফল অতি সুস্বাদু ও মিষ্ট হয়। এখন আমরা বেশ

বুঝিতে পারিয়াছি যে মৎস্য আমাদের কতদূর উপকারী এবং কিরূপে মৎস্যের চাষ করিলে অধিক মৎস্য জন্মে তাহাও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। যদি কেহ ইহার সম্বন্ধে আরও বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত করান তাহা হইলে মৎস্যভোজী মাত্রেরই পরম লাভ হয়। কিন্তু কতকাল পরে ইহার প্রতি লোকের কৃপাকটাক্ষ পড়িবে, তাহা বলা যায় না।

মাছের চাষে লাভ বেশ আছে—পাঁচ বিঘা একটি জলকর হইতে ৫০৲ টাকার ডিম ফেলিয়া ফুটাইতে পারিলে দুই শত টাকারও অধিক পোণা বিক্রয় হইতে পারে। পরে যে মাছ অবশিষ্ট থাকিয়া যায় তিন বৎসর পরে তাহা বিক্রয় করিয়া ন্যুন কল্পে ১০ মণ মাছ ধরিয়া ১০৲ টাকা হিসাবে মণ ১০০৲ টাকা লাভ হইবে। প্রথম বৎসর হইতে পোণা বিক্রয় এবং দুই বৎসর পর তৃতীয় বৎসর হইতে সন সন বড় মাছ বিক্রয় হইতে পারে। সকল পুষ্করিণীতে ডিম ফুটে না—খুব পরিষ্কার জলা পুষ্করিণীতে ডিম ফুটার অসুবিধা হয়। পুকুরে শাল, শোল, বোয়াল মাছ থাকিলে মাছের পোনা খাইয়া ফেলে, পুষ্করিণীর খুব গভীর জল হইলে মাছ শীঘ্র বাড়ে না, পুকুরে খাইবার জিনিষ না পাইলে মাছ বাড়ে না, পুকুরের জল সর্ব্বদা নাড়া না পাইলে মাছ বাড়ে না। জলাশয় গেঁড়ী গুগলিতে পরিপূর্ণ থাকিলে মাছ মাটিতে চরিতে পায় না ও বাড়ে না। একটা পুকুর লইয়া মাছের আবাদ হয় না। এক জলাশয় হইতে অন্য জলাশয়ে মাছ চালিয়া ফেলিতে না পারিলে মাছ বাড়ে না। মাছ চালার খরচ আছে, ডিম ফেলার খরচ আছে, পোণার আহার দিবার খরচ আছে, মাছের আহার যোগাইবার খরচ আছে, ভোঁদড়, গোসাপ হইতে ছোট মাছ রক্ষা করিবার খরচ আছে, শাল, শোল, বোয়াল মাছ বিনাশের খরচ আছে, পুষ্করিণীতে মাঝে মাঝে জাল দিবার খরচ আছে, পুষ্করিণী রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার রাখার খরচ আছে, জমির খাজনা আছে। যাহা হউক খরচ বাদে তিন চারিটী জলাশয় লইয়া মাছের চাষ করিলে চার ও ৫ বিঘা জলকর হইতে গড়ে ২০০৲ টাকা লাভ হইতে পারে। বরফ দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে মাছ সংরক্ষিত করিয়া স্থানান্তরে পাঠাইতে পারিলে লাভ অধিক।

মাছেরও রোগ হয়, মাছের গায়েও গুটি হয় গুটি হইলে পুষ্করিণীর সব মাছ মরিয়া ভাসিয়া উঠিতে থাকে সেই মাছ অন্য পুকুরে ফেলিলে সেখানকার মাছেরও গুটি দেখা দেয়। গুটির কোন প্রতিকার দেখা যায় না। মাছ ধরিয়া পুড়াইয়া বা পুতিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য। পুতিলে গলিত মৎস্য সার হইতে পারে। জল বিষাক্ত হইলে মাছ ভাসিয়া উঠে ও অচিরে, মরিতে থাকে জল ঘাঁটিয়া দিলে প্রতিকার হয় বা মাছ স্থানান্তরে লইয়া গেলে মাছ বাঁচে। বড় বড় জলাশয়ে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে লোকে হাতি নামাইয়া জল ঘাঁটিয়া দেয়।

পরিপাক প্রণালী

ভুক্ত দ্রব্য নানারূপ রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলী ও অন্ত্রাশয়ে জীর্ণ হয়। যাহা পরিপাক হয় না তাহা মলমূত্র রূপে বহির্গত হইয়া যায়। শিশুগণের খাদ্যের প্রায় অর্দ্ধভাগ পরিপাক হয়, পক্ষান্তরে বয়োপ্রাপ্ত এবং স্থূলকায় ব্যক্তির খাদ্যের শতকরা ৮০-৯০ ভাগই পরিত্যক্ত হয়। পরিশ্রমী ব্যক্তি যাহা জীর্ণ করিতে পারে অলস ব্যক্তি তাহা পারে না। আমরা নিম্নস্থলে পাক ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

মুখের অমৃত। ভুক্তদ্রব্য চর্ব্বনকালে মুখের লালা মিশ্রিত হয়। লালা কিঞ্চিৎ ক্ষারগুণ বিশিষ্ট তরল পদার্থ। উত্তমরূপে চর্ব্বন করিলে অধিক পরিমাণে লালা উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ এক ব্যক্তির এক দিবসে কিঞ্চিদধিক এক সের লালা উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাংসাশী জন্তু চর্ব্বন করিয়া আহার গ্রহণ করে না বলিয়া ইহাদের খাদ্যে অতিশয় অল্প লালাযুক্ত হয়। আমিষ খাদ্য পরিপাকের নিমিত্ত লালার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। লালা কর্ত্তৃক ভুক্তদ্রব্যের শ্বেতসার পদার্থ শর্করায় (মলটোজ্) পরিণত হইয়া জীর্ণ হয়। সুতরাং লালা ব্যতীত শ্বেতসার জীর্ণ হয় না। চলিত কথায় লালাকে মুখের অমৃত বলা হয়, বাস্তবিকই লালা অমৃত। খাদ্যদ্রব্যের শ্বেতসার পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়াও প্রায় এক ঘণ্টা কাল লালা কর্ত্তৃক শর্করায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পাকস্থলীতে যখন অম্ল রসের আধিক্য হয় তখন এই ক্রিয়া (শ্বেতসার শর্করায় পরিবর্ত্তন) স্থগিত হয়। শুষ্ক খাদ্য, শর্করা অম্ল এবং সুগন্ধ ও সুস্বাদু দ্রব্য গ্রহণ করিলে মুখে বিলক্ষণ পরিমাণে অমৃত উত্থিত হয়।

পাকস্থলীর অম্লরস। ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে উপনীত হইলে তথায় একপ্রকার অম্লরস উৎপন্ন হয়, ইহাকে গ্যাসট্রিক্ রস বলে। ইহাতে পেপসিন্ ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডেরই আধিক্য। রেনিন্ নামক পদার্থ যাহাতে দুগ্ধ ছানায় পরিণত হয় তাহাও ইহাতে বিদ্যমান। রক্তের লবণ হইতে এই হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ উৎপন্ন হয়। সুস্থ পাকস্থলীতে সারাদিনে প্রায় দেড় সের এই রস উৎপন্ন হয়। এই রস খাদ্যের প্রোটিড্ দ্রবীভূত করিয়া জীর্ণ করে। বলা বাহুল্য যে ভুক্তদ্রব্য কোন পাচক রসদ্বারা সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হইলে, ইহা কখনও জীর্ণ হয় না। আমিষ খাদ্য মাংস, মৎস্য, ডিম্ব প্রভৃতি সর্ব্বাগ্রে পাকস্থলীর অম্লরস দ্বারা পরিপাচ্য হইয়া থাকে। নিরামিষভোজী জন্তুর পাকস্থলীর অম্লরস, আমিষভোজী জন্তুর

অম্লরস অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারী। খাদ্য উত্তমরূপে চর্ব্বিত হইলে ত্বরায় পাকস্থলীর অম্লরস দ্বারা য়্যালবুমিনয়েড্ পরিপাচ্য হয়। কঠিন য়্যালবুমিনয়েড্ খাদ্য পাকস্থলীতে জীর্ণ হয় না, ইহা পাকস্থলীর নিম্নে অবস্থিত ক্ষুদ্র অন্ত্রাশয়ে জীর্ণ হইয়া থাকে। লালা মিশ্রিত চর্ব্বিত খাদ্য ও উক্ত খাদ্য গ্রহণ করিলে পাকস্থলীর অম্লরস ত্বরায় উৎপন্ন হয়। খাদ্যের সহিত অধিক পরিমাণে তরল পদার্থ গ্রহণ করিলে পাচক অম্লরস অত্যন্ত তরল হইয়া পড়ে, সুতরাং খাদ্যের উপর এই রসের ক্রিয়া প্রবল হয় না। অজীর্ণ রোগের পক্ষে আহারের সময়ে জলপান নিষিদ্ধ। তরল খাদ্য আহারের সময়ে গ্রহণ না করিয়া অন্য সময় গ্রহণ ব্যবস্থেয়। লঘু আহার অর্থাৎ জলযোগের সময়ে তরল খাদ্য যথা, চা, দুগ্ধ, সরবৎ প্রভৃতি গ্রহণ করা যাইতে পারে। সুরা, ক্ষার, ট্যানিস্ (হরিতকি) প্রভৃতি পদার্থ আহারের সময়ে গ্রহণ করিলে, এই পাচক রস উৎপত্তির ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। পিত্তের আধিক্য হইলে ইহা (পিত্তরস) কখন কখন পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া অম্লরসের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম করে। কঠিন জলে অবস্থিত চুণও ম্যাগ্নেসিয়ার যৌগিক, তাম্র, লৌহ, দস্তা, জিঙ্ক প্রভৃতির যৌগিক পদার্থ সকল পাকস্থলীতে পরিপাক ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটায়। ভিনিগার, টার্টরিক প্রভৃতি এসিড্ দ্বারা পাকস্থলীর অম্লরস উৎপন্ন হয় বলিয়া ইতি পূর্ব্বে অনুমান করা হইত, কিন্তু এই সকল এসিড্ ব্যবহারের বিরুদ্ধে এখন অনেক বহুদর্শী চিকিৎসক মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। অধিক লবণ গ্রহণ করিলেও এই অম্লরস উৎপত্তির বিঘ্ন ঘটে। কোন কোন খাদ্যের পক্ষে এক ঘণ্টা সময় মাত্র পাকস্থলীর ক্রিয়া সমাধা করিতে প্রয়োজন হয়।

দুগ্ধ পাকস্থলীতে প্রবেশ করিবামাত্র ইহার অম্লরসের রেনিন দুগ্ধকে ছানায় পরিণত করে। ছানার জল তখন তখনই জীর্ণ হয় ; পরে ছানা ঐ অম্লরস দ্বারা পচনীয় হইয়া থাকে।

এইরূপে খাদ্যের য়্যালবুমিনয়েড্ পদার্থও কিঞ্চিৎ শ্বেতসার, যাহা মুখামৃত দ্বারা ইতিপূর্ব্বে শর্করায় পরিণত হইয়াছিল, তাহা পাকস্থলীতেই জীর্ণ হয় ; অর্থাৎ এই দ্রবীভূত খাদ্য রস বা দ্রাবণরূপে পরিবর্ত্তিত হইলে, পাকস্থলী ইহা গ্রহণ বা শোষণ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট খাদ্য অন্ত্রস্থলীতে প্রবেশ করে।

ঔষধার্থ সাধারণতঃ বরাহের পাকস্থলী হইতে পেপ্সিন্ নিষ্কর্ষণ করা হয়।

পিত্তরস—ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলী হইতে পরিত্যক্ত হইয়া ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে। তথায় পিত্তকোষ হইতে পিত্তরস আসিয়া খাদ্যের সহিত মিলিত হয়, এবং ইহার অম্লত্ব নষ্ট করে। পিত্তরস ক্ষারগুণ বিশিষ্ট তিক্ত পদার্থ। ভুক্ত দ্রব্যের অধিকাংশ তৈল পদার্থ এই পিত্তরস দ্বারা জল মিশ্রিত সাবানের আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া

জীর্ণ হয়। উপযুক্ত পরিমাণে পিত্তরস উৎপন্ন না হইলে কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগ জন্মে। পিত্তকোষকে ইংরাজীতে লিভার জল।

প্যান্‌ক্রিয়েটিক্ বা ক্লোম রস। পাকস্থলী হইতে খাদ্য ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করিলে, এই যন্ত্র হইতে প্যানক্রিয়েটিক্ রস নামক আর এক প্রকার ক্ষারগুণ বিশিষ্ট রস বহির্গত হইয়া খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। প্যানক্রিয়েটিক্ রস ভুক্ত দ্রব্যের শ্বেতসার, তৈল পদার্থ ও পাকস্থলী হইতে পরিত্যক্ত প্রোটিড্ পরিপাক করিয়া থাকে। এই পাচক রস দুগ্ধের ক্যাজিনের (ছানার) উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই রসের সহিত মিলিত হইয়া ঘৃত ও চর্ব্বি প্রভৃতির এসিড্ ও গ্লিসারিণ্ পৃথক হইয়া জীর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তরস ক্লোম রসের অভাব হইলে ঘৃত, তৈল প্রভৃতি কখন পরিপাচ্য হয় না। কিন্তু ইক্ষু শর্করার উপর ইহার কোন ক্রিয়া নাই।

অন্ত্র রস—উপরোক্ত চারিপ্রকার রস দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের যাহা কিছু অপাচ্য থাকে তাহা অন্ত্র রস দ্বারা জীর্ণ হইয়া থাকে। এই রস ক্ষুদ্র অন্ত্রাশয় হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা ইক্ষু চিনিকে ফল চিনিতে পরিবর্ত্তিত করিয়া জীর্ণ করে।

ভুক্তদ্রব্য বিবিধ পাচক রস দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া জীর্ণ হইলে, ইহা প্রথমতঃ পিত্তকোষে প্রবেশ করিয়া পরিষ্কৃত হয়, পরে হৃদপিণ্ডে উপস্থিত হয়। তথায় শুদ্ধ হইয়া ইহা সর্ব্বশেষে ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রে উপনীত হয়। তথায় অক্সিজেন বায়ু সংস্পর্শে ইহা রক্তে পরিণত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হয়। যাহা অপরিপাচ্য থাকে তাহা বৃহৎ অন্ত্রাশয় হইয়া মলদ্বার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়।

নিদ্রাকালে শরীরের যন্ত্র সমূহ নিস্তেজ হইয়া থাকে। সুতরাং নিদ্রা হইতে উঠিয়াই আহার করা অসঙ্গত। তখন কিছু তরল পদার্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহাদ্বারা কোষ্ঠ সরল থাকে। নিদ্রা হইতে উঠিয়া অঙ্গ সঞ্চালন বা ভ্রমণ করিলে যন্ত্র সমূহ পুনঃ সতেজ হয়। পরে বিশ্রাম করিয়া স্নানাহার বিধেয়। আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে জলপান করিলে পাচক রস সমূহ স্ব স্ব ক্রিয়া উত্তমরূপে সমাধা করে।

আহারের সময় সর্ব্বদা নির্দ্ধারিত থাকা আবশ্যক। অসময়ে আহার করিলে পাক-ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। আহার করিয়াই কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত, ইহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে আহার গ্রহণের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে পুনঃ আহার করা অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু শিশুগণ ৩ ঘণ্টা অন্তর আহার করিতে পারে। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির তিন বার আহারই যথেষ্ট। এক সময়ে অনেক প্রকার ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলে পরিপাক ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটে। অধিক মসলা যুক্ত ব্যঞ্জনাদি সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি

ফল স্বতন্ত্র গ্রহণ করিতে ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অল্প পরিমাণে সুপক্ক ফল আহারান্তে গ্রহণ করিলে ভুক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাচ্য হয়।

আহারান্তে দুই বা তিন ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া নিদ্রা যাওয়া উচিত। আহারের পরেই নিদ্রা গেলে পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র দুর্ব্বল হয়, ইহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হয় এবং সুনিদ্রা হয় না।

নিম্নস্থলে পাকস্থলী ও পাকক্রিয়ার অন্যান্য যন্ত্রের চিত্র প্রদত্ত হইল।

১-২। গল নালী।
৩-৪। পাকস্থলী।
৫-৮। পাকস্থলী হইতে খাদ্য অন্ত্র নালীতে প্রবেশ করিবার প্রণালী।
৯-১২। পিত্ত কোষ।
১৩। পিত্ত কোষ হইতে পিত্ত রস নিষ্কাষণের মুখ।
১৪। ক্লোম যন্ত্র।
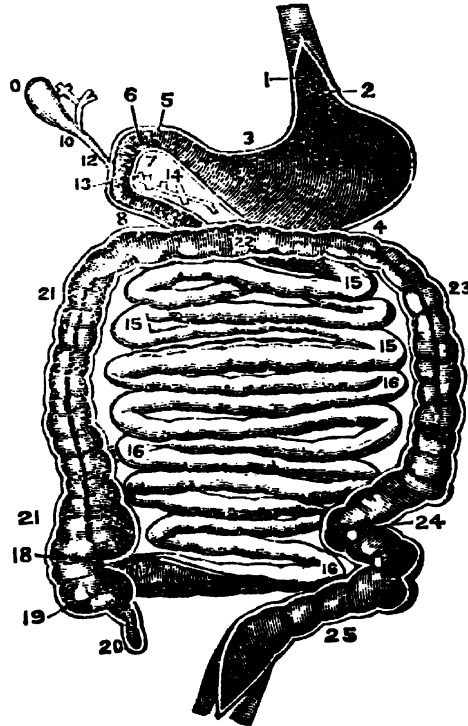
১৫-১৬। ক্ষুদ্র অন্ত্রাশয়।
১৭-১৮। ক্ষুদ্র অন্ত্রাশয় হইতে অপাচ্য খাদ্য বৃহৎ অন্ত্রে প্রবেশের দ্বার।
২১-২৪। বৃহৎ অন্ত্র।
২৫। মল দ্বার।

সরকারী কৃষি সংবাদ

তুষার পাত হইতে ক্ষেত রক্ষা—

বাঙলা দেশে চৈত্র বৈশাখ মাসে বৃষ্টির সময় খুব ঠাণ্ডা হইলে বৃষ্টি পতনের সঙ্গে যেমন শিল পড়ে তেমনি শীত প্রধান দেশে খুব ঠাণ্ডার সময় তুষার পড়ে। জলীয় বাষ্প জমিয়া তুলার মত ক্ষেত পাথারের উপর পড়িতে থাকে এবং তাহাতে শস্য নষ্ট হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় ফসল রক্ষার অনন্য উপায়। কিন্তু আজ কাল নিরুপায়ের উপায় বিমা কোম্পানি করিয়া দিয়া থাকেন। যেমন জীবন বিমা, বিবাহ বিমা, অসময়ে পরিবার পোষণার্থ বিমা, পণ্যদ্রব্য রক্ষার্থ বিমা, ব্যবসা রক্ষার্থ বিমা হইতেছে তেমনি আজ কাল ইউরোপের লোকে ক্ষেতের ফসল বীমা পদ্ধতিতে রক্ষা করিয়া থাকে। ক্ষেত বিমা করিলে তুষার পাত প্রভৃতিতে শস্য নষ্ট হইলে বীমা কোম্পানি সে ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকেন। ফ্রান্সে প্রত্যেক তিন একর বাঙলায় প্রায় ১০ বিঘা পরিমাণ জমির জন্য ১২৲ টাকা বাৎসরিক বিমা কোম্পানিকে দিতে হয়। ইউরোপের ন্যায় ধনাঢ্য দেশে এ প্রথা সাজে কিন্তু ভারতের দরিদ্র প্রজা প্রতি দশ বিঘায় দুই কিম্বা পাঁচ টাকা দিয়াও ফসল রক্ষা করিতে অক্ষম। বিজ্ঞান কিন্তু দরিদ্রের আনুকুল্যে অগ্রসর হইয়াছে। যেরূপ বৈদ্যুতিক তার লাগাইয়া রাখিলে ইমারতে বাজ পড়া নিবারণ করা যায় সেইরূপ শিলা পাত বা তুষারপাত হইতে ক্ষেত রক্ষার উপায় স্থির হইয়াছে। একটি বিস্তৃত ক্ষেতে মাঝে ১০০ ফিট উচ্চ মাচান প্রস্তুত করিয়া মৃত্তিকার সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়া একটি তামার মোটা তার লাগাইয়া রাখিলে প্রায় সাড়ে তিন মাইল বিস্তৃত ক্ষেতে তুষার পতন নিবারিত হয়। কেবল তুষার পতন নহে এই নির্দ্দিষ্ট বেড়ের মধ্যে বায়ুর বেগও কম থাকে। এই কার্য্যে খরচ প্রতি দশ বিঘায় তিন আনার অধিক নহে। ভারতের শীতাধিক্য প্রদেশ সমূহে তুষারে অনেক ফসল নষ্ট হয়। অতএব অত্রস্থ কৃষি-বিভাগ যদ্যপি এইরূপ স্থানে মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া এই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করেন তাহা হইলে গরীব প্রজা বৃন্দের ভবিষ্যতে পরম হিত সাধিত হইতে পারে।

বঙ্গদেশে গমের চাষ—১৯১১-১২

বিহার, নদীয়া, মুরসিদাবাদ, হাজারীবাগ ও পালামৌতে গমের চাষ করা হয়। ঐ বৎসর ১২৬৩৭৬০ একর জমিতে চাষ করা হইয়াছে। নদীয়া ও পূর্ণিয়া জেলায় বপন কার্য্য একটু বিলম্বে শেষ হইয়াছে।

সেপ্টেম্বর ও নভেম্বরে বৃষ্টি মন্দ হয় নাই। সারণ, চম্পারণ ও দ্বারবঙ্গে একটু বিলম্বে বপন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

বিহার ও ছোট নাগপুরে বৃষ্টি বেশী হইয়াছে। উড়িষ্যাও নিম্ন বঙ্গের অনেক স্থানে বৃষ্টি কম হইয়াছে। শস্যোৎপাদনের পক্ষে বায়ুর অবস্থা মন্দ নহে। শস্যের বর্ত্তমান অবস্থা ভাল।

পূর্ব্ববঙ্গে রবিশস্যের চাষ—১৯১১-১২

খেসারী, মুগ, মাসকলাই প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের রবিশস্যের প্রকার বিশেষ। ৮১/২ লক্ষ একর জমিতে এই সব শস্য বপন করা হইয়াছিল। তামাক ও বোরোধান ২১/৪ লক্ষ একর জমিতে বোনা হইয়াছিল। রংপুর ও জলপাইগুড়িতে তামাকের চাষ অধিক পরিমাণে করা হয়। ১৫ই নবেম্বর হইতে ১৫ই জুন পর্য্যন্ত যে সমস্ত ফলের চাষ করা হয় তাহা রবিশস্যের অন্তর্গত। আদা, লঙ্কা হলুদ প্রভৃতি মশলা সকল ১১/৬ লক্ষ একর জমি বেশী হইয়াছিল। চিনা, কাউন প্রথম এক লক্ষ একর জমিতে চাষ করা হইয়াছিল।

বৃষ্টির সামঞ্জস্য বশতঃ শস্যের মঙ্গলের আশা করা গিয়াছিল। অক্টোবর ও নভেম্বরে নদীতে জল বৃদ্ধি হওয়ায় বপন কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। ডিসেম্বরে বায়ুর অবস্থা বড়ই শুষ্ক ছিল। মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে বেশী বৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিলম্বে বৃষ্টি হওয়ার জন্য কোন রূপ সুফল ফলে নাই। মোটের উপর সময় ভাল ছিল না। কলাই ও ধান্য ৮৮১২০০ একর জমিতে, তামাক ২৬৮৩০০ একর ও বোরো ধান ২৭৫২৯ একর জমিতে উৎপন্ন হইয়াছিল।
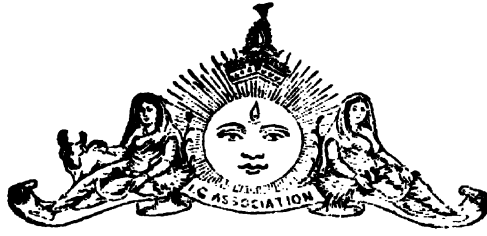
আষাঢ়, ১৩১৯ সাল।

তাড়িৎপ্রবাহের সহিত উদ্যানজাত বৃক্ষ লতার সম্বন্ধ

তাড়িৎশক্তি প্রভাবে ইতঃস্ততঃ বার্ত্তা প্রেরিত হইতেছে, বহুসংখ্যক আরোহী ও মালপত্র লইয়া গাড়ী ছুটীতেছে, বহুতর নগর দীপালোকে শোভিত হইতেছে, এই শক্তিতে কত শত ইঞ্জিন পরিচালিত হইয়া মানুষের জল তোলা, গমভাঙ্গা প্রভৃতি কত কি কাজে লাগিতেছে তাহার সহজে পরিমাণ করা যায় না।

এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে এই তাড়িৎপ্রবাহ উদ্যান পালকেরও বিশেষ কাজে লাগিতেছে। বৃক্ষ লতার মাথার উপর দিয়া তাড়িৎপ্রবাহিত করিলে বৃক্ষ লতার অত্যাশ্চর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং তাহাতে ফলফুল শিগ্র হয় ও ফলফুল খুব বড় হইয়াও থাকে।

কেবল তাড়িৎপ্রবাহ কেন তাড়িতালোকও এই প্রকারে বিশেষ কার্য্যকরী।

মুক্ত বাতাসে খোলা জায়গায় কিন্তু তাড়িৎপ্রবাহের কিম্বা তাড়িতালোকের তাদৃশ প্রভাব দৃষ্ট হওয়া সম্ভব নহে। কেবলমাত্র গাছ ঘরের মধ্যেই বৃক্ষাদির উপর তাড়িৎশক্তির সম্পূর্ণ প্রভাব নির্দ্ধারণ করাই যাইতে পারে। এরূপ প্রকারের পরীক্ষা কিন্তু প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ সুতরাং অতি বৃহৎ উদ্যানেই এই প্রকারের পরীক্ষা হইয়া থাকে। এমেরিকা ও ইউরোপে এই প্রকারের পরীক্ষা হইতেছে বটে কিন্তু ভারতবর্ষে অদ্যাপিও এত উন্নত উপায়ে ফল ফুল উৎপাদনের অবসর দেখা যাইতেছে না। এখানে বড় বড় ফল ফুলের বাগান নাই বলিলেই হয়। অতি সামান্য স্থানের উপর ছোট খাট গাছ-ঘর আছে মাত্র। এদেশে ধনাঢ্য লোকে বা দশ জনে মিলিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতঃ বাগানের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সুতরাং বৈদ্যুতিক প্রবাহ লইয়া নাড়া চাড়া করিবার এখানে উদ্যোগ কুত্রাপিও দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

তাড়িৎপ্রবাহের সাহায্য লওয়ায় এদেশে আর একটি অন্তরায় আছে। ইউরোপ, এমেরিকায় অধিকাংশ নগর উপনগরে তাড়িৎশক্তির ছড়াছড়ি, এদেশে কতিপয় মাত্র বর্দ্ধিষ্ণু নগরে মাত্র তাড়িৎশক্তির কেন্দ্র আছে। সুতরাং এদেশে উদ্যানপালকগণ সহজে তাড়িৎশক্তির সাহায্য লাভে বঞ্চিত।

প্রাকৃতিক নিয়মে অল্পবিস্তর বৃক্ষাদির উপর তাড়িৎপ্রবাহিত হইতেছে। দর্শনবিদগণ বলেন যে ভূমি হইতে কিছু উর্দ্ধে বাতাসে তাড়িৎশক্তি আছে, উহা প্রতিনিয়ত মাটির সহিত মিশিতে চেষ্টা করিতেছে। বৃক্ষ লতাদির গাত্রতন্তু বাহিয়া এই শক্তি মাটির সহিত আসিয়া মিলিত হয়। ইহাতে বৃক্ষ লতাদির উপকার হয়। যখন অল্প পরিমাণে তাড়িৎ সঞ্চিত হয় তখন এই মেশামিশির সময় কোন বাহ্যিক নিদর্শন দেখা যায় না। মাত্রায় অধিক হইলে আমরা বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুতে ইহার নিদর্শন পাই।

কৃত্রিম উপায়ে তাড়িৎ উৎপাদন করিয়া যখন আমরা বৃক্ষ লতার মাথার উপর দিয়া প্রবাহিত করিতে পারি তখনই তাড়িৎশক্তি আমাদের করায়ত্ত হইল, আমরা তাহা লইয়া আমাদের কার্য্য সাধন করিয়া লইয়া থাকি। কিন্তু তাড়িৎ যন্ত্রের দাম নিতান্ত কম নহে, সেইজন্য সকলের ইহা ব্যবহার করা সাধ্যায়াত্ত নহে। এই কারণে নগর, উপনগর যেখানে তাড়িৎশক্তির কেন্দ্র আছে তাহার নিকটে বাগান হইলে মূল স্থান হইতে বিভিন্ন উদ্যানে তাড়িৎ প্রবাহিত করা সহজ হইয়া উঠে।

উদ্যানের উপর তার খাটাইয়া তাড়িৎ প্রবাহিত করিতে হয়। বৃক্ষ লতাদির দশ ফিট উপরে তারগুলি খাটাইলে চলে, কোন বিজ্ঞানবিদের মতে তারগুলি ১৬ ফিটের উপর রাখিলে ভাল হয়। তারগুলি দুই দুইটি তাড়িৎ দণ্ডের সহিত সমান্তর ভাবে খাটান হইয়া থাকে। তৎপরে আবার দীর্ঘ প্রস্থে অনেকগুলি তার খাটান হয়। অবশেষে দেখা যায় যে তার খাঁটান অথবা তারের জাল খাঁটান একই কথা বলিয়া মনে হয়।

মুক্ত উদ্যান গুলিতেও এইরূপে তাড়িৎ সাহায্যে কিছু উপকার পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু আচ্ছাদন যুক্ত ঘরের মধ্যে তাড়িতের শক্তি অধিকতর কার্য্যকরী বলিয়া মনে হয়।

তাড়িৎপ্রবাহ পরিচালনের কতিপয় নিয়ম আছে। আবহাওয়া শুষ্ক থাকিলে কোন শস্য ক্ষেত্রের উপর তাড়িৎপ্রবাহিত করিতে নাই কেন না তাহাতে ফসলের মাত্রা কমিয়া যায়। বর্ষাকালে যখন উপরের তাড়িৎ মৃত্তিকাসন্নিহিত তাড়িতের সহিত সর্ব্বদাই মিশিতে চেষ্টা করে, যখন বায়ু আর্দ্র থাকে তখনই তাড়িৎ প্রবাহিত করিলে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। এরূপ অবস্থায় কেবল যে ফসল ভাল হয় এমন নহে, প্রায়

সপ্তাহধিক কাল অগ্রে ফসল তৈয়ারি হইয়া উঠে এবং তাহাতে উদ্যান পালকগণের লাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

তাড়িৎপ্রবাহের মত তাড়িতালোকের প্রভাবও কিছু কম নহে। তাড়িতালোক প্রভাবে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়, গাছ পালা শীঘ্র বাড়িতে থাকে, ফল ফুল শীঘ্র উৎপাদিত হয়। সূর্য্যাস্তের পরে দুই ঘণ্টাকাল কোন ক্ষেতে আলো জ্বালিয়া রাখিলে এই ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তড়িতের শক্তি আমরা এখন যাতে তাতে লাগাইয়া অনেক কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইতেছি। উদ্যান ব্যাপারও ইহা আমাদের বিশেষ সহায় দেখা যাইতেছে কিন্তু বাগান ক্ষুদ্র হইলে বা অল্প মূলধনের কারবার হইলে আমাদিগকে জ্ঞান থাকিতেও অজ্ঞানের মত বসিয়া থাকিতে হইবে।

কৃষি ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান

বেঙ্গল স্যানিটারি বোর্ডের এঞ্জিনিয়ার

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বিদেশী 'ফারমারের' কথা বলা হইয়াছে। তার পর তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের দেশে একদল কৃষি-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গঠনের উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন যদি কেহ বলেন বিলাতী 'ফারমারের' কথা আসিতেছে কেন? আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য কার্য্যপ্রণালী গ্রহণ করিতেছি। পাশ্চাত্য দেশের নিকট যে দুইটী প্রধান শিক্ষনীয় বিষয়, তাহা আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। যে সকল বৈজ্ঞানিক কৌশল, সুপ্রথা আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহার সাহায্য আমাদিগকে লইতে হইবে। তাহা না হইলে প্রতিযোগিতায় জিতিব কি করিয়া? জগতটা আর পূর্ব্বের ন্যায় নাই। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশ কেবলমাত্র তাহাদের আত্মোদ্ভাবিত কর্ম্ম কৌশল লইয়া বসিয়া নাই। জগতের জাতি সকল এখন এক পরিবারভুক্ত বিশাল যৌথ সহকারিতার মাঝখানে আসিয়াছে। সাহিত্য, বিদ্যুৎ ও বাষ্প আমাদিগকে একত্র করিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে ও ষ্টীমার এখন সকল দেশেই হইয়াছে। আমরা সমস্ত অতীতের অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। নিশ্চয়ই তাহার সুবিধা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

এই তো গেল এক কথা। আর এক কথা এই, আমরা সখের অনুকরণের পক্ষপাতী নহি। যেমন তেমন বিলাতের 'ফারমারেরা' করে, ঠিক হুবহু সেইটী হয়তো আমাদেশের দেশের উপযোগী না হইতেও পারে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এমন একটী শিক্ষিত কৃষি-ব্যবসায়ী সম্প্রদায় হউক, যাঁহারা দেশের সনাতন সুনিয়মগুলি এবং জগতের কৃষি-জীবির অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক কৌশলগুলি জানিয়া তদুপরি নিজের বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিতে পারেন এবং ভারতীয় কৃষি-ব্যবসায়ে একটা অভিনব কার্য্যকারিতা আনয়ন করিতে পারেন। মৌলিকতা, অতীত অভিজ্ঞতা সমষ্টির উপরেই দাঁড়াইয়া থাকে।

আমাদের দেশের চাষীরা তো আর বৈজ্ঞানিক কৌশলগুলি কাজে লাগাইতে পারে না। তাহাদের অর্থ নাই, শিক্ষা নাই, কর্ম্ম কৌশল জানা নাই। যাহা কিছু করিতে হইবে, তাহা এই শিক্ষিত দলকেই করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রথমেই আমরা এই শিক্ষিত কৃষক দল কিরূপ হইবে, কি কার্য্য তাহাদের করিতে হইবে, কৃষি কার্য্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উপযোগিতা কি তাহার একটা আভাষ দেওয়া যাইতেছে।

অনেকের ধারণা কৃষিকাজে লাভ নাই। সুতরাং সেই কাজে লাগিয়া হয়তো সর্ব্বসান্ত হইয়া, পরে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া, শিক্ষিত ব্যক্তি অতি শোচনীয় দাসত্বে কাল কাটাইবে। এটা কাপুরুষের কথা। আমাদের দেশে বার আনা ভাগ লোক, যাহারা একেবারে অশিক্ষিত ও গরীব, তাহারাও কৃষিকাজ করিয়া লাভ করিতেছে এবং তাহাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা। অবশ্য প্রতি ৪ বৎসরে একবার অজন্মা হয়। গরীব অশিক্ষিত কৃষিজীবির কত অসুবিধা দেখুন।

১। তাহাদের মূলধন নাই।

২। উপযুক্ত শিক্ষা নাই।

৩। লাভজনক সুনিয়ম আয়ত্ব নাই।

৪। শতকরা ৩৬৲ হইতে ৫০৲ পর্য্যন্ত মহাজনকে সুদ দিয়া লাভ করিতে হয়।

৫। অজন্মায় লোকসান হইতে রক্ষা হইবার জন্য বীমা (Insurance) বন্দোবস্ত নাই।

৬। নিজের জমা নাই।

এত অসুবিধা সত্বেও তাহারা লাভ করিয়া খাইতেছে।

তাহাদের একমাত্র সুবিধা এই যে তাহারা নিজের কাজ নিজেই করে। শিক্ষিত কৃষিব্যবসায়ীকে লোক রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। সুতরাং তাহাকে এত বড় কাজ করিতে হইবে—যাহাতে লোকজনের পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ করিয়া নিজের অভিপ্সিত লাভ থাকে। আজিও পল্লীগ্রামে অনেক ভদ্র গৃহস্থ চাষ

করিয়া লাভ করিতেছেন। তাঁহাদের একমাত্র অসুবিধা এই যে জমীতে 'যো' হইলে লোকজন পাওয়া বড় কঠিন হয়। সেইজন্য অনেকে সাঁওতাল, বুনা প্রভৃতি মজুর ভিন্ন স্থান হইতে আনাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন।

শুধু লাভালাভের প্রলোভন লইয়া যাহারা কাজে লাগিবে, তাহাদের জন্য কোন কথা বলা হইতেছে না। যে আদর্শ আমরা খাড়া করিতেছি তাহা অন্য শ্রেণীর লোকের জন্য। ভারতে একটা নূতন দিন আসিয়াছে। ভারতের শিরায় শিরায় একটা অদৃশ্য রক্তস্রোত চলিয়াছে। সমস্ত জাতিটা তার সাধনায় পথে চলিতেছে, তার আত্মপ্রকাশ হইবে। যে ভাব আজি ভারতের চিন্তাকে মন্থন করিতেছে—সেই চিন্তাস্রোতের ক্ষুদ্র বীচি সংঘাত আজ আমাদের ক্ষুদ্র তড়াগেও তাহার স্পন্দন শক্তির লীলা দেখাইতেছে। আমরা চাই ভারতের মৌলিক আত্মপ্রকাশ, নূতন পথ, নূতন পাথেয়। অমরা পল্লীতে ফিরিয়া যাইতে চাই, সেখানে কর্ম্মক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাই। পল্লীর বনানীর ভিতর,—মাঠে,—ঘাটে, প্রথায়, চরিত্রে,—সমাজে ধর্ম্মে এখনও যে আমাদের জাতীয়ত্বের প্রাণ-বীজ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহাকে সুকর্ষিত করিতে চাই।

এ সকল কার্য্য করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের স্বাধীন জীবিকার প্রয়োজন। পল্লীবাসের প্রয়োজন। আচ্ছা কি রকম করিয়া স্বাধীন জীবিকার দ্বারা আমরা আকাঙ্খিত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারি—কল্পনা করা যাক্। একটা 'স্কীম' প্রস্তুত করা যাক, 'স্কীমটা' স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে সমস্ত প্রশ্নটী বিশ্লেষণ করিলে মন্দ হয় না। তাহা হইলে আমাদের একটী উপকার এই হইবে যে, আমরা অনেক কৃষী পন্থী, ব্যবসায়ী, ভাবুক ও বিশেষজ্ঞের মত পাইতে পারিব। কারণ আমরা আন্দোলন করিতেই আসরে নামিয়াছি এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের বক্তব্য বিষয় পত্রস্থ করাও আমাদের আন্দোলনের অন্যতম দিক।

প্রথম প্রশ্ন—কে এ কাজ করিবে এবং করিতে প্রস্তুত ?

যে ব্যক্তি সুশিক্ষিত, সুতরাং চরিত্রবান, যাঁর হৃদয় আছে, দেশের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদিতেছে, দেশের কিছু কাজ করিবার জন্য যিনি বিশেষ চিন্তা করেন এবং চিন্তাজন্য যাঁর পশ্চাতে শক্তি জাগিয়াছে, যিনি দাসত্বে ঘৃণা করেন এবং স্বাধীন পথ আত্মপরিণতির উপযোগী বিবেচনা করেন, যিনি সুস্থকায় এবং ত্যাগশীল তিনিই প্রথম এই কাজে লাগিতে পারেন। এমন অনেক পল্লীগ্রামে আছে—যেখানে খুঁজিলে এমন লোক একটীও মিলিবে না। তাহাতেই বা হতাশের কারণ কি ? একটীতে না মিলে দশটী বা বিশটীর মধ্যে একটী মিলিতে পারে। 'বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গলায় এমন লোক অনেক জন্মিয়াছেন। অনেকে মনে করিতে পারেন কাজ তো কৃষির উন্নতি, তাহাতে এত খাঁটী লোকের প্রয়োজন কি ? প্রথম যাঁহারা

রাস্তা দেখান—তাঁহারা উন্নত প্রকৃতির লোকই হইয়া থাকেন। প্রতি দেশে, প্রতি যুগে—এমন লোকের সংখ্যাল্পতা দেখা যায়। তাঁহারা ঘোরান্ধকারময় বিপদসঙ্কুল পথের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া পশ্চাতবর্ত্তী পথিক দলের জন্য আলোক-বর্ত্তিকা উচ্চে তুলিয়া ধরেন। প্রথম কতকগুলি ভাল লোককে কাজে লাগিতেই হইবে। কারণ অনেক সময় দেখা যায় যখন একটী মহত্তর ভাব লোকসমাজকে কর্ম্মে প্রেরণা দেয়, তখন সেই সুবিধার অন্তরালে আপনার নিকৃষ্ট স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতে, কতকগুলি বিশ্বাসঘাতক লোক কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়া নিজে তো অকৃতকার্য্য হয়ই, বিশেষতঃ সমস্ত উত্থাপিত বস্তুটী পণ্ড করে। স্বদেশী আন্দোলনের মাহেন্দ্র সময়ে এইরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক দেশের প্রভূত অমঙ্গল করিয়াছে। এখানে এ কথাও স্পষ্ট করিয়া বলার প্রয়োজন যে, এই শ্রেণীর লোক ছাত্র ও যুবক দলের মধ্যে খুব কম এবং বিষয়ী লোকের মধ্যে অত্যধিক দেখা গিয়াছে। আমাদের দেশে ব্যবসায়ী, বিষয়ী ও পল্লীগ্রামের অলস লোক সকল নীতি বিষয়ে এতদূর অধঃপতিত যে তাহাদিগকে পরিচালিত করা এবং তাহাদের নিকট কোন কাজ লওয়া একরূপ অসম্ভবপর। সুতরাং এই সকল কার্য্যে যাঁহারা অগ্রবর্ত্তী হইবেন এবং নেতৃত্ব করিবেন তাঁহারা নীতিতে, শ্রমশীলতায় এবং উৎসাহে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবৎ হওয়ার প্রয়োজন। কৃষক-পত্রের পরিচালকগণ যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক বাঙ্গলার শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া এই মর্ম্মে একটী বিজ্ঞাপন পত্রস্থ করেন যে যাঁহারা পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যাপারে ব্রতী হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা যেন কৃষক আফিসে স্ব স্ব নাম, ঠিকানা ও কিরূপ সহকারিতা করিতে সক্ষম হইবেন লিখিয়া পাঠান, তবে ভবিষ্যতে আমাদের কাজের বহুল উপকার হইবে। অবশ্য কাজের সঙ্গে কর্ম্মীর সম্বন্ধ। কাজ ও কর্ম্মী ভিন্ন বস্তু নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থ কোথায়?

অনেককেই অনুযোগ করিতে দেখা যায় যে মূলধনের অভাবে তাঁহারা কোন ব্যবসায়-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। আমাদের 'ফারমারেরা' অবশ্য অর্থ-বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবেন। তাহা হইলে তাঁহারা সাধারণের ন্যায় মূলধন যোগাড় হইল না বলিয়া সমস্ত জীবনটাই বিনাকাজে কাটাইয়া দিবেন না। অবশ্য যাঁহাদের পূর্ব্ব সঞ্চিত অর্থ আছে—তাঁহারাই স্বকীয় অর্থোন্নতির জন্য কাজে লাগুন। যাঁহারা সমর্থ, সংযমী এবং যাঁহাদের ঐকান্তিকী চেষ্টা আছে তাঁহারা অবশ্য সঞ্চয়াদি দ্বারা মূলধন সৃষ্টি করিবেন। যেখানে সম্ভব সেখানে যৌথ সহকারিতায় মূলধন সৃষ্টি করা যাইতে পারে। অনেকে সুনাম, পরিশ্রম ও পসার দ্বারা কৃত্রিম মূলধন সৃজন করিয়া কাজ করেন, পরিশেষে লভ্য অর্থ দ্বারা কর্জ্জ শোধ দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভবিষ্যত অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকেন

না। অনেক পল্লীগ্রামেও দেখা যায় যে প্রভূত অর্থ অলসভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। কিন্তু কোনও কাজে আসিতেছে না। ধনী তাহার সঞ্চিত ধন কাজে লাগাইয়া বাড়াইতে জানে না অথবা নষ্ট হইবার ভয়ে কাজে লাগাইতে পারে না। অনেক কষ্টার্জ্জিত ধন দুর্নীতি পরায়ণ লোকের হাতে পড়িয়া নষ্ট হইতে দেখিয়াছে। কাজেই নিজেও কিছু করিতে পারে না এবং অন্যের হাতে দিতেও ভয় পায়, তখন সে তাহা নিভৃতে আটক করিয়া রাখে। এইরূপে অনেক টাকা সমাজের ব্যবহারে না আসিয়া আমাদের অনেক ক্ষতি করিতেছে। আর এক দিকে দেখা যায় প্রকৃত কাজের লোক অর্থের অভাবে বসিয়া আছে। এই বদ্ধ ধন ও এই বদ্ধ কর্ম্মীর ভিতর চলৎশক্তি কি প্রকারে আনা যাইতে পারে? দুইটী বিভিন্ন তড়িৎ-শক্তির মধ্যে সংযোজক তার সংলগ্ন করিলে যেমন সুপ্ত শক্তির বিকাশ হয়, তেমনি বদ্ধ ধন ও বদ্ধ কর্ম্মীর ভিতর পসারের সংযোজনা দ্বারা উভয়কেই গতিশীল করিয়া বৃহৎ কার্য্য করিতে পারা যায়। নগত টাকায় শুধু যে মূলধন হয় তাহা নহে, সুনাম (credit), ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি, শ্রমপটুতা প্রভৃতি দ্বারা মূলধন সৃষ্ট হইতে পারে। ধনীর ঘরে যে পরিমাণ টাকা থাকে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক তাহার ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি হয়। এই খ্যাতি শুনিয়া বাজারের লোক তাহাদের জিনিষ, পরিশ্রমী লোক তাহাদের শ্রম, ব্যবসায়ী লোক তাহার ব্যবসায়ের লভ্যাংশ দিতে আপনি তাহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়। যত না সে টাকায় মূলধন খাটায়, তাহার ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি তাহার বহুল মূলধনের কার্য্য করে। এইজন্য ব্যবসার ক্ষেত্রে নামিলে অল্প নগত টাকায় এমন কি অনেক সময় টাকার পরিবর্ত্তে সুনামের দ্বারা, কাজ চলিয়া যায় এবং কাজ চলিলে অর্থ আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সঙ্গে ব্যবসায়ী যদি নীতি রক্ষা করিয়া চলেন, তাঁহার কথা যদি ঠিক রাখেন তবে তিনি অতি শীঘ্র প্রভূত মূলধনের অধিকারী হইয়া পড়েন। দেনা পাওনা, হিসাব ও কথায় যেন কোন অনিয়ম, বা নড়চড় না হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীর অর্থের অভাব হয় না। কারণ আমাদের দেশে মূলধন সমস্তই বসিয়া আছে, তাহা কাজে লাগাইতে ধনীর নিজেরই স্বার্থ অধিক—ধনী কৃপণ স্বভাব হইলেও সে নিজের স্বার্থ লুপ্ত করিতে কখনই চাহিবে না—সে মূলধন দিতে একরূপ সমাজের নিকট বাধ্য, কেবল হে বাঙ্গালার কাজের লোকগণ! সুনীতির বর্ম্ম পরিয়া তোমরা এস, সুনামের পরিমল বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া দেও, দিয়া তোমরাও ধন্য হও, তোমার সমাজকে ধন্য কর এবং তোমার দেশের মুখোজ্জ্বল কর। (ক্রমশঃ)

খেজুর গুড়

চিনির ব্যবসা—শুধু চিনির ব্যবসা কেন সমস্ত ব্যবসাই, যতদিন অজ্ঞ ও আপাতদর্শী ব্যবসাদারদিগের হস্ত হইতে যথার্থ ব্যবসাভিজ্ঞলোকের হস্তে না আসে অথবা এখানকার ব্যবসাদারদিগের মধ্যে বিধিবদ্ধ বিস্তৃত বাণিজ্য শিক্ষা প্রবেশ না করে ততদিন এ ব্যবসার কিছুতেই উন্নতি হইবে না। সমস্ত সভ্য জগৎ এখন একটি ব্যবসায় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জিনিষপত্র চালান দেওয়ার সুবিধা হওয়াতে একটী দর পৃথিবীর সমস্ত পণ্য-জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। এদেশের চিনি জাভা বা জার্ম্মাণীর চিনির সহিত প্রতিযোগিতায় না পারিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেবল ভাবের উপর কখনই ব্যবসা চলে না। স্বদেশী বলিয়া শিক্ষিতেরা যতই আগ্রহ করিয়া এদেশের চিনি যে কোন মূল্য দিয়া ব্যবহার করুন না কেন, সাধারণ লোকে চিরকালই সস্তার পক্ষপাতী থাকিবে। এ অপ্রিয় সত্য ত আমরা প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাহাতে নিজেদের দেশের উৎপন্ন-দ্রব্য প্রতিযোগিতায় অন্যান্য সমস্ত দেশের উৎপন্ন-দ্রব্যকে পরাভূত করিয়া সেখানকার বাজার দখল করে এবং প্রতিযোগিতায় বলবত্তম হইয়া নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে তাহার জন্য জর্ম্মানী ও যুক্তরাজ্য কত উপায় উদ্ভাবন করিতেছে তাহা ভাবিলেও আশ্চর্য্য বোধ হয়। ব্যবসা যে কত বড় একটা জিনিষ—তাহার নিপুণ পরিচালনে যে কত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন তাহা আমরা ভাবিয়াও দেখি না।

বিস্তৃত ও বিধিবদ্ধ ব্যবসার উদাহরণ দিতে গেলে প্রথমেই যুক্তরাজ্যের ট্রাষ্ট্ (Trust) গুলির কথা মনে আসে—সেই বিস্তৃত সুনিয়ন্ত্রিত পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য-ব্যবসায় আর আমাদের খাপছাড়া কোণঠাশা ব্যবসার আবছায়া! কোন ইউরোপীয় অধ্যাপককে বলিতে শুনিয়াছি যে ট্রাষ্ট্ গুলিকে ট্রাষ্ট্ নাম না দিয়া চীট্ (Cheat) অর্থাৎ প্রবঞ্চক বলাই উচিত—কারণ তাহারা সততার ও সুলভ মূল্যের ভান করিয়া বস্তুতঃ ব্যবসা গুলিকে একচেটে করিয়া ফেলিতেছে। তা তিনি যাই বলুন না কেন, ট্রাষ্ট্ বাণিজ্য-জগতে যে নবযুগের সূচনা করিয়াছে তাহার ফলাফল দেখিবার জন্য সমস্ত ব্যবসার যুগ, ব্যবসার যুগ হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে ট্রাষ্ট সেই যুগের বিজয়কেতন। ট্রাষ্ট গুলির ক্ষমতা অসীম—যুক্তরাজ্যের রাজশক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহাদের পশ্চাতে রহিয়াছে। বন্দোবস্ত এমন যে মাঝে কোন মধ্যস্বত্বভোগী নাই। কাঁচা মাল বা "ক্ষেত্রের মাল" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ক্রেতা কর্ত্তৃক ব্যবহারের ঠিক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত অবস্থা ভেদই ট্রাষ্টের

নিজের হাতে। ইহাদিগের মূলধনের পরিমাণ আমাদের নিকট স্বপ্নের মত। মাল চালানের জন্য রেলওয়ে কোম্পানিকে ইহারা নানা উপায়ে হস্তগত করিয়াছে। সে ব্যবসা আর তার সেই বিধিবদ্ধ কার্য্যপদ্ধতি আমরা যে কেবলমাত্র অনুষ্ঠান করিতে পারি না তাহা নহে—ধারণাও করিতে পারি না।

আরও আছে—ষ্টীম বা বাষ্পে যে কল চলে হস্তচালিত কল অপেক্ষা তাহার সুবিধা অনেক। একজন লোক একটা বয়লারের পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে। যদি সে বয়লারে অন্ততঃ কুড়ি ঘোড়ার জোর থাকে তাহা হইলে সে বয়লারে ২০×৬=১২০ জন মানুষের পেশীর শক্তি আছে। ষ্টীমে যে শুধু এতটুকু সুবিধা তাহা নহে—যে কাজের জন্য বয়লার মুখ্যত চলে তাহা ছাড়া পারিপার্শ্বিক অনেক কাজের জন্যও উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। চিনি প্রস্তুত করিবার জন্য যে বয়লার চলে তার শক্তিতে করাত লাগাইয়া কাঠ চেরাই করা চলিতে পারে—সেই কাঠে চিনি রাখিবার বাক্স প্রস্তুত হইবে। ঐ একই বয়লারের শক্তিতে কারখানার যন্ত্র মেরামত কাজও চলে। কোটচাঁদপুরের কলে একই বয়লারের শক্তির সাহায্যে চিনি হইতে মিছরি প্রস্তুত ও ঘানি হইতে তৈল বাহির করিবার ব্যবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে—ষ্টীমে কাজ চালাইলে যাহা উচ্ছিষ্ট বস্তু (by product) হয়, তাহারও অপচয় না হইয়া ঐ কল সম্পর্কিত অন্যান্য কাজে আসিতে পারে।

আর একটা কথা সাধারণভাবে বলিবার আছে—সমাজ-তত্ত্ববিৎদিগের এখন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে এইরূপ বিরাট এবং একচেটে ব্যবসা সমাজের পক্ষে—অর্থাৎ সমাজের যাহারা ভিত্তি সেই শ্রমকারীদের পক্ষে অনুকুল হইবে কি না। ট্রাষ্ট্ মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের বিলোপ সাধন করিতেছে এবং নিজে নিজে বিচ্ছিন্নভাবে যে কেহ ছোট ছোট ধরণের কোন ব্যবসা করিবেন সে পথ বন্ধ করিয়া দিতেছে। ইউরোপে ও অন্যান্য দেশে এই ব্যবসাপদ্ধতিতে মজুরশ্রেণী মজুরই থাকিয়া যাইতেছে—একটা স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইতেছে। ধনীর সিন্ধুক ক্রমেই বোঝাই হইতেছে—শ্রমকারীর পকেট আর কিছুতেই পুরিতেছে না। এ সমস্ত সুবিধা অসুবিধা স্বীকার করিয়া লইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নের আমাদের আপাততঃ সমাধানের প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রথমেই দেখা উচিত যে প্রতিযোগিতায় আমাদিকে বলবান হইতেই হইবে—নচেৎ আমরা জগতের কেন আমাদের নিজেদের দেশের পণ্যরাজ্যেই স্থানভ্রষ্টই থাকিব। কাজেই যে উপায়ে হউক না কেন—অন্যান্য দেশ যেমন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি করিয়াছে আমাদের তদ্রূপ বা তেমনি কিছু করিতে হইবে। মজুর শ্রেণীর পক্ষে বা মধ্যস্বত্বভোগীর পক্ষে তাহা শুভ হইবে কি না তাহা পরে বিবেচ্য—আগে মাথাটাকে রক্ষাই করা হোক—তারপর তার ব্যথার কথা ভাবিলেই চলিবে। বিশেষতঃ

এমন অনেক ব্যবসা আছে—যেখানে ষ্টীমের সাহায্য দরকার হইবেই—দুর্ব্বল নরহস্ত কিছুতেই পারিয়া উঠিবে না। মানুষের অভাব এত বেশী এবং সে অভাব মোচনের উপায় এত নির্দ্দিষ্ট যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প আয়াসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভই তাহার কর্ম্মচেষ্টার মন্ত্র। এরূপ অবস্থায় ৫৲ টাকা মণ দরের চিনি ফেলিয়া লোকে কি করিয়া ৮৲ টাকা মনের চিনি ব্যবহার করিবে ?

সাধারণভাবে ব্যবসা সম্বন্ধে এইটুকু বলিয়া খেজুর রস হইতে চিনি প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে যেটুকু বলিবার আছে তাহাই বলিব। প্রথমেই এ সম্বন্ধে কৃষকদিগের কথা মনে পড়ে। কৃষকের ৬।৭টি ফসলের মধ্যে খেজুর গুড় একটি মাত্র। তাহার ধানের আবাদ আছে, রবিশস্যের আবাদ আছে, পাটের আবাদ আছে—এই সমস্তগুলি একসঙ্গে চালাইবার জন্য সে কোনটাতেই বিশিষ্টভাবে তাহার অবিভক্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে না। শীতকালে বেলা ছোট, সে সময় মজুরও সস্তা নয়, কাজেই তখন রস হইতে গুড় প্রস্তুত কালীন জ্বালানির জন্য যে কাঠ দরকার তাহার চেলাই ইত্যাদি জন্য মজুরী বেশী পড়ে। আমি একজন বেশ স্বচ্ছল অবস্থার কৃষককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে অন্য সময় যখন মজুর সস্তা থাকে সে সময় তাহারা জ্বালানি কাঠ ঠিক করিয়া রাখে না কেন ? সে বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাস পর্য্যন্ত তাহাদের অর্থাৎ কৃষকদের কার্য্যের তালিকা দিল—বাস্তবিক তার কোনও সময় অবকাশ নাই—পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাহার কাজ অনেক। মনে রাখিবেন জ্বালানি কাঠ অন্ততঃ সিকি পরিমাণে কিনিতে হয় না—পল্লীতে সারা বৎসর ধরিয়া যে সমস্ত জঙ্গল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় শীতকালে কৃষকেরা বিনামূল্যে তাহা জ্বালানির জন্য কাটিয়া লয়। বিশেষ পল্লীগ্রামে তাহাদের প্রধান জ্বালানি যে বাঁশ তাহার মূল্য অতি সামান্য—তথাপি জ্বালানির মহার্ঘতা সম্বন্ধে তাহাদের অনুযোগ ঘুচে না। আরও অসুবিধা আছে। একই কৃষক এই সমস্ত ফসলের জন্য ব্যস্ত থাকাতে তাহার স্বাস্থ্যেও কুলাইয়া উঠে না। বর্ষার সময় সে বেচারী কোমর জলে দাঁড়াইয়া পাট কাচিতে লাগিল—ফলে তাহার জ্বর হইল। যশোহরের ম্যালেরিয়া—যা একবার মানুষকে ধরিলে আর শীঘ্র তার সৌহৃদ্যবন্ধন ছেদন করিতে চাহে না—বেচারীকে শয্যাশায়ী ও প্লীহা যকৃতে বৃহতোদর করিয়া রাখিল। আশ্বিন মাস আসিল—তাহার 'গাছমহাল' পড়িয়া রহিল। হয়ত লোক-মাহিয়ানা করিয়া রাখিয়া সে কাজ চালাইতে লাগিল—সে উত্থানশক্তিরহিত। ফল—

"ঘরে বসে পোহে রাত
হা ভাত তার হা ভাত !"

এ প্রবাদ এদেশে কখন মিথ্যা হয় না। লাভের পথে আরও প্রতিবন্ধক আছে। প্রত্যেক কৃষকই স্বতন্ত্রভাবে সামান্যসংখ্যক গাছ লইয়া মহাল করে। ২০০ গাছের

জন্য যে খরচ ৪০০ গাছের জন্য তাহার দ্বিগুণ খরচ ত নহেই—২০০ গাছের খরচের উপর সামান্য মাত্র বেশী। এই প্রসঙ্গে খেজুর মহালের লাভ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা হিসাব দেখা প্রয়োজন।

কৃষিপদ্ধতিপ্রণেতা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এক বিঘা জমিতে একশত গাছ লাগাইয়া যেরূপ আয় হয় তাহার এইরূপ হিসাব দিয়াছেনঃ—প্রতি গাছে গড়ে (সপ্তাহে) /৫ সের রস হইলে সমস্ত ঋতুতে এক একটি গাছে অন্ততঃ ২১।২৬ সের গুড় উৎপন্ন হইবে। উহার মূল্য ন্যূনকল্পে ১/৮০ আঠার আনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে এক বিঘা জমির গাছে ১১২॥০ টাকা উৎপন্ন হয়। গুড় প্রস্তুতের খরচ উর্দ্ধ সংখ্যা ৩৭॥০। এই খরচ বাদে প্রতি বিঘায় লাভ ৭৫৲ টাকা! * সমস্ত ঋতু ৫ মাস তন্মধ্যে সকল সময় সমান পরিমাণে গুড় না হইলেও গড়পড়তা প্রতি মাসে ১০।১২ টাকা করিয়া লাভ। খুব বিশিষ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে উমেশ বাবুর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। যদি খরচের পরিমাণ আরও কিছু বেশী করিয়া ধরা যায় এবং উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ আরও কিছু কম করিয়া ধরা যায় তথাপি প্রতি ১০০ গাছে এক বিঘা জমির উপর ৫ মাসে ৫০৲ টাকা লাভ হইবেই—ইহা অভ্রান্ত সত্য। একজন লোক ২০০ শত গাছ অক্লেশে কাটিতে পারে কারণ পালা করিয়া গাছ কাটা হয়। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে সমস্ত খরচ বাদে একজন কৃষক শীত ঋতুতে মাসে ২০ টাকা হিসাবে অক্লেশে উপার্জ্জন করিতে পারে।

কৃষকের এই সামান্য আয় হয়ত আমাদের পক্ষে লোভনীয় নাও হইতে পারে—কিন্তু আমাদের দেখা উচিত যে, প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে টিকিতে হইবেই। কাজেই যতদূর সম্ভব লাভের অংশ এই প্রতিযোগিতায় সাফল্যের দিকেই ব্যয় হওয়া উচিত। কৃষক নিজে গুড় বিক্রয় করিবে—কিন্তু সেই পয়সাতেই হাটে বা গ্রামের দোকানে মারিচ চিনির সন্দেশ কিনিয়া খাইবে কিম্বা ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় ইত্যাদি কিনিবে। দেশের জিনিষ ব্যবহার করিব নিজেদের মধ্যে এমন একটা

---

* খেজুর গাছ প্রত্যহ কাটা হয় না। তিন দিন জিরেনের পর দুই দিন কাটা হয়। প্রত্যেক গাছে কিন্তু সপ্তাহে ১০ সেরের অধিক রস হয় না। অগ্রহায়ণের ১৫ই হইতে ফাল্গুনের ৫ই পর্য্যন্ত প্রত্যেক গাছ হইতে তিন মাসে ৩ মণ রস পাওয়া সম্ভব ১ মণ রস হইতে /৭॥ সের সার গুড় উৎপন্ন হয়। এক বিঘায় পূর্ণ বয়স্ক ১০০ গাছ হইতে ২২৫০ সের অর্থাৎ ৫৬।০ মণ গুড় উৎপন্ন হইবে। তাহার মূল্য আজকালকার বাজার দরে ২৲ টাকা মণ হিসাবে ১০২॥০ আনা। মোটামুটি প্রত্যেক গাছ হইতে ১৲ টাকা আয় এবং গাছ প্রতি ॥০ আনা ব্যয় বাদে ॥০ আনা লাভ হইয়া থাকে।

গাছ হইতে ভাল রস ব্যতীত ঝারার রস (অর্থাৎ সকলে ভাঁড় নামাইবার পর যে রস টসিতে থাকে) কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা হইতে চিটা গুড় তৈয়ারি হয়। তাহা তামাকে মাখাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এইরূপ গুড় বিক্রয় করিয়া বানসালের অনেক খরচ লাঘব হয়। কৃঃ সঃ

নিয়ম তাহারা মানিতে পারে না। কাজে কাজেই আমাদিগকেও এই প্রতিজ্ঞা সর্ব্বস্ব ব্যবসা অপেক্ষা যথার্থ প্রতিযোগিতার ব্যবসার দিকে লক্ষ্য করা উচিত। আমাদের দেখা উচিত যাহাতে কৃষকদিগের মধ্যে বেশ সুনিয়ন্ত্রিত ও বিজ্ঞানসম্মত নূতনতম উপায় প্রচলিত হয়, যাহাতে লাভের অংশ আরও বেশী হয়। নূতন যন্ত্রাদি বা নূতন কোন উপায় কৃষকের চির পুরাতনাভ্যস্ত বুদ্ধির বিরোধী। এবিষয়ও শিক্ষিত ও কর্ম্মঠ ভদ্রসন্তানগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের অপেক্ষা করিতেছে।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে প্রত্যক্ষভাবে যেটুকু চাষের কাজ সেটা কৃষকদের হাতেই রাখা উচিত, নচেৎ তাহাদের অন্ন মারা যাইবে এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্যেই বিফল হইয়া যাইবে। এদেশে মজুর সস্তা কাজেই তাহাদের এই লাভটুকু চিনি সস্তা হওয়ার পক্ষে কোন বিঘ্ন আনিবে না অন্যান্য দিক দিয়া তাহা পোষাইয়া যাইবে। বাস্তবিকই কৃষক শীত ঋতুর কয়েক মাস যে টাকাটা পায় তাহার ভাগ লইবার জন্য কেহই লোভ করেন না। কিন্তু যুক্তরাজ্য ও জর্ম্মানী তাহাদের মজুরের মহর্ঘতা বাষ্পশক্তি দ্বারা পোষাইয়া লয়—ট্রষ্টের ব্যবস্থাগুণে প্রথম হইতে শেষ অবধি সমস্ত লভ্যাংশই তাহাদের ঘরে যায়—এদেশে রপ্তানি করিবার জন্য তাহাদের জাহাজ ভাড়াও নাম মাত্র লাগে। তাহাদিগের এতগুলি সুবিধার সহিত আমাদিগকে লড়িতে হইবে। কাজেই বলিতে হয় যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় এ ব্যবসাটি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হস্তগত না করিলেও কৃষকদিগের মধ্যে যাহাতে সমবায় ভাবে কাজ করিবার শক্তি ও সুযোগ ঘটে, যাহাতে তাহারা যতদুর সম্ভব সস্তায় গুড় উৎপাদন করিতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। কেবলমাত্র গুড় সস্তা হইলেও লাভ কম নয়—কারণ গুড়, গুড় অবস্থাতেও ব্যবহৃত হয়। এবং চিনির জন্য কাঁচা মালরূপেও ব্যবহৃত হয়। যদি প্রথম অবস্থাতেই দাম একটু কমান যায় তবে শেষ অবস্থাতেও দাম কমিবে। বিশেষ যাঁহারা গুড় ব্যবহার করেন তাঁহাদেরও অধিক সুবিধা হইবে।

কৃষকদিগের সহিত চিনির ব্যবসায়ের যে স্তরের সম্বন্ধ তাহা অতি সহজ। অশিক্ষিত কৃষক তাহার সহজবুদ্ধি ও অভ্যাস দ্বারা কয়েক বৎসরের মধ্যেই এবিষয়ের সমস্ত তথ্য জানিয়া লইতে পারে। কিন্তু কেবল উৎপাদন করিলেই ত হইল না। কৃষক গুড় উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু চিনির ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে জয়ী হইতে হইলে তাহার কতটুকু শক্তি, কি প্রকারে জয় করিতে হইবে তাহা সে জানে না—এসমস্ত আলোচনা তাহার চিন্তা-শক্তির গণ্ডীর বাহিরে। কৃষক মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার লয় পরে গুড়ের ঋতুর সময় মহাজন সেই টাকা আদায় করিবার জন্য নিজের ইচ্ছামত দর দিয়া কৃষকের গুড় লইতে থাকে। এইরূপ

'গুড়ের দাদন' প্রথা দ্বারা মহাজন নিজের ইচ্ছামত দর নিয়ন্ত্রিত করে। যেটুকু লভ্যাংশ তাহার সামান্যই কৃষক পায়। বেশীর ভাগ অযথা ভাবে এমন এক সম্প্রদায়ের সিন্দুকে যায় যাহারা সমাজের কোনই হিত করে না, বরং কৃষকের বুকের রক্ত শোষণ করিয়া তাহাকে নির্জীব করিয়া ফেলে। তাহারা এ লাভ ভোগ করিবার কে ?--কিন্তু কে তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিবে ? যদি গুড়ের ব্যবসায় ক্ষেত্র বিস্তৃত হইত তাহা হইলে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর মহাজনের এরূপ প্রভুত্ব সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এ ব্যবসা একটি মাত্র স্থলে আবদ্ধ বলিয়া ইহা বিস্তৃত দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে না পারিয়া মহাজনের ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীর করতলগত হইয়া পড়ে। অপচয় আরও আছে ঃ—দিনের বেলায় যে রস নিসৃত হয় তাহা কৃষকেরা সঞ্চিত করে না—তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এ রসের পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে ইহা দ্বারা মোটামুটি ভাবে ত চিটাগুড় প্রস্তত হইতে পারেই এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রকৃষ্ট উপায়ে ইহা হইতে যে অন্য কোন কাজের জিনিষ না হইতে পারে তাহাই বা কে জানে ? কেহ হয়ত বলিবেন যে যদি বাস্তবিকই সমস্ত অপচয় হইতে কোন কাজের জিনিষ পাওয়ার সম্ভব থাকিত তাহা হইলে সে বিষয় এতদিন অনুসন্ধান করিয়া তাহার একটা মীমাংসা হইয়া থাকিত। কিন্তু কে মীমাংসা করিবে ? আমাদের কি স্বাধীন চেষ্টা বলিয়া একটা জিনিষ আছে ? কিন্তু তাঁহারা আবার হয়ত বলিবেন যে সাহেব কোম্পানীরা তাহা হইলে এ ব্যবসায় এতদিন হস্তগত করিত তাহারা কখন প্রকৃতির দান এরূপ ভাবে নষ্ট হইতে দিত না। কে বলিয়াছে যে সাহেব কোম্পানীরা ইহা হস্তগত করিতে চেষ্টা করে নাই ? যখন যশোহর জেলায় নীলকুঠির খুব প্রাদুর্ভাব ছিল তখন এ ব্যবসায়ও তাহারা স্বায়ত্ত করিতেছিল। কিন্তু যখন নীলের চাষ যশোহর জেলায় আর সম্ভবপর হইল না, তখন সমস্ত কোম্পানীই নিজ নিজ কুঠি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র চলিয়া যায়—যশোহরে আর অন্য ইংরেজ কোম্পানীর চিহ্ন রহিল না।

খেজুর রস যে যে মৌলিক উপাদানের সংমিশ্রণে প্রস্তত তাহাতে চিনি প্রস্তুতের উপকরণ ভিন্ন আর একটি পদার্থ আছে—যাহা ঐ রস হইতে বাদ দিতে পারিলে দুই প্রকার লাভ হয়। প্রথমতঃ গুড় সহজে নষ্ট হইতে পারে না এবং ঐ গুড় হইতে চিনি অনেক দিন ধরিয়া অবিকৃত অবস্থায় থাকে। মারিচ চিনি ও দেশীয় খেজুর গুড়ের চিনির আস্বাদ গ্রহণ করিলেই উহাদের মধ্যে একটু তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায় ! খেজুর গুড়ের চিনির ঐ যে একটু বিশেষ আস্বাদ উহা ঐ অতিরিক্ত পদার্থটির জন্য হয় এবং উহা চিনিকে কোনরূপে সাহায্য করা দূরে থাকুক বরং অপকারই করে। দ্বিতীয়তঃ ঐ জিনিষটি অন্য একটি ব্যবসায়ে অতীব প্রয়োজনীয়। যদি এই পদার্থটিকে বিশ্লেষণ করিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে এই উচ্ছিষ্ট দ্রব্য

(By-product) টির মূল্য গুড়ের মূল্য অপেক্ষাকৃত সস্তা করিতে পারিবে। আর যে জিনিষটি এখন তাহার বিশিষ্ট কার্য্য না করিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহা অল্প দামে বিক্রয় করিলে চামড়া পরিষ্কার বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। এই একটি মাত্র দ্রব্য দ্বারা চামড়া এবং গুড়ের ব্যবসা একত্র উপকৃত হইবে। এই দ্রব্যটির নাম Tanin. Humphrey Davy সাহেব খেজুর গাছের অন্তঃসার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উহাতে অনাবশ্যক রূপে বাহুল্য ভাবে ঐ Tanin বিদ্যমান আছে। চামড়া কষ করিতে উহা বিশেষ রূপে প্রয়োজনীয়। এখন দেখুন যে এই ব্যবসায়ের প্রথম অবস্থার কার্য্য যাহা সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞ এবং চিরপুরাতনাভ্যস্ত কৃষকদিগের মধ্যে আবদ্ধ, তাহাতে যদি শিক্ষিত সম্প্রদায় মনোযোগ করেন তাহা হইলে আমাদের দেশের চিনির ব্যবসায়ে কি বিপুল পরিবর্ত্তন সূচিত হইবে। যদিও খেজুর গাছ হইতে রস মোক্ষণের বর্ত্তমান উপায় ভিন্ন অন্য কোন সুবিধাজনক উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে কি না সন্দেহ, তথাপি আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা অনেক অপচয়কে কার্য্যে লাগাইয়া মূল উদ্দেশ্যের অনেক সহায়তা করিতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এখন দেখুন আমাদের বিজ্ঞানবিৎ যুবকদিগের কার্য্য করিবার ক্ষেত্র কোথায়—আমাদের স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায়ের নিষ্ঠা ও শক্তি কোথায় সাফল্য লাভ করিবে?

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য ব্যবসায় কৃষকদিগের মধ্যে যেটুকু আবদ্ধ তাহাই এবং মোটামুটি ব্যবসার মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করিলাম। কৃষকদিগের অবস্থাই আমাদিগের পক্ষে বিশেষরূপে জানিবার প্রয়োজন আছে। তাহাদের যে অজ্ঞতা তাহা তাহাদের এবং সমস্ত সমাজশরীরের উন্নতির প্রতিবন্ধক। আমাদের উচিত সেই অজ্ঞতার অপোনদন করিয়া তাহাদিগকে অভিজ্ঞতা প্রদান করা, যাহাতে তাহারা তাহাদের উপর যে ভার ন্যস্ত আছে তাহা যথার্থভাবে সম্পন্ন করিতে পারে। নচেৎ কাদার পুতুল গড়িয়া তাহা সোণার পাতে মুড়িলে কি হইবে?

এইত গেল প্রথম অবস্থা অর্থাৎ রস হইতে গুড় প্রস্তুত করার অবস্থার কথা। এখন দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ গুড় হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার অবস্থা বাকী আছে—সে অবস্থা আরও প্রক্রিয়াবহুল এবং তাহার আলোচনা আরও উপকারী। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইবে ভাবিয়া এইখানেই আপাততঃ থামিতে হইল। পূর্ব্বের প্রবন্ধে অর্থনীতির দিক দিয়া খেজুর গুড়ের ব্যবসা সম্বন্ধে আলোচনা করিব লিখিয়াছিলাম—কিন্তু কেবলমাত্র কতকগুলি অঙ্কদ্বারা একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া দিলে তাহা কোন প্রয়োজনেই লাগিবে না। এইজন্য যথাযথভাবে সে পদ্ধতি অবলম্বন করি নাই। যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি এই বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কখনও এইরূপ একটা হিসাবের জন্য আটকাইবে না।' ললিতমোহন রায়। "প্রবাসী"

পত্রাদি

শ্রীশশিভূষণ মজুমদার—জলঙ্গী পোঃ আঃ, মুর্শীদাবাদ

১। ধঞ্চে বীজ—ধঞ্চেবীজ কলিকাতায় বৎসরে কত মণ পরিমাণ বিক্রয় হইতে পারে?

২। উহা বিদেশে রপ্তানি হয় কি না?

৩। উহার বেশী পরিমাণ খরিদ্দার কাহারা?

৪। কলিকাতার মহাজনদের নিকট আনুমানিক কত টাকা মণদরে বিক্রয় হইতে পারে?

৫। আগামী অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে যে বীজ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইব তাহা এই সময়ে মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া অগ্রীম বিক্রয় চুক্তি হইতে পারে কি না?

সম্ভবতঃ আমি এই সময় হইতে চেষ্টা করিলে বৎসরে ৪০০০/ ৫০০০/ হাজার মণ ধঞ্চে সংগ্রহ করিতে পারিব।

উত্তর—ঠিক কত মণ ধঞ্চে বীজ কলিকাতার বাজারে বিক্রয় হয় তাহা জানিবার উপায় নাই। অধুনা ইহার প্রধান খরিদ্দার চা-বাগানের মালিকগণ। ধঞ্চে বীজ বিদেশ রপ্তানি হয় না। চা-বাগানে ব্যবহারের জন্য বৎসরে চারি কিম্বা পাঁচ হাজার মণ ধঞ্চে বিক্রয় হওয়া একেবারে অসম্ভব নহে। কলিকাতায় প্রত্যেক চা-বাগানের এজেন্ট আছেন তাঁহাদের নিকট পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারা যায়। যাঁহারা অধিক বীজ লইবেন তাঁহারা প্রতি মণ পাঁচ কিম্বা ছয় টাকার অধিক দর দিবেন না। গভর্ণমেন্ট বীজাগার সমূহেও দুই কিম্বা তিন শত মণ ধঞ্চে বীজ হিসাবে সাধারণ চাষীগণের ব্যবহারের জন্য সঞ্চিত থাকে। আমাদের সমিতিও বৎসরে প্রায় দেড় শত মণ ধঞ্চে বীজ সাধারণ চাষীগণ বিক্রয় করিয়া থাকে। খুচরা হিসাবে ইহা সময় সময় ৮৲ টাকা মণ দরেও বিক্রয় হয়।

ধুতুরার ব্যবহার—অনুগ্রহ পূর্ব্বক আকন্দের তুলার খরিদ্দার কাহারা এবং কত টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতে পারে জানাইবেন। অনেক দিবস পূর্ব্বে কৃষকে দেখিয়াছিলাম ধুতুরার গাছ আদি বেলেডোনার পরিবর্ত্তে ঔষধে ব্যবহার হয় সুতরাং উহার খরিদ্দার কাহারা এবং কত টাকা মণ দরে বিক্রয় হয় জানার ইচ্ছা। Bengal Chemical এ ব্যবহার হয় কি?

উত্তর—আকন্দ তুলা, আমাদের দেশের কেমিষ্টগণ অতি অল্প পরিমাণে লইয়া থাকেন। দরের কিছু ঠিক নাই। ধুতুরা পাতার রসের প্রলেপ বেলেডোন প্রলেপের

মতই কার্য্য করে। কেমিষ্টগণ (রসায়নতত্ত্ববিদ্‌গণ) ইহার খরিদ্দার। কলিকাতায় কতিপয় রসায়নতত্ত্বাগার আছে যথা—বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাকিউটিক্যাল ওয়ার্কস্‌, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌, পিকক্‌ কেমিক্যাল ওয়ার্কস্‌, মেঃ বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানি। এই সকল স্থানে ধুতুরা পাতা, ফল ইত্যাদি বিক্রয় হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দাস ওভারসিয়ার, শিবগঞ্জ পোঃ আঃ, মালদহ,

মৃত্তিকা পরীক্ষা—মাটী পরীক্ষার সহজ উপায় কি ?

ইক্ষু চাষের কোন উপদেশ পুস্তক আছে কি না? যদি না থাকে মোটামুটি চাষের সময় ও নিয়ম জানাইবেন।

ইক্ষুরস বাহির করিবার যন্ত্র কোথায় ও কতদামে পাওয়া যাইবে ?

জল তুলিবার সিউনির দাম কত? ইহাদ্বারা কূপের জল তোলা যায় কি ? কত বিঘা জমীতে জল দেওয়া যায় ?

রেড়ীর খৈল সার বিঘাপ্রতি কত লাগে ?

কীট নিবারক আরক দ্বারা সকল উদ্ভিদের পোকা পলায়ন করে কি ? ১ কৌটা বটিকাতে কত বিঘার কাজ করে ?

উত্তর—সাধারণ মাটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ; (১) দোয়াঁস যাহাতে বালি ও কর্দ্দম সমান ভাগে আছে, (২) বেলে দোয়াঁস যাহাতে বালির ভাগ অধিক কর্দ্দমের ভাগ কম এবং (৩) কাদা দোয়াঁস যাহাতে কাদার ভাগ অধিক বালির ভাগ কম।

প্রত্যেক ভারতীয় মৃত্তিকায় জীবজ সার, চুণ, কাদা ও বালি আছে। মৃত্তিকার নমুনা ভাজনা খোলায় আগুনের উত্তাপে ভাজিলে জীবজ সার (humus) পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর মৃত্তিকা ওজন করিলে যাহা কম পড়ে তাহাই জীবজ সার। মৃত্তিকার নমুনা জলে গুলিলে যাহা গলিয়া বাহির হইয়া যায় তাহাই চুণ ও কর্দ্দম, যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই বালি। নমুনার মৃত্তিকা হইতে এইপ্রকারে বালির অংশ নির্দ্ধারিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাই মৃত্তিকা পরীক্ষার সাধরণ ও সহজ নিয়ম। বিশেষ প্রকারে মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিতে হইলে আপনাকে কৃষি-রসায়নের সাহায্য লইতে হইবে। আমরা আপনাকে এইজন্য শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত কৃষি-রসায়ন পুস্তক পাঠ করিতে পরামর্শ দিতেছি।

ইক্ষুচাষ, রস ও চিনি,—ভূতপূর্ব্ব কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর প্রণীত "শর্করা-বিজ্ঞান" পাঠে ইক্ষু-রস ও তাহা হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তত সম্বন্ধে সকল বিষয় জানা যায়। ইক্ষু-রস বাহির করিবার বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের দাম ৬০৲ টাকা

হইতে ১৫০৲ টাকা। কলিকাতা বরণ্ কোম্পানির নিকট পাওয়া যায়। ভারতীয় কৃষি সমিতিকে পত্র লিখিলে তাহারাও খরিদ করিয়া পাঠাইতে পারেন।

জলোত্তলন যন্ত্র—এই সম্বন্ধে কৃষকে বহুবার আলোচনা করা হইয়াছে। আপনি বিগত বর্ষের কৃষক দেখিবেন।

খৈল সার—জমির অবস্থানুসারে এবং ফসলের আবশ্যকানুসারে খৈলের মাত্রা প্রতি বিঘায় দুই মণ হইতে দশ মণ ধার্য্য হইতে পারে। পরিমাণ নির্দ্ধারণ জমির মৃত্তিকা বিশ্লেষণ না করিলে, করা যায় না। তবে নিজের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা সাধারণতঃ একটী পরিমাণ ঠিক করিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন কার্য্য নহে।

কীটনিবারক আরক—ইহা ব্যবহারে প্রায় সমস্ত কীট ক্ষেত ছাড়িয়া পালাইবে। খুব কঠিন পতঙ্গ ভিন্ন অন্য পতঙ্গ বা কীটের দেহে ইহা বিষের কার্য্য করে। পাতার উপর ইহার গন্ধে ও স্বাদে কঠিন পক্ষ পতঙ্গও পলায়ন করে। এক কৌটা বটিকা তিন বিঘা জমির কীট নিবারণ করিতে পারে।

সার-সংগ্রহ

ভারতে গোজাতির অবনতি

গোজাতির উল্লেখ আমরা বেদে দেখিতে পাই। ঋক্ মন্ত্রে গোকুলের আরাধনা দেখিতে পাওয়া যায়। গোজাতির রক্ষণকুশলতা হইতে পুরাকালে ঋষিগণের গোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। পর্ব্বতের আসন্ন তৃণবহুল প্রদেশে ঋষিগণের গোচারণ রক্ষিত হইত বলিয়া "গোত্রের" সৃষ্টি হয়। হিন্দুর গৃহস্থজীবনে গোজাতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হেতু আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে গোজাতির উন্নতি সাধন, রক্ষণ ও পরিপালন কর্ত্তব্য। জনক রাজা স্বহস্তে গো-যুগলের সাহায্যে ভূমিকর্ষণ করিতেন। স্মৃতিতেও গোদানের ভূয়িষ্ঠ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমাদিগের গৃহস্থালীতে অনেক প্রকারে উপকার সাধিত হইয়া থাকে। চাষে বলিষ্ঠ বলদের বিশেষ প্রয়োজন। অতি পুরাকাল হইতেই কি পার্ব্বত্য কি সমতল প্রদেশে গোযানের প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়। মুসলমানগণ যুদ্ধে গোশকটের এবং কামান টানিতে গো-চতুষ্টয়ের ব্যবহার করিতেন। গোমূত্র ও গোময়ে অত্যুত্তম্ সার হয়। আমাদিগের দেশের চাষারা মুগ, কড়াই, কপি, বিট ইত্যাদি গাছের পরিবর্দ্ধন জন্য গোমূত্র আদৌ ব্যবহার করে না।

ইহাতে একটি প্রধান "সার" পদার্থ নষ্ট হইতেছে, তাহা আমাদিগের দেশের অজ্ঞ অশিক্ষিত চাষীরা দেখে না। দুগ্ধের জন্যও গোপালন আমাদের দেশে বহুল দৃষ্ট হয়। বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক গৃহে দুই একটি করিয়া গাভী দুগ্ধের জন্য পালিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের শিশু ও বালকগণ গোদুগ্ধ পান ব্যতিরেকে জীবন সংগ্রামে অবস্থিতি লাভে একান্ত অসমর্থ। কলিকাতা ও বড় বড় সহরে দুগ্ধ দিন দিন বড়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

ইউরোপ দেশীয় গো অপেক্ষা আমাদিগের দেশীয় গো, সকল প্রকারে হীন। পূর্ব্বোক্তগুলি (Taurus) জাতীয়। ইহার মধ্যে হলষ্টীন, আরশায়ার, জারসী, গার্ণসী, ডেভনশায়ার, চেশায়ার হাইল্যাণ্ড, শ্রপ্‌শায়ার প্রভৃতি জাতীয় দুগ্ধবতী গাভিগুলিই প্রধান। ইউরোপখণ্ডের মধ্যে ফরাসী, ডেনমার্ক ও সুইশ দেশীয় গাভিগুলিই অত্যধিক দুগ্ধবতী এবং ঐ দেশগুলি হইতেই ঐ খণ্ডের যাবতীয় গোজাত সামগ্রী উৎপাদিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড দেশের মধ্যে চেশায়ার ও ডেভনশায়ার জার্সি ও গার্ণাসী গাভীই সর্ব্বপ্রধান। বিলাতের গাভী বহু শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ফল। ইহাদের "ঝুট" নাই। কোন কোন বিলাতী গাভীর শিঙও নাই। শৃঙ্গবিহীন করিতে হইলে শৈশবাবস্থায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার "কষ্টিক" প্রয়োগ করিলে সহজেই শৃঙ্গের উদ্গম রহিত হয়। বিলাতী গাভীগুলি চতুষ্কোণ আকৃতি; তাই তাহারা দেখিতে এত সুন্দর। আমাদের দেশের গোজাতির শকট-বহন, লাঙ্গলাকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ঝুঁটের প্রয়োজন আছে। তাই তাহাদের মধ্যে ঝুঁট দেখা যায়। আমাদের দেশে গাভীগুলির চতুষ্কোণাকৃতি হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন। ডারউইনের পুস্তক "Origin of species, ওয়ালেসের পুস্তক Animals & plants under domestication &c. &c." প্রভৃতি পুস্তক পাঠে পদ্ধতিগুলি আয়ত্ত করিয়া তাহা আমাদের দেশীয় গোজাতির উন্নতিসাধনে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়।

আমাদিগের দেশে বহু গরু রোগে মারা যায়। গো চিকিৎসকের একান্ত অভাব। এই অভাব মোচন আশু হওয়া কর্ত্তব্য। চাষীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য যে তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের নিকটে আবেদন করিয়া প্রত্যেক জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গো চিকিৎসালয় স্থাপন করান। আমাদের দেশে গোজাতির প্রতি খুবই অনাদর প্রদর্শন করা হয়; কিন্তু তাহাদের দ্বারায় কাজ লইতে আমরা খুবই অগ্রসর। তাহাদিগকে আমরা ভাল গোয়ালে রাখি না, পুষ্টিকর আহার দিই না, অত্যন্ত খাটাই, গুরুতর বোঝা বহাই, না বহিতে পারিলে অযথা নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকি। পশ্চিমের বড় বড় নগরে প্রত্যেক চৌরাস্তায় গোজাতির লেহন জন্য বড় বড় লবণ বা সৈন্ধব পাথর থাকে, জলপানের জন্য ইন্দারার সঙ্গে চৌবাচ্ছাপূর্ণ

জল রাখা হইয়া থাকে। বঙ্গে এ সব আদৌ নাই। বোধ হয় পূর্ব্বে পুষ্করিণীর বাহুল্য ছিল বলিয়া পশ্চিম দেশীয় প্রথা এদেশে আদৌ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালাদেশে পানীয় জলের অভাব যে কি পরিমাণে হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। গ্রীষ্মকালে মনুষ্যের পানীয় জলের অভাবের সহিত গোজাতির পানীয় জলের সমধিক অভাব হইয়া থাকে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মিশর দেশীয় পিরামিডের উপরিস্থিত ষাঁড়ের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে গোজাতি অতি প্রাচীনকালে মিশর দেশ হইতে আর্য্যজাতির উপনিবেশ স্থাপনের সহিত আনীত হইয়াছিল। এই মতটি আমি সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঋক্ ও অথর্ব্ববেদে, রামায়ণের বশিষ্ঠসুমন্ত সংবাদে ও অপরাপর স্থলে, মহাভারতে স্মৃতিগ্রন্থে, পুরাণে ও তন্ত্রাদিতে গোজাতির বহুল উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্টের জন্মের ৩ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারত-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই ভারতীয় গোজাতির উৎকর্ষতা দর্শনে প্রীত হইয়া আলেক্‌জাণ্ডার ২ লক্ষ গাভী, বলদ ও ষাঁড় নিজ ম্যাসিডেনিয়া প্রদেশে গোজাতির উন্নতি সাধনের জন্য লইয়া যান। গ্রীক্ ঐতিহাসিক এরিয়ান হইতে মেটফোর্ড সাহেব তাঁহার গ্রীসের ইতিহাসে এই কথা তুলিয়াছেন। এরিয়ান টলেমী হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। গোজাতি দ্বারা আমাদিগের প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনে অশেষবিধ উপকার সাধিত হইয়া থাকে বলিয়া ধর্ম্মগ্রন্থে গোজাতির নাশ বা হানি সাধন অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এমন কি মোগলসম্রাট আকবর আইন দ্বারা অবাধ গোবধ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮০২ সালে মহারাষ্ট্রকুল গৌরব দৌলৎরাম সিন্ধিয়া যাহাতে ইংরাজরাজ্য মধ্যে গোবধ সাধিত না হয়, তজ্জন্য ইংরাজসম্রাটকে বরং কতক দেশ ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। নেপাল ও অন্যান্য অনেকগুলি স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের মধ্যে গোবধ নিষিদ্ধ। এই জন্য ভরতপুরের মহারাজ বৃদ্ধ ও হীনবল গরু ক্রয় করিয়া জঙ্গলে ছাড়িয়া দিতেন। এই স্বাধীনীকৃত গোজাতির বংশাবলীর বিক্রয় বোধ হয় পাওনিয়ার পত্রিকায় এগ্রিকোলা নামধেয় কোন পত্রপ্রেরক লিখেন। ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ পত্রিকায় "বন্য গোজাতি" শীর্ষক এক বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দামো, হোশেঙ্গাবাদ, বাবাই প্রভৃতি মধ্যভারতের জঙ্গল সমূহে এইরূপ বন্য গো পালে পালে বিচরণ করিয়া থাকে। এইরূপ একপাল বন্য গোজাতি কৃষকগণের শ্যামল শস্যক্ষেত্র অবাধে নষ্ট করিত। সহৃদয় সরকার বাহাদুর অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, অন্যূন ৮৫ বর্গ মাইলের শস্য এইরূপে নষ্ট হইয়া থাকে। নিঃস্ব প্রজাবর্গকে অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে বলিয়া এইরূপ ২।৪ পাল বন্য গাভীকে বন্দী করণাভিলাষে বিগত ১৯০৯ সালের মে মাসে মধ্যপ্রদেশের ডেপুটী কমিশনার, ডেঃ ডাইরেক্টার-অব্-এগ্রিকলচার এবং

তহশীলদার কৃতসংকল্প হন। সামান্য চেষ্টার পর বাবাই পাল গেপ্তার হয় এবং কিছু-কাল পরে ধৃত গোগুলি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হয়। এই গুলির মধ্যে অধিকাংশই চাষের জন্য এবং জল তোলার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, উকিল হাইকোর্ট, কলিকাতা।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

শ্রাবণ মাস।

সব্জীবাগান।—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বরবটী, বেগুন, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি তথাপি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা।—দোপাটী, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা,) এমারন্থাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (Sun-flower) মাটিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাত্‌লা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল কাটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুলকলম করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বুঝে।

আনারসের গাছের কেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

যাঁহারা বেড়ার বীজ বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধাঁরে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুরমত গজাইতে পারে।

শস্যক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মরশুম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড়ই ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণবঙ্গে পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে বীজ ধান্য বপনের উপযুক্ত সময়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া যাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি বিচলিত করা কর্ত্তব্য। সুপারী গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোময় দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছ হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা বা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালী কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এ মাসে পুঁতিলেও হইতে পারে। বেগুন, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারিয়া লঙ্কার চারা পুঁতিবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুঁতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। দোয়াঁস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে, সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁকআলুর বীজ পুঁতিবে। শাঁকআলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আলা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটে।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ খণ্ড। } শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

পিপুল

কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার লিখিত।

"ক্ষেতের কোণা বাণিজ্যের সোণা।"

দীর্ঘকাল যাবৎ পরের গোলামী করিতে করিতে আমরা একেবারে মনুষ্যত্বহীন, উদ্যম উৎসাহ বিহীন ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে আস্থা যত্নশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। অধিক কথা বলিব কি, আমাদের এক্ষণে এমনই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, আমাদের বাটীর চতুষ্পার্শ্বে যে সকল অত্যাবশ্যক, নিত্য প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণোপযোগী ঔষধি তরুলতা বিনা যত্নে প্রকৃতির নিয়মে স্বতঃই জন্মিয়া ধরিত্রীর শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না। ঐ যে বনে জঙ্গলে বাড়ীর চারিধারে, ছায়াযুক্ত স্থানে, পিপুলের লতা জন্মে, তাহার কি আমরা খোঁজ খবর রাখি? যখন কাশি হয়, তখন হয়ত ঐ লতা জ্বাল দিয়া গোলমরিচ সহ সেবনে আরাম বোধ করি; কিন্তু উহা যে অনায়াসলভ্য ও সমধিক লাভজনক একটী প্রধান কৃষিদ্রব্য, তাহা আমরা মনেও করি না। যথারীতি আবাদ করিলে প্রতি বিঘায় অন্যূন ১০০৲ টাকা হয়ত নেট আয় হইতে পারে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিকে আমাদের রুচি নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সকল দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ১৫৲ পনর টাকার কেরাণীগিরির জন্য আমরা লালায়িত। বঙ্গীয় যুবকগণ যদি একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রণালীতে পিপুলের চাষ করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই আমাদের কথার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ও আপনাদিগকে ধন্য মনে করিবেন।

ক্ষেত্র নির্ব্বাচন

দোয়াঁস উন্নত ভূমি, যেখানে বর্ষার জল না উঠে এবং বৃষ্টির জল না দাঁড়ায় এমন স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, পৌষ মাস হইতে ক্ষেত্র এক ফুট গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হইবে। পিপুল বাগানের চারিধারে ১ বা ১॥০ ফুট গভীর নালা কাটিয়া জমি চিহ্নিত করতঃ তাহার উপর বেশ মজবুত করিয়া এরণ্ড (ভেরেণ্ডা) কিম্বা চিত্রা গাছের বেড়া দিতে হইবে, যেন ক্ষেত্রে গরু বাছুর, ছাগল ইত্যাদি প্রবেশ করিতে না পারে। গাছ রোপণের পূর্ব্বে জমি চারিবার চাষ দিলেই চলিবে। প্রতি বিঘায় ৪০/ মণ গোবর সার দিলে ফলন ভাল হয়।

সময় নির্দ্ধারণ

পৌষ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত ৪ বা ৫ বার জমিতে চাষ দিয়া বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে পিপুলের বীজ (অর্থাৎ গাঁটযুক্ত লতা) ৫।৬ গাছি একত্রে আটি বাঁধিয়া প্রত্যেক চারি হাত অন্তর রোপণ করিতে হইবে। কিন্তু লতা রোপণের পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্রে চারি হাত অন্তর সারি বাঁধিয়া ধঞ্চের গাছ লাগাইতে হয়, কারণ পিপুল লতার সহিত ধঞ্চে গাছের বড়ই প্রণয়, ধঞ্চে গাছের শীতল ছায়ায় বেশ সতেজে জন্মিয়া থাকে এবং ঐ গাছ আশ্রয় করিয়া প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপাদন করে। এ কারণ পিপুল চাষ করিবার পূর্ব্বে ধঞ্চে গাছ লাগান আবশ্যক। জমি প্রস্তুত হইলে ফাল্গুন মাসের প্রথমে ঐ জমিতে দীর্ঘ প্রস্থে সমানে ৪ হাত অন্তর ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে ৩।৪টী করিয়া ধঞ্চের বীজ পুতিয়া দিয়া তাহার উপর একটু একটু জল দিলে আপনা আপনি চারা জন্মে। ঐ চারাগুলি ৮।১০ আঙ্গুল বড় হইলে অপেক্ষাকৃত সতেজ এক একটী চারা রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। পরে চৈত্র মাসের শেষে লতা সংগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের প্রথমেই সেই লতাগুলিকে ১৬ ১৭ অঙ্গুলি পরিমিত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ৫ ৬ গাছি লতা একত্র করতঃ আটি বাঁধিতে হয়। এইরূপ আটি বাঁধিবার সময়, যাহাতে লতার গাঁটগুলি উল্টাপাল্টা হইয়া না যায় এবং তাহার বিপরীত ভাবে রোপিত না হয় এরূপ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। আটিগুলিতে গোবর গোলা মাখাইয়া ঐ ধঞ্চে গাছের ফাঁকে ফাঁকে দৈর্ঘ্য প্রস্থে এক হাত অন্তর সমানে সারি করিয়া ৪।৫ আঙ্গুল খাড়াভাবে মাটির নীচে পুতিয়া যাইতে হইবে।

রোপণের পর বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকিলে গোড়ায় কিছু কিছু জল দেওয়া কর্ত্তব্য। আটিগুলি পুতিবার সময় জল না পাইলে রৌদ্রে আতড়াইয়া যায়, পরে বৃষ্টি পাইলে গজাইয়া উঠে। নিম্নে অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রণালীর চাষের বিষয় বিবৃত হইল।

লতা সংগ্রহ হইলে কিছুদিন একস্থানে জমা করিয়া রাখিয়া তাহা হইতে বোটা শুদ্ধ পাতাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয় এবং তদ্দ্বারা ৮।৯ অঙ্গুলি ব্যাস বিশিষ্ট ছোট ছোট বেড় পাকাইয়া অথবা ৯।১০ অঙ্গুলি পরিমিত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এক হাত ব্যবধানে কিছু কিছু মাটি খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটী বেড় কিম্বা খণ্ডীকৃত ৩।৪ গাছি লতা দুই আঙ্গুল মাটীর নীচে পুতিয়া দিতে হয়। ঐ সকল বেড় বা লতার ৫।৬টী করিয়া গাঁইট থাকা আবশ্যক। এইরূপে লতা পুতিলে কিছুদিন পরে উহা হইতে সতেজ পিপুলের চারা জন্মে। চারাগুলি কিছু বড় হইলে পরে বাগানের সমুদয় জমি অল্প অল্প খুঁড়িয়া দিতে হয় এবং ইহার পর জমিতে ঘাস জন্মিলে তাহা নিড়াইয়া দিতে হয়, অন্য কোন যত্নের প্রয়োজন হয় না। চারাগুলি বড় হইয়া ক্রমে ক্রমে ধঞ্চে গাছ বাহিয়া উপরে উঠে। এবং আষাঢ় মাসের শেষ পর্য্যন্ত ফল প্রদান করে। এই সকল লতার মধ্যে জাফরী প্রস্তুত করিয়া দিলে লতা জাফরীর গা বহিয়া উঠিয়া অধিক ফল দান করিতে পারে। লতা ঘন হইলে নিস্তেজ লতাগুলি কাটিয়া ফেলিয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়। ধঞ্চে গাছগুলি ৩।৪ মাসের হইলে বাগানে ছায়াদানের উপযুক্ত হয়। আবার এদিকে পিছনের লতাও বাড়িয়া তাহাকে আশ্রয় করে। এইজন্য প্রথম বৎসরে বেশী লাভ হয় না। কারণ বৈশাখ মাসে লতা পুতিয়া তাহা হইতে আষাঢ় শ্রাবণে ফল প্রাপ্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রথম বৎসরে ধঞ্চে গাছ ও পিপুল লতা বড় হইতে ৪।৫ মাস লাগে। দ্বিতীয় বৎসর হইতে পিপুল চাষের লাভ আরম্ভ হয়।

যত্ন করিয়া রাখিলে ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত পিপুলের বাগান রাখা যাইতে পারে। এই সময়ের মধ্যে লতা পরিবর্ত্তন করিতে হয় না। ফল তুলিবার পর লতার গোড়া কাটিয়া দিলেই সেই গোড়া হইতে আপনা আপনি নূতন লতা গজাইয়া উঠে। ক্রমে বাগানের ধঞ্চে গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া গেলে নূতন গাছ লাগাইয়া পুরাতন গাছগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। ৪।৫ বৎসরে ধঞ্চে গাছ বুড়া হইয়া যায়। তখন তাহাতে বাগানের ছায়া দানের উপযুক্ত পাতা জন্মে না। আষাঢ় মাস হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত লতায় পিপুল ধরে এবং পৌষ মাসের প্রথমে পাকিতে আরম্ভ করে। একসঙ্গে সমস্ত পিপুল পরিপক হয় না। অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পাকিতে থাকে। অতএব এক দিন বা এক সময়ে সমস্ত পিপুল উঠাইতে হয় না, ক্রমশঃ তুলিতে হয়।

পিপুল তুলিবার সময় টান লাগিয়া যাহাতে লতা ছিঁড়িয়া না যায় এরূপ সাবধান হইতে হইবে। পিপুল পাকিতে আরম্ভ হইলে তাহার মধ্যে বীরপাক, অর্থাৎ সুপক পিপুলগুলি তুলিয়া তাহা রৌদ্রের উত্তাপে শুকাইতে হয়। ১০।১২ দিনে

পিপুল শুকায়। অপক্ক পিপুল শুকাইলে চিম্‌সে হইয়া যায় এবং দানা বাঁধে না। পিপুলে দানা না বাঁধিলে দাম বেশী হয় না। শুষ্ক পিপুল কুলা দ্বারা ঝাড়িয়া বস্তাবন্দী করিয়া রাখা উচিত। পিপুল নানা ঔষধে ব্যবহৃত হয় বলিয়া কলিকাতার বাজারে ইহা অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়, এমন কি কোন কোন সময়ে ১০০৲ টাকা করিয়া মণ বিক্রয় হয়, অত্যন্ত সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইলেও ৪০৲ টাকা মণের কম কখনও বিক্রয় হয় না। রীতিমত বাগান করিয়া চাষ করিলে বিঘা প্রতি ৫/ মণ পিপুল উৎপন্ন হইতে পারে।

মফঃস্বলের পুষ্করিণী ও উদ্বিড়াল।

শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায় লিখিত

মফঃস্বলের পুষ্করিণী বলিলেই যেন কেহ আগে না বুঝিয়া বসেন যে, আমি মজাপুকুর, পচা জল, পানীয় জলের অভাবে পল্লীবাসী মরণাপন্ন ইত্যাদি চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া ভাষার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিতেছি। আমি দেখাইতেছি যেমন মফঃস্বলের পল্লী হিংস্রক জন্তু সমাকুল, দূষিত বাষ্প মিশ্রিত বায়ু সেবনে জনপদ জনশূন্য হইয়া যাইতেছে, সেইরূপ মফঃস্বলের প্রাচীন পুষ্করিণীগুলিও লতাগুল্ম পরিবৃত উদ্বিড়ালের লীলাক্ষেত্র হইয়াছে এবং তাহাদের উৎপাতে মৎস্যশূন্য হইয়া পড়িতেছে।

কথায় আছে—

ঘায়ের শত্রু তেলাপোকা, ঋণীর শত্রু সুদ;
ভেকের শত্রু বিষধর, মাছের শত্রু উদ্।

উদ্বিড়ালকে চলিত কথায় স্থান বিশেষে উদ্ বা ধেড়ে বা জলমার্জ্জার কহিয়া থাকে। পাড়াগাঁয়ের চিরন্তন প্রথা কোন একটা বড়পুকুর বা প্রকাণ্ড দীঘির ধারে এক এক পাড়া হইয়া বসবাস করা। সেই কারণে গ্রামের ভিতর সেকালের দীঘির চতুষ্পার্শে বামনপাড়া, কায়েতপাড়া, গয়লাপাড়া, বাগ্দীপাড়া, কামার, কুমার, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি অনেক পাড়া দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময় গ্রামের কোন জমিদার বা ধনাঢ্যব্যক্তি পাড়ার মধ্যেই গ্রামবাসীদিগের নিত্য ব্যবহারের জন্য বড় বড় পুকুর কাটিয়া দিতেন। এক্ষণে সে সব প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে কচিৎ কেহ ক্ষুদ্র একটী ডোবা সদৃশ পুকুর কাটিয়া তাহাকে হরিসাগর, বিধুসাগর, রামসায়ের, রাণীসায়ের প্রভৃতি লম্বা চওড়া নামকরণ করিয়া থাকেন, দুঃখের বিষয় ঐ সমস্ত

বিংশ শতাব্দীর সাগর বা সায়ের ১০।১২ বৎসরের মধ্যে বনজঙ্গলপূর্ণ হইয়া ম্যালেরিয়া ও সর্প বরাহাদির আবাস হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ব্বকালে এই সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন দীঘির চারিধারে লোক বাস করিত, আলো জ্বালিত, পাড়ের উপর দিয়া লোকজন যাতায়াত করিত, মৎস্যলোলুপ জল-মার্জ্জারগণ পুষ্করিণীর কিনারায় আখড়া স্থাপন করিতে পারিত না, কাজে কাজেই সে সময় একজনের পুকুরে দশ জন মাছ ধরিয়া খাইলে ও মালিক জাল ফেলিলেই অক্লেশে রুই, কাতলা, মিরগাল প্রভৃতি বড় বড় মাছ জালে ধরিতে পারিতেন। আর আজকাল গৃহস্থ জলের মত অর্থব্যয় করিয়া বড় মাছের পোণায় পুকুর ভরিয়া দিতেছেন, কিন্তু কাজের সময় সারাদিন জালাছি করিয়া জাল ফেলিয়াও চুনাপুটী পর্য্যন্ত মিলাইতে পারিতেছেন না।

এই স্বচ্ছন্দজাত প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপর, ফুলফল ভরা বিটপী ব্রততীর মধুময় —প্রেমময় পল্লীর সবুজ হৃদয়ের উপর ভগবান এরূপ কঠিন বজ্র হানিতেছেন কেন, পল্লীর প্রেমে তাঁহার এত অনাদর কেন তাহা সেই অনাদি অনন্ত অজ্ঞেয়চরিত্র ভগবানই বলিতে পারেন। এক্ষণে ম্যালেরিয়ার ও ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবে পাড়া কি পাড়া উজাড় হইয়া যাইতেছে, পুষ্করিণীগুলির একধারে হয়ত কয়েক ঘর বাসিন্দা মিটমিট করিতেছে, অপর তিন ধার ঘন জঙ্গলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত জঙ্গলের মধ্যে দলে দলে ধেড়ে আসিয়া বাসা বাঁধিতেছে আর ক্ষুদ্র চিংড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ মাছ পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া অন্য পুকুর দখল করিয়া বসিতেছে। পাড়াগাঁয়ে এই প্রকারে দিন দিন ধেড়ের বংশ বৃদ্ধি হইতেছে, পূর্ব্বে গ্রামের বাহিরে মাঠের পুকুরে ধেড়ের অত্যচারের কথা শুনা যাইত এক্ষণে খিড়কীর ঘেরা পুকুর পর্য্যন্তও উদের উৎপাতে মৎস্য শূন্য হইয়া যাইতেছে। অনেকের ধারণা উদ ২।১টা থাকিয়াই পুকুরের মাছ খায় কিন্তু তাহা ভুল। বন্য বরাহের ন্যায় ইহারা পুকুরের পাড়ে, খড় বাগানে বিলের ধারে উলুবনে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। কখনও কখনও কোন পুকুরে হয়ত প্রথমে ২।১ জোড়া উদ নামিতে আরম্ভ করে কিন্তু অচিরেই তাহারা অনেকগুলি দলবদ্ধ হইয়া পড়ে। গৃহস্থ এই জানোয়ারের হস্ত হইতে মাছ রক্ষা করিবার জন্য পুষ্করিণীর জলে কাঁটা ও বাঁশের আগা নিক্ষেপ করিয়া জল নষ্ট করিয়া থাকে। বাঁশের কঞ্চি খুব ঘন করিয়া জলে দিলে আপাতঃত ২।১ মাসের জন্য ধেড়ের উৎপাত বন্ধ হয় বটে কিন্তু কঞ্চি পচিয়া গেলে আবার সেই উৎপাত পূর্ব্বের ন্যায় দেখা যায়। এই সকল জল মার্জ্জার একবার পুকুরের মাছের আস্বাদ পাইলে আর সে স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহে না, সেই পুষ্করিণীর পাড়েই বসবাস করিয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে।

পল্লীবাসীর ধারণা বর্ষার সময় পুষ্করিণীর জল বাড়িলে উদ্বিড়ালে মৎস্য ধরিতে পারে না কিন্তু সেটী সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বর্ষা নামিলে ধীবর ও বাগ্দীগণ খালে

বিলে পাটা দিয়া ঘুনি পাতিয়া মাছ ধরিতে আরম্ভ করে। বিলের সহিত খাল ও খালের সহিত নদীর যোগ থাকায় সে সময় জেলে বাগ্দীদিগের ঘুনি ও দোয়াড়ে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাছ পড়ে। এক একটা ঘুনি আগাগোড়া মাছে ভরিয়া থাকে। জল মার্জ্জারগণ বিনাক্লেশে দোয়াড় ভাঙ্গিয়া উদর পূর্ণ করিয়া মৎস্য ভক্ষণ করিবার জন্য সে সময় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বিল ও খাল ধারের জঙ্গলে গিয়া বাস করে সেই কারণেই বর্ষার সময় পুষ্করিণীতে উদের উৎপাত কম হয়। একবার অন্দরের এক খিড়কীর পুকুরে উদের উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, ১৪।১৫ সের বড় বড় কাতলা উদকাটা হইয়া মরিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল আমরা রাত্রে পাহারা দিবার জন্য একতলার ছাদে ৪।৫ জন বসিয়া রহিলাম। ভগবানের কি চমৎকার বিধান! তিনি যেমন খাদকের জন্য খাদ্য দিয়াছেন আবার সেইরূপ খাদ্যের অনর্থক প্রাণ নষ্ট হইতে রক্ষা করিবারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। বাজ পক্ষী চেষ্টা করিলে একদিনে যথেষ্ট পক্ষী সংহার করিতে পারিত কিন্তু তাহার একটী মাত্র শীকার সংগ্রহ হইলেই সে তাহার নিজের তীব্র ভাষায় ডাকিতে থাকে; সে ভাষার অর্থ যাহারা বুঝিবার তাহারাই বুঝে, তাহারাই প্রমাদ গণিয়া নিজে নিজে সাবধান হইতে থাকে, আমরা তাহার বিন্দু বিসর্গও উপলব্ধি করিতে পারি না। শ্যেন পক্ষীর রব একবার শুনিলেই অন্যান্য পক্ষীবর্গ সভয়ে প্রাণ লইয়া লুকাইয়া পড়ে। জল মার্জ্জারগণও সেইরূপ প্রথম শীকার লইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া কিচ্ কিচ্ করিয়া চর্ম্মচটিকার ন্যায় ডাকিতে থাকে, সেই ডাক শুনিয়াই সম্ভবতঃ মৎস্যগণ গভীরজলে কাদায় অঙ্গ আবরণ করিয়া ফেলে নতুবা একদিনেই এক একটী প্রকাণ্ড দীঘী উদের দ্বারা মৎস্য শূন্য হইয়া পড়িত।

আমি পূর্ব্বে বলিতেছিলাম আমরা উদ্ দেখিবার জন্য পুকুরের ধারে ছাদের উপর বসিয়াছিলাম খানিক রাত্রে উদের ডাক শুনিয়া বুঝিলাম পুকুরে উদ্ নামিয়াছে। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে ঘণ্টা দুই বাদে দেখিলাম বাঁধা ঘাটের উপর দিয়া ২০।২৫টা উদ্ বেজীর ন্যায় সারি বাঁধিয়া সড় সড় করিয়া জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি অনেক স্থানে ঠিক ঐভাবে বন্য বরাহদিগকে দল বাঁধিয়া সারি দিয়া শাবক সমেত জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছি। ঘটনাচক্রে গর্ত্তের বাহির হইলে হয়ত কোন কোন ধেড়ে মারিবার জন্য কোন কল বা যন্ত্র দেখিতে পাই না। বাগ্দীগণ বিলে ধেড়ে ধরিবার একপ্রকার ফাঁসি কল পাতিয়া রাখে, তাহাতে কিছুই হয় না। যাহাদের পুকুর বাটী সংলগ্ন তাহারা একটা বড় বাঁশ চিরিয়া দুই ভাগ করিয়া পুকুরের পাড়ে পুতিয়া রাখে। বাঁশের এক ফালিতে দড়ি বাঁধিয়া রাত্রে মাঝে মাঝে টানিতে থাকে, বাঁশের দুম দাম শব্দে উদ্ জলে নামে না, এই উপায়ও চিরস্থায়ী নহে,

কিছু দিন পরে বংশ দণ্ডের আওয়াজ উপেক্ষা করিয়াও জল মার্জ্জারগণ মৎস্য ভক্ষণ করিতে জলে নামিয়া থাকে। পুকুরের ধারে সারারাত আলো জ্বালিয়া রাখিয়াও অনেকে উদ্ তাড়াইয়া থাকেন।

আমরা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি পুকুরের চারি ধারে খড় জড়াইয়া একটা কিম্ভূত কিমাকার মানুষ তৈয়ার করিয়া পুতিয়া রাখিলে এবং পুষ্করিণীতে কহ্লার (কয়লা) গাছ লাগাইতে পারিলে ধেড়ের কবল হইতে একরূপ মৎস্য রক্ষা করা যাইতে পারে।

একজন বহুদর্শী জেলের নিকট শুনিয়াছিলাম ধেড়ের দল পুকুরে নামিয়া পুকুরের একধার দিয়া সারি বাঁধিয়া ঘুরপাক দিয়া মাছ তাড়াইতে থাকে। ধেড়েগণ কুল ধরিয়া অল্প জলে ঘুর পাক দেওয়ায় জলেরও একটা এক টানা স্রোত উপস্থিত হয় মৎস্যগণ ধেড়েদিগের আগে আগে স্রোতে গা ভাসাইয়া ছুটীতে থাকে, জল মার্জ্জারের আলোড়িত জল স্রোতের কি এক আকস্মিক আকর্ষণে গভীর জলের বড় মাছও কুলে আসিয়া স্রোতের সঙ্গে ছুটীতে আরম্ভ করে তখন জলমার্জ্জারগণ মুহুর্ত্তের মধ্যে স্রোতের বিপরীত দিক হইতে উল্টা ঘুর দিয়া মৎস্যগণের সম্মুখীন হইয়া টপাটপ্ ধরিয়া ফেলে। প্রবীন ধীবরের এই যুক্তি সমীচীন বলিয়া অনুমান হয় কারণ গভীর জলের ছোট ছোট পোনা মাছগুলিকে সরলভাবে জল মধ্যে তাড়াইয়া ধরা সহজ ব্যাপার নহে, এইরূপ একটা চক্র-জাল বিস্তার না করিলে আর উদ্গণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দীঘি মৎস্য শূন্য করিতে পারিত না। আমি যে সমস্ত ছোট মাছ উদে কাটা দেখিয়াছি, তাহার সবগুলিই সম্মুখদিক হইতে ধরা ও মুখ চোখ সব ছ্যাঁদা করা। সেবার আমাদের দীঘিতে প্রতিদিন এক সের, দেড় সের করিয়া কাতলা জলে মরিয়া ভাসিয়া উঠিতে লাগিল, প্রত্যেক মাছেরই মুখ ও গলসা ছেঁড়া দেখিতে পাইয়াছিলাম। অবশেষে ঐরূপ কতকগুলি মানুষ তৈয়ারি করিয়া পুষ্করিণীর ধারে বসাইয়া দেওয়ায় সে যাত্রা পুকুর রক্ষা পাইয়াছিল। উদের শিকারের মধ্যে কাতলা মাছই বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কাতলা মাছ বেশী জলের তলে যাইতে পারে না, সেইজন্য তাহারা সর্ব্বাগ্রে কাতলা মাছেরই সর্ব্বনাশ সাধন করে। মিরগাল মাছ অধিকাংশ সময়ে পাঁকের মধ্যেই মাথা গুঁজিয়া থাকে বলিয়া মিরগাল মাছকে প্রায় উদে ধরিতে পারে না। আমি খুব বড় বড় কাতলা মাছের পিছনের দিকে উদে কাটিয়া মারিয়া ফেলিতে দেখিয়াছি, আমার বিশ্বাস বড় মাছ কম দৌড়ায়, আর তাহাদিগকে সম্মুখের দিক হইতে ধরাও সহজসাধ্য নহে বলিয়াই জলমার্জ্জারগণ বড় মাছগুলিকে পিছনের দিক দিয়া আক্রমণ করিয়া থাকে। যাই হউক ম্যালেরিয়া যেমন মফঃস্বলের পল্লীবাসীদিগকে ধ্বংস করিতেছে, উদ্বিড়ালও সেইরূপ পল্লীগ্রামের পুষ্করিণী হইতে

বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য মৎস্যকুল নাশ করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালী চিংড়ি মাছের কাঙ্গালী, সেই চিংড়ি মাছ পর্য্যন্তও বুঝি আর থাকে না। কেবল উদ্ ত পুকুরের জন্যই বাঁধা নহে, খাল, বিল, নদী, সবই যে দিন দিন উদে ভরিয়া উঠিতেছে। নদীর মাছ অধিকাংশই ত বর্ষার সময় খালে বিলে বাস করে। মাছের বংশ রক্ষা করিতে গেলে জলমার্জ্জারগণের উপরও সকলেরই নজর রাখিয়া কিছু কিছু আইন জারি করিয়া চলিতে হইবে।

উদবংশ ধ্বংস করিবার যদি কেহ কোন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা কৃষকে প্রকাশ করিলে বড়ই কৃতার্থ হইব।

সরকারী কৃষি সংবাদ

লোণা ইলীশ—

ইলীশ মাছের মত তৈলদ ও সুস্বাদু মাছ খুব কমই আছে। ইহা লোণাজলের মাছ কিন্তু বর্ষার সময় ইহারা সমুদ্রের উপকূল পরিত্যাগ করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে নদীমুখে প্রবেশ করে। জেলেগণ ইহাদের আসিবার প্রতীক্ষা করিতে থাকে। যখন এই রূপার ন্যায় শুভ্র মাছ নদীজলে উজান ধরিয়া আসিতে থাকে, তখন তাহারা জলের চক্‌চকে চেহারা দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, নদীতে মাছের ঝাঁক আসিয়াছে এবং তাহারা তাহাদের নৌকা উজানে লইয়া মৎস্য ধরিতে প্রবৃত্ত হয়। ইউরোপে মৎস্য ধরিবার জন্য ছোট জাহাজ বা মটরবোট আছে। ইউরোপীয় জেলেরা খুব দৃঢ় জালে ঘেরিয়া ফেলিয়া এককালে অনেক মৎস্য ধরিতে পারে। আমাদের জেলেদের জাল ছোট, নৌকা ছোট এবং জাল এত শক্তও নহে যে তাহাতে ঘেরিয়া যত ইচ্ছা তত মৎস্য ধরা যায় এই জন্য তাহাদের ধীরে ধীরে সারাদিন পরিশ্রম করিয়া মৎস্য ধরা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।

পূর্ব্বে আমাদের দেশের জেলেগণ গঙ্গা বা পদ্মা, বা রূপনারায়ণ যে নদীতে মাছ ধরা হইত তথায় নিকটবর্ত্তী কোন বাজারে মাছ বিক্রয়ার্থ পাঠান। দূরে পাঠাইতে হইলে অনেক মাছ পচিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। এখন বাক্সে বরফ দিয়া মাছ পাঠান হয় বলিয়া, পচিয়া নষ্ট হওয়া অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছে এবং সুদূর বাজারে সস্তা মূল্যে অপেক্ষাকৃত টাট্‌কা মাছ পাওয়া যাইতেছে। যে ইলীশ মাছের আমদানী হয়, তখন এত ইলীশ মাছ পাওয়া যায় যে, লোকে খাইয়া

ফুরাইতে পারে না, কিন্তু অসময় দুই একটা ইলিশ মাছও পাওয়া কঠিন। অসময়ের জন্যই লোণা ইলিশ প্রস্তুত করিবার আবশ্যক। আমাদের দেশে মাছগুলি চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া লবণ মাখাইয়া হাঁড়ি বন্ধ করিয়া রাখিলেই লোণা মাছ প্রস্তুত হইল। ইউরোপে মৎস্য সংরক্ষণের উপায় ইহা অপেক্ষা সর্বাংশে ভাল বলিয়া মনে হয়। ইউরোপীয়গণ মাছ কুড়ি পঁচিশ মিনিট কাল খুব লোণা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে ছোট বড় মৎস্যগুলি বাছাই করিয়া লয়। অনন্তর মাছগুলি আঁশ ছাড়াইবার ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে লম্বা লম্বা তার খাটান আছে। সেই তারের সাহায্যে আঁশ ছাড়াইবার বড় সুবিধা। স্ত্রীলোকেরা এই কার্য্য সমাধা করে। আঁশ ছাড়ান শেষ হইলে অন্য ঘরে পাঠান হয়। তথায় মাছের মাথা ও লেজ কাটিয়া এবং নাড়িভুড়ি বাহির করিয়া মাছগুলি বাক্সে বন্ধ করা হয়। তদন্তর মৎস্যপূর্ণ টীনগুলি বড় বড় ধাতু পাত্রের (ট্রে) উপর সাজাইয়া বাষ্পীয় ইঞ্জিন ঘরে বাষ্প সাহায্যে টিনগুলি কিছু গরম হইলে, উহাদের মুখ বন্ধ করা হইয়া থাকে এবং প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা বা ৩৫ মিনিটকাল গরমে রাখিয়া এই টীন ঠাণ্ডা ঘরে নীত হয় এবং পরিষ্কার করিয়া কাগজ জড়াইয়া লেবেল মারিয়া বিক্রয়ার্থ সজ্জিত করিয়া রাখিয়া থাকে। মাছগুলি এইরূপে দীর্ঘকাল রাখিয়া যখনই খোলা হউক না কেন টাট্‌কা মাছের মত খাইতে আস্বাদ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে মৎস্য রক্ষার এত জটিল উপায় অবলম্বনের অনেক বিলম্ব আছে। সুখের বিষয় এই যে বরফের বাক্সে যে সময়ের যে মাছ তাহা অনেক দূর দূরতর স্থানে নীত হইতেছে, এবং লোণা ইলিশের ব্যবসা ক্রমশঃ বাড়িতেছে বলিতে হইবে।

পুষায় কৃষি-সম্মিলনী

বিগত ১৯১১ খৃঃ অব্দের ২০শে নবেম্বর, পুষা কৃষি সম্মিলনীতে (১) কৃষক-সমাজে কৃষিজ্ঞান প্রচারের উপায়-নির্দ্ধারণ (২) সহজ-লভ্য সার ও সার-ব্যবহারে অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় এবং (৩) ইক্ষুচাষ ও চিনির ব্যবসায় (Sugar Inbustry) এই তিনটী আলোচ্য বিষয়ই কৃষিপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

সভার কার্য্য—

(১) গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পাঠ ও গ্রহণ ভারতীয় ও প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগের কার্য্যপ্রণালী-নির্দ্ধারণ

(২) কৃষি-পরীক্ষা কার্য্যের ফলাফল (Results of the experimental work) কৃষকের গোচরীভূত করিবার প্রকৃষ্ট-উপায়-চিন্তা

(৩) সার—(ক) ভারতবর্ষের সহজলভ্য ও সুলভ (economical) সার ; (খ) পশুর মূত্রাদি (Cattle manure) রক্ষা ও তাহার সদ্ব্যবহার।

(৪) তৈল-নিষ্কাশন-মিশ্র-শিল্প ও তাহার ব্যবসায়-বিস্তৃতির উপায়-চিন্তা।

(৫) সংবাদ-পত্রে সম্মিলনীর কার্য্য-বিবরণী প্রকাশ

(৬) পুরাতন বা পূর্ব্বতন কৃষি-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী যে সকল ব্যক্তি কোন অনন্যসাধারণ কর্ম্ম (work of exceptional merit) নির্ব্বাহ করিয়াছেন বা যে সকল বে-সরকারী ভদ্রলোক কৃষি কার্য্যে অনুরক্ত বা কৃষির উন্নতিকর কোন কার্য্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে L.Ag. উপাধি-প্রদানের যৌক্তিকতা-সম্বন্ধে আলোচনা।

(৭) ভারতে কৃষি-সমিতির কর্ত্তব্য

(৮) প্রাদেশিক কৃষি-বিভাগের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধান-কার্য্যের সাধারণ-প্রণালী নির্ণয়

(৯) উন্নতজাতীয় শস্যের অবিমিশ্র সুবীজ-সংগ্রহ

(১০) ইক্ষু-চাষ ও চিনির ব্যবসায়

(ক) দেশীয় শ্রম-শিল্পের উন্নতি-বিধান ;

(খ) বৈদেশিক আমদানী পরিষ্কৃত (refined) চিনি ;

(গ) ইক্ষু-চাষ-ভূমির বিস্তৃতি-সম্বন্ধে আলোচনা।

(১১) কার্পাস-তত্ত্বানুসন্ধান Cotton-investigations।

কৃষক সমাজে কৃষি-কথা-প্রচারের উপায়—

কৃষি সম্মিলনী অষ্টবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

(১) কৃষি সমিতি গঠন।

(২) সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে, কৃষি পরীক্ষা-কার্য্যের অনুষ্ঠান চাষ-পরীক্ষা করা হইয়াছিল ; ফল সন্তোষপ্রদই হইয়াছে—বৈজ্ঞানিক কৃষিতে কৃষকের আগ্রহ বাড়িয়াছে।

(৩) দেশীয় ভাষায় কৃষি বিষয়ক সংবাদ পত্র এবং কৃষি-বিষয়িণী পুস্তিকা ও সার্কুলার বা বিজ্ঞাপনীর প্রকাশ ও প্রচার।

(৪) কৃষি-প্রদর্শনী-স্থান।

(৫) পরিভ্রমণকারী কৃষি-প্রচারক প্রেরণ।

(৬) কৃষক ও কৃষক-সন্তানদিগকে কৃষি-বিদ্যায় অল্পকালব্যাপী শিক্ষা-প্রদানে ব্যবস্থা।

(৭) নব-প্রবর্ত্তিত-শস্য-বিক্রয়ের প্রাথমিক অবস্থায় সাহায্য-প্রদান।

(৮) যৌথ-ঋণ-দান-সমিতির সহিত সংশ্রব স্থাপন।

আমরা বারান্তরে অন্যান্য প্রস্তাব গুলির আলোচনা করি। [কৃঃ সঃ]

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে ইক্ষুর আবাদ ১৯১১-১২—

এতদঞ্চলে আকের ক্ষেতে সেচ দিতে হয় না প্রায়ই প্রচুর বৃষ্টি হয়। বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত এরূপ বৃষ্টি হইয়াছিল যে তাহার পরে আর বৃষ্টি না হওয়াতেও কোন ক্ষতি হয় নাই। নিচু ক্ষেতে জলপ্লাবনে কিছু আক নষ্ট হইয়াছে। পোকার উপদ্রবেও কিছু নষ্ট হইয়াছে কিন্তু সে ক্ষতি তাদৃশ অধিক নহে।

আবাদের পরিমাণ—১৭৯,৩০০ একর এতৎ পূর্ব্ব বর্ষের জমির পরিমাণ ১৮১,৩০০ একর মাত্র।

ফসলের পরিমাণ—মোটের উপর ষোল আনা ফসল জন্মিয়াছে ধরিয়া লইলে একর প্রতি ২৪ হন্দর গুড় উৎপন্ন হইবে। এক হন্দরের বাঙলা ওজন ১ মণ ১৪ সের। এই হিসাবে ৪,৩০৩,২০০ হন্দর গুড় আলোচ্য বর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১০ ভাগ অধিক গুড় পাওয়া গিয়াছে।

এই অঞ্চলে উৎপন্ন খেঁজুর, তালের গুড়ের পরিমাণ ৮০১,২০০ হন্দর। ইহার প্রায় ⅔ ভাগ ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা হইতে উৎপন্ন হয়।

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমের আবাদ—১৯১১-১২

আলোচ্য বর্ষে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে সুবৃষ্টি হয় নাই; হাজারা বিভাগে হইয়াছিল। শীতকালে জলদি বৃদ্ধি আরম্ভ হইয়াছিল এবং গমের আবাদের সুযোগ ঘটিয়াছিল এবং গমের আবাদের সুযোগ ঘটিয়াছিল এই কারণে তৎপূর্ব্ব বর্ষ অপেক্ষা গমের আবাদের জমির পরিমাণ কিছু অধিক। এই বৎসরের জমির পরিমাণ ১,২০৩,১০০ একর। ইহার মধ্যে ২৮৪,৭০০ একর জমিতে সেচন জলের সুবিধা ছিল, বাকী ৯১৮,৪০০ একর জমিতে চাষ বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর ছিল।

উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ—২৮০,০২০ টন। হিসাবে বুঝা যায় ৫২০ পাউণ্ড গম এক একর জমি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এক পাউণ্ড বাঙলায় প্রায় আধসেরের সমান। তৎপূর্ব্ব বর্ষের ফলন কিছু অধিক একর প্রতি ৫॥০ পাউণ্ড।

গমের মূল্য—পেশওয়ারে গমের ২॥৵৮ পাই হইতে ৪৲ টাকা মণ পর্য্যন্ত বিকাইয়াছে। অন্যান্য বৎসর ২৸৵৮ পাই হইতে ৩॥৵২ পাই পর্য্যন্ত দর উঠিয়াছিল।

বাঙলায় তুলার আবাদের চতুর্থ বিবরণী—১৯১১-১২

বাঙলা জলদি তুলার পরিমাণের অর্দ্ধেক রাঁচিতেই জন্মায়। সাঁওতাল পরগণা, আঙ্গুল মানভূম এবং সিংভূম জেলাতে জলদি তুলা জন্মায়, তবে তাদৃশ অধিক নহে। আলোচ্য বর্ষে জলহাওয়া জলদি তুলা চাষের অনুকুল ছিল না। জল হাওয়া নাবী তুলাচাষের অনুকুল ছিল। নাবী তুলা চাষের প্রধান কেন্দ্র—সারণ। এখানকার চাষের অবস্থা ভাল। কটক ও দ্বারবঙ্গে নাবী তুলা জন্মে। দ্বারবঙ্গে অতি বৃষ্টিতে এবং কটকে অনাবৃষ্টিতে তুলার আবাদের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু মোটের উপর তুলার আবাদের অবস্থা ভাল জলদি তুলার আবাদী জমির পরিমাণ—৫৯,৯৬২ একর; নাবী তুলার জমির পরিমাণ ৩২.০৯২ একর, উৎপন্ন ১১,৪২৬ বেল নাবী তুলা জন্মিবে বলিয়া অনুমান করা হয়।

জাপানে শ্রমশিল্প। জাপানীরা কি যুদ্ধ বিদ্যা, কি শিল্প কি, বাণিজ্য সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য জগতকে পর্য্যন্ত চমৎকৃত করিয়াছে। জাপানী বাণিজ্যের পসার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। অন্যান্য দ্রব্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া রেশম ব্যবসায়ের কথা ধরিলে দেখা যায় যে জাপান ১৯০৮ শালে প্রায় এক কোটি ২০ লক্ষ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে। উক্ত বৎসরে তাহারা এমেরিকা যুক্তরাজ্যে ৮৯,১৬২ বেল, ইউরোপে ৪১,২৬০ বেল রেশম রপ্তানি করিয়াছে।

জাপানীরা খুব অধ্যবসায়ী ও নিপুণ শিল্পী কত প্রকারের মনোহারী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহারা কত পয়সা বিদেশ হইতে রোজগার করে। জাপানী ছাতা, জাপানী পাখা, জাপানী ল্যানটান্, জাপানী কাগজের রুমাল প্রভৃতি কত দ্রব্যই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। জাপানী দেশালাইয়ের বাক্স গুলিই কত সুন্দর, দেখিলেই লইতে ইচ্ছা হয়। ঐ সকল দ্রব্য সস্তার চুড়ান্ত। ইহাদের শিল্প কুশলতা শিখিবার জন্য বাস্তবিক লোভ হয়।

শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল।

আগাছা কুগাছা

ক্ষেত্রস্বামী কিম্বা উদ্যানপালকগণ সকলকেই আগাছা কুগাছা দমনের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হয়। একটু অন্যমনস্ক হইলে তাঁহাদের ক্ষেত কুগাছায় ভরিয়া যাইবে, বাগানে রোপিত গাছপালা বা ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইয়া যাইবে কিম্বা তাহাতে যথোপযুক্ত ফল ফলিবে না। সেইজন্য ক্ষেতের শস্য উৎপাদন কিম্বা বাগানের ফলফুলের গাছ রোপণ করিতে হইলে যেমন তাহাদের কোন সময় বীজ বুনিতে হয়, কিরূপে তাহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিম্বা তাহাদের পাইট, কারকিৎ কিরূপ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা দ্বারা একটা সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হয়, সেই রকম আগাছা কুগাছায় ফল ফুল কখন হয়, কখন তাহাদের বীজ পাকে, কি প্রকারে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হয়, কিসে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদি প্রকার তাহাদের জীবনী সমালোচনার আবশ্যক হইয়া পড়ে। উদ্দেশ্য কিন্তু বিভিন্ন—একটি, ক্ষেত্রজাত ফসল এবং উদ্যানজাত আবশ্যকীয় বৃক্ষলতাদি পালন, অপর পক্ষে আগাছা কুগাছার ধ্বংস। উদ্ভিদমাত্রেই জীবনী ভালরূপ আলোচিত না হইলে তাহার পালন কিম্বা ধ্বংসের বিশিষ্ট অনুষ্ঠান করা কিছুতেই সম্ভব নহে। আবশ্যকীয় গাছ পালার কোনটির ডালকটিং করিয়া বংশ বাড়াইতে হইবে, কোনটির কলম করিতে হইবে, কোনটির সহিত অপর গাছের জোড় লাগাইতে হইবে, কোনটির বীজ হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হইবে। আগাছাগুলিরও স্বভাব এই প্রকার। যাহার ডালে গাছ হইবে, তাহার ডাল মাটি সংলগ্ন হইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। যাহার মূলে গাছ হইবে তাহাদিগকে মূলসমেত উৎপাটিত করিতে হইবে, যাহার বীজে গাছ হইবে তাহাদিগকে বীজ হইবার পূর্ব্বে তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

বাগান অপেক্ষা ক্ষেতে আগাছার উৎপাত অধিক। বড় ফল ফুলের গাছের তলায় আগাছা বড় জোর করিতে পারে না এবং একবার পরিষ্কার করিয়া দিলে অধিককাল পর্য্যন্ত পরিষ্কৃত থাকে, কিন্তু ছোট গাছের তলায় সে সুবিধা হয় না। বড় গাছে লতা জন্মিলে তাহা একবার গাছে উঠিতে পারিলে প্রকাণ্ড বৃক্ষকেও খুব ক্লেশ দেয় এমন কি সময়ে সময়ে সময়ে তাহাদের মৃত্যু ঘটায়। বাগানে আগাছা সহজে উৎপাটন করা যায়। এখানে গাছের ফাঁকে অনায়াসে কোদাল লাঙ্গল চালাইয়া আগাছার বংশ লোপ করা যাইতে পারে। কোপান বা লাঙ্গল দিবার রীতিপদ্ধতি অনুসারে আগাছা শীঘ্র দমন হয়। ক্ষেতের আগাছা কিন্তু অধিক কষ্টদায়ক। ক্ষেতে পাট বুনিবার পর যদি ঘাস জন্মে, তবে তাহা নিড়ান ভিন্ন গতি নাই। আউশ ধানের ক্ষেতে যদি আগাছা জন্মে তবে তাহা নিড়াইয়া ফেলা বা হাতদ্বারা উপাড়িয়া ফেলা ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে? সেই জন্য ক্ষেতে আগাছা যাহাতে জন্মিতে না পারে এরূপ পূর্ব্বসতর্কতার প্রয়োজন। বীজের সঙ্গে যেন আগাছার বীজ না থাকে, সারের সঙ্গে আগাছার বীজ ক্ষেতে চলিয়া না আসে, ক্ষেতের ধারের আগাছা কুশ, কেশে, উলু প্রভৃতি ঘাসের বীজ নিজ ক্ষেতে আসিয়া না পড়ে। এই কারণে ক্ষেতের ধার, ভিত, আইল নিজের গরজে পরিষ্কার রাখিতে হয়।

আবশ্যকীয় গাছ অপেক্ষা আগাছার বংশবৃদ্ধি খুব অধিক। একটা বুনো কচু গাছ মাটির ভিতর শিকড় চালাইয়া সদ্য বৎসরে দুই চারি শত কচু গাছ উৎপন্ন করিতে পারে। একটি কালকাসুন্দা গাছ হইতে এক বৎসরে দশ হাজার বীজ উৎপন্ন হয়। একটা শিয়ালেকাটা গাছের বীজের পরিমাণ এক বৎসরে ৫০০০০ হাজারের কম নহে। এই সকল উদ্ভিদের আত্মরক্ষার উপায় আছে। কচুর আটা এত কুটকুটে যে, তাহা গবাদিতে খাইতে পারে না—ক্ষুধার জ্বালায় যদি দৈবাৎ খায়, তাহা হইলে মুখ দিয়া লাল স্রাব হইয়া মারা যাইবার যোগাড় হয়। কাসুন্দে গাছের পাতা এত কটুরসাত্মক যে, তাহা গরু ছাগলের অখাদ্য। শিয়ালকাঁটা গাছের কাঁটার জন্য তাহার নিকট ঘেসিবার যো নাই।

ঘাসজাতীয় উদ্ভিদমাত্রেই দুই রকমে বংশবৃদ্ধি হয়। মূল কিম্বা শিকড় হইতে বংশ বাড়ে, বীজ হইতেও বাড়ে। ক্ষেতে দুই একটা মুথা জন্মিলেই একমাস পরে দেখ যে, ক্ষেত মুথায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, অথচ কোন মুথা ঘাসটিতে ফুল বা বীজ হয় নাই। দুর্ব্বারও ঐরূপ, উলুও ঐরূপ। বোধ হয় গবাদিতে খাইয়া ফেলে বলিয়া তাহারা বংশ রক্ষার ঐ দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছে। আর এক প্রকার ঘাস তাহাকে বাঙলাদেশে চোরকাঁটা বা চোরাকাঁটা বলে। ঘাসের বীজগুলির অগ্রভাগ সুচাগ্র, শীষ হইয়া তাহাতে বীজ হয়। শীষগুলি মাটি হইতে

এক ফুট বা পনেরো ইঞ্চ উচ্চ হয়। চলিবার সময় মানুষের কাপড়ে বা গরুবাছুরের গাত্রলোমে আটকাইয়া ইতস্ততঃ নীত হইয়া তাহাদের নামের স্বার্থকতা রক্ষা করে। তাহার বীজ ছাড়াইবার এই অপূর্ব্ব কৌশল। কৌশল কোনটিতে কম। উলু বা কেশের ফুল হইল, ফুলগুলি সূক্ষ্ম কেশরযুক্ত, তাহার মধ্যে বীজ নিহিত রহিল। বীজগুলি যেই পাকিল অমনি তাহারা পক্ষীশাবকের ন্যায় নীড় জননীকে পরিত্যাগ করতঃ কেশর সাহায্যে বাতাসে ভর করিয়া এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং ইহজগতে তাহারা নিজ অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া স্বতন্ত্র ঘাসের ঝাড় নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল। এই উড়নশীল শত্রুগুলিকে বেশী ভয়। গো, ছাগাদি ইহার ধ্বংসের জন্য ব্যগ্র, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের চেষ্টাও চাই।

শীতের শেষে বৃষ্টি হইবার পর মাটি একটু নরম হইলেই খুব শুষ্ক আবহাওয়ায়, কিম্বা খুব গরমের সময় চষিলে অনেক আগাছা মূলসহ বিনষ্ট হয়। বারম্বার মুথার ক্ষেত্রে কিন্তু চষিলেও মুথা মরে না। জমি কোপাইয়া মাটি আল্গা করিয়া দিলে মুথার মূল আল্গা মাটি পাইয়া মাটির উপরদিকে ভাসিয়া উঠে, তখন আস্তে আস্তে কোপাইয়া বা নিড়াইয়া ফেলিলে তবে ক্ষেত পরিষ্কার হইবে। আমাদের দেশের চাষীরা মুথা মারিবার আর একটি কৌশল অবলম্বন করিয়া থাক। মুথাযুক্ত ক্ষেতটি চষিয়া তাহাতে ধঞ্চে বুনিয়া দেয়। ধঞ্চে একটু বড় হইলেই আওতায় মুথা আপনি মরিয়া যায়।

আগাছার মধ্যে কতগুলি বৎসর বৎসর হয় এবং তাহাদের বীজ পাকিয়া মাটিতে পড়িতে আরম্ভ হইলেই তাহাদের কার্য্য শেষ হইল—তাহাদের তখন দেহের অবসান হয়। কাঁটানটে, কাসুন্দে, শিয়ালকাঁটা, বনতুলসী প্রভৃতি ঐ জাতীয়। বীজ হইবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে ক্ষেত পাথার হইতে তুলিয়া ফেলিতে পারিলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। কতকগুলি স্থায়ীভাবে বাগবাগিচা অধিকার করিয়া থাকে এবং তাহারা কেবল বীজ নহে মাটিতে শিকড় চালাইয়াও তাহাদের বংশবৃদ্ধি করে। সেওড়া, ভাঁট— এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল আগাছা জমি কোপাইয়া শিকড় সমেত তুলিয়া না ফেলিলে উপায় নাই। বাগভারাণ্ডা, চিতা, পাথরকুচী প্রভৃতির ডালে গাছ হয়, সুতরাং সেইগুলি উপাড়িয়া তাহাদের গাছ যথা তথা ফেলিয়া রাখিলে জঙ্গলে পরিণত হয়। মাদার, জিওল, ভেরাণ্ডা, চিতা প্রভৃতি ডালে গাছ হয় বলিয়া লোকের সেগুলি দিয়া বাগানের বা ক্ষেতের বেড়া দিবার সুযোগ ঘটে। আগাছা গুলি দমনে রাখিতে হয় এবং ইচ্ছামত তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে পারিলে কখন কখন অনেক উপকারে আসে।

আগাছার কথা আলোচনা করিতে একটি বিষয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যায়। শস্য বীজের সহজেই জীবনীশক্তি লোপ হয়, কিন্তু আগাছা বীজের বোধ হয় একটিও

নষ্ট হয় না, দীর্ঘকাল মাটির ভিতর ঠিক থাকে, পচে না বা অন্য কোনরূপে নষ্ট হয় না, একটু বৃষ্টির জল পাইলেই বীজ গজাইয়া উঠে। পাখিতে কিম্বা জন্তু জানোয়ারে খাইয়া তাহাদের মলের সহিত বাহির হইলেও তাহাতে গাছ জন্মে।

আগাছা, কুগাছা বাগবাগিচায় যদৃচ্ছাক্রমে বাড়িতে দিলে জঙ্গলে ভরিয়া যায় বটে, কিন্তু আগাছাদ্বারা কোন উপকার পাওয়া যায় না এ কথা বলা যায় না। আগাছার গাছগুলি ছোট অবস্থায় জমির সহিত চষিয়া পচাইয়া ফেলিতে পারিলে সবুজ সারের কার্য্য করে। বাঙ্গালাদেশে যেখানে রোপাধান বা জলিধান হয়, তাহার জমি জলে কাদায়, ঘাসে চষিয়া এইরূপে সারবান করা হয়। বাগানের পগারের ধারে বা পুষ্করিণীর ধারে ঘাস জন্মাইতে পারিলে, পাড়ের মাটি ধুইয়া যায় না। যখন ক্ষেতে শস্য থাকে না, তখন জমির উপরিভাগ আগাছায় আচ্ছাদিত থাকিলে জমির নাইট্রেট জল ধুইয়া যাইতে পারে না। আগাছা থাকিলে তবে চাষীগণ আগ্রহ করিয়া কোদাল দ্বারা, নিড়ানিদ্বারা, নানা প্রকারে জমির কারকিৎ করে, অতএব জমির সুপাইটের আগাছা একটি হেতু। আবার আগাছা হইতে সুচাষদ্বারা সুগাছ হয়, তখন মানুষের কত উপকারে আসে—গোলাপ, দ্রাক্ষা, চা, সালাদ তাহার উদাহরণ স্থল।

আগাছাদ্বারা জমির মৃত্তিকা নির্ণয় হয়। জমিতে সাধারণতঃ কোন প্রকার আগাছা জন্মায় তাহা দেখিলে জমির প্রাকৃতিক অবস্থা কতকটা বুঝা যায়;—

বালি মাটিতে—শিয়ালকাঁটা, বামনহাটি প্রভৃতি আগাছা জন্মায়।

লোণা মাটিতে—হড়কোচা, নলের মত এক প্রকার ঘাস, ঝাউজাতীয় এক প্রকার গাছ জন্মায়।

দোয়াঁস মাটিতে—সেওড়া, ভাট, দুর্ব্বা জন্মায়।

কাদাদোয়াঁস ভারি মাটি—মুথা, ভাঁটকুল, বৈঁচ এবং গোলঞ্চ, বুনো দ্রাক্ষা প্রভৃতি লতা জন্মে।

নিস্তেজ জমিতে—চোরকাঁটা ঘাস।

সেতান জমিতে—কচু, একপ্রকার জলোঘাস, এই ঘাস গবাদিতে ভাল রকম খায় না।

যেমন বুনো গাছ হইতে উপকারী গাছ জন্মান যায় তেমনি—দেখা যায় কতকগুলি উদ্যান জাত গাছকে যদি ইচ্ছামত বাড়িতে বা জন্মাইতে দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহারা আগাছার রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জিনিয়া, পপী, কনভালভিউলস্ প্রভৃতি ফুল লোকে সখ করিয়া বাগানে জন্মাইয়া থাকে কিন্তু তাহারা ইচ্ছা জন্মিতে পাইলে সখের বাগান বনে পরিণত করিয়া থাকে। হোসেনাহেনার গাছ ইচ্ছামত বাড়িতে দিলে অতি অল্পকাল

মধ্যে জঙ্গলে পরিণত হয়। হাইবিস্কস্ মিউটাবিলিস্ বাৎসরিক গাছ, বীজ হইতে উৎপন্ন হয়। ইহার বীজ পাকিয়া তলায় ঝরিয়া পড়িতে দিলে রক্ষা নাই। ঢেঁড়সের মত ইহার ফলের গায়ে তীক্ষ্ণধার রোঁয়া আছে। ইহার গাছে বাগান ভরিয়া গেলে বাগানে প্রবেশ করা কঠিন। এন্টিগোনন লেপটাপস্ নামক একটি বেশ সুন্দর লতা আছে। লোকে জাহাজে করিয়া স্যাণ্ডুইচ দ্বীপ হইতে এদেশে আনিয়া বাগানের ফটকের কেয়ারির উপর তুলিয়া দিল। ইহার দৃশ্য দেখেকে. সুন্দর লাল, শাদা ফুল গুচ্ছের শোভা অতুলনীয়, কিন্তু বীজ পাকিয়া পড়িতে আরম্ভ হইল, সেখান হইতে দুরে তথা হইতে আরও দূরে গাছ জন্মিল, শেষে এখানেও বুঝি স্যাণ্ডুইচ দ্বীপের সৃষ্টি হয়। ডুরাণ্টায় অতি সুন্দর বেড়া হয় কিন্তু বীজ তলায় ছড়াইয়া পড়িতে দিলে বঁইচ কাঁটার বনের ন্যায় কাঁটাবনের সৃষ্টি হইবে। সখ, বিনা আয়াসে হয় না, অত্যন্ত আয়াস সহকারে সকল ফল ফুল আগাছা কুগাছার গাছ গুলিকে সংযত করিয়া রাখিতে না পারিলে শোভা বিলুপ্ত ব্যতীত শোভা বর্দ্ধিত হইবে না।

আগাছা মারিবার জন্য এত চেষ্টার আবশ্যক কি,—আগাছাও উদ্ভিদ, আবশ্যকীয় গাছও উদ্ভিদ।—উভয়েরই সমান খাদ্যের আবশ্যক আমাদের ক্ষেতের, বাগানের শস্যের বা বৃক্ষ লতাদির আহার যদি আগাছায় খাইয়া ফেলে তবে আমাদের গাছ লতা কি খাইয়া বাঁচিবে? জমির রস যদি আগাছায় শুষিয়া লয় তবে বৃক্ষ লতাদিতে কি প্রকারে রস সঞ্চারিত হইবে। আমাদের শস্য ক্ষেতের বা বাগ বাগিচায় হাওয়া চলা-চল যদি আগাছা বন্ধ করিল তাহারা কি প্রকারে নিশ্বাস প্রশ্বাস লইয়া বাঁচিবে, যদি আগাছা রৌদ্র আটকাইয়া বসিয়া থাকে তবে শস্যাদি আলোক বিহনে কতদিন বাঁচিবে? শস্যের খাদ্য ও আগাছার খাদ্য যে তুল্য, বিজ্ঞান তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে, বন মূলা, বন করুন ফ্লাউয়ার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় তাহারা শতকরা ২.৩৮ পটাস এবং ২.৮৩ ভাগ চুণ ভুমি হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। আরও ভাবনা এই যে আগাছা, ভূমি হইতে জল শোষণ করিয়া পত্রদ্বারা বায়ুমণ্ডলের সহিত মিশাইয়া দেয় তাহাতে জমি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া পড়ে এবং চাষের ব্যাঘাত ঘটায়।

আগাছা দ্বারা আর একটা বিশেষ অপকার সাধিত হয়—তাহারা নানা জাতীয় পোকার আশ্রয়। পোকা গুলি বন জঙ্গলে বাড়িয়া দল বাঁধিয়া যাইয়া শস্যক্ষেত্র বা ফলের বাগান আক্রমণ করে।

সময়মত ও সুকৌশলে আগাছার ধ্বংস করিতে না পারিলে শস্যের প্রভুত হানি হয়। কখন অর্দ্ধেক ফসল নষ্ট হয় কখন বা চৌদ্দ আনা ক্ষতি করে।

প্রতিকার—আগাছা না হইতে দেওয়া বা হইলে মারিবার চেষ্টা করা।

(১) কোদাল দ্বারা ক্রমাগত জমি কোপাইতে পারিলে আগাছা নিবারিত হইতে পারে।

(২) প্রতি বৎসরেই আগাছাতে ফলফুল জন্মিবার পূর্ব্বে তুলিয়া ফেলিলে আগাছা দমন করা যায়।

(৩) সেওড়া ভাটি প্রভৃতির বন কাটিয়া কোপাইয়া তাহাদের শিকড় তুলিয়া দিতে পারিলে তাহারা সমূলে বিনষ্ট হয় কিন্তু তাহার সুবিধা না হইলে তাহাদিগকে ক্রমাগত কাটিতে পারিলে তাহারা ক্রমশঃ তেজহীন হইয়া পড়ে এবং প্রতিবার ডাল পাতা গজাইবার সময় তাহাদের সঞ্চিত আহার ফুরাইয়া তাহাদিগকে মৃতকল্প করিয়া তুলে।

(৪) বীজ বপনের সময় সতর্ক হইতে হইবে যেন তাহাতে একটিও আগাছার বীজ না থাকে। যাহারা এরূপ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে সেই বীজ-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বীজ খরিদ করা কর্ত্তব্য।

(৫) শীতের পরই যদি জমিতে চাষ দেওয়া যায় তাহা হইলে জমির সমস্ত আগাছা বীজ ফুটিয়া উঠিতে পারে এবং তখন সেইগুলিকে নিড়াইয়া বা কোপাইয়া নষ্ট করা যায়।

(৬) যে সকল শস্য খুব ঘন জন্মায় যেমন পাট, ধঞ্চে, লুসার্ণ, ঘাসভুট্টা, ফাঁপর ঘাস, তাহারা আগাছা খুব নষ্ট করে। ক্ষেতের শস্য একবার বাড়িয়া গেলে আগাছা গুলি তাহার তলায় পড়িয়া নিশ্চয় প্রাণ হারায়।

(৭) যে সব ক্ষেতে আগাছা প্রচুর তথায় মূলজ খন্দের চাষই আবশ্যক কারণ মূলজ খন্দের জমি অনেকবার কোপান ও ওলটপালট করা হয় এই হেতু আগাছা দমিত হয়।

(৮) জমির আগাছা হাত দিয়া মাটি নরম থাকিতে থাকিতে তুলিয়া ফেলিতে পারিলে অনেক সুবিধা হয়।

(৯) জলা জমির আগাছা ড্রেণ কাটিয়া জল বাহির করিয়া জমি শুকাইতে পারিলে মরিয়া যায়।

(১০) আগাছা নষ্টকারী ঔষধ আছে তাহা কিন্তু ব্যয় সাপেক্ষ এবং সব আগাছা তাহাতে মরে না।

পত্রাদি

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়, চন্দনপুর, চন্দনপুর পোষ্ট, ভায়া গোবরডাঙ্গা।

মাননীয় কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সম্পাদক মহাশয়,

নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বহু অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আশা করি আপনার দেশবিখ্যাত পত্রে এগুলি প্রকাশিত হইলে একটা না একটা অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

(১) কলিকাতার প্রখ্যাত ডাক্তার ৺ জগবন্ধু বসু মহাশয় বলিতেন, কাঁচিলা জাতীয় এক প্রকার ঘাসের মূল সেবন করিলে বিজাতীয় যকৃতগ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করে। ঐ ঘাস নাকি পশ্চিম অঞ্চলে পাওয়া যায়। কাঁচিলা ঘাসের আকার কি প্রকার, ইহা বঙ্গদেশে পাওয়া যায় কি না, কোন সময় জন্মায়, ইহার বীজ কেহ দিতে পারেন কি না?

(২) চকৃমা নামে এক জাতীয় গাছ আছে। চকৃমা গাছের পাতা বাটিয়া যে কোন বেদনায় প্রলেপ দিলে বেদনা নিশ্চয়ই উপশম হয়। শুনিতে পাই এই গাছ মালদহ, রঙপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে পাওয়া যায়। চকৃমা গাছ বাঙ্গলার অন্য কোন স্থানে জন্মায় কি না? এই গাছের বীজ কেহ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন কি না? কৃষকে প্রকাশ করিলে বড়ই উপকৃত হইব।

(৩) শ্বেতকুঁচ উর্দ্ধশ্লেষ্মার উৎকৃষ্ট ঔষধ। এদেশে শ্বেতকুঁচ বিরল। ইহার বীজ বা চারা পাওয়া যায় কি না, কি ভাবে কোন মাটিতে কোন সময় লাগাইতে হয়?

[শ্বেত কুঁচ বীজ বা চারা পাওয়া সুকঠিন নহে। সময়মত পাওয়া যায়। বর্ষার সময় বীজ বপন করিলে চারা হয়। চারা তৈয়ারি করা কঠিন নহে। অন্য দুইটি উদ্ভিদ সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া যাইতেছে]　　কৃঃ সঃ

আমাদের আবেদন—তিন বৎসর গত হইতে চলিল ১৮৬ নং বউবাজার ষ্ট্রীটে বান্ধব লাইব্রেরি স্থাপিত হইয়াছে। ইতি মধ্যে উক্ত পাঠাগারে ৩০০০ হাজার বাঙ্গালা এবং ন্যূনাধিক ১০০০ ইংরাজি পুস্তক সংগৃহিত হইয়াছে। সহরের এই অংশের অনেক লোকে এমন কি অন্দরের স্ত্রীলোকগণও বিবিধ পুস্তক পাঠের সুযোগ পাইতেছেন। উক্ত পাঠাগারটি সুব্যবস্থায় চালাইতে হইলে ইহার নিজস্ব একটি বাটি এবং দশ হাজার টাকার মূলধন অন্ততঃ আবশ্যক এবং মাসিক ১০০ টাকা আয়ের

আবশ্যক। সাধারণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়। ইহার প্রবর্ত্তকগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল, পণ্ডিত নৃসিংহচরণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, বিদ্যারত্ন, ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক এম, এ, বি, এল, এম ডি। অধ্যাপক হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, (উকিল হাইকোর্ট) কবিরাজ দুর্গাদাস ভট্ট এম, এ, এম, আর, এ, এস, ; অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, পি, আর, এস, ; বাবু বিমলচন্দ্র দাস গুপ্ত উকিল হাইকোর্ট, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ দে এম, এ, বি, এস্‌সি ; বাবু প্রবোধকুমার দাস বিএল, উকিল এম, আই, আর, এস্।

[সাধারণতঃ আমাদের দেশের পাঠাগার গুলি তৃতীয় শ্রেণীর নভেল, নাটকে পূর্ণ। তাহা পাঠ করিয়া জনসাধারণের কোন জ্ঞানোন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায় না। যে সকল পাঠাগারে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন আছে আত্মোন্নতিমূলক বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহিত ও পঠিত হয় সেই সকল পাঠাগারই সাধারণের সহানুভূতি পাইবার উপযুক্ত। আজকাল কি চাষ আবাদ, কি ব্যবসা বাণিজ্য এমন কি গৃহস্থালীতেও বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। স্কুল কলেজ ব্যতীত সাধারণ পাঠাগারে যাহাতে ব্যবহারিক বিজ্ঞান চর্চ্চার সুবিধা হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিলে তবে আধুনিক পাঠাগারগুলি বর্ত্তমান যুগে নিজ নিজ সত্ত্বার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবে। প্রবর্ত্তকগণের নাম দেখিয়া বোধ হয় ইহা একটি উচ্চশ্রেণীর পাঠাগার হইবে।] কৃঃ সঃ

বানরের উপদ্রব—কলিকাতার সন্নিহিত ঘুঘুডাঙ্গা, পালপাড়া ও বনহুগলী নামক স্থানে বড়ই হনুমানের উৎপাত। তাহাদের উৎপাতে গাছে ফল থাকিতে পায় না, ক্ষেতের ফসলও রক্ষা করা দায়। খড়দা হইতে কোন পত্র প্রেরক ইক্ষুক্ষেতে বানরের উপদ্রবের কথা লিখিতেছেন। হিন্দুর দেশে আমরা এই রামানুচরদিগকে প্রাণে বধ করিতে বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ প্রকারে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হইলে চাষী কি প্রকারে বাঁচিবে এবং সাধারণের এই ক্ষতির প্রতিকারই বা কি? এই সকল দুষ্ট পশুগুলিকে প্রাণে না মারিয়া ভয় দেখাইতে ক্ষতি নাই। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে ইহারা ভয় করে না। গুলতির গুলির ভয় করে। হাওয়া বন্দুকে ছোট ছোট ছিটে মারিয়া ইহাদিগকে ভয় দেখাইলে সহজে বড় উপদ্রব করে না।

করাতের গুঁড়ায় পয়সা। ইউরোপ, আমেরিকার লোক সর্ব্বদাই ধুলামুটি হইতে সোণা ফলাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহারা দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই উৎসুক। এখানে কাঠের গুঁড়া পোড়ান, তাহার কয়লায় টীকা ও গুল প্রস্তুত, কাঁচের জিনিস প্রভৃতি রেল বা জাহাজে পাঠাইবার জন্য প্যাক করিতে ইহার

ব্যবহার ব্যতীত ইহার অন্য কোন ব্যবহার দেখা যায় না, কিন্তু আমেরিকায় কাঠের গুঁড়া হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। নরওয়েতে কাঠের গুড়া জমাইয়া তাহা জাহাজের খোলে বা মেজেতে লাগান হয়। যুদ্ধ জাহাজে গোলাগুলির আঘাতে অন্য প্রকার পলস্তারা ফাটিয়া চটিয়া যায় ইহার পলস্তারা ঠিক থাকে। তথায় হোটেলে, রান্নাঘরে ও সাধারণ সভা গৃহের মেজে নির্ম্মাণে ইহার বহুল ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

ভুট্টা বা রাই গুঁড়া করিবার কল আছে ভালরূপ গুঁড়াইয়া লইয়া থলে বোঝাই করিয়া জাহাজে পাঠান হয়। নানা কাজে লাগে বলিয়া ইহার দাম উক্ত দেশে প্রতি টন ৩ পাউণ্ড।

ভারতে ধানের জমির পরিমাণ—১৯১১-১২ সালে ধানের আবাদী জমির পরিমাণ সমগ্র ভারতে ৫,৬৪,৪৩,০০ একর। ইহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৫,৮৬,০০০ একর কম জমি ধানের আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কম। শতকরা ৬৬ ভাগ ধানের জমি বঙ্গদেশ ও আসামে অবস্থিত।

ভারত হইতে চা রপ্তানি—ইউরোপ, আমেরিকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা চা পান করিয়া থাকেন। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী প্রত্যেক লোকের জন্য গড়ে প্রায় ৪ পাউণ্ড চার প্রয়োজন। এই চা ইউরোপ ও আমেরিকায় জন্মে না। এসিয়া মহাদেশ হইতে প্রতি বৎসর ২৭ কোটি টাকার চা ইউরোপ এবং আমেরিকায় রপ্তানি হইয়া থাকে। সিংহল হইতে যে পরিমাণ চা রপ্তানি হয় তাহার মূল্য ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এতদ্ব্যতীত চীন, জাপান, যাভাদ্বীপ ও ফরমোসাদ্বীপ হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হয়।

সার-সংগ্রহ

ভারতে গোজাতির অবনতি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ইউরোপ দেশে গৃহপালিত অশ্বের দ্বারায় চাষের যে সাহায্য হয়, অস্মদ্দেশে বলদবৃন্দ দ্বারা সেই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে চাষের যাবতীয় কার্য্য) হলবহন, ভূমিকর্ষণ, শকটবহন, মোটবহন, ফৌজের ট্রাণস্পোর্ট বহন বলদের

দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। এই কারণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সামর্থ্যবান বলদ উৎপাদনে এত উৎসুক। পঞ্জাব প্রদেশ মধ্যে হিসাবের এবং মহীশূরের মধ্যে হান্সুরের পশুশালা ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ স্থল। হিউএন্‌সাংঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং আইন ই-আকবরী পাঠে আমরা অবগত হই যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে যুদ্ধবিগ্রহের অভিযানে গোজাতির সাহায্যে বহুতর কার্য্য অবাধে সাধিত হইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চাষের জন্য বলদের ব্যবহার সমগ্র ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কয়টি কারণ আছে। (১) অশ্ব (labour) শক্তি অপেক্ষা "গো শক্তি" আমাদের দেশে সস্তা। (২) আমাদের দেশের মাটী বাষ্পশক্তির সাহায্যে কর্ষণোপযোগী নহে। (৩) বলদের মূল্য অস্মদ্দেশে অশ্ব অপেক্ষা বহু সস্তা ও উহা অনায়াসলভ্য।

ঘি, মাখন, ননী, ছানা, ক্ষীর, ছানার জল আমাদিগের প্রধান খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য বলিয়া, গোপালন আমাদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম। পুরাকাল হইতে অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ হইতে, হিউএনসাংঙের সময় ও আইন-ই-আকবরীর সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ গোপালনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের অনাস্থাযুক্ত পালনে গোজাতির সমধিক অবনতি ঘটিয়াছে। গোপালনের দিকে আমাদিগের সমধিক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যেহেতু ভারত কৃষিপ্রধান দেশ।

এখন একটী জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ বিলাতী গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা ভাল না মন্দ এবং কোন জাতীয় গাভী অধিক দুগ্ধবতী? সম্যক্ আলোচনা করিয়া এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য ভারতবর্ষের অনেক স্থানের ক্ষুদ্র জাতীয় গাভীকুল স্বল্প দুগ্ধবতী হইলেও এই বিশাল প্রদেশে অধিক দুগ্ধবতী গাভী আছে। এদেশে এখনও সুরভিনন্দিনীর বংশজাতগণ আছে যাহারা জার্সি; ডিভনশায়ার, গার্ণসি, হোলষ্টিন বা সুইস গাভিকুলের দুগ্ধদানের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে। নেলোর, কাথিয়াবাড়, মণ্টগোমেরী, হিসার, ঝান্সির পগেয়া গাভী যত্নে লালিত পালিত হইলে পাশ্চাত্য গাভীকুলের দর্পচূর্ণ করিতে সমর্থ। কেহ কেহ বলেন যে,—ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ বিলাতী গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা গুণে অনেক হীন — দুধে মাঠা কম, মাখন কম। তাঁহাদের কথায়, The milk of the Indian cows is too poor in quality to be of any use for large dairy purposes. ইহা সম্পূর্ণ ভুল। গাভীর দুগ্ধ, যত্ন, খাওয়ানর উপর এবং উত্তম বলদের উপর নির্ভর করে। শেষ বিষয়ে দুই এক কথা এই খানে বলা আবশ্যক। একটি কম দুগ্ধবতী ক্ষুদ্র জাতীয় অপরটি বেশী দুগ্ধবতী ভারতীয় গাভীর কথা ধরুন। প্রথমটিকে একটি হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড় দ্বারা এবং দ্বিতীয়টিকে অপেক্ষাকৃত কৃশ ষাঁড় দ্বারা সন্তান উৎপাদন করুন। কি ফল

হইবে তাহা দেখুন। গবর্ণমেণ্ট ফারমে এবং আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাক্ষেত্রে একরূপই ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথমটির বৎস মাতা অপেক্ষা বলিষ্ঠ, বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে; যেহেতু বড় fœtusটি ধরাইবার জন্য জরায়ুটিকে অপেক্ষাকৃত বড় আকার ধারণ করিতে হইয়াছে এবং ফলে যথাকালে বলিষ্ঠ বৎস প্রসব করিয়াছে। দ্বিতীয়টির বৎস যদিও ষাঁড়ের মত বড় হয় নাই, কিন্তু মাতা অপেক্ষা বড় হইলেও হীনবল হইয়াছে। বড় Ovary ভাসিয়া থাকায় fœtusটি সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিলাভ করে নাই বলিয়া ছানাটি হীনবল হইয়াছে। সেইজন্য তেজস্কর উত্তম জাতীয়, লক্ষণাপন্ন ও বলিষ্ঠ দেখিয়া ষাঁড় দ্বারা সন্তান উৎপাদন করান উচিত। যে গাভী গরম হয় না বা জল বায়ুর প্রভাবে ঋতুমতী হয় না, তাহাকে মাঠে চরিতে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমার সময়ে শ্বেত কুঁচ ও কুক্কুট অণ্ডের কুসুমটি দুই এক বার ১৫ দিবস ব্যতিক্রমে খাওয়ান কর্ত্তব্য। গাভী ঋতুমতী হইলে তাহার কয়েকটি লক্ষণ পরিদর্শিত হয়—বাঁটগুলি লালবর্ণ ধারণ করে, গাভী মুহুর্মুহু ডাকিতে থাকে, ছট ফট করিতে থাকে, ঘন ঘন মলমূত্র ত্যাগ করিতে থাকে, লেজটি সোজা অবস্থায় পড়িয়া থাকে না। ইত্যাদি আরও অনেক লক্ষণ আছে, যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের Agricultural Chemist ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ সম্বন্ধে ১৯০৫-৬ সালের রিপোর্টে কি বলিয়াছেন, তাহা দেখুন :—The Indian Cow's milk is not poorer than, but as rich as that of the European Cow's milk in butter fat. Dr. Walter Leather তাঁহার রিপোর্টে ১৯নং Agricultural Ledgerএ ১৯০০ সালে নিম্নলিখিত ফল দেখাইয়াছেন :—

			Protœids	Laclosse	Mineral.
1	Poona	6.2.99	4.60	4.43	0.97
2	,,	28.299	4.625	6.36	1.015
3	Saidapet	29.3.00	4.33	6.125	1.045
4	,,	4.4.00	4.355	6.235	1.02
5	,,	7.4.00	4.37	66.55	0.975

ভারত জাত গাভীদুগ্ধে ৪-৬ p. c. মাখন বা ঘৃত (butter fat), protœids (কেশীন ও এলবুমেন) ৩.১—৩.৫ per cent, Laclose (চিনি 4.4-5. p.c. এবং mineral ৭-৮ p. c. বিলাতী গাভী দুগ্ধের মত থাকে। গোদুগ্ধের উপর আমাদিগের জীবন ধারণ নির্ভর করে। সেইজন্য ইহা যতই টাট্কা (fresh) এবং বিশুদ্ধ ব্যবহৃত হয়, ততই মনুষ্য জীবনের হিতকর। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেইজন্য বলিয়াছেন "The cow is a chemical laboratory in which continued chemical changes are going on." গোময় ও গো-মূত্রের বিশ্লেষণ

দ্বারা যাহা ডাঃ লেদার ১৮০০ সালে পাইয়াছেন, তাহা দেখিলে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে যে, আমাদের চাষাগণ কিরূপ সার নষ্ট করিয়া থাকে। সারের জন্য গোমূত্রের ব্যবহার আমাদের দেশে প্রায় দৃষ্ট হয় না। গোহাড়ে সার হয়। ইহার ব্যবহার আমাদের দেশে চাবাগানে ছাড়া অপর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। গোজাতি কি জীবিত কি মৃত উভয় অবস্থায় আমাদিগের উপকার করে। গোহাড় ছুরির বাঁট ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে হস্তিদন্তের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাড় পোড়াইয়া তদ্দারা রূপা পরিস্কৃত করা হয় এবং গুঁড়াইয়া, পোড়াইয়া, এবং পচাইয়া সারের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। গুঁড়া হাড় সলফিউরিক এসিডে কিম্বা কষ্টিক পটাসে গলাইয়া সারার্থে অবাধে ব্যবহৃত হইতে পারে। হাড়ে শতকরা ৫৫ p. c. ফস্‌ফেটঅব-লাইম এবং মেগনিসিয়া আছে। বৃদ্ধ গরুর হাড় অধিকতর উপকারী।

গো চর্ম্ম আমাদের দেশে জুতা, গাড়ির সাজ, ব্যাগ, পোর্টমেণ্টো, মৃদঙ্গ, ঢোলাদি বাদ্যযন্ত্র ছাওয়ান, এবং শত শত আবশ্যক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যত গোবধ হয়, এরূপ আর কোন দেশেই প্রায় হয় না। সেইজন্য ভারতবর্ষ চামড়ার জন্য বিখ্যাত। অল্পদিনের মধ্যে শত শত মুসলমান চর্ম্ম ব্যবসা করিয়া ধনকুবের হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। হিন্দুগণ এ ব্যবসা করেন না। ইহা হিন্দুর ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ত্যজ্য। কিন্তু আজকাল মুখুয্যে, চাটুয্যে ও কত বন্দ ঘটী, ফুলের মুখটী সন্তান জুতার দোকান করিয়া স্বীয় পদমর্য্যাদা মস্তকহীন হিন্দু সমাজে অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিয়াছেন।

লোম হইতে গদি, জিন, কুসান ইত্যাদি প্রস্তুত হয়, শিং হইতে ছুরির বাঁট, চিরুণী ইত্যাদি তৈয়ারি হয়, গোপদ হইতে নীটস ফুট অয়েল চোলাই হয়। ইহাতে চর্ম্ম নরম এবং মসৃণ থাকে। খুর, হাড়, চর্ম্ম হইতে শিরিষ প্রস্তুত হয়। গোরক্তে চিনি পরিস্কৃত হয়, সার হয় এবং শিং রক্ত এবং খুরে রঙ্গ তৈয়ার হয়। গো-চর্ব্বিতে সাবান, এবং বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গোজাতি অশেষ প্রকারে আমাদিগের উপকার করিতেছে।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, উকিল হাইকোর্ট, কলিকাতা।

বনের আবশ্যকতা

বন দেখিলে স্বতঃই আমরা ভয় পাই। বন, ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাস-ভূমি ও ম্যালেরিয়ার আকর, কিন্তু এসকল সত্ত্বেও বন উপেক্ষণীয় নহে। বন না থাকিলে দেশের বায়ুমণ্ডল নীরস হয়, পৃথিবীতে বারিপাতের অভাব হয়, তন্নিবন্ধন কৃষিকার্য্যের সমূহ ক্ষতি হয়। ভারতের ন্যায় দেবমাতৃক ভূখণ্ডে সমূহ পরিমাণে বারিপাত না হইলে চাষ আবাদ করা সুদূরপরাহত ব্যাপার হইয়া পড়ে। যে দেশে বিস্তীর্ণ বন-ভূমির অভাব, সে দেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না, কিম্বা যদিও হয় তাহা অতি সামান্য এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া চাষ আবাদ করতঃ দেশের অভাব বিমোচন করা অসম্ভব।

বনময় দেশে নানা জাতীয় হিংস্রক জন্তু বাস করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে সকল উপায় আছে, তৎসমুদায় মানুষের করায়ত্ত। আর ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ যে মানুষের চেষ্টায় দূর করিতে পারা যায় না, এমন কোন কথা নাই। ম্যালেরিয়া বা অন্য কোন রোগ বনের অস্তিত্ব হেতু উৎপন্ন হইলেও, বনবিনাশের পক্ষপাতী আমরা নহি, কারণ বনের অস্তিত্বহেতু বায়ুমণ্ডল সিক্ত থাকে, এবং তাহারই ফলে বৃষ্টি হইয়া থাকে। যে দেশে যত অধিক পরিমাণে বন আছে, সে দেশে তত অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইয়া থাকে। দেশে জঙ্গল থাকিলে বারিপাত হয়, এবং তাহা সংসারের উপকারের জন্যই হইয়া থাকে। বনভূমি বা গাছী (Forest) হইতে কি উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইল ;—

(১) বনভূমি হইতে নানাবিধ বাহাদুরী কাষ্ঠ (timber,) জ্বালানি কাষ্ঠ ও সংসারের ব্যবহারোপযোগী বহু প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(২) বন-ভূমির সংরক্ষণার্থ জন-মজুরের প্রয়োজন হয়, বন-জাত নানাবিধ পদার্থকে সাংসারিক কার্য্যের উপযোগী করিবার জন্যও বহু শিল্পী জন-সমূহের আবশ্যক হয়। এতন্নিবন্ধন বহুলোকের অন্নের সংস্থান হয়, মহাজনগণের অর্থাগমের একটী বিশিষ্ট পথ প্রসারিত হয়, ফলতঃ দেশের শিল্প বাণিজ্যের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

(৩) বন-জাত দ্রব্যের ব্যবসায়কল্পে মহাজনের অর্থ পরিচালিত হয়, এবং অর্থ বৃদ্ধি হয়।

(৪) বনভূমির অস্তিত্বে স্থানীয় বায়ুমণ্ডল ও ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ (temperature), অনেক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এবং স্থানীয় আব-হাওয়া (climate) সমভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

(৫) বনভূমির বায়ুমণ্ডলে শৈত্যের বৃদ্ধি হয়, এবং ভূমির রস সমধিক পরিমাণে শুষ্ক হইতে পায় না।

(৬) বন-ভূমির অস্তিত্বহেতু বারিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না।

(৭) বন-ভূমিতে বহু পরিমাণে বৃষ্টির জল পরিশোষিত হয়, এবং সেই জল ক্রমে ক্রমে নিঃসারিত হইয়া নদীসমূহকে বারোমাস অল্পাধিক পূর্ণ রাখে, এতদ্ব্যতীত সহসা জলপ্লাবনের আশঙ্কা থাকে না।

(৮) বন ভূমির অস্তিত্ব হেতু বালুকারাশি বিধৌত হইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং নদীসমূহে সহজে চর উৎপন্ন হইতে পায় না; ভূ-পৃষ্ঠের বিক্ষোভ হয় না এবং ভূমি নিমজ্জিত হইতে পারে না।

(৯) বন-ভূমি বায়ুপ্রবাহের দ্রুততাকে (velocity) নিয়ন্ত্রিত করে, সন্নিকটস্থ গ্রাম নগর ও ক্ষেত-পাথারকে প্রবল এবং অসহনীয় শীতল ও উষ্ণ বাতাস হইতে রক্ষা করে, গৃহপালিত পশুদিগকে চারণ স্থান ও আশ্রয় প্রদান করে।

(১০) বন-ভূমির দ্বারা অম্লজান (oxygen) ও ওজোন * (ozone) নামক বাষ্পীয় পদার্থের উদ্ভবের সহায়তা হয়।

বন-ভূমির দ্বারা যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার উল্লেখ করা গেল। এক্ষণে উক্ত দশটী বিষয়কে স্বতন্ত্র ও বিশদভাবে আলোচনা করিব।

ডাক্তার ক্রুম্বি ব্রাউন স্বকৃত পুস্তকে স্পষ্টই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অনেক স্থলে বনভূমির উচ্ছেদ সাধিত হওয়ায় অনাবৃষ্টির আবির্ভাব হইয়াছে এবং সেই সকল স্থানে ও অপরাপর অনেক বনভূমিশূন্য স্থানে বনভূমির সৃষ্টি হওয়ায় বারিপাতের সূত্রপাত হইয়াছে। † মরিচ-সহরের উল্লেখ কালে তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত দ্বীপটী আমাদিগের অধিকারে আসিলে, দেখা যায় যে উহার পর্ব্বতমালা ও তাহার সন্নিহিত স্থান সমূহ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এই মনোরম্য দ্বীপের অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাকীর্ণাবস্থায় থাকে। সাহেবদিগের তাহা ভাল লাগে নাই, ফলতঃ সেই জঙ্গল কর্ত্তিত হইতে থাকে। এইরূপে জঙ্গল যত হ্রাস পাইতে লাগিল, স্থানীয় বারিপাতও তত হ্রাস হইতে লাগিল, বায়ুমণ্ডলের সিক্ততা নষ্ট হইয়া তৎপরিবর্ত্তে দিন দিন উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, নির্ঝরিণী সমূহে বারির অভাব হইতে লাগিল। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ আব-হাওয়া পরিবর্ত্তনের ও নির্ঝরিণী সমূহের জলাভাবের কারণ অনতিকাল মধ্যেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। অতঃপর সেই দ্বীপের পূর্ব্বাবস্থা আনয়ন করিবার জন্য পুনরায় বৃক্ষ রোপিত হইতে লাগিল এবং নদী ও নির্ঝরিণীগণ পূর্ব্ববৎ জলপূর্ণ হইয়া উঠিল,—বারিপাত বৃদ্ধি পাইল।

---

* বায়ুমণ্ডলিক অম্লজান বৈদ্যুতিক ক্রিয়াবশে প্রকারান্তরিত হয়। ঈদৃশ অবস্থাপন্ন অম্লজানের নাম 'ওজোন'। উক্তরূপ পরিবর্ত্তনকালে 'ওজোন'-বাষ্পে এক প্রকার গন্ধের সমাবেশ হয়।

† Dr. J. Croumbie Brown's Forests and Moisture.

মরিসস্ দ্বীপের কথা ছাড়িয়া দিই। বিগত পঁচিশ কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের আব-হাওয়া কিরূপ ছিল, বারিপাতের পরিমাণ কত অধিক ছিল, নদীকূল কত বেগবতী ও জলপূর্ণ ছিল, আর এক্ষণেই বা কি হইয়াছে তাহা প্রাচীন ব্যক্তিগণের স্মরণ আছে। এইরূপ পরিবর্ত্তন হেতু বাঙ্গালার বারিপাত কমিয়াছে, ফলে নানাবিধ রোগের আবির্ভাব হইয়াছে, পূর্ব্বতন রোগসমূহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বারির অল্পতা হেতু ধরিত্রীর উৎপাদিনী শক্তির হ্রাস প্রাপ্তি হইতেছে। সুবিস্তীর্ণ সুন্দরবন (যাহা সচরাচর সোঁদর-বন নামে অভিহিত) দিন দিন যত বৃক্ষহীন হইতেছে বাঙ্গালা-দেশের জল-বায়ুর ততই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। পঞ্চনদ, যুক্ত প্রদেশ ও বিহার অপেক্ষা বঙ্গদেশে এখনও অধিক বারিপাত হইয়া থাকে। আবার বাঙ্গালা হইতে যত আসামের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, তত বারিপাতের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাই। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা দারজিলিঙ গিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, সে সময়ে তথায় কত অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইত, কিন্তু এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃষ্টির পরিমাণের লাঘব হইয়াছে। প্রায় একুশ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম দারজিলিঙ গিয়াছিলাম, তখন তথাকার অধিক দিনের প্রবাসীগণের নিকট শুনিয়াছিলাম যে পূর্ব্বাপেক্ষা বারিপাত কমিয়া গিয়াছে, এক্ষণে যে আরও কমিতেছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই, তবে গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগ দ্বারা কর্ত্তিত বৃক্ষ সকলের স্থানে নূতন বৃক্ষ রোপিত হওয়ায় আপততঃ আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন তত বুঝা যায় না। আট নয় বৎসরের কথা হইল, আমি আসামের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত মার্গেরিটায় গমন করি। সে স্থান বিপুল জঙ্গলময়। আমি তথায় যে দুই এক মাস ছিলাম তাহার মধ্যে এমন একটী দিনের কথা মনে হয় না, যে দিন সেখানে বৃষ্টি হয় নাই। প্রসঙ্গক্রমে এক দিন কয়েকটী বন্ধুর সহিত এই বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। ইঁহাদিগের মধ্যে এক জন তথায় বাস করিতেছেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব্বে তাহা অপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হইত, এবং ক্রমে বন-জঙ্গল কর্ত্তিত হইয়া সহরের যত আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে ও যত চা-বাগানের সৃষ্টি হইতেছে, ততই বারিপাত হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। এইরূপে অনেক স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বারিপাত কমিয়া যাওয়া দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। অনেকেই অনুযোগ করিয়া থাকেন যে, দেশের উৎপাদিনী শক্তির হ্রাস হইতেছে এবং তাঁহারা ইহার কারণ প্রদর্শন করেন এই যে, অবিশ্রান্ত ভাবে বহুকাল যাবৎ আবাদ হওয়ায় এরূপ ঘটিতেছে। একথাটি যে একবারেই অমূলক তাহা নহে, তবে তাঁহারা যে কারণ টুকু প্রদর্শন করেন তাহাই প্রথম ও শেষ নহে। ইহাপেক্ষা গুরুতর কারণ বারিপাতের অল্পতা, ও আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন। জমিতে যতই দীর্ঘকাল

আবাদ করা যাউক বারিপাতের অভাব না হইলে জমি কখনই একবারে নিঃস্ব হইতে পারে না।

বারিপাতে যে কেবল মৃত্তিকা সরস হয় ও বায়ুমণ্ডলের সিক্ততা বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে উহা সারের কার্য্য করে, এই জন্য যে দেশের বারিপাত অধিক সে দেশের ক্ষেত্রসমূহ সুবর্ণপ্রসবিনী শস্যশালিনী। আকাশের জল মাত্রেই সার-সংযুক্ত, সুতরাং সে জলে উদ্ভিদের যত উপকার দর্শিয়া থাকে, নদী বা খাল বিলের জলে তাহা হয় না। তাহা ব্যতীত আকাশের জলে ভূমি যেরূপ সমভাবে ও সুচারুরূপে সিক্ত হইয়া থাকে এমন আর কিছুতে হয় না।

ভারতের সাধারণ মাটি নিঃস্ব হইতে পারে না ইহাই আমার দৃঢ় ধারণা। মৃত্তিকা সারে পরিপূর্ণ আছে কিন্তু অনেক সময়ে নানা কারণে তাহা উদ্ভিদের কাজে আসে না। প্রবন্ধান্তরে এবিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে। (সঙ্কলিত)

ভারতের আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত সার

এবারেও এইরূপ কৌশলেই মাননীয় স্যার গায়ফ্লীটউড উইলসন মহোদয় রাজকোষে ৪ কোটী ১২॥০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত দেখাইয়া আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে অনুমান করিয়াছেন যে ভারত সাম্রাজ্যের আয় আলোচ্য বর্ষে প্রায় ১১৭ কোটী টাকা হইবে এবং ব্যয় ১১৮॥০ কোটী টাকা হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ১২২ কোটীতে ও ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়া ১১৮ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে। কাজেই ফাজিল জমা বা উদ্বৃত্ত হিসাবে অর্থসচিব মহাশয় ৪ কোটী ১২॥০ লক্ষ টাকা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

যে সকল কারণে গবর্ণমেণ্টের আয় বাড়িয়াছে, তাহার মধ্যে পূর্ব্বানুমান অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ও অধিক মূল্যে অহিফেন বিক্রয়ই প্রধান। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, গত বর্ষে বজেট বা আনুমানিক আয় ব্যয় নির্দ্দেশকালে অর্থসচিব মহাশয় যখন অহিফেনের মূল্য অতীব অল্পহারে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তখন বোম্বাই প্রদেশের অন্যতম সদস্য স্যার সাসুন ডেবিড মহোদয় বলিয়াছিলেন, "অর্থসচিব মহাশয় যে মূল্যে অহিফেন বিক্রয় হইবে বলিয়াছেন, তদপেক্ষা উচ্চতর মূল্যে সমস্ত সরকারী অহিফেন আমি অদ্যই কিনিয়া লইতে প্রস্তুত আছি।" পাঠক দেখিবেন এতদিন পরে স্যার সাসুন ডেবিড মহোদয়েরই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইয়াছে। অধিক মূল্যে ও অধিক পরিমাণে অহিফেন বিক্রয় হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের আয়ের অঙ্কে ২ কোটী ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অতিরিক্ত অর্থের যেরূপ সদ্ব্যবহার করিতে গবর্ণমেণ্ট কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তাহা এই—

অস্থায়ী স্বর্ণঋণ শোধ	প্রায়	১,৮০,৫৫,০০০৲
প্রাদেশিক স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে	„	৫০,০০,০০০৲
কৃষিবিষয়ক উন্নতি সাধনে	„	২০,০০,০০০৲
স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক গবেষণাসমিতি স্থাপনে	„	৬০,০০০৲
কলিকাতায় বিশিষ্ট চিকিৎসা বিদ্যালয়	„	৫,০০,০০০৲
ব্রহ্মদেশে ও বোম্বায়ে টল্যাবোরেরি স্থাপনে	„	৪,০০,০০০৲
মোট		২,৬০,১৫,০০০৲

তারপর অন্যান্য রাজস্বের কথা। গত বৎসর অনেক স্থলেই কৃষির অবস্থা তেমন ভাল ছিল না বলিয়া সরকারের ভূমি-রাজস্বের আয় অনুমানের অপেক্ষা ১ কোটী ৪৪ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে।

আমাদের দেশের বহির্ব্বাণিজ্য বা আমদানি রপ্তানির পরিমাণ এবার খুব বাড়িয়াছিল। কাজেই শুল্কবিভাগের আয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। আবকারী বিভাগের আয় ৫৮ লক্ষ টাকারও অধিক বাড়িয়াছে। লবণ বিভাগের আয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। আবকারী বিভাগের আয় ৫৮ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। লবণ বিভাগের আয় বহুদিন পরে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষ্ট্যাম্পের আয় পূর্ব্বানুমান অপেক্ষাও গতপূর্ব্ব বর্ষেরও অপেক্ষা কিছু কমিয়াছে। টাঁকশালের আয় ২১ লক্ষ ৩৭৷৷০ হাজার টাকা বাড়িয়াছে। কিন্তু রেলের আয় যেমন বাড়িয়াছে, তেমন আর কিছুরই বাড়ে নাই। কারণ, রেলের জন্য গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত বহু কোটী মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন। দেশে রেল পথের বিস্তারও অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই রেলে মাল প্রেরণের পরিমাণ ও যাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। তাই অর্থসচিব মহাশয়ের অনুমান অপেক্ষা এবার রেলে ১ কোটী ১৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল আয়েও গবর্ণমেণ্টের মোটের উপর ২ কোটী ৭০ লক্ষ টাকা অধিকতর আয় হইয়াছে।

এই অতিরিক্ত আয়ের অর্থ যেরূপে ব্যয়িত হইয়াছে ও হইবে, তাহার তপশিল এই :—

বঙ্গদেশ ও আসামপ্রদেশের পুনর্গঠন	১,১৭,৩০,০০০৲
রাজকর্ম্মচারীদিগকে অর্দ্ধমাসের বেতন পুরস্কার দানে	৩১,৮০,০০০৲
কাঠিয়াওয়াড়ের দুর্ভিক্ষঋণ মোচনে	১০,৮০,০০০৲
মান্দ্রাজে জল ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থায়	২৫,০৫,০০০৲
ব্রহ্মদেশে পথঘাট প্রভৃতির উন্নতি বিধানে	১৯,৯৫,০০০৲
আবুর যুদ্ধের ব্যয়ে	৮,৭০,০০০৲

* ইহার মধ্যে প্রথম দফায় যে ১ কোটী ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার উল্লেখ আছে, তাহা নূতন বঙ্গ, আসাম এবং বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গঠনে ও শাসন-কার্য্যারম্ভে ব্যয়িত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অর্থ সচিব মহাশয় ব্যয়ের অঙ্ক আনুমানিক আয়ের অপেক্ষা অধিক ধরিয়া গত বৎসর বজেট প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার অনুমান অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ মোটের উপর ১°কোটী ২৬ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা কম হইয়াছে। কিন্তু উহার মধ্যে ৩৩৸৹ লক্ষ টাকা যেরূপভাবে কম খরচ হইয়াছে, তাহা আমরা নিতান্তই দোষাবহ বলিয়া মনে করি। গত বৎসর দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যোন্নতির ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা যে টাকা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, তাহার সমস্ত তাঁহারা ঐ দুই শুভ কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন নাই। কাজেই ঐ দুই বিভাগের ব্যয় হিসাবে ঐ ৩৩৸৹ লক্ষ টাকা কম খরচ হইয়াছে। ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়। সেইরূপ দুর্ভিক্ষ নিবারণ কল্পে খাল কাটাইবার জন্য যে টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল, তাহা হইতেও ১৮ লক্ষ টাকা বাঁচান হইয়াছে, ইহাও সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। অথচ সামরিক বিভাগে পূর্ব্বানুমানের অপেক্ষা ১৫ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় করিতে রাজপুরুষদিগের কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ হয় নাই।

অহিফেনের চাষ কম হওয়ায় গত বর্ষে ঐ বিভাগের ব্যয় প্রায় ৬৬৸৹ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। দিল্লী দরবার উপলক্ষে ১॥৹ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া পূর্ব্বে অনুমান করা গিয়াছিল; কিন্তু ঐ ব্যাপারে ১ কোটী ১৫ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হয় নাই। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের দিল্লী দরবার উপলক্ষে কত ব্যয় হইবে, পূর্ব্বে তাহার কোনও অনুমান করিতে পারা যায় নাই। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদিগের ব্যয়ের পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬৸৹ লক্ষ টাকা হইয়াছে তাহা হইলেই রাজসমাগম উপলক্ষে রাজকোষ হইতে সর্ব্বশুদ্ধ ১ কোটী ৫১॥৹ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। তদ্ভিন্ন শাসন ও সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে অর্দ্ধ মাসের বেতন দানের জন্য প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা ও কয়েকজন দেশীয় নরপতির ঋণমোচন ব্যাপারে প্রায় ১২৸৹ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে।

নববর্ষের আয়-ব্যয়।

এইরূপে সালতামামী হিসাব দাখিল করিয়া অর্থ সচিব মহাশয় আগামী ১৯১২-১৩ সালের আয় ব্যয়ের একটা আনুমানিক খসড়া সভার সমক্ষে উপস্থিত করেন। তাঁহার মতে আগামী বর্ষে ভারত সাম্রাজ্যের—

মোট আয়	...	...	১১৮,৯৫,৯৬,০০০৲
মোট ব্যয়	...	...	১১৬,৬৯,২২,০০০৲
জমা	...		২,২৬,৭৪.০০০৲ টাকা

হইবে। প্রায় সকলবিভাগেই ব্যয় সঙ্কোচের যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে অর্থসচিব মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের শেষেও অনুন ২।৹ কোটী টাকা রাজকোষে উদ্বৃত্ত

দেখাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছেন। বিশেষতঃ এবার সামরিক বিভাগের ব্যয় প্রায় ১৬৸০ লক্ষ টাকা কম পড়িবার সম্ভাবনা আছে। গত বারের দিল্লী দরবারের খরচটিও এবার আর পড়িবে না। ফলে শিক্ষার বিস্তার ও দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি কল্পে অধিক অর্থ ব্যয় করিবার গবর্ণমেন্টের সুবিধা হইবে।

দিল্লী দরবারের সময়ে স্থির হইয়াছিল যে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার-কল্পে প্রতি বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত ব্যয় করিবেন। এক্ষণে রাজকোষের সচ্ছল অবস্থা দেখিয়া গবর্ণমেন্ট ঐ অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া ৬০ লক্ষ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান বর্ষে আরও ৬৫ লক্ষ টাকা শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি বিধান-কল্পে অতিরিক্ত ব্যয়িত হইবে। অর্থাৎ সাধারণ নিয়মিত ব্যয়ের উপর এই ১।০ কোটী টাকা শিক্ষার জন্য অধিক ব্যয় করা হইবে। ইহা অবশ্যই সুখের বিষয়। স্বাস্থ্যোন্নতি বিভাগের জন্য গবর্ণমেণ্ট এবার মোট ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ঐ টাকা স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্ম্মচারী-দিগের বেতন ও সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়েই ব্যয় হইবে। তদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ অঞ্চলের একটা গ্রাম্যকর রহিত করিয়া তত্রত্য প্রকৃতিপুঞ্জকে বার্ষিক ২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকার দায়ে অব্যাহতি দান করা হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষে দিল্লী নগরীর নির্ম্মাণের জন্য গবর্ণমেণ্ট তিনকোটী ঋণ গ্রহণ করিবেন এবং আগামী বর্ষের উদ্বৃত্ত রাজস্ব হইতে এক কোটী টাকা দিল্লীর জন্য ব্যয় করিবেন। তদ্ভিন্ন রেলপথ বিস্তারের জন্য অন্যান্য বর্ষের ন্যায় এবারেও প্রায় ১২ কোটী টাকা ধার করা হইবে স্থির হইয়াছে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে মোটের উপর শিক্ষা বিভাগের জন্য গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ২ কোটী ৫৫৸০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন, এখন বৎসরে ৪ কোটী ৫৬॥০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। স্বাস্থ্য বিভাগেরও ব্যয় গত তিন বৎসরে ১ কোটী ৬৫।০ লক্ষ টাকা হইতে ৩ কোটী ৫২॥০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। অর্থ সচিব মহাশয় বলিয়াছেন যে, এই দুই বিষয়ে দিন দিন ব্যয় বৃদ্ধি করা বড়লাট বাহাদুরের বাসনা। এই সংবাদে সকলেই সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ভাদ্র মাস।

কৃষি-ক্ষেত্র।—যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সার মিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপি বীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতা'র মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতিপূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত হোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুণ চাষী খেঁতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর ৬।৮ ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে, তাহাতেও এই সময় উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীতকালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩ ৪ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজগুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না।

ওল ও মানকচু এই তুলিবার সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে এই মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery) এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান।—লিচু, লেবু প্রভৃতি ফলগাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখনও চলিতেছে।

বীজ নারিকেল, হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগকে গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

ফুলের বাগান।—বালসম (Balsam) জিনিয়া (Zinnia) কনভলভিউলাস মেজর (Convolvulus Major) আইপোমিয়া (Ipomœa) প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ার করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিত, কারণ সেগুলির বর্ষাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্সী, এষ্টার, মিগ্নোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।
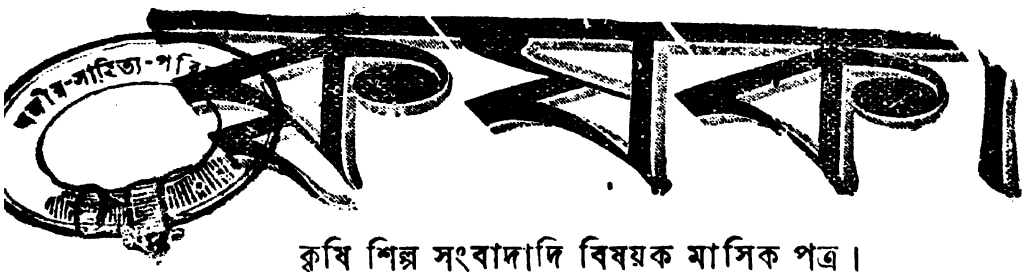
১৩শ খণ্ড। | ভাদ্র, ১৩১৯ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

ব্রহ্মদেশে চাষ-বাস

(কৃষকের জন্য লিখিত)

আজ প্রায় আট বৎসর হইতে চলিল এই দেশে কার্য্য উপলক্ষে অবস্থান করিয়া কুড়িটী জেলা এবং সহস্রাধিক গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া আমি আমার অভিজ্ঞতার ফল লিপিবদ্ধ করিতেছি। যদি কেহ ইহা পাঠ করিয়া এদেশে চাষ-বাস করিতে যত্নবান হয়েন ও অন্যান্য সংবাদ জানিতে ইচ্ছুক হ'ন তাহা হইলে আমাকে নিম্ন-লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে সাদরে উত্তর দিব।

এদেশে অল্প জঙ্গল বিশিষ্ট অনাবাদী জমি যথেষ্ট পরিমাণে পড়িয়া আছে, সামান্য কষ্ট স্বীকার করিয়া গভর্ণমেণ্ট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে হয়। প্রথম কয়েক বৎসর জমির খাজনা লাগে না, পরে অতি সামান্যহারে দিতে হয়। এদেশের জমি অতীব উর্ব্বরা এবং অল্প পরিশ্রমে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। জমি পছন্দ করিতে হইলে, এই সময় আসিয়া দেখিলে ভাল হয়, কারণ বর্ষার সময় কোন স্থানে জল জমে ও কোথা দিয়া বাহির হইয়া যায়, এ সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা যায়। এদেশে ধান্য ও রবিশস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ফলের বাগান করিতে পারিলে একটী নির্দ্দিষ্ট আয়ের সম্পত্তি হয়—এখানে ফলের বাগান একখানি জমিদারী বিশেষ। যদি উৎসাহী যুবকগণ সামান্য চাকরীর জন্য লালায়িত না হইয়া এ বিষয়ে মনযোগী হ'ন, তাহা হইলে বিশেষ সুখের কারণ হয়।

কয়েক দিবস গত হইল জনৈক বিলাতী এসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার আমাকে একটী ফলের বাগানের এষ্টিমেট তৈয়ারী করিয়া দিতে বলায়, আমি তাঁহাকে যে এষ্টিমেট দিয়াছি নিম্নে তাহার নকল দিলাম। তবে এস্থানে বলা আবশ্যক যে এই এষ্টিমেট সাহেবী ধরণের করা হয়, সেইজন্য ইহাতে খরচ অধিক ধরা হইয়াছে, কিন্তু আমরা নিজে করিলে ইহার অর্দ্ধেক ব্যয়ে হইতে পারে।

একশত একার জমিতে ফলের বাগান করিবার হিসাব।

ব্যয়।	সংখ্যা	রেট	টাকা
জমি লইবার জন্য সার্ভে ফিঃ ইত্যাদি ...	১০০ একার	১৲	১০০৲
জঙ্গল পরিষ্কার ও গাছের গুঁড়ি উত্তোলন ...	,, ,,	২০৲	২০০০৲
জঙ্গলী বেড়া	,, ,,	১০৲	১০০০৲
(১) উৎকৃষ্ট কলার গাছ প্রতি একারে ২৪০		প্রতি শত	
∴ ২৪০ × ১০০ ...	২৪০০০	২০৲	৪৮০০৲
(২) নারিকেল গাছ ,, ,, ৭০			
∴ ৭০ × ১০০ ...	৭০০০	৩০৲	২১০০৲
(৩) বাগানের চতুষ্পার্শ্বে ঘন সারি সুপারি গাছ...	২২৪০	২৲	৪৫৲
(৪) কমলা, ম্যাঙ্গোষ্টীন, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছ			১০০০৲
ম্যানেজারের বাঙ্গলা, দ্বারোয়ানের, মালীর এবং কুলীর ও গোয়াল ঘর ...	......	......	১০০০৲
১ জোড়া গাড়ী এবং ২ জোড়া বলদ ...	......	......	৪০০৲
তরিতরকারীর বীজ	... ..	......	১০০৲
কলের লাঙ্গল, জল তুলিবার কল, বাগানের যন্ত্র ইত্যাদি ক্ষেত্রে জল লইয়া যাইবার জন্য পাইপ লাইন ও ১০টী কূপ	......	......	১০০০৲
সার ও বেড়া মেরামত করিবার খরচ ...	......	......	৪৫৫৲
ঠিকে কুলী	......	......	১০০০৲
	মোট খরচ	...	১৫০০০৲

বার্ষিক ব য়।

ম্যানেজার	১ জন	১০০৲ হিঃ = ১০০৲ ...	১২ মাস	১০০৲	১২০০৲
চীনে মালী	২ জন	৩০৲ হিঃ = ৬০৲ ...	১২ মাস	৬০৲	৭২০৲
চীনে কুলী	২৫ জন	১৫৲ হিঃ = ৩৭৫৲ ...	১২ মাস	৩৭৫৲	৪৫০০৲
দ্বারোয়ান	২ জন	১২ হিঃ = ২৪৲ ...	১২ মাস	২৪৲	২৮৮৲
গাড়োয়ান	১ জন	১২ হিঃ = ১২৲ ...	১২ মাস	১২৲	১৪৪৲
					৬৮৫২৲

১——৪ গাছের দাম, গাড়ীভাড়া এবং রোপণের জন্য ঠিকা কুলী খরচা সহ ধরা হইয়াছে।

বাৎসরিক আয়। (দুই বৎসর পরে)	সংখ্যা। কাঁদি	রেট।	টাকা।
কলা	২৪০০০	১৲	২৪০০০৲
তরীতরকারী	......	......	৬০০০৲
	মোট	...	৩০০০০৲

দুই বৎসরের খরচ বাদ

২ × ৬৮৫২৲ = ১৩৭০৪৲ ; মূলধন ফেরৎ = ১৫০০০৲ ...	......	......	২৮৭০৪৲
দুই বৎসর পরে মোট লাভ		...	১২৯৬৲

তৃতীয় বৎসর হইতে সপ্তম বৎসর পর্য্যন্ত

৩০০০০ — ৬৮৫২ = ২৩১৪৮

তাহা হইতে	৫ বৎসরে ২৩১৪৮৲	১১৫৭৪০৲

(৭ বৎসর পরে কলা চাষ বাদ দিয়া)

	গাছ	প্রতি গাছ	
নারিকেল	৭০০০	৪৲	২৮০০০৲
সুপারি	২২৪০	॥০	১১২০৲
কমলা লেবু, ম্যাঙ্গোষ্টীন ও অন্যান্য ফল ...	......	......	২০০০৲
			৩১১২০৲

৭ বৎসর পরে বার্ষিক খরচ

ম্যানেজার ১০০৲ হিঃ ১২ মাসে ১২০০৲ ; দ্বারোয়ান ১০ জন ১০৲ হিঃ ১২ মাসে ১২০০৲ ; খুচরা খরচ ও জমির খাজনা বাদ ১৭২০৲	......	......	৪১২০৲
বার্ষিক মোট লাভ		...	২৭০০০৲

আমি মোটামুটি যে হিসাব দেখাইলাম, বলা বাহুল্য যে ইহাতে ব্যয় অত্যধিক এবং আয় অতি কম ধরা হইয়াছে। প্রথমতঃ কলার বাগান করিলে একেবারে ২৪000 হাজার গাছ রোপণ করিবার আবশ্যক নাই, কারণ পর বৎসর এই গাছ হইতে ইহার ৩।৪ গুণ ছোট গাছ পাওয়া যাইতে পারে, ইহাতেও অর্দ্ধেক খরচ কমিবে। ইহা ব্যতীত জর্ম্মান দেশীয় এক প্রকার কল পাওয়া যায় (দাম ২০০৲—৩০০৲) তাহাতে কলা গাছের আঁশ তুলিয়া বিক্রয় করিলে প্রতি গাছে ।০—॥০ আনা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। যে গাছগুলি কলা দিবে সে গুলি ফেলিয়া না দিয়া ইহার আঁশ তুলিতে পারা যায়।

এখানে একটী ডাব ৵০, নারিকেল ৵০, উৎকৃষ্ট কলা ১ কাঁদি ১৷৷০—২৲ পর্য্যন্ত, বেগুণ তিনটা দুই পয়সা, এই রকম সমস্ত জিনিষ মহার্ঘ। ফলের বাগান করিতে হইলে নিম্নব্রহ্মে (Lower Burma) রেঙ্গুনের সন্নিকটে করা উচিত, কারণ ওখানে বর্ষা প্রায় ৬ মাস থাকে এবং সরকারী রিপোর্টে নিম্ন ব্রহ্মকে (Agricultural Districts) বলে।

যদি একজন লোকে ১৫০০০৲ হাজার টাকা মূলধন যোগাড় করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিন জন অংশীদার ৫ হাজার টাকা হিসাবে দিয়া ১৫০০০৲ হাজার টাকা মূলধন তুলিতে পারেন, তাহা হইলে এই প্রকার কার্য্য বিশেষ লাভজনক হয়। যাঁহারা এখানে চাষ-বাস করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রতি বৎসর দুই জন তিন মাসের জন্য দেশেও যাইতে পারেন।

এদেশে মাদ্রাজী ও সুরাটের মুসলমান ব্যতীত আর কোন জাতিকে বড় একটা চাষ-বাস করিতে দেখা যায় না। বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণ ১৫ আনা মসীজীবী, বাকী এক আনা ওকালতী, ডাক্তারী ইত্যাদি "স্বাধীন ব্যবসায়ে" নিযুক্ত আছেন।

চীনে মালী ও কুলী রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা যেমন অবিকারচিত্তে মূত্র, পুরীষ এবং অন্যান্য সার সংগ্রহ করিয়া জমিতে দিবে, এরূপ আর কোন জাতি পারিবে না। ইহারা বাগানের কাজ সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞ (Expert) সেইজন্য কিছু বেশী বেতন দিতে হইলেও ইহাদের দ্বারা অন্যান্য মালী ও কুলী অপেক্ষা ৫।৭ গুণ কাজ পাওয়া যাইবে।

আজ দেশের এই দুঃসময়ে আমি বঙ্গের উৎসাহী কর্ম্মী যুবকবৃন্দকে আহ্বান করিতেছি—দলে দলে মূলধন সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা এদেশে আসিয়া চাষ-বাস করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করুন। সামান্য ২৫।৩০ টাকার চাকরীর জন্য কত যুবক চীন সীমান্তে ও কত দুরদেশে যাইতেছেন, আর আজ রেঙ্গুনের নিকটবর্ত্তী স্থানে আসিয়া এমন সুবিধার কর্ম্ম ছাড়িয়া অন্নের জন্য হাহাকার করিবেন, ইহা ভাবিতেও কষ্ট হয়।

যদি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া "কৃষকের" কোন পাঠক এই কার্য্যে অগ্রসর হ'ন, তাহা হইলে আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব, এবং আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য হয়, তাহা সানন্দচিত্তে করিব। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দে।

ঠিকানা—
A. C. DE',
Tagundaing P. O.,
Via—Thazi, (District Meiktia),
(Upper Burma.)

নারিকেল

(১)

নারিকেলের বীজ সংগ্রহ করা একটু কঠিন ব্যাপার। বৈশাখ মাসে যে নারিকেল ঝুনা হইয়া পড়িয়া যায় বা গাছে থাকে তাহাই বীজের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। যে গাছ অতি প্রাচীন হয় নাই অথচ যার যৌবনের তেজ কমিয়া আসিয়াছে এইরূপ বৃক্ষ হইতেই ফল সংগ্রহ করা আবশ্যক। যে ফল বীজ রাখা হইবে এইরূপ গাছকে 'কাঁকনি গাছ' বলিয়া থাকে। সেটী বেশ ঝুনা হওয়া চাই, তাহার চোখ খুব বড় বড় থাকা চাই এবং যে কাঁদিতে অল্প ফল আছে এমন কাঁদি হইতে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যদি গাছ অতি প্রাচীন হয় ও বীজের চক্ষু ছোট হয় তাহা হইলে অঙ্কুর লম্বা ও সরু হইয়া থাকে এবং নব উৎপন্ন গাছে ভাল ফল ধরে না। চারা গাছের ফল বীজ রাখিলে বীজের চোখের কাছে ধসা ধরে এবং যদি গাছ তৈয়ারী হয় সে গাছ নাড়িয়া পুঁতিয়া দিলে প্রথমে খুব বাড়িতে থাকে ও মোটা হইয়া পড়ে কিন্তু সেই গাছের ফল, শাঁস হইতে না হইতেই খসিয়া পড়িবে এবং অল্প দিনের মধ্যেই গাছ মূল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাইবে।

বীজ সংগ্রহের সময় গাছ হইতে নারিকেল ভূমে নিক্ষেপ করা উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে ছোবড়া ফাটিয়া গিয়া ভিতরে জল প্রবেশ পূর্ব্বক ভিতরের খোলাকে ফাটাইয়া দিতে পারে। যদিও এরূপে পাড়া বীজে গাছ তৈয়ারী হইতে পারে কিন্তু সেই সকল গাছ অতি দুর্ব্বল হইয়া থাকে এবং অল্প ফল উৎপন্ন করে ও ফলগুলি ছোট হয় এবং শাঁস না হইতেই পড়িয়া যায়। গাছে নারিকেল অধিক ঝুনা হইয়া গেলে তাহাও বীজ রক্ষার পক্ষে উপযুক্ত নহে, কারণ ভিতরের জল শুকাইয়া গিয়া অঙ্কুরের ক্ষতি করিয়া থাকে। এই সকল কারণে বীজ সংগ্রহ করিবার সময় গাছের উপর হইতে দড়ি বাঁধিয়া একটী ঝুড়ির মধ্যে করিয়া বীজ নামান প্রয়োজন। জলের ধারের গাছ হইতে বীজ কাটিয়া জলে ফেলিয়া দিলেও তত ক্ষতি হয় না।

বীজ সংগ্রহের পর একমাস পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে বাহিরের ছোবড়া শুষ্ক হইয়া বীজের ভিতরে জল প্রবেশের পথ বন্ধ করিয়া দেয়। বীজ টাট্‌কা পুতিলে পর বাহিরে ছোবড়া শীঘ্র পচিয়া যায় ও অঙ্কুর জন্মায় না।

যেখানে জল জমিয়া থাকিতে পায় না। বীজ গুলি এরূপ একটু উঁচু জমিতে পোতা উচিত। চাষীর বাড়ীর উঠানে বালি জমির উপর যেখানে রীতিমত জল ফেলা হয়, এমন স্থানে পুতিলে বেশ ভাল অঙ্কুর জন্মায়। কেহ কেহ টবের মধ্যে

বালি মাটী ও গোময় সার পুরিয়া বীজ পুতিয়া থাকেন, কেহ কেহ বীজের এক দিকের একখানা ছোবড়া ফেলিয়া দিয়া এবং বোঁটার নীচের খোলা বাদ দিয়া ঘরে রাখিয়া দেন তাহাতে এক মাসের মধ্যেই চারা জন্মিয়া থাকে। কলি বক্র ভাবে উঠিলে অনেক চারা বাঁচে না বলিয়া গাছ মরিয়া যাইতে পারে।

কোথাও কোথাও দুটা নারিকেল বীজের ছোবড়া তুলিয়া পরস্পরের সহিত বাঁধিয়া একটী বড় বাঁশের উপর বা কাঁঠাল গাছের ডালে বা চালের মটকায় ঝুলাইয়া রাখা হয়। এইরূপে ফলগুলি শিশির, বৃষ্টি, বাতাসের দ্বারা তিন মাসের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয়। যখন চারিটী পাতা নির্গত হয় ও গাছগুলি ৪।৫ মাসের হয় তখন তাহাদের নাড়িয়া পুতিতে হয়।

সুপারি ও নারিকেল চারা নাড়িয়া পুতিলে গাছ ভাল হয় কিন্তু আমের গাছ নাড়িয়া পুতিলে ছোট ছোট আম হয়, কাঁঠাল নাড়িয়া পুতিলে ভোয়া হয়। কথায় বলে—

গো নারিকেল নেড়ে রো।
আম টেটুরে, কাঁঠাল ভো॥

যে স্থানে নারিকেল নাড়িয়া পুতিতে হইবে পুতিবার ছয়মাস পূর্ব্বে তথায় গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। গর্ত্ত কাটিবার পূর্ব্বে পরস্পরের ব্যবধানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। নীচু জমিতে ১২।১৬ হাত অন্তর এবং উঁচু জমিতে ২০ হাত অন্তর গর্ত্ত কাটা উচিত। প্রবাদ আছে—

নারিকেল বার, সুপারি আট।
এর ঘন, তখনি কাট॥

মোট কথায় এরূপ অন্তর অন্তর গাছ বসাইতে হইবে যাহাতে একটির পাতা অন্যের সহিত লাগে না। খনার সুপ্রসিদ্ধ বচন এই—

হাতে হাতে ছোঁয় না।
মরা ঝাঁটি রয় না॥
খনা বলে যখন চায়।
তখন কেন লয় না॥

অর্থাৎ পরস্পরের পাতার সংস্পর্শ না থাকিলে ও মরা পাতা কাটিয়া দিলে গাছে সর্ব্বদাই ফল ফলিয়া থাকে।

প্রত্যেক গর্ত্তটী ১॥ হাত গভীর করিতে হইবে এবং ভিতর হইতে কাঁকর পাথর এবং অপর গাছের শিকড় বেশ করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। গর্ত্তের তলায় একস্তর শামুক গুগ্‌লী প্রভৃতির খোলা, তার উপরের স্তর বালি দিয়া পোরাইতে হইবে। ইহাতে উর্ব্বরতাও বৃদ্ধি হইবে এবং উই পোকা হইতে বীজের কোন

আশঙ্কা থাকিবে না। কেহ কেহ উই পোকা ধ্বংস করিবার জন্য চারার সহিত একরূপ গাছ রোপণ করিয়া থাকে। তাহার তীব্র গন্ধে পোকা মাকড় থাকে না। মাটীর সহিত ছাই মিশাইয়া দিয়া গর্ত্ত বুজাইলেও উই ধরিতে পারে না এবং গাছের যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে।

আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে নারিকেল চারা পুতিতে হয়। পুষ্করিণীর পানা ও শেওলা দিয়া গাছের মূলদেশ ঢাকিয়া দিতে হয়। তাহাতে গাছের গোড়া শীতল থাকে এবং সেগুলি পচিয়া সারেরও কার্য্য করে। গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ গাছে জল দেওয়া প্রয়োজন। ইহার জমী কিছু নাবাল হইলেই ভাল হয়, তাহাতে জমী বেশ সরস থাকে। মাছের আঁইস ও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ সার ইহার প্রধান উপযোগী। চারা গাছের উপর ছায়া দিবার জন্য কলার বাগানে নারিকেল চারা রোপণ করা উচিত। আরও তাহাতে মাটি সরস থাকে এবং কলাগাছের এঁটে, পাতা প্রভৃতি পচিয়া সারের কার্য্য করে। কথায় বলে—

আগে পুতে কলা।
বাগ বাগিচা ফ'লা॥
শোনরে বলি চাষার পো।
পরে নারিকেল, ক্রমে গো॥

গাছগুলি বসানর পর তাহার রক্ষণে বিশেষ যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য। ইহা না ঘিরিয়া রাখিলে ছাগাদি পশুদ্বারা অনিষ্ট হইতে পারে। একবার মাঝের পাতা নষ্ট হইয়া গেলে আর তাহার বাড়িবার উপায় নাই। সমুদ্রের ধারে, নদী বা পুষ্করিণীর ধারে, ধানক্ষেত্রের ধারে ইহা অধিক জন্মায়। পুরাতন বাড়ীর স্তূপের উপর এবং যে সকল স্থলে মানব ও পশুর অধিক গমনাগমন আছে সেই সকল স্থানে প্রচুর জন্মায়, কারণ তাহাদিগের মল মূত্র হইতে ইহারা পর্য্যাপ্ত সার পাইয়া থাকে।

নারিকেলের স্বাভাবিক জন্মস্থান ভারতীয় সমুদ্রের উপকূল এবং পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দ্বীপমণ্ডলী। সমুদ্র হইতে যত দূরে আসা যায় ততই বৃক্ষের ও ফলের খর্ব্বাকৃতি ও ফলের সুস্বাদ হীন হইতে দেখা যায়। সিংহল, সিঙ্গাপুর, মালায় ও মাদ্রাজের নারিকেল যত সুমিষ্ট হয় বাঙ্গালা দেশে তেমন হয় না। উচ্চবঙ্গ হইতে যত পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া যায় ততই নারিকেল গাছ কম দেখিতে পাওয়া যায়। নারিকেলের কোমল মূল সকল কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিতে অসমর্থ এই জন্য বেহার প্রভৃতি দেশে ইহা জন্মায় না। যে স্থানের জলবায়ু লবণাক্ত, এবং মাটী রসাল এইরূপ স্থানেই ইহা জন্মিয়া থাকে।

বেলে অপেক্ষা দো-আঁশ এবং দো-আঁশ অপেক্ষা এঁটেল মাটি নারিকেলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বালির ভাগ অধিক থাকিলে বালি রৌদ্রে এত উত্তপ্ত

হয় যে, গাছের মূলকে নষ্ট করিয়া দেয়। অত্যুচ্চ নীরস জমী এবং ডোবা, নীচু জমী ইহার পক্ষে ক্ষতিজনক। জমীতে বালির ভাগ অধিক থাকিলে তাহার সহিত পুষ্করিণীর পাঁক বা বালী মাটি মিশাইয়া দিতে হয়।

ভালরূপ যত্ন লইলে এবং গবাদি পশু ও পোকার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিলে প্রথম বৎসরেই নূতন পত্রোদ্গম হইয়া থাকে। তৃতীয় বৎসরের মধ্যেই পাতার গোড়া অশ্বখুরবৎ বৃক্ষকে বেষ্টিত করিয়া থাকে। চতুর্থ বৎসরে গাছের গুঁড়ি ভূমির উপর দেখা যায়। পঞ্চম বৎসরে গুঁড়ি বেশ বড় হইয়া থাকে এবং ২০।২৪টী পাতা জন্মিয়া থাকে, তাহার ৩৬টী পাতা জন্মিলেই ফল ধরিতে থাকে। ষষ্ঠ বৎসরেই নারিকেলের ঝুরি নামিতে আরম্ভ হয়; এই সময়ে গাছ ১০।১২ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। প্রথমকার ঝুরি প্রায়ই শুকাইয়া যায় কিন্তু ক্রমেই অন্যান্য ঝুরি নামিয়া ফুল ও ফল ধরে। ছয় মাস ফল পড়িতে থাকে এবং পাকিতে এক বৎসর লাগে।

জল বায়ু ও মাটীর উপর বৃক্ষের ফল ধারণ নির্ভর করে। মোটামুটি হিসাবে একটী গাছে বৎসরে ১০০।১২০ ফল ধারণ করে। নীচু বালী জমিতে ২০০ পর্য্যন্ত দেখা যায়। এক জাতীয় নারিকেল হাজারে বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহার খোল ছোট হইয়া থাকে। ফাল্গুনের গোড়া হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত রৌদ্রের উত্তাপে ফলের বৃদ্ধি সত্বর সম্পাদিত হয়।

যখন প্রথমে নারিকেল ঝুরি নামিতে আরম্ভ হয় তখন তাহাতে ফল ধরিতে না দিয়া তাহা কাটিয়া তাহা হইতে তাড়ি বাহির করিয়া লওয়া হয়, তাহাতে ভবিষ্যতে ফলগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। কোথাও কোথাও নারিকেল হইতে কেবল মাত্র তাড়ি বাহির করা হয়। অধিক তাড়ি নির্গমন করিয়া লইলে গাছ শুকাইয়া যাইবে অতএব ছয় মাস পর্য্যন্ত তাড়ি বাহির করিয়া তাহার পর পাঁচ বৎসর গাছকে বিশ্রাম দিতে হয়।

বৎসরের মধ্যে ৮।১০ খানা পাতা কাটা উচিত। যে পাতাগুলি ঝুলিয়া পড়িবে সেই গুলিই কাটা উচিত কিন্তু পাতা ঝুলিয়া পড়িয়া বৃক্ষের কাণ্ডকে রৌদ্রের তাপ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। গাছে ফল ধরিতে বিলম্ব হইলে অথবা গাছে না ফল ধরিলে উহার গাত্রে স্থানে স্থানে দুই তিনটী গর্ত্ত করিয়া দিলে গাছে ফল ধরে। এই গর্ত্ত বা ছিদ্র কাণ্ডের দুই দিক ভেদ না করে। এইরূপ গর্ত্ত করিলে গাছের তেজ হ্রাস হয় ও ফল ধরিয়া থাকে। গাছের গোড়ায় অনধিক দেড় হস্ত পরিমাণ উচ্চ স্থানে বাটালি বা তদ্রূপ কোন যন্ত্র দ্বারা এইরূপ গর্ত্ত কাটিতে হয়।

নারিকেলের প্রায় ৩০ প্রকার জাতি আছে। তন্মধ্যে সচরাচর যে কয়টী দেখিতে পাওয়া যায় তাহারই উল্লেখ করা গেল—

১। এক প্রকার হরিদ্রাবর্ণের নারিকেল জন্মে তাহাকে ব্রাহ্মণ নারিকেল বলে। ইহার আকার মাঝারি রকমের হয়।

২। তাম্রবর্ণের যে নারিকেল হয় তাহা খাইতে বড় সুমিষ্ট, আকার বড় নহে।

৩। কচি অবস্থায় সবুজবর্ণের ও পাকিলে লাল দেখায়। ইহাই সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। ছোট বেলের ন্যায় আকারের এক প্রকার নারিকেল হয়। যদি উহা দেখিতে অতিশয় ক্ষুদ্র কিন্তু ডাব অবস্থায় প্রচুর জল থাকে। ইহাকে হাজারি নারিকেল বলে। প্রত্যেক কাঁদিতে ৭০।৮০ ফল থাকে।

৫। সিঙ্গাপুরে, ইহা চারি পাঁচ সের ওজনে থাকে।

সিংহলের একপ্রকার নারিকেল বাঙলা দেশে আসিয়াছে এবং সিংহলের নারিকেল হইতে গাছ জন্মিয়া খুব বড় খোলের নারিকেল জন্মিতেছে। এই নারিকেলে প্রায় আড়াই তিন সের জল ধরে। ইহার শাঁস কিন্তু খুব পাতলা।

নারিকেল গাছ সাধারণতঃ ৬০ হইতে ৮০ হাত উচ্চ হইয়া থাকে এবং ২ হাত ব্যাস হইয়া থাকে। প্রতি গাছে সাধারণতঃ প্রায় ৮।১০ কাঁদি হয় এবং প্রত্যেক কাঁদিতে ৫ হইতে ১০ পর্য্যন্ত ফল ধরে। ইহা এক শত বৎসর বাঁচিতে পারে।

এণ্ডির অনিষ্টকারী পোকা

পোকা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে জুন ও জুলাই মাস হইতে বর্ষারম্ভে ইহাদের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী হয়, এণ্ডির অনেক প্রকার কীট শত্রু আছে। কখনও কখনও ইহারা দুই তিন রাত্রির মধ্যে ৮।১০ বিঘার এণ্ডির পাতা খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলে ; প্রথমে ২।৪টী মাত্র পোকা দেখা যায় ; ক্রমেই ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ; পোকা যখন ছোট থাকে, তখন অনেকের নজরে পড়ে না ; এমনও দেখা গেল যে, পূর্ব্ব দিন ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ পাতা দেখিয়া আসা গিয়াছে কিন্তু পরদিন ক্ষেত্রে যাইয়া দেখা গেল যে, ক্ষেত্রে একটীও পাতা নাই ; কেবল পাতার শিরাগুলি বর্ত্তমান আছে ও তদুপরি পোকাগুলি খাবার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; ১৮৮৯ সালে ম্যাকেঞ্জি সাহেব আসামের জইন্তা পাহাড়ে বহু খরচ করিয়া অনেক এণ্ডি পোকা পুষিয়াছিলেন, কিন্তু অন্যান্য পোকার উপদ্রবে পাতা অভাবে তাঁহার কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছিল, এণ্ডি গাছে অনিষ্টকারী পোকা দেখা দিলে উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার পূর্ব্বে বাছিয়া ফেলা ছাড়া আর সহজ উপায় নাই ; একবার ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইলে সমুদায় ক্ষেত্রের পাতা নষ্ট না করিয়া ছাড়ে না। যদিও পোকা দমনের জন্য অনেক ঔষধ আছে, কিন্তু উহা প্রয়োগ করিতে হইলে অনেক টাকার দরকার এবং আমাদের দেশের কৃষককুলের অবস্থা এত স্বচ্ছল নহে যে তাহারা টাকা খরচ করিয়া পোকা দমন করিতে পারে।
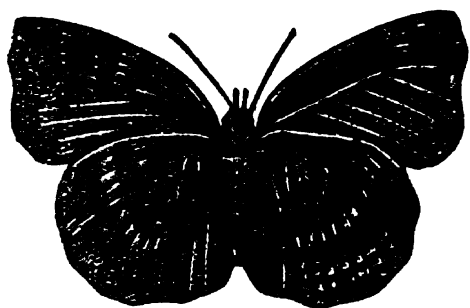
কাঁটালে পোকার প্রজাপতি
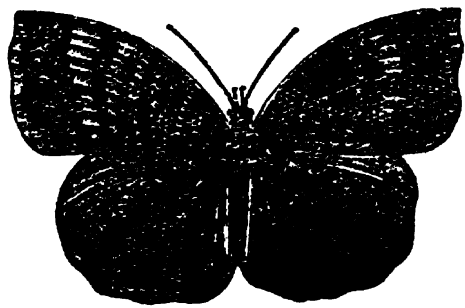
কাঁটালে পোকার প্রজাপতি

মিশ্র ফসল থাকিলে অর্থাৎ এণ্ডির সঙ্গে অন্য কোনও ফসল জন্মাইলে পোকার সংখ্যা বেশী বাড়িতে পারে না, কারণ এক গাছের পাতা নিঃশেষ করিয়া নামিয়া অন্য গাছে যাইবার সময় ব্যাঙ ও অন্যান্য স্বাভাবিক শত্রুর হাত হইতে এড়াইতে পারে না ; এক জায়গায় ছোট এণ্ডির ক্ষেত হইলে উহাতেই বেশী পোকা লাগিয়া থাকে, কিন্তু

মাঠ ভরা এণ্ডির চাষ থাকিলে পোকার প্রকোপ তেমন দেখা যায় না, কারণ পোকাগুলি সকল ক্ষেত্রে ছড়াইয়া থাকে এবং সংখ্যায় বেশী থাকিলেও তেমন অধিক অনিষ্ট হইতে দেখা যায় না; গাছগুলির ডগা ফেলিয়া দিলে বেশী লম্বা হইতে পারে না এবং পোকার সহিত পোকা ধরা পাতাগুলি বাছিয়া ফেলাও সহজ হয়। ক্ষেত চষিয়া দিলেও অনেক মাটির নীচের পোকা উপরে উঠিয়া যায় ও পাখী ও ব্যাঙে ইহাদিগকে ধরিয়া ধরিয়া খায়। আমাদের দেশে সকাল বেলা ভিজা পাতার উপরে যে ছাই ছিটাইয়া দেওয়ার রীতি আছে তাহা মন্দ নহে; ইহাতে ছাই সহিত পাতা খাইয়া পোকার অজীর্ণ রোগ হয় ও মরিয়া যায়।
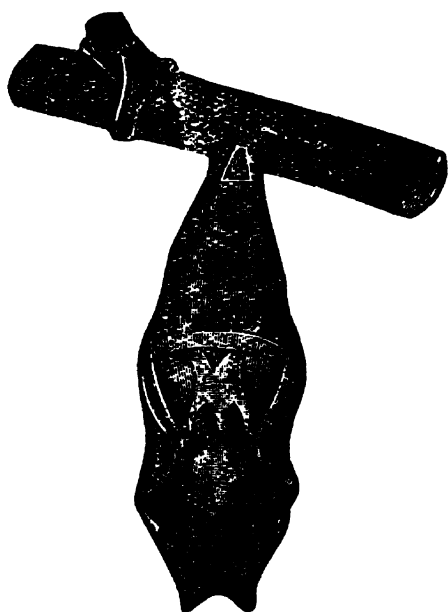
কাঁটালে পোকার গুটী
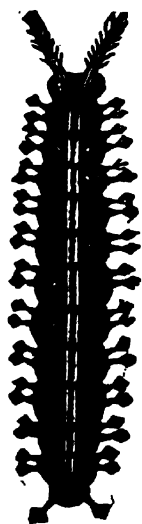
কাঁটালে পোকার শুককীট

পাতায় কাঁটালে পোকা—(ERGOLIS MERIONE)

প্রায় সব কীটই ডিম হইতে ফুটিয়া শুক কীট অবস্থায় শস্যের অনিষ্ট করে; মূককীট (শুক কীটগুলি বড় হইয়া গুটী প্রস্তুত করে ও তন্মধ্যে মূককীট বা পুত্তলিতে পরিণত হয়) ও প্রজাপতি (কয়েকদিন পরে শুক কীটগুলি গুটীর মধ্যে দুই পক্ষ বিশিষ্ট হইয়া প্রজাপতিতে পরিণত হয় ও গুটী হইতে বাহির হয়) অবস্থায় ইহারা শস্যের হানি করিতে পারে না।

এই জাতীয় শুক কীটগুলি সবুজ রঙের এবং প্রজাপতিগুলি পিঙ্গল রঙ বিশিষ্ট; ইহাদের গায়ে ও মস্তকে শাখাবিশিষ্ট অনেক কাঁটা আছে; ইহারা এড়ির পাতা খাইয়া গুটী প্রস্তুত করিয়া মূক কীটে পরিণত হয়; গুটীগুলি পাতার ভাঁজের মধ্যে থাকিয়া

গাছে ঝুলিতে থাকে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই কীট দেখা যায়; মে হইতে অক্টোবর মাসে ইহাদের বেশী প্রাদুর্ভাব হয়। চিত্রে ইহার কীট, গুটী ও প্রজাপতি দেখান গেল; এক একটী প্রজাপতি পাতার উপর ২০০।৩০০ শত ডিম পাড়ে; ডিমগুলি ৬।৭ দিন পরে ফুটিয়া ২৫।৩০ দিন পাতা খাইয়া পুনরায় গুটী প্রস্তুত করে ও মূক কীটে পরিণত হয়; পোকা দেখিলেই বাছিয়া ফেলাই পোকা দমনের সহজ উপায়: ডিম সহিত পোকা-ধরা পাতাগুলি ফেলিতে পারিলে আরো ভাল।

শুয়া পোকা—(TRAHALA VISHNU)*

ইহারা এক প্রকার বিছা জাতীয় কীট, ইহারা গাছের কাণ্ডের নীচে একত্রিত হইয়া থাকে; খাইবার সময় পাতায় যাইয়া খাইয়া থাকে; ইহারা বড় হইলে লম্বায় প্রায় ২ ইঞ্চি পরিমাণ হয়; ইহাদের সমস্ত শরীর রোমে আবৃত এবং এক টুকরা ছোট কম্বলের মত দেখায়; ইহারা অন্যান্য গাছেরও পাতা খাইয়া থাকে; শরীরের লোম দ্বারা ইহারা গুটী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে মূক কীটে পরিণত হয়; প্রজাপতি সবুজ ও হলদে রঙের হয়; পুরুষ প্রজাপতি স্ত্রী প্রজাপতি অপেক্ষা অনেক ছোট; ইহারাও গাছের পাতায় ডিম প্রসব করে ও ঐ ডিম ফুটিয়া সংখ্যায় বৃদ্ধি হয়; পোকাগুলি ছোট থাকিতে অথবা ডিমগুলি পাতার সহিত বাছিয়া পুড়াইয়া বা পুতিয়া ফেলাই প্রশস্ত।

লেদা পোকা—(OPHIUSA MFLICERTE)*

ইহারা লোমহীন লেদা পোকা জাতীয়; ইহারা এড়ির খুব বেশী ক্ষতি করে; ইহাদের বংশবৃদ্ধিও খুব অল্পদিনে হইয়া থাকে; এই জাতীয় কীট ২।৩ রাত্রির মধ্যে কখনও কখনও ১৫।২০ বিঘার জমির পাতা খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলে; গাছে কেবল ডাঁটা ও পাতার শিরাগুলি থাকে; ইহাদের বংশ যাহাতে বৃদ্ধি না হইতে পারে সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত; পূর্ব্বলিখিত দুই জাতীয় পোকা ইহার মত এত অনিষ্টকারী নহে; ইহারা রাক্ষসের মত পাতা খাইয়া থাকে; একটী স্ত্রী প্রজাপতি প্রায় ৪০০।৫০০ ডিম পাড়ে, ঐ ডিম হইতে ৬।৭ দিন পরে পোকা ফুটিয়া বাহির হয়; ১৫।২০ দিনের মধ্যে গুটী প্রস্তুত করিয়া মূক কীটে পরিণত হয়; জুন হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত ইহাদের বেশী প্রাদুর্ভাব হয়। ইহাদের সংখ্যা বেশী হইয়া গেলে, ইহাদিগকে দমন করা এক প্রকার কষ্টসাধ্য; সমস্ত ক্ষেতের গাছগুলি কাটিয়া ফেলা ভিন্ন আর অন্য কোনও উপায় থাকে না; ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও তেমন সুফল পাওয়া যায় না; কম থাকিতে বাছিয়া ফেলিতে পারিলেও পাতার মধ্যস্থিত ডিমগুলি পাতার সহিত ফেলিয়া দিতে পারিলে ইহারা সংখ্যায় বাড়িতে পারে না।

* অন্যান্য পোকার চিত্র "ফসলের পোকা" পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

গুটী কীটগুলি লম্বা, ছেয়ে রঙের ও তন্মধ্যে লাল ও শাঁদা লম্বা রেখা বিদ্যমান আছে; ইহারা পাতার উপর জোঁকের মত চলে; পাতার ভাঁজের মধ্যে গুটী প্রস্তুত করতঃ মূক কীটে পরিণত হয়; বৎসরে ইহাদের অনেক পর্য্যায় হয়; নিকটে জঙ্গল থাকিলে উহা হইতে বাহির হইয়া এড়ির পাতা নিঃশেষ করিয়া ইহারা অন্য স্থানে চলিয়া যায়। লেদা পোকা ও উহার প্রজাপতি ডিম পাড়িবার কয়েক দিন পরেই আপনা হইতে মরিয়া যায়।

লাল মাকড়সা

এক প্রকার লাল মাকড়সা এড়ির পাতায় সরু ছিদ্র করিয়া রস খায় ও পাতাগুলি শুখাইয়া যায়; এই মাকড়সাগুলি খুব ছোট, সাধারণতঃ চোখে দেখা যায় না; এণ্ডি রেশম কীটকে মাকড়সাপূর্ণ পাতা খাওয়াইলে ইহাদের অজীর্ণ রোগ হইয়া থাকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ইহারা তেমন অনিষ্টকর নহে; এপ্রিল ও মে মাসে ইহাদের বেশী প্রাদুর্ভাব; বৃষ্টি হইলে জলে মরিয়া যায়। গন্ধকচুর্ণ ইহাদের দমনের পক্ষে বেশ উপযোগী; গন্ধক গুঁড়াইয়া ক্রুড অয়েল ইমালসনের ও জলের সহিত মিলাইয়া পিচকারীর সাহায্যে বাষ্পাকারে ছিটাইয়া দিতে পারিলে বেশ ফল পাওয়া যায়; সংখ্যায় কম হইলে পাতা বাছিয়া ফেলিলেই চলে; চিত্রে এই মাকড়সাকে বড় আকারের করিয়া দেখান হইয়াছে।

এণ্ডির ফলের পোকা—(DICHOCROCIS PUNCTIFERALIS)

এই কীট এণ্ডির বীজ কোষের অনিষ্ট করে; যে থোবাগুলি প্রথমে বা পরে পাকে উহাতেই এই পোকা বেশী দেখা যায়; এই কীট ও ইহার প্রজাপতি অতি ছোট; প্রজাপতির গায়ের রঙ কাল ডোরাবিশিষ্ট উজ্জ্বল হলুদবর্ণের; যখন ক্ষেতে ফলের থোবা একসঙ্গে অনেক পাকিতে আরম্ভ হয়, তখন এই জাতীয় কীটের সংখ্যা কম হয়।

এণ্ডির শম্বুক জাতীয় এক প্রকার অনিষ্টকারী পোকা আছে যাহারা গাছের তলায় মাটীর নীচে লুকাইয়া থাকে ও ইচ্ছানুসারে গাছে চড়িয়া পাতা খাইয়া থাকে; আরো অনেক প্রকার কীট আছে যাহারা এড়িপাতার অল্পবিস্তর ক্ষতি করে।

ছাতা রোগ

এণ্ডির কয়েক প্রকার ছাতা পড়া রোগ আছে, যাহারা পাতা ও কাণ্ড আক্রমণ করে; কিন্তু এই রোগ দ্বারা এণ্ডির তেমন অনিষ্ট হয় না; ছাতা পড়া রোগাক্রান্ত পাতা ও কাণ্ড দেখিলেই কাটিয়া পাতা ও গাছ পুড়াইয়া বা পুতিয়া ফেলা উচিত; কয়েকটী ছাতা পড়া রোগের নাম করা গেল;—Molamsora Ricini, Phylopthora Cerospora; এবং Physalospora ইত্যাদি। ছাতা পড়া রোগাক্রান্ত পাতা খাওয়াইলে পোকার অজীর্ণ রোগ হয়।

পোকার দমন উপায়

এভিন্ন পোকা লাগিলে প্রথমতঃ পোকা সহিত আক্রান্ত পাতাগুলি পুড়িয়া ফেলা উচিত; প্রতি ৩.৪ দিন অন্তর ক্রমান্বয়ে বাছিয়া ফেলিলে অনেক পোকা কমিয়া যাইবে; কিন্তু খুব বেশী পোকা লাগিলে নিম্ন লিখিত ঔষধ পিচ্‌কারী বা দম্‌কলের সাহায্যে গাছের পাতাতে বাষ্পাকারে ছিটাইয়া দিলে পোকাগুলি বিষাক্ত ঔষধের সংস্পর্শে বা পাতার সহিত বিষাক্ত ঔষধ খাইয়া অজীর্ণ রোগে মরিয়া যায়। Crude oil Emulsion, Lead Arseniate (সেঁকো বিষ) Lead Chromate, Sanitary Fluid, Vermisapor, এবং Kerosine oil Emulsion. যাবতীয় কীটের মারাত্মক ঔষধ; এইগুলি নিম্নলিখিত পরিমাণে গাছে প্রয়োগ করিলে উহাদের কোনও অনিষ্ট হয় না এবং প্রয়োগ করিবার ৮।১০ দিন পরে গৃহপালিত পশুদিগকে খাওয়াইলেও কোনও ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না; ঔষধ প্রয়োগ করিবার দুই এক দিন পরে বৃষ্টি হইলে জলে ধুইয়া যায় ও কোনই ফল পাওয়া যায় না।

১। কুড়িসের জলে পাঁচ ছটাক ক্রড অয়েল ইমালসন মিলাও; ৫ গেলন crude oil Emulsin এর দাম ৬৷৷০ টাকা; প্রাপ্তি স্থান Bathgate & Co, Calcutta.

২। ১½ তোলা আন্দাজ Lead Arseniate ৫ তোলা চূণ ও তোলা গুড় ২ সের জলে গরম করিয়া মিলাও ও তৎপরে আরো ১৮ সের জল ঢালিয়া দেও; মূল্য ।৵০ আনা পাউণ্ড প্রাপ্তি স্থান;—Heartly and Gresham & Co. Post Box No 225, Bombay.

৩। ৩ ছটাক হইতে ৫ ছটাক Saintary Fluid ২০ সের জলে মিলাও; মূল্য ৫ গেলন ৯৷৷০ টাকা; প্রাপ্তি স্থানঃ—Wison, Heywood and Clark & Co, Oriental Building, Bombay.

৪। এক ছটাক বারসোপ, এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের কেরোসিন তেলের সহিত মিলাও এবং খুব নাড়িতে থাক; ইহাতে আরো ১৫ সের জল ঢালিয়া দেও।

৫। ১½ আউন্স Lead Chromate ২০ সের জলে ভাল করিয়া মিশাইয়া লও; এক পাউণ্ড Lead Chromate এর দাম ।৴০ আনা; প্রাপ্তি স্থানঃ—Shalimar paint, colours, Varnish & Co. No 6 Lyons Range. Calcutta; ইহা Lead Arseniate এর মত এত বিষাক্ত নহে। এই পরিমাণে পিচ্‌কারীতে বা দম্‌কলে ভরিয়া পাতায় বাষ্পাকারে ছিটাইয়া দিলে বেশ ফল পাওয়া যায়। প্রথম বারে না মারিলে ২য় বার দিতে হয়।

১নং ৩নং ও ৪নং ঔষধ গায়ের বিষ অর্থাৎ পোকার গায়ে লাগিলে মরে আর ২নং ও ৫নং ঔষধ পেটের বিষ অর্থাৎ পাতার সহিত পোকায় খাইলে মরে।

বাষ্পাকারে ঔষধ ছিটাইবার যন্ত্রের দাম অনেক বেশী: আমাদের দেশের কৃষকদের পক্ষে এত দামী জিনিষ ক্রয় করা কষ্টকর; "ফসলের পোকায়" একটি পিচকারীর ছবি দেওয়া আছে; বাজারে চেষ্টা করিলে ২৲ টাকা মূল্য দিয়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে; অন্য প্রকার বাষ্পাকারে ছিটাইবার পিচ্‌কারী ও দমকলের মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান দেওয়া গেল।

১নং চিত্র সাধারণ পিচ্‌কারী মূল্য ২৲

২নং Knapsack Sprayer ; মূল্য ৩৮৲ টাকা প্রাপ্তিস্থান :—Burn & Co Ld Howrah.

৩নং Success Knapsack sprayer ; মূল্য ৫৪৲ টাকা; প্রাপ্তিস্থান Burn & Co Ld, Howrah.

৪নং Goulds' Standard Spray pump ; মূল্য ৪৫৲ ; প্রাপ্তি স্থান—The planters' Stores and Agency & Co, No 3 Mission Row, Calcutt.

আজ কাল স্থানে স্থানে অনেক কৃষি সম্মিলনী স্থাপিত হইতেছে; ইহাদের উদ্যোগে অনায়াসে স্থানীয় কৃষকদের জন্য একটি কল কেনা যাইতে পারে; কৃষকেরা একবার এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া সুফল পাইলে ইহার বিশেষ আদর করিবে ও পরে নিজেরাই খরিদ করিবে; পৃথিবীর সকল সভ্যদেশেই উন্নত প্রণালীর চাষের সহিত ইহাদের আদর ক্রমেই বাড়িতেছে।

সরকারী কৃষি সংবাদ

বাঙলায় আকের আবাদ—১৯১১-১২

আলোচ্য বর্ষে সময়মত সুবৃষ্টি হওয়ায় আকের আবাদ ভাল রকম হইয়াছে এবং পাই কম ষোল আনা ফসলের আশা করা যায়।

বাঙলায় তুলার আবাদের চতুর্থ বিবরণী—

এই বিবরণী পাঠে জানা যায় যে বাবী ও জলদি তুলা সমগ্র প্রদেশে ২১,৭৭৮ বেল উৎপন্ন হইয়াছে। গত বৎসরের উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ১৮,৬০০ বেল মাত্র।

বঙ্গে নীলের আবাদ—

বাঙলায় নীলের চাষ প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখনও বিহারে এবং মুঙ্গেরে কিছু নীলের চাষ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান বর্ষে ২৬,৭৫২ ফ্যাক্টরি মণ নীল উৎপন্ন হইয়াছে। গতপূর্ব্ব বৎসরের উৎপন্ন নীলের পরিমাণ ২০,৬৮৬ ফ্যাঃ মণ মাত্র।

বাঙলায় আকের আবাদ—

বাঙলা দেশে সাধারণতঃ নিম্ন লিখিত কয়েক প্রকার আক দেখিতে পাওয়া যায়,—

সাম সাড়া—ইহার রঙ হলুদে, নরম, মোটা, চিবাইয়া খাইতে ভাল।

ডোরাদার মারীচ (Stiped Mauriting) এই আক কয়েক বৎসর হইল ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছে। মারীচদ্বীপে ইহা খুব ভালরকম জন্মিয়া থাকে। বাঙলায় আসিয়া ইহার নাম বজায় রাখিতে পারিয়াছে কিন্তু মারীচ দ্বীপের মত এত বড় হয় না।

কাজ্‌লা—রঙ বেগুণে, শক্ত, সরু। রস কিন্তু ঘন হয়।

পাউণ্ড—উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে জন্মিয়া থাকে। বাঙলায় ও ইহার চাষ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাও চিবাইয়া খাইবার পক্ষে ভাল। আক মোটা ও নরম হয়। রঙ হলুদে, চিবাইয়া খাইবার আকের আয় বাঙলায় সমধিক।

খড়ি—বাঙলায় অনেক স্থানে ইহার চাষ হয়। রঙ সবুজ হরিদ্রা, অত্যন্ত শক্ত, চিবাইয়া খাইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। শেয়ালে এই আকের বেশী ক্ষতি করিতে পারে না। বাঙলায় শেয়ালের উপদ্রব এত বেশী যে অনেকে বাধ্য হইয়া এই আকের চাষ করিয়াছে। ইহাকে পোকায়ও বেশী নষ্ট করিতে পারে না। ইহা অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে, শক্ত বলিয়া ইহা হইতে রস নিষ্কাষণ কিছু কষ্টকর।

লাল মারীচ—মারীচ দ্বীপ হইতে বাঙলায় আসিয়া হাজির হইয়াছে। রঙ লাল, নরম, মোটা, চিবাইয়া খাওয়া চলে।

কালা বোম্বাই—গাঢ় বেগুনের রঙ কাল বলিলেও চলে, খুব নরম ও মোটা। রঙপুরে ইহার সমধিক পরিমাণে চাষ হয়। এককালে সমগ্র বাঙলায় ইহার চাষে খুব যত্ন ছিল কারণ ইহা চিবাইয়া খাইবার পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট আক। কিন্তু ইহার একটি প্রধান দোষ এই যে ইহাতে বড় বেশী ধসা ধরে তাই ইহার চাষ ক্রমশঃ উঠিয়া গিয়াছে।

আসামে কয়েকটি আক—

মগ—আসামে এই জাতীয় আকের চাষই অধিক। রঙ হল্‌দে, খুব শক্ত নহে, মোটা হয়।

মঝরা—ইহাও আসামের আক, ইহার সহিত বাঙলার খড়ি আকের অনেকাংশে মিল আছে।

দুই রকমে আকের আদর হইয়া থাকে—যে আক চিবাইয়া খাইতে ভাল তাহা বাঙলা দেশে খুব দরে বিক্রয় হয়। এই কারণে সামসাড়া প্রভৃতি আকের চাষে খুব লাভ হয়। গুড় বা চিনি প্রস্তুতের জন্য কোন কষ্ট না পাইয়া সহজে আক বিক্রয় হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে লাভের পয়সা ঘরে আসে। কিন্তু এই প্রকারের আকগুলি অতিশীঘ্র পোকা লাগে এবং ইহাদের ক্ষেতে শেয়ালের উৎপাতও সমধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কথা এই যে আকের রসে শর্করার পরিমাণ অধিক সে আকের চাষেও লাভ হইয়া থাকে।

মারীচ দ্বীপ হইতে ডোরাকাটা মারীচ আক যাহা এদেশে আমদানী হইয়াছে তাহাই বাঙলায় অধুনা প্রচলিত ইক্ষুর মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। কারণ এই আক বিঘা প্রতি ফলনে অধিক, ইহার রসে শর্করার পরিমাণ অধিক, গুড়ের পরিমাণও অধিক হয়।

ইক্ষুতে দুই প্রকার শর্করা থাকে চিনি শর্করা (সুক্রোজ), চিটে শর্করা (গ্লুকোজ)। যে গুড়ে দানাদার শর্করা অধিক তাহাতে দানা বাঁধে ও গুড় ভাল হয়। যাহাতে চিটের ভাগ অধিক তাহার গুড় ঝোলা হয়।

সরকারী রাসায়নিক পরীক্ষাদ্বারা ৯ প্রকার আকের রস বিশ্লেষণ করিয়া যাহা স্থির হইয়াছে তাহার ফল নিম্নে বিবৃত করা হইল—

	দানাদার শর্করা	চিটে	মোট শর্করা	শতকরা কত ভাল চিনি
ডোরাদার মারীচ	১৮ ৩৩	০ ১৯	১৮·৫২	১·০২
কাজলা	১৬·৩৬	০·৮২	১৭·১৮	৪·৭৭
সামসাড়া	১৭·৮২	০·৫১	১৮·৩৩	২·৭৮
পাউণ্ড্রা	১৭·৯২	০·৫৩	১৮·৪৫	২·৮৭
খড়ি	১৬·৩৮	১·২২	১৬·৬০	৭·৩৪
লাল মারীচ	১৩·৬৫	১·৫৫	১৫·২০	১০·১৯
কালাপুরা	১৭·৪৬	০·৪০	১৭·৮৬	২·২৩
মগ	১৬·৮৫	০·৪১	১৭·২৬	২·৩৭
মঝরা	১৩·৫০	২·১৪	১৫·৬৪	১৩·৬৮

ভাদ্র, ১৩১৯ সাল।

ফিগের চাষ

ফিগ্‌কে ভারতের পশ্চিম প্রান্তের লোকেরা আঞ্জির বলে, বাঙলা দেশে ডুমুর বলে। নাতি শীতোষ্ণ শুষ্ক আবহাওয়ায় কিম্বা শীতল গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ডুমুর ফলিয়া থাকে।

প্রবাদ আছে যে ডুমুরের ফুল কেহ দেখিতে পায় না তাই বলিয়া কেহ যেন না বিশ্বাস করেন যে ডুমুরের ফুল হয় না। ফুলটি শাখাগ্রের কিম্বা পত্র বিন্যাসের সন্ধিস্থানের শাঁসাল ত্বকের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে, ফুল পতঙ্গগণ দ্বারা নিষিক্ত হয় এবং শাঁসাল অংশ ক্রমে ফলে পরিণত হয়। বাঙলাদেশে যজ্ঞডুম্বুর, (ইহার কাষ্ঠ হোমাদি দেবকার্য্যে ব্যবহার হয় বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।) দেশী ডুম্বুর, বল্লাডুম্বুর এই কয়প্রকার ডুম্বুর দেখিতে পাওয়া যায়। দেশী ডুম্বুর আকারে ছোট এবং কাঁচা ও কচি অবস্থায় তরকারিতে ব্যবহার হয়। যজ্ঞডুম্বুর ও বল্লাডুম্বুর পাকিলে মিষ্টি হয় কিন্তু মনুষ্যে আগ্রহ করিয়া খায়—ইহা একটি উপাদেয় আহার। কালিফর্ণিয়ার ডুম্বুর আকারে খুব বড়, পাকিলে সুমিষ্ট এবং দেশ বিদেশের লোকে ইহা খাইয়া থাকে। সেই ডুম্বুরের আবাদ করিতে সকলেই সমুৎসুক।

মৃত্তিকা—দোয়াঁস পলিমাটি ইহার আবাদের বিশেষ উপযোগী। জমি জলবসা হইলে চলিবে না সুতরাং বাগানে জল নিকাশের পয়োনালা থাকা বিশেষ আবশ্যক। দক্ষিণ ভারতে কেবল দোয়াঁস মাটিতে ডুম্বুর বেশ হয়। এতদ্দেশে তিন ফিট নিচে চূণ থাকায় মাটিতে জল বসিতে পায় না। কাল, শক্ত তেজাল মাটিতে গাছের জোর খুব হয়, ডাল পালা, পাতা খুব বাড়ে কিন্তু ফল ছোট হয় এবং ফলের আস্বাদ কমিয়া যায়।

চারা প্রস্তুত—ডুম্বুর গাছের তলায় তাহার শিকড় হইতে কখন কখন যে চারা বাহির হয়, তাহা তুলিয়া পুতিয়া নূতন গাছ করা যাইতে পারে অথবা ডাল কাটি বা ধাপ কলম করিয়া চারা প্রস্তুত করা যায়। ধাপ কলমের কথা 'কৃষকের' পাঠকের অবিদিত নাই। মাটিতে ডাল নোয়াইয়া তাহাতে মাটি চাপা দিয়া রাখিলে—ঐ অংশ হইতে শিকড় বাহির হয়। চাপা দিবার অংশটি চিরিয়া বা দুই পাশ একটু একটু চাঁচিয়া দিলে শিকড় শীঘ্র বাহির হয়। ডালটি খুব ভারি পদার্থ দ্বারা চাপিয়া রাখা এবং মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া কর্ত্তব্য। শিকড় বাহির হইলে ডালটি একেবারে না কাটিয়া ধারাল ছুরীদ্বারা অল্পে অল্পে কাটিয়া এক মাসে সম্পূর্ণ কাটিয়া ফেলিতে হয়। শিকড়গুলি ছিঁড়িয়া না যায় এমন করিয়া মাটি সমেত খুঁড়িয়া স্থানান্তরে পুতিতে হয়। ডালকাটি করিয়া কলম করিতে হইলে ফেব্রুয়ারি মাসে দেড় ফুট লম্বা ডাল কাটিয়া গোবরের স্তূপে কিম্বা ছায়াযুক্ত স্থানে বসাইয়া শিকড় বাহির করিয়া লইয়া বাগানে ১২ ফিট অন্তর বসাইতে হয়।

গাছ বসাইবার সময়—ডুম্বুর গাছ হয় আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে কিম্বা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বসান কর্ত্তব্য। গাছ বসাইয়া আবশ্যকমত গোড়ায় জল দিতে হয়, যত দিন না গাছগুলি ধরিয়া বসে ততদিন নিয়ত জল দিতে হইবে। গাছ বসাইবার দুই মাস পূর্ব্বে তিন ফিট গভীর ও দুই ফিট চওড়া গর্ত্ত খুঁড়িয়া মাটি গর্ত্তের মুখের চারিধারে রাখিয়া দিলে মাটিতে বাতাস রৌদ্র পাইয়া অনেকটা চূর্ণ ও সারবান হইয়া থাকে। গাছ বসাইবার সময় পুরাতন গোময়সার এবং এই মাটি দিয়া গর্ত্তপূর্ণ করিতে হয়। প্রতি গর্ত্তে এক ঝুড়ি গোবর সার পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। গাছ বসাইবার পর মধ্যে মধ্যে গোড়ার চারিধারে কোপাইয়া মাটি আল্গা করিয়া ও আগাছা মারিয়া দিতে হয়। গাছ বসাইবার এক বৎসর পরে কার্ত্তিক মাসে গোড়া কোপাইবার অব্যবহিত পরে তিন ফলাযুক্ত কাঁটা দ্বারা (ফর্ক) দুই ফিট গভীর গোড়ার শিকড়ের মাটি আল্গা করিয়া ফেলিয়া মাটি সরাইয়া শিকড়ে রৌদ্র ও বাতাস লাগাইতে হয়। ইহাতে কিছু কিছু ভাসা শিকড় ছাঁটা কার্য্যও হইয়া থাকে। অগ্র শিকড়গুলি এক সপ্তাহ হইতে এক পক্ষ পর্য্যন্ত খোলা রাখা হইয়া থাকে। তৎপরে প্রতি গাছের গোড়ায় এক ঝুড়ি হিসাবে ছাই ও গোবর সার দিয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। পুনরায় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সার দিতে হয়। এই সারগুলি গোড়ার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিয়া কাঁটাদ্বারা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। গোড়া খুঁড়িয়া এইরূপে হাওয়া রৌদ্র লাগাইলে গাছগুলিকে কিছু তাতবাত সহিষ্ণু করা যায়।

জল সেচন—কার্ত্তিক মাসে গাছের গোড়ায় মাটিয়া দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিবার পরই গাছে জল সেচন অত্যাবশ্যক। তার পর সপ্তাহে একবার কিম্বা দশদিন অন্তর

জল সেচন কর্ত্তব্য। নিয়মমত জল সেচনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে পারিলে গাছের তেজ সমান থাকে এবং ফল অধিক হয়। গাছের চারি দিকে গোলাকার ১ ফুট চওড়া এবং ৬ ইঞ্চি গর্ত্ত খুঁড়িয়া সেই খাত জলে পূর্ণ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করাই জল সেচনের প্রকৃষ্ট প্রণালী। গাছের ডাল যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে তাহার শেষ প্রান্ত ধরিয়া জল নালা কাটা বিধেয়। গাছের কাণ্ডের খুব সন্নিকটে জল প্রয়োগ করিলে কখন কখন গাছের বিষম ব্যাধি উপস্থিত হয়। মূলে এবং কাণ্ডে ধ্বসা ধরিতে পারে।

ডাল ছাঁটা—ডুম্বুর গাছের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। ধাপ কলম ও ডাল কাটি কলম করিয়া যে সকল ডাল কাটা যায় তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়।

পোকার উপদ্রব—একপ্রকার চিঙড়ী পোকা আছে তাহা মাটি সন্নিহিত কাণ্ডের মধ্যে ছিদ্র করিয়া গাছ মারিয়া ফেলে। শিলং সরকারী বাগানে এই পোকায় ফিগ্‌গাছের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে। সকল ফিগের ক্ষেত্রেই এই পোকা দেখা দেয়। অন্য প্রকার সুড়ঙ্গকারী পোকা ফিগের কাণ্ডে গর্ত্ত করে। গাছের গায়ে রস পড়িতে দেখিলেই পোকা লাগিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে হইবে। গর্ত্তের মুখ কাটিয়া বাড়াইয়া এই পোকাগুলিকে ধ্বংস করা যায়। যেখানে সুড়ঙ্গ গভীর সেখানে কেরোসিন ইমলসন কিম্বা কার্ব্ববাইসলফাইডের মত কোন প্রকার বিযাক্ত দ্রব্য তরল অবস্থায় পিচকারীদ্বারা গর্ত্ত মুখে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় তাহাতে পোকাগুলি মরিয়া যায়। পাকা ফলেরও শত্রু আছে। এই গুলিকে পাখী, কাট বিড়ালী, ইন্দুর ইত্যাদির হাত হইতে রক্ষা করিতে হয়।

পরাগ নিষেক—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে পতঙ্গদ্বারা ডুম্বুর পরাগ নিষিক্ত হইয়া ফল প্রসবে সমর্থ হয়। কেবল এক জাতীয় পতঙ্গই ডুম্বুরের গর্ভাধান কার্য্যে ব্রতী; অন্য পতঙ্গাদি বড় এখানে ঘেঁস দেয় না। ঐ জাতীয় পতঙ্গের অভাব হইলে ডুম্বুর ফল প্রসবে বঞ্চিত হয়—গর্ভাধান না হইলে কি প্রকারে ফল প্রসূত হইবে। ইহার কিন্তু প্রতিকার আছে। একটি পালক লইয়া সেই শাঁসাল গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ঘুরাইলে পরাগ রেণু গর্ভকেশরের উপর পড়িয়া তাহাতে লাগিয়া যায়। ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থিত দেশ সমূহে এই উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে কিন্তু ভারতে কুত্রাপি এই প্রথা প্রচলিত নাই।

ভারতবর্ষে আসামে ফিগের বড় আবাদ আছে আসামের সমতল ভূভাগে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে যেখানে তুষারপাত হয় না তথায় ডুম্বুর দুইবার ফলে এক বর্ষায় আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাসে; দ্বিতীয় বার ফাল্গুন হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসে। এই কয় মাসই বড় গরম ও শুকনার সময়। এই সময়ের ফিগ বা ডুম্বুর বড়ই সুস্বাদু ও সুন্দর। শিলঙে

বৎসরের একবার মাত্র ফল হয়। বর্ষার সময় ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ পাকিতে থাকে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ফল থাকে। সাতিশয় ঠাণ্ডা বলিয়া ও সূর্য্যালোকের অভাবহেতু ফল বড়ই নরম ও তাদৃশ সুস্বাদু হয় না। নভেম্বর মাসে অনেক কচি কচি ডুম্বুর দেখা গেল কিন্তু পাকিবার পূর্ব্বে হয়ত ঠাণ্ডায় ও তুষারপাতে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল।

ঘুঁটে বা ঘুঁইটা—কেবলমাত্র গোবর বা তাহার সহিত কুটি কিম্বা তুঁষ, কাটের গুঁড়া মিশাইয়া গুলি রূপাটির মত এক একখণ্ড শুকাইয়া লওয়া হয়। এই গুলি রন্ধন কার্য্যে লাগান হইয়া থাকে। যেখানে রন্ধনাদি কার্য্যের জন্য কাট, কয়লা মিলে না, সেখানে গোবর সার হিসাবে চাষের কার্য্যে খরচ না হইয়া রন্ধনাদির কার্য্যে লাগান হইয়া থাকে। ইহাতে কিন্তু সমূহ ক্ষতি হয়।

আমরা কৃষকে বারম্বার নানাপ্রকার সারের কার্য্যকারীতা তুলনা ও আলোচনা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, যাবতীয় সাধারণ সার অপেক্ষা গোবর সারের শক্তি সমধিক।

জ্বালানি ইন্ধনের হিসাবে ঘুঁটের তুলনা করিলে ঘুঁটের উত্তাপ প্রদান শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা কম বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাপক ওয়াটসন সাহেবকৃত কয়েকটি ইন্ধনের গড় উত্তাপ নিম্নে দেওয়া হইল।

ইন্ধনের নাম			দাহনকালে মোট উত্তাপের পরিমাণ।
কেরোসিন্	...	...	১৯৬১১ ভাগ
কয়লা উৎকৃষ্ট	...	...	১২১৪১ ভাগ
জ্বালানি কাষ্ঠ	...	...	৭২১০ ভাগ
ঘুঁটে	...	...	৪৩৩০ ভাগ

যৎটুকু উত্তাপ এক ভাগ জলকে ১ ডিগ্রি ফারণ হিটে উত্তপ্ত করিতে পারে ততটুকু উত্তাপকে ১ মাত্রা উত্তাপ ধরা হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায় যে ঘুঁটের উত্তাপ প্রদান শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা কম।

যে সকল স্থানে কেরোসিন বা কয়লা বা কাষ্ঠ ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করিবার সুবিধা আছে তথায় ঘুঁটে পোড়ান উচিত নহে। সরকারী বিবরণীতে ঘুঁটের দামেরও একটা তালিকা করা হইয়াছে এবং কাষ্ঠ, কয়লার সহিত ইহার দামের তুলনা করা হইয়াছে।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১ মণ ঘুঁটের দাম ।০ আনা,
বোম্বাই প্রদেশে ১ মণ ঘুঁটের দাম ।১০ আনার অধিক নহে।
মান্দ্রাজে ইহার দাম গড়ে ৵০ আনা।

বিভিন্ন স্থানে কয়লা বা কোকের মূল্য—

	কয়লা	প্রতি মণ খুচরা	কোক্
কলিকাতা	।৶০	,,	॥৶০
মান্দ্রাজে	॥০	,,	৸০
পাটনা	।৶০	,,	॥৶০
সুরাট	॥০	,,	৸০

উপরোক্ত তালিকায় বুঝা গেল মান্দ্রাজে ঘুঁটে জ্বালানিরূপে ব্যবহারে লাভ আছে। বাঙলায় ১৲ টাকার ঘুঁটে এবং ১৲ টাকার কয়লায় প্রায় সমান কার্য্যকারী উত্তাপ পাওয়া যায়। মূল্য হিসাবে ধরিলে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, কেরোসিন ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে মান্দ্রাজ ব্যতীত সর্ব্বত্রই অধিক খরচ পড়ে এবং ঘুঁটে ব্যবহার করিলে সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচে হয়। কেরোসিন আবার ষ্টোভ ব্যতীত ব্যবহার করা চলে না। কয়লা জ্বালাইতে গেলে স্বতন্ত্র চুলির আবশ্যক ইহাতেও কিছু ব্যয় বাহুল্য আছে। কিন্তু একটা কথা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে গোবর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার, জ্বালানি ব্যতীত ইহার অপর ব্যবহার না থাকিলে ইহাকে জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিলে আমরা কোনপ্রকারে বাধা দিতাম না। উদ্ভিদের তিনটি প্রধান খাদ্য গোবরে আছে—ইহাতে নাইট্রোজেন আছে, পটাস আছে ও ফস্ফরিক অম্ল আছে। এক শত সের গোবর সারে প্রায় এক সের নাইট্রোজেন, এক সের ফস্ফরিক অম্ল ও ১॥০ সের পটাস আছে। এই উপাদান গুলির মূল্য বাজার দরে যথাক্রমে ১।০+।৶০+৶০ আনা। ১০০ সের গোবর সারের মূল্য ১৸৶০ আনা দাঁড়াইল। জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করিলে ১০০ সের ঘুটের মূল্য ॥৶০, কিন্তু সাররূপে ব্যবহারে তাহার দাম ১৸৶০—আড়াই গুণ অধিক। সুতরাং ঘুঁটে জ্বালানি না করিয়া সাররূপে ব্যবহার করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বাঙলাদেশে ১৲ টাকা মূল্যের গোবর ব্যবহার করিলে ২॥০ টাকা মূল্যের খনিজ সার ব্যবহারের সমতুল্য হয়, ইহা বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার বিষয়।

আলুর চালান—বর্ত্তমানযুগে অধিকাংশ স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, খাদ্যদ্রব্য সমূহ ক্রমশঃ অধিকতর মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে। উৎপাদনের কেন্দ্র হইতে ব্যবহারের কেন্দ্র পর্য্যন্ত বহনির খরচের তারতম্যে দ্রব্যাদির মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গোলআলুর উল্লেখ করিতে পারা যায়। আলু চাষের প্রকৃত খরচ যত হউক কি না হউক বহনি খরচেই আলুর মূল্যবৃদ্ধি পাইয়া থাকে। যখন ইহা বিবেচনা করা যায় যে আলুর ওজনের তিন চতুর্থাংশ কেবল

মাত্র জল, তখন মনে হয় যে, শুদ্ধ জলের বহনির জন্য যে অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, তাহা যদি কোন প্রকারে বন্ধ করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে আলুর দাম অপেক্ষাকৃত কম হইত। সম্প্রতি সেইরূপ একটি উপায়ই আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহাতে পরিষ্কৃত ও খোসা ছাড়ান গোটা অথবা চাকা আলু চাপ প্রয়োগ দ্বারা এরূপভাবে শুষ্ক করিতে পারা যায় যে উহাতে আদৌ জল থাকে না। আলু চাপে কঠিন হইয়া যায়। ব্যবহারের পূর্ব্বে সামান্য সময় জলে ভিজাইয়া রাখিয়া তৎপরে সাধারণ আলুর ন্যায় তরকারিতে ব্যবহার করিতে পারা যায়। স্বাদের কিছুমাত্র তারতম্য হয় না। ঐ প্রথায় দুইটি সুবিধা আছে—প্রথমতঃ আলুর ওজন তিন চতুর্থাংশ কমিয়া গিয়া বহনি খরচ অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় এবং দ্বিতীয়তঃ আলু সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হওয়ায় সাধারণ আলুতে পচার জন্য যে লোকসান হইত তাহা হইতে পারে না। ফলতঃ এই প্রথা বিশেষ লাভ জনক হইলেও আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইবার এখনও বিলম্ব আছে। আপাততঃ একটি জর্ম্মণ কোম্পানিই ইহার পেটেণ্ট করিয়াছেন এবং জর্ম্মণিতেই ইহার প্রচলন প্রথমতঃ হইবে। তবে সময় ক্রমে এদেশেও যে এই নব প্রথা আসিবে তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

মসলার উপকারিতা—লবঙ্গ, দারুচিনি, মরিচ প্রভৃতি মসলা তরকারিতে স্বাদ অথবা গন্ধ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে মসলা সমূহের জীবাণু নাশক শক্তিও কম নহে এবং এই হিসাবে দারুচিনি (অর্থাৎ উহার গন্ধোৎপাদক তৈল) এমনকি হাইড্রাজ পারক্লোরাইড্ দ্রাবণ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। লবঙ্গের তৈল দারুচিনির তৈল অপেক্ষা চতুর্গুণ কার্য্যকর। গোলমরিচ, লঙ্কা, আদা, সরিষা প্রভৃতি মসলায়ও অল্প বিস্তর তৈল আছে এবং ঐ সমুদয় তৈলের উপাদানে এমন কোন না কোন একটি পদার্থ আছে যাহা ব্যাক্টিরিয়া বৃদ্ধির অন্তরায়। এইজন্য যে স্থলে কোন পক্ক খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করিতে হয় সেখানে পরিমাণ মত মসলা প্রয়োগ করিলে শুদ্ধ যে স্বাদ ও গন্ধ রুচিকর হয় তাহা নহে, রক্ষিত দ্রব্যও শীঘ্র পচিতে পায় না। অবশ্য মসলা ভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে অন্য কোন রক্ষণশীল পদার্থ ব্যবহার করিতে হয়। শুধু মসলাই যথেষ্ট হয় না।

পত্রাদি

রবার বৃক্ষের আবাদ--রবার আবাদের বিষয়ক প্রশ্ন সম্বলিত আমরা তিন খানি পত্র পাইয়াছি তাহার উত্তরে আমরা জানাইতেছি—

এদেশে দুই প্রকার রবার বৃক্ষের আবাদ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে—একটি প্যারা রবার ও অপরটি সিয়ারা রবার। আজ কালকার দিনে রবারের অনেক আবশ্যক। বাঙলা দেশে ইহার আবাদ প্রচলন করিতে পারিলে মন্দ হয় না। কিন্তু ব্যবসায়ের হিসাবে রবার বৃক্ষের আবাদ তাদৃশ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয় না। আসামে ইহার আবাদ কথঞ্চিৎ সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই দুই প্রকার রবারই ব্রেজিল দেশীয়, ব্রেজিলে সাধারণতঃ জানুয়ারি হইতে জুন পর্য্যন্ত বর্ষা। এপ্রিল মাসেই বৃষ্টির প্রকোপ বেশী এই মাসে ১৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বারি পতন হয়। এখানকার মাটি সরস ও উর্ব্বর। এইরূপ মৃত্তিকাতেই ইহার আবাদ ভাল রকম হওয়া সম্ভব। এই বিশ্বাসে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে ও সিংহলে ইহার আবাদ করিবার চেষ্টা হয় কোথাও সুবিধামত আবাদ হয় নাই। একমাত্র ব্রহ্মদেশে ইহার আবাদ সুবিধাজনক হইতে পারে। দুই জাতীয় রবারের মধ্যে সিয়ারার গাছ অপেক্ষাকৃত সহজে উৎপন্ন করা যায়, সহজে মরে না, বাড় বৃদ্ধি কিঞ্চিৎ অধিক। চট্টগ্রাম, আসাম যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব ও মান্দ্রাজে ইহার আবাদ প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। দেখা যাইতেছে যে ব্রেজিল হইতে তথাকার অনুরূপ ও সম পরিমাণ রবার এখানে ও উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। "ব্রিটিশ ভারতে রবারের আবাদ" নামক মিঃ রাইট লিখিত পুস্তকে রবার চাষের বিশেষ তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে।

লেবু ঘাস—কৃষকের কতিপয় গ্রাহক লেবু ঘাস সম্বন্ধে জানিতে চাহেন। তদুত্তরে তাঁহাদিগকে জানান যাইতেছে যে, লেবু ঘাস বাঙলা দেশে অনেক স্থানে সহজে জন্মিয়া থাকে। এখানে অনেকে সখ করিয়া বাগ বাগিচায় লাগাইয়া থাকেন কিন্তু ইহা হইতে সুগন্ধী তৈল বাহির করিবার চেষ্টা দেখা যায় না। ঘাস একবার লাগাইলে অনেক বৎসর থাকে। মাঝে মাঝে গোড়া কোপাইয়া সার দিলে ভাল হয়। বৎসরের মধ্যে দুই তিন বার কাটাইয়া লইলে পুনরায় বেশ ঝাড় হইয়া উঠে। বর্ষাকালে একটা ঝাড় ভাঙ্গিয়া অনেকগুলি নূতন ঝাড় উৎপাদন করা যায়। আসামে পার্ব্বত্য প্রদেশে এই ঘাস প্রচুর জন্মিতে দেখা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে ১০০০ মণ ঘাস হইতে প্রায় ৩৮২ আউন্স তৈল পাওয়া যায়। বাঙলায় সাধারণতঃ ২ আউন্সে এক ছটাক তৈল ধরিয়া লওয়া

যায়। ১০০ মণ ঘাস হইতে তৈল বাহির করিবার খরচ ৩৫৲ হইতে ৪০৲ টাকা। তৈল ৮৲ সের দরে বিক্রয় হইতে পারে।

ছোট এলাচ—বড় এলাচ—গিরীন্দ্রমোহন সরকার, মাতলা, ২৪ পরগণা। আপনার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে বড় এলাচ, ছোট এলাচ বাঙলায় সমতল ভূমিতে ভাল জন্মে না। আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলে ওয়াজিল, শিলং প্রভৃতি স্থানে ছোট এলাচ, বড় এলাচ বেশ ভাল রকম জন্মিতে দেখা যায়। এলাচ বেশ ধরিয়া থাকে। তবে এতদঞ্চলে এলাচ গাছে ছাতা রোগে বড় ক্ষতি করে। বড় এলাচ খাসিয়া পাহাড় ও আসামের অন্য পার্ব্বত্য দেশে বনে জঙ্গলে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায় সুতরাং বড় এলাচ এখানে ভাল হইবার কথা। বাঙলার নিম্ন ভূমিতে বড় এলাচের ফল হয় কিন্তু তাহা তত সুপুষ্ট হয় না। ছোট এলাচের চাষ হয় না বলিলেই চলে। এলাচের জন্য রসা জমি ও ঠাণ্ডা জল হাওয়ার আবশ্যক। এইজন্য আমাদিগকে এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতির জন্য ভারত মহাসাগরের দ্বীপ পুঞ্জ হইতে আমদানী অপেক্ষায় থাকিতে হয়।

রিটার আদর—আমরা বনে জঙ্গলে যে সমুদয় দ্রব্য অনাদরে নষ্ট হইয়া যাইতে দিই বিদেশীরা সে সকল হইতেই দু পয়সা করিয়া লয়। রিটা অবশ্য অনেকেই দেখিয়াছেন। ইহার উপরের খোসা চূর্ণ করিয়া অপরাপর দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া যে সাবান প্রস্তুত হয় তাহার মূল্য সামান্য অথচ পরিষ্কার রাখার ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক। রিটার আঁটি হইতে যে তৈল হয় তাহাও সাবান প্রস্তুত এবং অপরাপর কার্য্যে লাগিয়া থাকে। জর্ম্মণ ব্যবসায়ীগণ এইজন্য প্রত্যেক বৎসর অনেক পরিমাণ রিটা ক্রয় করিয়া থাকেন। আমাদের দেশ হইতে যে কতক পরিমাণ রিটা রপ্তানি না হয় তাহা নহে, কিন্তু মরক্কোর নিকটবর্ত্তী আলজিরিয়া প্রদেশে আজকাল রিটার রীতিমত চাষ হইতেছে এবং সেই স্থান হইতেই জর্ম্মণি প্রধানতঃ রিটা বীজ ক্রয় করেন। চীন দেশে রিটার নিকট আত্মীয় একটি আছে। উহার চাষ আমেরিকায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত গরম কাপড় ধোলাই করা ভিন্ন অন্য কার্য্যে সামান্যই রিটা ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানের জঙ্গল রিটাগাছে পরিপূর্ণ। অভাব কেবল উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা ঐ বীজ সংগ্রহ করিয়া কাজে লাগান। যত দিন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সে চেষ্টা না হইবে ততদিন শুধু রিটা কেন অনেক বন্য দ্রব্যই অর্থে পরিণত না হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইবে।

গরুর আটালু—গৃহ পালিত গবাদি জন্তু মাত্রেরই গায়ে আটালু ধরে। ছোট বড় কয়েক জাতীয় আটালু আছে। উহারা জন্তুগণের শরীরের রক্ত খাইয়া

বৰ্দ্ধিত হয়। আটালু যে কি প্রকার পোকা তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। ইহারা জন্তুর গায়ের রক্ত ছাড়া ঘাস কিম্বা গাছের কচি পাতার রস খাইয়াও বাঁচিতে পারে। ইহারা স্তুপাকারে ডিম পাড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে ইহাদের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া যায়।

কেরোসিন তৈল ও জলে কিঞ্চিৎ পরিমাণ সাবান গুলিয়া গরু বাছুরের গা ধোয়াইয়া দিলে আটালু মরিয়া যায়। জলে অধিক পরিমাণে কেরোসিন মিশাইলে গরুর গায় অত্যন্ত জ্বালা ধরে। ২০ সের জলে ১ সের সাবান মিশ্রিত কেরোসিন তৈলের অধিক মিশান উচিত নহে। অন্য উপায় আটালু বাছিয়া মারিয়া ফেলা। পল্লিগ্রামে লোকে একটি আগুন মালসা লইয়া গরুর গায়ের আটালু বাছিতে থাকে। আটালু বাছিয়া সে গুলিকে ঐ আগুনে ফেলিয়া মারা হয়। ইহাতে কিন্তু অনেক সময় যায় এবং একেবারে আটালু মারিয়া নিঃশেষ করা সহজ নহে। পারিজাত যাহাকে সহজ ভাষায় পালুতে মাদার বা তেপালুতে বলে তাহার ছাল ছেঁচিয়া অল্প জলের সহিত বাটিয়া গরুর গাত্রে মাখাইলে দুই দিন মধ্যে গবাদির গায়ের আটালু মরিয়া যায়। গবাদির গায়ে আটালু ধরিলে তাহারা জীর্ণ শীর্ণ হয় এবং ছোট ছোট বাছুর মরিয়াও যাইতে পারে।

পারিজাত—(পালুতে মাদার) ইহার পাতার রস মধুর সহিত মিশাইয়া খাইলে ক্রিমি নাশ হয়। পাতার রস ছোট চাম্‌চের এক চাম্‌চে ও এক চাম্‌চে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইতে হয়। পালুতে মাদারের পাতা বাটিয়া ঝোল করিয়া খাইলে উদরাময় ও আমাশয় আরোগ্য হইতে পারে। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে পালুতে মাদার পাতার রস এক ছটাক সর্প দংশন মাত্র খাওয়াইতে পারিলে রোগী আরোগ্য হইতে পারে। পাতার রস নিঙড়াইয়া লইয়া সেই সিঠা ক্ষত স্থানে লাগাইতে হয়।

ধানের ক্ষেতে ক্ষারী লবণ—ধানের আবাদের সাধারণ কতকগুলি নিয়ম জানিলেই ধানের চাষে সফল মনোরথ হওয়া যায় না। ধানের চাষ সহজ কিন্তু এক একটি দৈবী উৎপাতের সময় শস্য রক্ষা করিবার উপায় জানা নাই। এক এক প্রকার ধানের চাষের তারতম্যে ফসল বাড়ে কমে। ক্ষেত হইতে শস্য আহরণের পরই জমি চষিয়া ক্ষেতে ধানের আবাদ করিলে কোন কোন ধানের ফলন কমিয়া যায়। সাহাবাদ জেলায় চাষীরা আশ্বিন মাসে ধানের ক্ষেতের জল বাহির করিয়া দেয় আবার কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই তাহাতে জল তুলিয়া দেয়। এতদ্বারা তাহারা একর প্রতি ৮ মণ ধান বেশী পায়। ইহা শুধু যে সাহাবাদের প্রথা

তাহা নহে অন্যান্য স্থানের চাষীরাও এরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়া থাকে। ধানের ক্ষেতে সুড়ঙ্গকারী পোকা লাগিলে কোন কোন স্থানের চাষীরা এক প্রকার বিষাক্ত পাতা ধান ক্ষেতের জলে ফেলিয়া দেয় পাতার বাঙলা জানা নাই, ইহার শাস্ত্রীয় নাম—Cleistanthus Collinus. বাঙালায় চাষীরা এ সন্ধান জ্ঞাত নহে। পঞ্জাবে চাষীরা ধানক্ষেতের জলজ আগাছা মারিবার জন্য জমি চষিবার সময় বাকস (adhatoda vasica) পাতা দিয়া থাকে। ইহার পাতায় আগাছা নষ্ট করিবার মত বিষাক্ত গুণ আছে। সাহাবাদে দক্ষিণা বাতাস বহিলে ধান রোগাক্রান্ত হয়। তথাকার চাষীরা তাহার প্রতিকার জন্য ক্ষারী লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর স্মিথ সাহেব কটকে এবং বাঁকিপুরে ধানের ক্ষেতে সালফেট অব ম্যাগ্নেসিয়া প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে ভাল ফল দাঁড়াইয়াছে। দুই মণ লবণ দিয়া এক একরে ১৪ মণ ধানের ফলন বাড়িয়াছে। ১৯১১ সালে পুষাতে ক্ষারী লবণের গুণ পরীক্ষা হয়। সেখানে ২॥ একর জমিতে এক মণ লবণ দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, যে জমিতে ক্ষারী লবণ পড়ে নাই তাহার ফলন একর প্রতি ২১ মণ কিন্তু লবণ দেওয়া জমিতে ৩৮ মণ ধান জন্মিয়াছে। ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ক্ষারী লবণে ধানের অনেক রোগ সারে এবং সারের কার্য্য করে।

সয় বিন—ইহা এক প্রকার সিম বিশেষ। জাপানে এই প্রকার সীমের খুব চাষ হয়। এক প্রকার ছোট দানা জাপানী সীম আনাইয়া নাগপুরে চাষ করা হইয়াছিল। এই জাতীয় সীমের নাগপুরে বেশ ভাল ফলন হইয়াছে। ইহা অনেকটা অনাবৃষ্টিসহ। এক একরে ৮০০ পাউণ্ড সীম জন্মিয়াছে। এই জাতীয় সীমে তৈলের ভাগ খুবই কম, শতকরা ১৩ ভাগ মাত্র কিন্তু ইহাতে প্রোটিডের মাত্রা বেশ আছে। প্রোটিড মনুষ্য ও পশু দেহ পোষণের প্রধান উপাদান। এই হিসাবে মানুষের ও গবাদির খাদ্য। এই জাতীয় সীমের বাঙলাদেশে নাম হনুমান কড়াই ইহা আমাদের দেশের বরবটির অনুরূপ। প্রায় ১৫ রকম এই জাতীয় কড়াইয়ের চাষ হইতেছে, এদেশে ইহার প্রচুর চাষ হইলে পশু খাদ্যের বিশেষ সাহায্য হইতে পারিবে।

সার-সংগ্রহ

খর্জ্জুর ও পাট

গভর্ণমেণ্ট আমাদের নিকট হইতে মাঝে মাঝে বিঘা প্রতি পাট ও ধান্যের আয় সম্বন্ধে একটা হিসাবকিতাব লইয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা মফঃস্বলের জমিদারদিগের নিকট হইতে জানিতে চাহেন যে পাটে বেশী আয় না ধানে বেশী আয়। এ ধানের অর্থ আশু ধান বা আউশ ধান ভিন্ন অন্য ধান হয় না। তাই সেবার স্বদেশী মাসিক পত্রে আমি 'পাট ও ধান' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছিলাম যে পাটের জমির পাইট, সার, টাকায় ২টা করিয়া মজুর এবং পাট কাচার পর ক্ষেতওয়ালার চিকিৎসা খরচ ধরিলে তাহার কিছুই লাভ থাকে না। চিকিৎসার কথা বলিলাম কেন, না পচা জলে পাট কাচার পর কৃষাণকে নিশ্চয়ই একটা না একটা রোগ ভোগ করিতে হয় ইহা আমাদের নিত্য পরীক্ষিত। বিশেষতঃ ধান বাঁধা-ফসল, হয়ত ২৫ বৎসর পরেও গৃহস্থের সমূহ উপকারে আসে, আর এক বৎসর পাটের দর না উঠিলে দ্বিতীয় বর্ষে পাটের কোন দরই প্রায় থাকে না।

যাই হউক বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমি দেখাইব যে পাট আসিয়া নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও চব্বিশপরগণা জেলার একটা দুর্লভ ফসল—গৌরবের জিনিষ ধ্বংস করিবার জন্য শনৈঃ শনৈঃ কৃষাণকে যাদু করিয়া ফেলিতেছে।

খেজুর গুড়ের সুমিষ্ট আস্বাদে রসনার তৃপ্তি সাধন করিতে কার না লালসা হয়? এই খেজুর গুড়ের জন্মস্থান খুলনা, যশোহর, নদীয়া ও চব্বিশপরগণার কতক অংশ। সাহিত্য সভার মাসিক পত্র সাহিত্যসংহিতায় একবার 'আমাদের ইচ্ছামতী' শীর্ষক কবিতার একস্থানে লিখিয়াছিলাম।

"বল কোথা অষ্ট বক্র খর্জ্জুর হরষে—
প্রদানিছে সুধা নীর নিজ কণ্ঠ চিরে;
ওগো এস দেখে যাও সাধ থাকে যদি—
আমাদের কাক চক্ষু ইচ্ছামতী তীরে।"

একদিন সেই অষ্টবক্র খেজুরগাছ পঙ্গপালের ন্যায় মধ্যবঙ্গের সরস মাঠ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিলই বা কেন? আবার সেই ৬০।৭০ বৎসরের আওলাত একণে বাঙ্গালার মাঠ হইতে অন্তর্দ্ধান হইতেছেই বা কেন?

যখন এদেশের কৃষাণ পাট চিনিত না, ডাঙ্গার জমীতে আউশ ধান বুনিত, ললিতা কুণ্ডের বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা আসিয়া সমগ্র মাঠ ডুবিয়া যাইত। কৃষাণ আধ পাকা আউশ ধান্য কাটিয়া মনে ভাবিত এই পলিপড়া উর্ব্বর জমিতে রবিশস্যের সহিত আর কোন আবাদ লাগান যায় কি না?

শেষে তাহারা হরিতের সহিত ডাঙ্গার জমিতে খেজুরের আঁটি পুতিয়া দিত। খেজুর বীজ খুব ফাঁক ফাঁক করিয়া পুতিতে হয়। যে জমিতে খেজুর চারা লাগান হয় সেই জমীতে আউশ ধান ও রবিশস্যের আবাদের কোন ব্যাঘাত হয় না; কারণ খেজুর, তাল, সুপারি ও নারিকেল এক জাতীয় গাছ। তাল ও নারিকেল হইতে খেজুরের শিকড় সরু ও স্বল্পবিস্তৃত। খেজুর গাছ যত দীর্ঘ ও আয়কর হইয়া সাবালক হইতে থাকে ততই আওতা কমিয়া যায়। ইহার সামান্য আওতাতেও যেটুকু ক্ষতি হইবার কথা বানের পলীতে তাহা পূর্ব্বে নিবারিত হইত। খেজুর গাছ ছাগল গরুতেও কম খায়, বিশেষতঃ গাছ দুই বৎসরের হইলে হোলি বৃক্ষের ন্যায় তাহার কণ্টকময় পত্রের নিকট কোন পশুই অগ্রসর হয় না, কাজে কাজেই খেজুরের আবাদ করিয়া কৃষাণকে আর পাড়াপড়সীর গরুছাগল ধরা পাকড়া করার জন্য অনর্থক বিবাদের সৃষ্টিপাত করিতে হয় না।

এই প্রকারে অতীতকালে কৃষকগণ ডাঙ্গার জমিতে খেজুরগাছ লাগাইয়া ৬।৭ বৎসর উত্তমরূপ হরিৎ ও আশুধান্য উৎপন্ন করিয়া লইত। খেজুর গাছ ৬।৭ বৎসরের মধ্যে সাবালক অর্থাৎ কণ্ঠ চিরিয়া সুমিষ্ট রস দিবার উপযুক্ত হইয়া পড়ে। এই গাছ সাবালক হইলে সেই জমিতে কৃষক প্রথম ভাদুরে কলাই ও আশুধান্য বপন করে আবার গাছ বেশী ঘন হইয়া গেলে কেহ কেহ ধানের পরিবর্ত্তে কেবলই ভাদুরে, কাত্‌কে, অড়হর, তেওড়া প্রভৃতি লাগাইয়া শেষে শীতের দীর্ঘ আবাদ-গাছ কাটিয়া গুড় তৈয়ার করিতে আরম্ভ করে। চাষীগণ আশ্বিনের শেষ হইতে চৈত্রের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত গাছ কাটিয়া থাকে। একবার খেজুর গাছ লাগাইতে পারিলে কৃষক ৪।৫ পুরুষ পর্য্যন্ত ভোগ করিতে পারে।

প্রকৃতির প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ভগবানের কেমন একটা অনুগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা না থাকিলে সে পরিবর্ত্তন স্থায়ী হইতে পারে না।

যেমন মুর্শিদাবাদ জেলার ললিতাকুণ্ডের বাঁধ ভাঙ্গিয়া এ অঞ্চলে প্রবল বন্যা আসা বন্ধ হইয়া গেল, অমনি কোথা হইতে পাট উড়িয়া আসিয়া মাঠ জুড়িয়া বসিল, আবার পাটের সঙ্গে সঙ্গেই ম্যালেরিয়ারও প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইল। পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি বৎসর বন্যা আসা বন্ধ না হইলে এ দেশের প্রজাগণ পাট বুনিলেও কাচিবার ভয়ে উক্ত আবাদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত; কারণ বন্যা আসিলে

এ অঞ্চলের মাঠ ঘাট প্রায় সমস্তই প্রখর স্রোতে তৃণশূন্য হইয়া পড়িত, সে সময় কখনও খানা ডোবা বা পচা পুকুরে পাট পচান সম্ভবপর হইতে পারিত না।

অনূ্যন ২৫ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি তখন আমাদের শৈশবকাল, তখন আমরা এরূপ গ্রামব্যাপী ম্যালেরিয়ার কথা জানিতাম না। কেবল গদখালী উলা ও বর্দ্ধমানের মহামারীর কথা উপকথার মতন শুনিতে পাইতাম। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে সেবার ৺ পিতাঠাকুর মহাশয় কলিকাতার বাসায় মৃত্যুশয্যায় বসিয়া ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়কে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন "ডাক্তারবাবু ১৫ বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবি নাই যে দেশের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্বরের ভয়ে শেষে আপনাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে।"

পাট না বুনিতেই ব্যাপারী আসিয়া ক্ষেতওয়ালার দ্বারে দ্বারে নূতন নোট দাদন দিয়া যাইতে লাগিল। প্রজারা মহাজন ও জমিদারের বাড়ী পাতিপুকুরের ছাপ দেওয়া মড়্‌মড়ে টাটকা নোটের তাড়া আনিয়া বহুদিনের ঋণ পরিশোধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। জমিদারও প্রজার নিকট হইতে বাকী বকেয়া সব আদায় করিয়া লইয়া প্রজাকে পাট বুনিবার পরামর্শ দিয়া কলিকাতাভিমুখে পাড়ি দিতে লাগিলেন। প্রজা পাটের প্রলোভনে পড়িয়া নূতন করিয়া খেজুরের চারা লাগাইবার কথা ভুলিয়া গিয়া যাহাতে বাপ ঠাকুরদাদার আমলের খেজুর বাগান সব লোপাট হয় তাহারই ব্যবস্থা করিতে লাগিল। তাই আজ দিন দিন এদেশের মাঠ খেজুরগাছ শূন্য হইয়া পড়িতেছে, ইছামতীর উর্ব্বর শ্যামল তীরে আর খর্জ্জুর বৃক্ষগুলিকে শালতরুর ন্যায় উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যায় না। প্রজাগণ ক্রমশঃ সস্তা দরে কামার কুমার ও গৃহস্থের নিকট জ্বালানীর জন্য খেজুর গাছ বিক্রয় করিয়া তাহাতে পাটের আবাদ করিতেছে। যখন খেজুরের আবাদ এ দেশে বেশী ছিল তখন এ অঞ্চলের স্থানে স্থানে অনেক বড় বড় চিনির কারখানা ছিল। চিনি তখন এখানে কত সস্তায় পাওয়া যাইত। এক্ষণে কেবল গোবরডাঙ্গা ও কোটচাঁদপুর প্রভৃতি ২।১টী গঞ্জে সামান্য ২।৪টা কারখানা মিটি মিটি করিতেছে মাত্র।

ইছামতী তীরে চান্দুড়িয়া চন্দনপুরের নাম অনেকেই অবগত আছেন। পূর্ব্বে শীতকালে এই চান্দুড়িয়ার হাটে ১০।১২ ক্রোশ হইতে হাট বসিবার পূর্ব্বে তিন দিন দিন-রাত ধরিয়া অনবরত গুড় বোঝাই গাড়ী আমদানী হইত এবং কলিকাতা হইতে বহু ব্যাপারী আসিয়া সেই গুড় কিনিয়া দেশ বিদেশে চালান দিত। বর্ত্তমানে চান্দুড়িয়ার হাটে শীতকালে হাটবারে ৫০ খানি গুড়ের গাড়ী আমদানী হয়, কিনা সন্দেহ। খেজুর গাছের আবাদ যখন বেশী ছিল তখন স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও গ্রামের যথেষ্ট উপকার হইত। প্রত্যেক কৃষাণের গৃহ পার্শ্বে অনূ্যন ৪।৫ মাস পর্য্যন্ত

প্রাতঃকালে ৫ ৬ ঘণ্টা ধরিয়া রস জ্বালাইয়া গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য বনজ লতাপাতার দপ্‌দপে আগুন সমভাবে প্রজ্বলিত হইত। তদ্দ্বারা সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু অনেক ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। কৃষকগণ রস জ্বালানির জন্য বর্ষার অব্যবহিত পরেই গ্রামের বন জঙ্গল আদাড় বিধাড় কাটিয়া ফেলিত। গ্রামগুলি নিবিড় অরণ্য এবং মশা, সর্প, বরাহ প্রভৃতির অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়া শীতের আরম্ভে যেন হাসিতে থাকিত। পাকা খেজুর ফল খাইয়া জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে ধানের টানাটানির সময় অনেক গরীব চাষা এক বেলার আহারের কার্য্য সমাধা করিয়া রাখিত, খেজুরের পাতা দ্বারা বেদে জাতি অতি সুন্দর পাটী তৈয়ার করে তাহাকে এদেশে বেদেপাটী কহে। বেদেপাটী এ অঞ্চলের গরীব লোকের শীতলপাটী হইয়া ঘরে ঘরে বিরাজ করে। খেজুরের পাটী হইতে চিনি রাখা উত্তম বস্তা প্রস্তুত হইয়া স্থানান্তরে চালান যায়। সম্ভবতঃ কাঁঠালের বীজের ন্যায় খেজুরের বীচি হইতেও একপ্রকার ময়দা প্রস্তুত হইতে পারে। খেজুর গাছ আরো অনেক উপকারে আসে। গরুর খাবারের আকাল উপস্থিত হইলে কেবলমাত্র খেজুরের পাতা কাটিয়া খাওয়াইয়া অনেক গৃহস্থ গরু বাঁচাইয়া রাখে।

পাটের দৌলতে ধানের চাষ কম হইয়া পড়িতেছে, স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া জীবন আয়ুহীন হইয়া যাইতেছে, পানীয় জল দূষিত হইয়া প্রতি বৎসর গ্রামে মহামারীর সৃষ্টি হইতেছে, আর আমাদের অঞ্চলের—কেবল আমাদের অঞ্চলের কেন—সমগ্র ভারতবর্ষের একটা বড় আমাদের—বড় গৌরবের—আয়কর দুর্লভ জিনিষ, তাহার জন্মস্থান হইতে চিরদিনের জন্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে যে গুড়ের মণ দুই টাকা ছিল এক্ষণে পাঁচ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইতেছে, আর কিছুদিন পরে খেজুর গুড়ের কথা দূরে থাকুক খেজুর গাছের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও লোপ পাইয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্ট একদিন মাটী খুঁড়িয়া শিকড়ের নিদর্শন দেখিয়া খেজুর গুড়ের আবাদ এককালে ছিল বলিয়া হয় ত তাঁহাদের খাতার একপাশে লিখিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ কৃষকগণ যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খেজুর বাগান কাটিয়া ফেলিয়া দিতেছে তাহা দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হইয়া যায়। মৎস্য আইনের মতন খেজুর গাছ রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একটা আইন পাস না করিলে কিছু দিন পরে খেজুরের গুড় আর এদেশে দেখিতে পাওয়া যাইবে না! যাহা একবার ধ্বংস হইয়া যায় তাহা আর সহস্র চেষ্টা করিলেও পরে ফিরিয়া আসে না।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়। (ভারতী)

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আশ্বিন মাস।

সব্জীবাগান।—এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই জলদি জাতীয় কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈয়ারী হইয়াছে। এই সময় নাবীজাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মূলজ সব্জীর চাষ এই সময় হইতে আরম্ভ। মূলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। বেগুন চারা ইতিপূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। জলদি কপিচারা যাহা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাতা গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়।

ফুলের বাগান।—এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ডালিয়া, ক্রিয়াস্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুল বীজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় বেগোনিয়া, জেরিনিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কাটিং বসাইতে পারা যায়, কিন্তু পাহাড়ে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়—সুতরাং সাসি দ্বারা আবৃত স্থানে সে সকল কাটিং পোতা উচিত। গোলাপের কলম (Budding) এখন করা যাইতে পারে—বিশেষতঃ হাইব্রীড পারপেচুয়াল জাতীয় গোলাপের বডিং হইবে। চীনা, টি, বুরবন জাতীয় গোলাপের কাটিংও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এখন করা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে সব্জী তৈয়ারী করা হইয়া উঠে না। তবে [illegible] ভিতর যত্ন করিয়া করিলে কিছু কিছু হইতে পারে। পর্ব্বতে দ্রাক্ষালতায় এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলি কাটিয়া, ছাঁটিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া, [illegible]াইতে হইবে।

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় গোলাপ হাপর হইতে নাড়িয়া বসাইতে পারা যায়। এই সময় উক্ত প্রদেশে ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান হইতেছে। আশ্বিন মাসের শেষে কার্ত্তিকের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারী হইয়া উঠিবে।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ খণ্ড। | আশ্বিন, ১৩১৯ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

বাণিজ্য বিজ্ঞান

জাপান প্রত্যাগত কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার লিখিত

বাণিজ্য ব্যতীত দেশের ধন বৃদ্ধি হইতে পারে না। কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যের প্রধান সাধক। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য বাণিজ্যের সাহায্যে, দেশ দেশান্তরে নীত না হইলে তদ্দ্বারা দেশের ধনাগমের পথ প্রশস্ত হইতে পারে না। বাণিজ্য দ্বিবিধ, অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য। যদ্দ্বারা দেশের এক ভাগের উৎপন্ন দ্রব্য, অন্য ভাগে নীত হইয়া বিক্রীত হয়, তাহার নাম অন্তর্ব্বাণিজ্য। ইহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয় না; কেবল দেশের এক অংশের ধন অন্য অংশে চালিত হইয়া থাকে। আর যদ্দ্বারা এক দেশের উৎপন্ন কৃষিজাত বা শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার, বিভিন্ন দিগ্‌বর্ত্তী নানা দেশে চালিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে তাহার নাম বহির্ব্বাণিজ্য। এই বহির্ব্বাণিজ্য নানা দেশীয় ধন রত্ন আনয়ন করিয়া কৃষি ও শিল্প প্রধান ভূভাগকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া থাকে। বাণিজ্যই সভ্যতার নিদান। এই বাণিজ্য প্রভাবে ইউরোপ, আমেরিকা দিন দিন অভ্যুদয়ের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছে। এই বাণিজ্য প্রভাবেই তদ্দেশীয় জনগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া, সুখ সৌভাগ্যে স্ব স্ব দেশকে সুর-পুরীতুল্য-শোভায় সুশোভিত করিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে উন্নতির এই সকল সজীব মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াও আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতেছে না।

বস্তুর ক্রয় বিক্রয় বা আদান প্রদানকে 'বিনিময় বলে। যে সকল বস্তুর বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যাইতে পারে, সেই সকল বস্তুকে ধন কহে। ধন ব্যতিরেকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এক স্থানে সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় না, কিম্বা একজনের যত্নে বা পরিশ্রমে সর্ব্বপ্রকার বস্তু প্রস্তুত হইতে পারে না, সুতরাং ধন বিনিময়ে আমরা প্রয়োজনানুরূপ অন্যান্য দ্রব্য প্রাপ্ত হই।

যে বস্তুকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া বিনিময় ব্যাপারের সুবিধা সম্পাদিত হয়, তাহা 'অর্থ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; সুতরাং ধন ও অর্থ একার্থ বাচক নহে। ধন বিনিময়ের অসুবিধা দূরীকরণার্থে অর্থনীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। মনে কর, কাহারও গো সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছে তাহাকে স্বীয় কৃষিলব্ধ ধান্যের বিনিময়ে গো সংগ্রহ করিতে হইবে, এ স্থলে গো বা ধান্য, ধন পদ বাচ্য। গো স্বামীর সে সময় ধান্যের প্রয়োজন না হইতে পারে। আবার যাহার ধান্যের প্রয়োজন তাহার হয়ত গো না থাকিতে পারে। এস্থলে বিনিময়ে সুবিধা না হওয়ায়, সমাজে নানাবিধ অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে, গো মূল্যের উপযুক্ত ধান্য বহন করিয়া লইয়া যাওয়া অল্প আয়াস সাধ্য ও অল্প ব্যয় সাধ্য নহে। এইরূপ অসুবিধা স্থলে, যদি এমন কোন মধ্যবর্ত্তী দ্রব্য থাকে যাহার বিনিময়ে লোকে অনায়াসে ইচ্ছানুরূপ দ্রব্য পাইতে পারেন তাহা সকলেরই প্রার্থনীয়, সেই মধ্যবর্ত্তী দ্রব্য 'অর্থ', পদ বাচ্য ;—যথা স্বর্ণ মুদ্রা, রজত মুদ্রা, তাম্র মুদ্রা ইত্যাদি। সকলেই জানেন যে, অর্থ বিনিময়ে স্ব স্ব অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্য পাওয়া যায়, তজ্জন্যই অর্থের গৌরব। যদি উহার বিনিময়ে কোন দ্রব্য পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে লোষ্ট্রাদির ন্যায় স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র খণ্ডের কোন মূল্যই থাকিত না। গৃহে তণ্ডুল থাকিলে, তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু মোহর, টাকা বা পয়সা তৎসাধনে সমর্থ নহে ; সুতরাং মুদ্রার স্বকীয় কোন গুণ নাই, বিনিময়ের সাধকতাই উহার এক মাত্র উপযোগীতা। অর্থ, বিনিময়ের সুবিধা সম্পাদন করে এবং উহাই দ্রব্য সমুদয়ের মূল্য নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায়। অর্থের প্রচলন হইয়াছে বলিয়া আমাদের যখন যে সামগ্রীর প্রয়োজন হইতেছে, উহাদ্বারা আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা প্রাপ্ত হইতেছি। বাণিজ্য বিনিময় ক্রিয়ার পরিণাম। বাণিজ্য দ্বারাই দেশের ধন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বাণিজ্য প্রথার প্রচলন হেতু বিভিন্ন দেশীয় কৃষি শিল্পজাত দ্রব্য সমূহের বিনিময়ে দেশ মধ্যে ধনাগমের পথ প্রশস্ত হয়। এইরূপে দেশের ধন বৃদ্ধি হইলে লোকে সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

বাণিজ্য দ্বিবিধ। একই দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের দ্রব্য সমূহের বিনিময় ব্যাপারের নাম অন্তর্ব্বাণিজ্য যথা শ্রীহট্টের কমলালেবুর বা বাখরগঞ্জের চাউলের, কলিকাতা অঞ্চলে বিক্রয়। এতদ্দ্বারা কেবল দেশের এক অংশের দ্রব্য অন্য অংশে নীত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদ্বারা দেশের ধন বৃদ্ধি হয় না। আর বিভিন্ন

দেশীয় পণ্যদ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া যে বিনিময় ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহাকে বহির্ব্বাণিজ্য কহে। যথা—ভারতবর্ষের পাট তুলাদির বিলাতে বিক্রয়। বহির্ব্বাণিজ্যই দেশে ধনাগমের প্রধান সাধক।

জল ও স্থল উভয় পথেই বাণিজ্য ব্যাপার সংসাধিত হইয়া থাকে। বহির্ব্বাণিজ্যের পক্ষে জলপথই সুবিধাজনক। সমুদ্র দেশ সমূহকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও, বাণিজ্য যেন তাহাদিগকে পরস্পর সংবদ্ধ করিতেছে। সাগরাদিতে নৌ চালনা করিতে অধিক ব্যয় হয় না, কিন্তু দুর্গম প্রদেশে রথ্যা নির্ম্মাণ করিয়া শকটাদি সাহায্যে বাণিজ্য করিতে হইলে ব্যয় বাহুল্য হইয়া থাকে; সুতরাং দ্রব্য সামগ্রীও অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মূল্য হয়। এইজন্য জলপথে বাণিজ্য ব্যাপার অধিক পরিমাণে সম্পাদিত হইতেছে।

বাণিজ্য জাতীয় উন্নতির মূল। বিনিময়—ইথিওপিয়, ইজিপ্‌সিয়ান্, গ্রীক্, রোম প্রভৃতি প্রাচীন সুসভ্য জাতি বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত অর্থ ও জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া স্বীয় সমাজের ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ, ফরাসি, জার্ম্মান, জাপানী এবং আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের অধিবাসীবর্গ যে এত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। ধনে, মানে, জ্ঞানে ও শিক্ষায় জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন, বাণিজ্যই তাহার একমাত্র নিদর্শন, যে ব্রিটন এক সময়ে অসভ্য বলিয়া সভ্য জাতির নিকট উপেক্ষিত হইত, যে ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসীগণ এককালে মৃগয়ালব্ধ আম মাংসে উদর পূর্ত্তি করিত, সেই ক্ষুদ্রদ্বীপের সুসন্তানগণ বাণিজ্য বলেই বর্ত্তমান সময়ে ধরিত্রীর শিরোভূষণ। "ইংলণ্ডেশ্বরের রাজ্যে কখনও সূর্য্য অস্তমিত হয় না।" এই যে প্রবাদবাক্য শ্রুতিগোচর হয়, বাণিজ্যই তাহার মূল।

বাণিজ্য জন্যই বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হইয়াছে। কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যের প্রধান উপাদান, সুতরাং বাণিজ্যের উন্নতি বিধান কল্পে অগ্রে কৃষি শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে উন্নতিশীল জাতি সমূহ বাণিজ্যের উন্নতি-সাধনার্থ বিবিধ যন্ত্রাদির উদ্ভাবন করিয়া দিন দিন বিজ্ঞানের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা বিজ্ঞানের বলে বসুধার গর্ভ হইতে বিবিধ ধন রত্নাদি উত্তোলন করিতেছেন। বিবিধ বাষ্পীয় যন্ত্র, বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় পোত প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বাণিজ্যের সুগমতা সম্পাদন করিতেছেন। লৌহবর্ত্ম, রাজপথ, সেতু নির্ম্মাণ প্রভৃতি পূর্ত্তকার্য্য সম্পাদন করিয়া কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতি বিধান করিতেছেন। বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি কল্পেই তাঁহারা খাল কাটিয়া, সাগরে সাগরে সংযোগ করিয়া দিতেছেন। উচ্চ শৈল শিখরেও শকট চালনার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং বেগবতী নদীর উপর বিচিত্র সেতু নির্ম্মাণ করিয়া শিল্প কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বাণিজ্য ও দূর দেশে গমন

পূর্ব্বে সমুদ্র পথে দূর দেশে গমন দোষণীয় ছিল না। বশিষ্ঠ ঋষির অনেক বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান ছিল। তিনি সেগুলি লইয়া সমুদ্র পথে যাতায়াত করিতেন। অগস্ত্য ঋষি গণ্ডুষে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, এই পৌরাণিক আখ্যায়িকার মধ্যে বোধ হয় তৎকর্ত্তৃক দুস্তর দক্ষিণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার আভাস পাওয়া যায়। বঙ্গীয় রাজকুমার বিজয় সিংহ বুদ্ধ দেবের সময় সাগর পার হইয়া লঙ্কাদ্বীপে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বোর্ণিও যবদ্বীপে হিন্দু রাজত্ব ছিল। কাম্বোডিয়া দেশে এবং বোর্ণিওর অন্তর্গত বড় বুদ্ধ নামক স্থানে সুবৃহৎ প্রাচীন দেব মন্দিরগুলি এখনও হিন্দু জাতির অতীত শিল্প নৈপুণ্যের ও দূর দেশে গমনশীলতার সাক্ষ্য দিতেছে। হুয়ান (?) চীন দেশে ফিরিবার সময় সমুদ্র পথে গিয়াছিলেন। তিনি যে জাহাজে গিয়াছিলেন হিন্দুরা ঐ জাহাজকে 'নসিবক' বলিত। তাম্রলিপ্ত, অনহিল, বারাপত্তন ও সমুদ্র তীরবর্ত্তী নগরগুলি তখন বাণিজ্যের প্রসাদে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। ফলতঃ এক সময়ে হিন্দু বণিকেরা পূর্ব্বে জাপান, পশ্চিমে আফ্রিকার অন্তর্গত মোজাম্বিক প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতেন। অধিক দিনের কথা নয়, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কোডিগামা, সমুদ্র পথে আসিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন আফ্রিকার পূর্ব্বোপকুলবর্ত্তী মোম্বাসা নামক স্থানের হিন্দু নাবিকেরাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া ভারত মহাসাগর পার করিয়া আনিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে ফিনিসিয়েরা ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বতীর হইতে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে আভির দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, তাঁহারা সে স্থান হইতে ময়ূর, সোণা, বানর ও অন্যান্য দ্রব্য লইয়া যাইতেন। এই আভির দেশকে তাঁহারা আকর বলিতেন। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছিল। ভারতবর্ষীয়েরা দেশীয় জাহাজে চড়িয়া পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও ভারতীয় দ্বীপ পুঞ্জে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। ক্রমে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উদ্যমেরও বিনাশ হইল; স্বদেশ পরিত্যাগ করিবার কথা শুনিলে হৃদকম্প হইতে লাগিল। পূর্ব্বে জলপথের ন্যায় স্থলপথেও হিন্দুরা বহু দূরে গমন করিতেন। পারস্যরাজ ডোরায়েসের অনেক হিন্দু তীরন্দাজ সেনা ছিল। ইহারা তাঁহার সঙ্গে গ্রীস্ দেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে গিয়াছিল। রোমক জাতির সেনাতেও অনেক হিন্দু শাস্ত্রী প্রেরিত হইত। এই সকল শাস্ত্রীর অবস্থানের নিমিত্ত সিসেষ্টার নগরে এক ফটক ছিল। আফগান, বেলুচিস্থানের 'ত' কথাই নাই, কারণ অশোকের সময়েও এই দুই প্রদেশ হিন্দুদিগের অধীন ছিল। 'বেলুচিস্থানের অন্তঃপাতী হিংলাজ এবং কাম্পিয়ান হ্রদের তীরবর্ত্তী জ্বালামুখী এখনও হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ স্থান।

কৃষি-সমিতি

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী লিখিত

ভারতবাসীর শতকরা ৮০ জন কৃষিজীবি। তাহারা ৩০ কোটী স্বদেশী ও প্রায় ৫ কোটী বিদেশী লোকের প্রতি বৎসর অন্নের সংস্থান করিয়া থাকে। শিক্ষা অভাবে তাহাদের কৃষি ও সামাজিক উন্নতির অন্তরায় ঘটিতেছে। পক্ষান্তরে অজ্ঞতা নিবন্ধন প্লেগ, ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি অকালে মারাত্মক ব্যাধির হস্তে তাহারা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় কৃষককুলের অবনতি দ্বারা যে কেবল ভারতবর্ষে অন্নাভাব হইবে তাহা নহে, ভারত হইতে খাদ্যপ্রার্থী অন্যান্য দেশেও খাদ্যের অনাটন অনুভূত হইবে। ভারতীয় কৃষকজাতির উন্নতি বিধান প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কৃষকের উন্নতির নিমিত্ত আমাদের মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উন্নতি করা উচিত।

(১) শিক্ষা　(২) স্বাস্থ্য　(৩) কৃষি

শিক্ষা ব্যতীত মনুষ্যের অজ্ঞতা দূর হয় না, কিম্বা শিক্ষা ব্যতীত মনুষ্যের উন্নতি সম্ভবপর হয় না; সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম। তবে কৃষকদিগের প্রাথমিক শিক্ষার সহিত স্বাস্থ্য ও কৃষিতত্ত্বশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদ্দেশীয় কৃষক-সম্প্রদায় এতই অজ্ঞ যে অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন হইলেও তাহারা পুত্রকন্যা-দিগকে কখনও বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবে না। আমাদের পল্লিগ্রামে বাস। স্বগ্রামে মুসলমান ও নমঃশূদ্রজাতীয় কৃষকদিগের সন্তানদিগকে বেতন ও পুস্তকের ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করান দুষ্কর বোধ করিয়াছি। কৃষকগণ বলে যে, তাহাদের সন্তান বিদ্যালয়ে গেলে তাহাদের গরুবাছুর কে রাখিবে এবং মাঠে তাহাদিগকে কে আহার ও জল যোগা-ইবে? বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন না করিলে এতদ্দেশীয় কৃষকের উন্নতি সুদূর পরাহত।

স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যতীত কেহ শিক্ষালাভ করিতে পারে না। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ইহাও স্বীকার্য্য যে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেও কোন ব্যক্তি স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিগুলি প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইতে পারে না। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, এবং নালা ও খাল কাটিয়া

জল নিষ্কাসনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। জীবন ধারণের নিমিত্ত যেরূপ উপযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন সেইরূপ বিশুদ্ধ পানীয় জলেরও প্রয়োজন। দূষিত জল পান করিলে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে; এবং দূষিত জলে নানাপ্রকার ব্যাধির বীজ নিহিত থাকে বলিয়া ইহা দ্বারা এতদ্দেশীয় সহস্র সহস্র লোক কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগে নিহত হয়। পানীয় জলে কোনপ্রকার ব্যাধির বীজ না আসিতে পারে—তাহার প্রতিরোধের নিমিত্ত প্রতি পল্লিতে সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। সমিতি পানীয় জল রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। কোন ব্যক্তি পুষ্করিণী, কূপ খনন করিতে ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত স্থান ও খরচের পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়ে তাহাকে উপদেশ দিবেন। বঙ্গদেশে অবস্থাপন্ন কৃষকও পুষ্করিণী সহজে খনন করিতে পারেন না। সর্ব্বপ্রথমে তাহার জমিদার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হয়। সমিতি এই বিষয়ে প্রজার হিত করিতে পারেন। বাসগৃহ নির্ম্মাণের সময় সমিতি কৃষককে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। বাসগৃহ কিরূপে নির্ম্মাণ করিলে কৃষকের বাড়ীর বায়ু ও আলোর অন্তরায় ঘটিবে না তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেক গৃহস্থ ঘরের উপর ঘর তুলিয়া আলো ও বায়ুর অভাবে গৃহ নানা ব্যাধির বাসগৃহে পরিণত হয়। প্লেগ এইরূপ গৃহই সহজে আক্রমণ করিয়া থাকে। এক বাসগৃহ হইতে অন্য বাসগৃহ অনেক দূরবর্ত্তী হওয়া সঙ্গত। গৃহস্থগণ চতুর্দ্দিকে গাছ পালা, বাগান প্রস্তুত করিয়া গৃহ অসূর্য্যম্পৃশ্য করিয়া ফেলেন। এইরূপ বাটী ম্যালেরিয়ার আশ্রয়স্থান হইবে না কেন? বঙ্গদেশের ভূমি নিম্ন, বাটীর চতুর্দ্দিকে ডোবা ও নালা। ডোবা ও নালায় সর্ব্বদা সূর্য্য কিরণ পতিত না হইলে ম্যালেরিয়া বাহক মশকে পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে। ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে হইলে বাসভবনের চতুর্দ্দিকে কখনও বাগ বাগিচা করা ও জঙ্গল রাখা উচিত নয়। সমিতি কৃষকদিগকে বাসভবন সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। অর্থের সঙ্কুলান থাকিলে গ্রামের আগাছা ও জঙ্গল কাটা কিম্বা নালা পরিষ্কার করিয়া পল্লির হিতসাধন করিতে পারেন। আমাদের বিবেচনা হয় যে, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়াও পল্লিগ্রামে এইরূপ স্বাস্থ্য উন্নতিকর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। লেখকের জন্মস্থান ফরিদপুরের অন্তর্গত বাজিতপুর। তথাকার স্বেচ্ছাসেবকগণ একবার এক বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়া বহুলোকের জলকষ্টের নিবারণ করিয়াছিলেন। কুইনাইন ম্যালেরিয়া জ্বরের অমোঘ ঔষধ। অনেক স্থলে প্রজাগণ সহজে কুইনাইনও প্রাপ্ত হয় না। সমিতি কুইনাইনের ব্যবস্থা করিয়াও গ্রাম্যলোকের উপকার করিতে পারেন।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যলাভ করিলে, কৃষক তাহার স্বীয় উপজীবিকা কৃষি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ ও ত্বরায় ইহার উন্নতিসাধন করিতে পারেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত

কৃষিসম্বন্ধীয় অবশ্য জ্ঞাতব্যবিষয় গুলিও কৃষকের সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে নানারূপ বীজ ও সারের নমুনা দেখাইয়া ইহাদের সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হইবে। অন্যদিকে সমিতি বিশেষ বিশেষ বীজ বা সার কিম্বা উন্নত কৃষি-প্রণালীর পরীক্ষা করিয়া কৃষকদিগকে গোচরে আনিবেন। সমিতি সময়ে সময়ে কৃষকদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে স্থানীয় ফসলের অবস্থা বিবৃত করিবেন যথা— কত জমিতে কোন ফসল জন্মিয়াছে ; গত বৎসরের অবস্থা কি ছিল, এই বৎসরইবা কত আনা পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইল? কোন আনাজের কত দর ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে কৃষকদিগের সমস্ত বঙ্গদেশের কিম্বা ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ ফসলের অবস্থার জ্ঞান জন্মিলে তাহারা তাহাদের উৎপন্ন ফসল উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। তাহারা এতই অনভিজ্ঞ যে কোন জিনিষের কলিকাতার দর মণকরা ৮৲ কিন্তু বেপারীগণ তাহাদিগের নিকট হইতে ঐ জিনিষ ৫৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে।

এতদ্দেশীয় দরিদ্র কৃষক তাহাদের বীজ পর্য্যন্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না। তাহারা বপনের সময়ে নিকৃষ্ট বীজ অগ্নিমূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য হয়। বলা বাহুল্য বীজ খরিদের টাকাও তাহাদের সংস্থান থাকে না। বীজ খরিদ করিতে মহাজনের নিকট টাকা কর্জ্জ করিয়া থাকে। মহাজনগণও সময় পাইয়া তাহাদের নিকট হইতে অত্যধিক সুদ আদায় করে। এইরূপে প্রজার প্রায় সমস্ত লাভ জমিদারের খাজনায় ও মহাজনের সুদে চলিয়া যায়। দেহের রক্ত জল করিয়াও প্রজা সম্বৎসরের জন্য স্ত্রীপুত্রের অন্ন সংস্থান করিতে সক্ষম হয় না। বঙ্গদেশে পাটে মহাজনের সুদ ও জমিদারের খাজনা দিয়াও লাভ থাকে বলিয়া বাঙ্গালী কৃষকের অবস্থা নিতান্ত খারাপ নহে। কিন্তু বেহারের প্রজা মহাজনের সুদ ও জমিদারের খাজনা দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং উপযুক্ত মূল্যে বা ধারে বীজ সংগ্রহ করিতে পারিলে দেশের যে কল্যাণ সাধন হইতে পারে তাহার বর্ণনা করা যায় না। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রত্যেক সমিতি একটী গোলা স্থাপন করিবেন। এতৎসম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এ বিষয়ে কি হইতেছে জানি না। এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

১। সমিতির একটা নির্দ্ধারিত মূলধন থাকিবে, প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০৲ টাকা। কৃষকগণ ১০৲ টাকা মূল্যের ধান, গম বা মটর প্রভৃতি বীজ সমিতিতে দান করিয়া সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। সমিতির আয় ব্যয় প্রভৃতি সমুদয়

কাজ কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতে ও সমিতির অর্থ তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ১০ জন কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্য নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।

২। সভ্যগণ সমিতির অর্থদ্বারা বীজ সংগ্রহ করিবেন এবং সাবধানে বীজ রক্ষা করিবেন।

৩। কোন কৃষক কোন বীজ প্রার্থনা করিলে আইন মত দলিল লইয়া তাহাকে সমিতি বীজ দিবেন এবং কৃষকের নিকট হইতে ফসল কাটিবার সময়ে এক মণে দেড় মণ শস্য গ্রহণ করিবেন।

৪। বীজ বপনের সময় উত্তীর্ণ হইলে সংগৃহীত বীজ বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিবেন এবং সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় বীজ ক্রয় করিয়া রাখিবেন। নগদ অর্থ প্রচুর জমা হইলে দলিল পত্র লইয়া শতকরা মাসিক ২৲ টাকা সুদে টাকা দাদন করিতে পারিবেন। বীজ সংগ্রহ ও বীজের দাদনই সমিতির প্রধান হওয়া উচিত কারণ ইহাতে সমিতির যেমন আর্থিক লাভ তেমন প্রজার যথেষ্ট উপকার সুদের হার অধিক হইলেও ইহা আপত্তিজনক হইবে না, কারণ সাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত আয়ের অর্দ্ধভাগ দেশের হিতকল্পে ব্যয় হইবে। সমিতি পরিচালনের ব্যয় আয়ের শতকরা ১২॥০ সাড়ে বার ভাগের অধিক হইবে না। অংশীদারগণ আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ প্রাপ্ত হইবেন। আয়ের শতকরা ১২॥০ ভাগ মূলধনে জমা হইবে। বক্রি ৫০ ভাগ সমিতির অধীনস্থ স্থানের স্বাস্থ্য. কৃষি ও শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবেন।

আমাদের আশা হয় প্রত্যেক পল্লিগ্রামে এইরূপ সমিতি স্থাপন করিয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

সরকারী কৃষি সংবাদ

বিহার এবং উড়িষ্যায় পাটের আবাদ—১৯১২—

বর্ত্তমান বর্ষে প্রায় ২৯৮,৩০০ একর পরিমাণ জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে।

এই বিভাগে পাটের আবাদ ক্রমশঃই বাড়িতেছে নিম্নের তালিকা দৃষ্টে তাহা বুঝা যায়।

		একর।
১৯০৮	...	২৫২,০০০
১৯০৯	...	২৪১,৪০০
১৯১০	...	২৪৮,২০০
১৯১১	...	২৫৮,১০০
১৯১২	...	২৯৮,৩০০

এই বিভাগের মধ্যে পূর্ণিয়ায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাট জন্মায়। সমগ্র বিভাগে উৎপন্ন পাটের প্রায় পনের আনা এখানেই জন্মায়। কটক ও সাঁওতাল পরগণায় কিছু কিছু পাটের আবাদ আছে। অন্যান্য জেলা সমূহে পাটের চাষ নাম মাত্র।

পূর্ণিয়ায় শ্রাবণের প্রথমে এবং মজঃফরপুর, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা ও কটকে ভাদ্রের প্রথমে পাট কাটা হইয়াছে. কিন্তু বালেশ্বরে ভাদ্রের শেষে এবং চম্পারণে আশ্বিনের প্রথমে পাট কাটা হইয়াছে।

আবাদের আরম্ভকালে কিছু অতিরিক্ত বৃষ্টি হওয়ায় এবং পরে সময় মত বৃষ্টি না হওয়ায় এবার পূর্ণিয়ায় পাটের ফলন কম দাঁড়াইয়াছে। এবারে ফলন ৮/০ আনা মাত্র। বিগত বর্ষে প্রায় পনের আনা ফলন হইয়াছিল। কটকে পনের আনার অধিক এবং সাঁওতাল পরগণায় ষোল আনার উপর পাট জন্মিয়াছে। অনুমানে দেখা যায় যে. এই বিভাগে ৭৯২,৯০০ বেল পাট জন্মিয়াছে। বিগত বর্ষে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ৭০৫.৫০০ বেল মাত্র ছিল। এক বেলের ওজন ৫ মণ অথবা ৪০০ পাউণ্ড।

উড়িষ্যা ও বিহারে ভাদুই শস্য—১৯১২—

এই বিভাগে বর্ত্তমানে ভাদুই শস্যের অবস্থা ভাল। সময় মত বৃষ্টিতে বিশেষ উপকার দর্শিয়াছে। আশু ধান্যও ভাদুই ফসলের মধ্যে গণ্য। সম্বলপুরে পোকায় আশুধান্য কিছু নষ্ট করিয়াছে। অনুমান ৮.৫৫৬,৪০০ একর পরিমাণ জমিতে ভাদুই শস্যের আবাদ হইয়াছে। সাধারণতঃ এতদঞ্চলে প্রায় ৮.৭৯৫,৭০০ একর জমিতে ভাদুই শস্যের আবাদ হয়। জেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ আশা করেন যে, ফলন পনের আনা রকম হইবে।

তুলা চাষের আমেরিকান পদ্ধতি—

আমেরিকাতে তুলা চাষের জমিতে শীতকালে বা শীতের শেষে লাঙ্গল মই দিয়া জমি বেশ ধূলিবৎ করা হয়। অতঃপর দুইটী পাখাওয়ালা লাঙ্গল দ্বারা জমিতে লাইন কাটিয়া লাঙ্গলের সিরালে সার দেওয়া হইয়া থাকে। প্রত্যেক সিরালের ব্যবধান ৩ হইতে ৪ ফিট। সিরালের যে গর্ত্তে সার দেওয়া হইলে, দুইটি সিরালের মধ্যস্থল হইতে মাটি টানিয়া দিয়া সেগুলি চাপা দেওয়া হয় এবং দুই সিরালের মধ্যভাগ নিচু এবং সিরালগুলি উঁচু মাদায় পরিণত হয়। আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে হাতে বীজ ছড়ান হয় না। বীজ ছড়াইবার সে দেশে রকম রকম লাঙ্গল আছে। লাঙ্গল চালাইয়া গেলেই ক্ষেতে

লাইনবন্দি বীজ বপন করা হইয়া যায়। সিরালগুলিতে এই প্রকারেই বীজ বপন করা হইয়া থাকে। বীজগুলি সারমাটির উপরেই বপন করা হইল। বীজ হইতে যন চারা নির্গত হইলে বাড়তি চারা তাহারা উঠাইয়া ফেলিয়া দেয়। জমি কমজোর হইলে ১২ হইতে ১৬ ইঞ্চি ব্যবধানে চারাগুলি রাখিয়া থাকে, কিন্তু তেজাল মাটিতে চারা হইতে চারার ব্যবধান ২০ হইতে ২৪ ইঞ্চি।

আমেরিকায় তুলার ক্ষেতে তুলা বীজ চূর্ণ ও অন্যান্য খনিজ-সার দেওয়া হইয়া থাকে। তাহারা একপ্রকার মিশ্রসার তৈয়ারী করে। ফস্ফরিক অম্ল ৮ ভাগ, দুই ভাগ নাইট্রোজেন এবং দুই ভাগ পটাস সেই মিশ্র সারের মাত্রা।

একর প্রতি কত বীজ আবশ্যক আমেরিকার চাষীরা তাহার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম বলিয়া দিতে পারে না। জমির অবস্থা, বিভিন্ন জাতীয় তুলার বীজ প্রভৃতি সকল দিক হিসাব করিয়া তবে বীজের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়। আমেরিকায় এপ্রিল, মে মাসে তুলার আবাদ আরম্ভ করা হয়, কোথাও বা জুন মাসের প্রথমেই তুলা বীজ বপন করা হইয়া থাকে। ইজিপ্ট কিম্বা ভারতবর্ষে তুলা বীজ আমেরিকা অপেক্ষা অনেক ঘন বপন করা হইয়া থাকে। ইজিপ্টে দুইটি সিরালের ব্যবধান ১৮ হইতে ২০ ইঞ্চি এবং চারা হইতে চারার ব্যবধান ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি। সিরালগুলিও অপেক্ষাকৃত উচ্চ। আমেরিকায় এক একর তুলার জমিতে কারকিৎ, মেরামত ও সার দেওয়া, বীজ ও তুলা আহরণ প্রভৃতি কার্য্যে ২৫ হইতে ৩০ ডলার খরচ পড়ে। এক ডলারের মূল্য কমবেশী ৩৲ টাকা মাত্র।

আমেরিকায় তুলা চাষের এক প্রকার চাকা ওয়ালা বীজ বপনের লাঙ্গল ব্যবহার হয়। একটি বলদে এই লাঙ্গল টানিতে পারে। পিছনে একজন কৃষাণকে ঠেলিয়া যাইতে হয়। ইহার দাম আমেরিকায় ২২॥০ আনা। আবার এই বীজ ছড়াইবার লাঙ্গলের সহিত সার ছড়াইবার বন্দোবস্ত আছে। এরূপ লাঙ্গলও পাওয়া যায়।

ভারতের পক্ষে কোন্ জাতীয় আমেরিকান তুলা উপযুক্ত তাহা এক্ষণে দেখা উচিত। বর্ষার সময় যে জমিতে তুলা জন্মান যায় তথায় আমেরিকার আপল্যাণ্ড তুলার চাষ করা বিধেয় এবং এদেশে চাষ করিবার সময়ও আমেরিকান বীজ ছড়াইয়া লাঙ্গল ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয় এবং বীজ ঘন বপন না করিয়া আমেরিকার মত ৩ হইতে ৪ ফিট অন্তর সিরাল করাই উচিত।

সিন্ধুদেশে তুলার চাষ খালের সেচা জলের উপর নির্ভর করে। এখানে ইজিপ্সিয়ান তুলার চাষই ভাল। চৈত্র, বৈশাখে এখানে বীজ বপন করা হয়।

এদেশের প্রথায় চাষ করিতে হইলে যেখানে সেচাজলে চাষ করিতে হইবে তথায় জমিতে জল সেচনের পর জমিতে "যো" হইলে দেশী লাঙ্গল দ্বারা ৩ ফিট

অন্তর সিরাল কাটিতে হইবে এবং সেই সিরালে সিরালে হস্ত দ্বারা বীজ বুনিয়া যাইতে হইবে। একর প্রতি ১৫ সের বীজের আবশ্যক হয়। সরস জমিতে বীজ বপন হেতু শীঘ্র বীজ জন্মাইয়া থাকে। আগাছা জন্মাইলে হাতে নিড়ান না করিয়া লাঙ্গল দ্বারা বার বার চষিতে পারিলে কম খরচে চাষ সুসম্পন্ন হয়। বাড়তি চারাগুলি কোদাল দ্বারা তুলিয়া ফেলিতে হয়। আমেরিকার বয়েড প্রলিফিক, টেক্সাস্ বিগবল, ট্রায়াম্ফ তুলা ভাল। গ্রীষ্মপ্রধান জায়গায় তুলা উত্তোলনের সময় প্রায়ই শুষ্কপাতা এবং ধূলা তুলার সহিত মিশিয়া যায়। তাহার প্রতিবিধানের কোন উপায় দেখা যায় না।

বীজ হইতে তুলা ছাড়াইবার জন্য করাত কল ভাল এবং আমেরিকার অপল্যাণ্ড তুলা ছাড়াইতে ইহা খুব কার্য্যকরী।

আলুর পোকা THE POTATO MOTH—

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের ইকনমিক বোটানিষ্ট ই, জে, উড্‌হাউস্ সাহেব "আলুর পোকা" সম্বন্ধে লিখিতেছেন যে, এক জাতীয় পোকায় আমেরিকা, ইউরোপ এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশে আলুর অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে আলুর 'সাধারণ পোকা' (Common pest of potatoes) বলা যায়। কয়েক বৎসর হইল, এই পোকা ইতালী দেশ হইতে বীজ-আলুর সহিত ভারতবর্ষে আসিয়াছে। প্রথমতঃ, বোম্বেতেই নবাগত কীট পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তৎপর ক্রমে ক্রমে, ইহা মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং বিহারে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। গত বৎসর বঙ্গদেশেও এই নবাগত কীটের উপদ্রব ঘটিয়াছিল। এই অনিষ্টকর কীট এক্ষণে বঙ্গদেশে ছাইয়া পড়িয়াছে এবং যে সকল জিলায় আলু জন্মে ক্রমশঃই তথায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

বিগত ১৯০৭ খৃঃ অব্দে, বিহারের অন্তর্গত দিনাপুরেই, প্রথম নবাগত আলুর কীটের উপদ্রব ঘটিয়াছিল। তৎপরবর্ত্তী বৎসরে, এই কীট বাঁকিপুর, পাটনা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শেষোক্ত স্থানসমূহের বহুসংখ্যক গুদামজাত আলুতে কীটের উপদ্রব হওয়ায় বিশেষ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। এই সময় হইতে, প্রতি বৎসরই অল্লাধিক পরিমাণে, পাটনার নানাস্থানের আলুর-গুদামে কীটের উপদ্রব ঘটিতেছে। কিন্তু রেলে রপ্তানি আলুর হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, পোকার উপদ্রবে পাটনাই আলুর রপ্তানি ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। বিগত ১৯০৮ সালে, দুই লক্ষ সাতাত্তর হাজার মণ আলু, একমাত্র পাটনা হইতেই, অন্যান্য স্থানে রপ্তানি হইয়াছিল; কিন্তু গতবর্ষে কেবলমাত্র চৌয়ান্ন হাজার মণ আলু রপ্তানি হইয়াছে। গতবর্ষে, শুধু পাটনায় নহে, অল্লাধিক পরিমাণে সারণ, চম্পারণ,

মজঃফরপুর, ভাগলপুর, হাজারিবাগ, সাঁওতাল-পরগণা, বর্দ্ধমান, হাবড়া এবং আম্দুল প্রভৃতি নানাস্থানেই কীটের উপদ্রব ঘটিয়াছিল। এই পোকা যেরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ইহারা যে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই বঙ্গের সর্ব্বত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িবে ও আলুর আবাদের সমূহ ক্ষতি করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পোকার বিবরণ—

স্ত্রী-প্রজাপতি আলু গাছের পাতায় অথবা ডাটার উপর ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিম হইতে ফুটিয়া, পোকাগুলি পাতা বা ডাটার ভিতরে প্রবিষ্ট হয় এবং ভিতরে যাইয়া রস শোষণ করিতে আরম্ভ করে। তজ্জন্য পাতা বা ডাটা গুলি শুকাইয়া যায়। আলুর চোখের উপরও স্ত্রী-প্রজাপতি ডিম পাড়ে। কীড়াগুলি ডিম হইতে বাহির হইয়া, আলুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং আলুর শাঁস খাইতে থাকে। আলুর চোখে কাল রঙ্গের কীড়ার বিষ্ঠার গুঁড়া দেখিলেই বুঝিতে হইবে যে, উহাতে পোকা লাগিয়াছে। দশ পনর দিনের মধ্যেই কীড়াগুলি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় এবং তখন প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি লম্বা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট ছোট গুটি বাঁধিয়া, তাহার ভিতর পুত্তলী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় অল্পদিন থাকিয়া, প্রজাপতিরূপে গুটি হইতে বাহির হয়। প্রজাপতিগুলি এক হইতে তিন ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয়; উহাদের বর্ণ কাল। গুদামে আলু ঢালা থাকে সেইজন্যই অনাবৃত আলুর উপর স্ত্রী-প্রজাপতির ডিম পাড়িবার সুবিধা হয়। একটি স্ত্রী-প্রজাপতি প্রায় একশতটি ডিম হয়। এই ডিম ফুটিয়া পোকা এবং পোকা হইতে একমাসের মধ্যেই, প্রজাপতি হইয়া, ডিম্ব প্রসব করিতে থাকে। এইরূপেই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই, ইহাদের বংশ অত্যধিকরূপে বাড়িয়া যায় এবং সেই পরিমাণে আলুর ক্ষতি হয়। বঙ্গদেশে চৈত্র হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্তই, কীটের উপদ্রবে গুদামজাত আলুর বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

পোকা নিবারণের উপায়—

সরকারী কীটতত্ত্ববিদ্গণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, শুষ্ক বালুর দ্বারা আলু ঢাকিয়া রাখিতে পারিলে, স্ত্রী-প্রজাপতি আলুর উপর ডিম পাড়িতে পারে না। বিগত ১৯০৯ সাল হইতেই, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ বালু দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া, আলু রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। উপরোক্ত উপায়ে, পাটনাতে ১৯১০ সালে ৫০/ মণ এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসর ১০০/ মণ আলু, আশ্বিনমাস হইতে চৈত্রমাস পর্য্যন্ত, পরীক্ষার্থ গুদামে সংরক্ষিত হইয়াছিল। ফল সন্তোষজনক হইয়াছে। গত ১৯১১ সালে, পাটনায় প্রায় দুই শত কৃষক প্রায়

৮৪৩১/ মন আলু উপরোক্ত উপায়ে বালি চাপা দিয়া রাখিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিল। ইহাতে খরচ বড় বেশী নহে। সুতরাং, আলু রক্ষা করিয়া, অসময়ে বেচিতে পারিলে, রক্ষা করিবার জন্য যে সামান্য ব্যয় হয় তাহা বাদেও. বেশ দু'পয়সা লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। গত ১৯১০ ও ১৯১১ সালে. যখন পাটনার সমস্ত গুদামে পোকায় আলুর বিস্তর ক্ষতি করিতেছিল. সেই সময়ে সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে ৯৬৲ টাকা ব্যয় করিয়া, ৭৫/ মণ আলু ৬ মাসের জন্য উপরোক্ত উপায়ে রাখা হইয়াছিল। ছয় মাস পরে গুদামের আলুগুলি ২৮৩৲ টাকায় বিক্রয় করাতে মণকরা ২॥০ টাকা বেশী পাওয়া গিয়াছিল। গুদাম ভাড়া. আলু বাছাই খরচ, চ্যাটাই এবং বালি প্রভৃতির মূল্য বাবদ মণ প্রতি ॥০ আনা বাদ দিলেও. ২৲ টাকা করিয়া নেট আয় হইয়াছিল।

সাবধানতা—

গুদামে আলু রক্ষা করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

(১) যে গুদামে আলু রাখিতে হইবে, তাহাতে যেন জল না পড়ে। ঘরটী ঠাণ্ডা ও দেওয়াল শুষ্ক হওয়া উচিত। আলু রাখিবার পূর্ব্বে, ঘরটী ভাল করিয়া ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া লওয়া উচিত, যেন তাহাতে পোকার ডিম বা প্রজাপতি না থাকে।

(২) গুদামের মেজে সাধারণ জমি হইতে যত উঁচু হয়, ঘরের মেজে যেন কোন সময়ই, এমন কি বর্ষাকালেও, সেঁতসেঁতে না হয়।

(৩) গুদামজাত করিবার পূর্ব্বে আলু বাছিয়া লওয়া উচিত। পচা বা পোকালাগা আলুগুলি বাছিয়া বাদ দিয়া তাহা মাটীর নীচে পুতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য, ভাল আলুর সহিত পোকা আলু গুদামজাত না হয়।

(৪) গুদামে আলু ঢাকিবার জন্য বালি খুব ভালরূপে শুকাইয়া রাখা উচিত। গুদামজাত আলু ঐ শুষ্ক বালি দ্বারা এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখা উচিত যে, বালুর ভিতর হইতে একটী আলুও যেন বাহির হইয়া না থাকে। আলুর গাদা এক হাতের অধিক উচ্চ না হইলেই ভাল হয়।

(৫) মাঝে মাঝে বালি সরাইয়া আলুর গাদা বাহির করিয়া, পচা ও পোকধরা আলু বাছিয়া পৃথক করিতে হইবে। এই সকল পোকা ধরা আলু মাটীর নীচে পুতিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। আলু বাছিয়া লইয়া, পুনরায় গাদাটী বালি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে।

আশ্বিন, ১৩১৯ সাল।

ভূমিকর্ষণ

সংসারের যে কোন কার্য্য করা হউক না কেন শক্তিসঞ্চয়ের আবশ্যক। জগতের প্রত্যেক অণুতে পরমাণুতে শক্তি বিক্ষিপ্তভাবে আছে। জলের মধ্যে বাষ্পের শক্তি নিহিত আছে, জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া কোন নিয়মে আবদ্ধ করিতে পারিলে তাহাকে শত শত কাজে লাগান যাইতে পারে। চাষের কাজে চাষীরা যে পরিমাণে সূর্য্যালোক, উত্তাপ, জল বায়ুকে নিজ আয়ত্তাধীন করিয়া যতটুকু তাহাদের কাজে লাগাইতে পারে ততোধিক পরিমাণে তাহারা তাহার ফলপ্রাপ্ত হয়। চাষের কার্য্যে যে যতটুকু কৌশল খাটাইতে পারে সেই চাষী সেই পরিমাণ উপসত্ব ভোগে অধিকারী হয়। কৌশল অবলম্বন করিয়া চাষ করিতে পারিলে চাষী তাহার খরচ কমাইতে পারে ও তাহার সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমরা ভূমি কর্ষণের কথা বলিব। ভূমিতে যো থাকিতে চাষ দিলে এবং তাতে, বাতে চষিয়া রৌদ্র হাওয়া খাওয়াইতে পারিলে এবং ভালরূপ কর্ষণ করিয়া মই দিয়া রাখিতে পারিলে, সময়ে ফসল উৎপাদনের বিশেষ সুবিধা হয়, অনেক সারের খরচ বাঁচিয়া যায়, জমির সহজভাবে আর্দ্রতা রক্ষা হেতু কতক পরিমাণে জল সেচনের খরচ কমিয়া যায়, জলদি ফসল উৎপাদনের সুবিধা হয় সুতরাং চাষীর লাভের পথ অধিকতর পরিষ্কার হয় এ কথা সহজে বুঝিয়া লওয়া যায়।

অনেকেই অবগত আছেন যে জল ও বায়ুর সংযোগে পাষাণও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছে। কৃষক, নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়া উহাদের প্রসার ও কার্য্যকারীতা বৃদ্ধি করিয়া লয়। কর্ষণদ্বারা মাটি গুঁড়া হইয়া যায় এবং তখন উহার প্রত্যেক ছিদ্রপথে বায়ু প্রবেশ করে। বায়ু সংযোগে মৃত্তিকা উর্ব্বর হইয়া

উঠে। তাহার কারণ বায়ুর সংযোগে মৃত্তিকা নিহিত উদ্ভিদের খাদ্যবস্তু অদ্রব অবস্থায় থাকিলে ক্রমশঃ দ্রব হয় ও উদ্ভিদগণকে পোষণ করিতে পারে। কর্ষণ দ্বারা মাটি চূর্ণ হইলে মাটির জল ধারণ ক্ষমতা, কৈশিকাকর্ষণ শক্তি ও বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প সংগ্রহের শক্তির বৃদ্ধি হয়। এইজন্যই ভূমির কর্ষণ আবশ্যক। ভূমি কর্ষিত হইলে উদ্ভিদগণ সহজে আল্গামাটিতে তাহদের কোমল শিকড় সকল চালাইতে পারে। মূলজ খন্দ এইরূপে সহজে পরিপুষ্ট হয়, লতা গুল্মাদিও কর্ষিত ভূমিতে সহজে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

মৃত্তিকা হইতেই কাকর পাথরের সৃষ্টি হইয়াছে, আবার পাথর রৌদ্রবাতাসেও জল সংযোগে ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছে এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিতে, মাটিতে পরিণত হইতেছে। ভূগর্ভের মধ্যে যে তাপ নিহিত আছে তাহাতে কত পদার্থ গলিয়া সুড়ঙ্গ পথে বহির্গত হইয়া প্রস্তরাদি সৃষ্টি করে আবার কিন্তু সেই সকল কঠিন পদার্থ বাতাতাপে ধূলিবৎ, মৃত্তিকাবৎ হইয়া যায়। এই ব্যাপার প্রতিনিয়ত চলিতেছে। এই কারণে আমারা মাটিতে লৌহ, য়্যালুমিনা, চূণ, ম্যাগ্নেসিয়া, সোডা, গন্ধক, ফস্ফরাস্ প্রভৃতি কতকগুলি পদার্থ দেখিতে পাই। কঠিন পাথর যে কেমন করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হয় তাহা বিস্ময়কর বটে। পাহাড়ের উপর পাথর গুলি কখন খুব উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে কখন ঠাণ্ডায় শিতল হইয়া যাইতেছে। কখন ঠাণ্ডা কখন উত্তপ্ত হয় বলিয়া পাথর ফাটিয়া যায়। তখন সেই ফাটার ভিতর জল প্রবেশ করে এবং সেওলাদি উদ্ভিদ যাইয়া তাহার ভিতর শিকড় চালাইয়া কঠিনের উপরও তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিপন্ন করে। বায়ুস্থিত কার্ব্বণিক এসিড বাষ্প তাহাদের সহায় হয় এবং ক্রমশঃ এমন যে কঠিন পাথর তাহাকে নরম করিয়া ফেলে। কখন কখন এই কঠিন পাথর গলিয়া কাদায় পরিণত হয়। কর্ষণ অবশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া দেয় এবং প্রকৃতির কার্য্যে সহায়তা করে। কর্ষণে কঠিন মৃত্তিকা চূর্ণ বিচূর্ণ হয় এবং তাহাতে রৌদ্র বাতাসের প্রভাব বৃদ্ধির উপায় করিয়া দেয় এবং অবশেষে সেই মৃত্তিকাকে চাষ উপযোগী নরম ও ধূলিবৎ করিয়া ফেলে।

মাটিতে ভূগর্ভ নিহিত খনিজ পদার্থ ব্যতীত অনেক প্রকার গলিত উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থ মিশ্রিত থাকে যত পাঁক ও ভারি মাটি হইবে তাহাতে তত জীবজ পদার্থ অধিক থাকে। বালি মাটিতে জীবজ পদার্থ নাই বলিলেও চলে। বাঙলাদেশের পুষ্করিণী, বিল বা ঝিল প্রভৃতি জলাশয়ের তলার মাটিতে জীবজ পদার্থ সমধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষাগারে এই মাটি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে যে ইহাতে শতকরা ৯ ভাগ জীবজ পদার্থ আছে। এখানে অন্যান্য মাটিও বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা গিয়াছে সাধারণ উচ্চ স্থানের

মাটিতে শতকরা ২, ৩, কিম্বা ৪ ভাগের অধিক জীবজ পদার্থ নাই। বাঁকিপুর হইতে দুইটি মাটির নমুনা পরীক্ষায় যথাক্রমে ৩.৩৪ এবং ৪.১১ ভাগ মাত্র জীবজ পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। কেবল বাঁকিপুর কেন বাঙলার সাধারণ মৃত্তিকা ইহার অধিক জীবজ পদার্থ পাওয়া যায় না ইহা পরীক্ষকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই সকল পদার্থ মাটিতে থাকার জন্য উদ্ভিগণের কি সাহার্য্য হয় এবং কর্ষণদ্বারা ইহারা কিরূপ অবস্থায় পরিণত হয় তাহাই এক্ষণে দেখা উচিত। উদ্ভিদ দেহ ফস্ফরাস্, পটাস্, চূর্ণ, গন্ধক, অন্যান্য পদার্থ ও তাহার সহিত কার্ব্বণ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাষ্প লইয়া গঠিত। উদ্ভিদ দেহ মরিয়া গেল, এই সকল উপাদান নানা রকমে রূপান্তরিত হইয়া মাটির সহিত মিশ্রিত হয়। মৃত উদ্ভিদ দেহ মাটিতে মিশাইবার সময় যখন পচণ ক্রিয়া আরম্ভ হয় তখন হিউমিক এসিড আদি কয়েক প্রকার অম্ল উৎপন্ন হয়। এই অম্লগুলি মাটিতে সমধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইলে মাটির উদ্ভিদ পোষণ শক্তি কমিয়া যায়। মৃত্তিকা ক্রমাগত কর্ষিত হইলে রৌদ্র বাতাস সংযোগ এই অম্লের হ্রাস হয়।

মাটিতে অগণিত জীবাণু বিদ্যমাণ আছে। তাহারা মৃত দেহ আক্রমণ করে। এই জীবাণুর দুইটির পৃথক শ্রেণী আছে—এক প্রকার জীবাণু মৃত দেহ হইতে নাইট্রোজেনকে উড়াইয়া দিবার সহায়তা করে, অপর দল সঞ্চয় করে। দুই দল পরস্পর বিরোধী। মৃত্তিকা কর্ষিত হইলে বায়ুসংযোগে নাইট্রোজেন সঞ্চয়কারী জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি হয় এবং অপর জীবাণুর ধ্বংস হয়।

ভারত চাষীগণ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে সামান্য বৃষ্টি হইলেই জমি চষিতে থাকে। উপরের কঠিন মাটি লাঙ্গলে বাজে বলিয়া তাহারা দুই এক পসলা বৃষ্টির অপেক্ষা করে। এই সময় জমি চষিয়া রৌদ্রে বাতাসে জমি তৈয়ারি করিয়া লইতে পারিলে সময়ে খুব ভাল ফসল হইবে ইহা তাহাদের বিশেষ ধারণা। এটা তাহাদের ভুল ধারণা হয়। এই সময় জমি চষিলে জমি খুব উর্ব্বর হয়। তাহারা আরও জানে যে জমিতে মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি শুটিধারী শস্য জন্মাইয়াছে সেই জমিতে অন্য কোন প্রকার ফসল জন্মাইলে বিনাসারেও ফলন খুব অধিক হয়। তাহারা নাইট্রোজেন সঞ্চয়কারী জীবাণুর কথা জ্ঞাত না থাকিলেও তাহাদের কাজের মত জ্ঞান আছে দেখা যায়।

কর্ষণের যত যন্ত্র আছে তন্মধ্যে আমাদের বিবেচনায় কোদাল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। জমি দুই কোপ হিসাবে কোপাইলে মাটি প্রায় ১ ফুট গভীর ভাবে কর্ষিত হয়। সাঁওতাল কৃষাণদিগের দাঁড়া কোদাল দ্বারা কোপান হইলে দুই কোপে এক ফুট অপেক্ষা বরং কিঞ্চিত অধিক মাটি কোপান হইবে। কোদাল দ্বারা কোপাইলে মাটি উল্টাইবার কাজটি সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যায়। কোদাল দ্বারা কোপান পরিশ্রম

সাধ্য সুতরাং ইহাতে ব্যয় অধিক হয়। ব্যয় কমাইবার জন্য বিস্তৃত চাষের ক্ষেতে লাঙ্গল দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

মাটি শক্ত হইলে গ্রীষ্মকালেও শুক্নার সময় লোহার উল্টান ফলাযুক্ত লাঙ্গল ব্যবহার করিতে পারা যায়, ইহাতেও দুই কাজ এক সঙ্গে হইয়া যায়। ক্ষেত হইতে রবি শস্য উঠাইয়া লইয়া যখন ক্ষেতে চাষ দেওয়া হয় তখন মাটি গভীরভাবে উলট পালট করিয়া কর্ষিত হইলে পরবর্ত্তী শস্য ভালপ্রকার জন্মে। নরম মাটিতে চাষ দিবার জন্য বাঙলা দেশে প্রচলিত সরু লোহার ফলাযুক্ত কাঠের লাঙ্গল একবারে অকেজো নহে।

গ্রীষ্মকালে মাটিতে গভীর কর্ষণ হইয়া থাকিলে মাটিতে বৃষ্টির জল বিশেষ রূপে অধিক দূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে। ইহাদ্বারা পরবর্ত্তী কালে সেই জমি কর্ষণের সুবিধা হয়।

জমি বারম্বার চষিয়া তাহাতে রীতিমত বৃষ্টির জল খাওয়াইয়া তাহার উপর মৈ পাড়িয়া মাটি উত্তম রূপ চাপিয়া রাখিলে জমিতে যো অনেক দিন পর্য্যন্ত বাঁধা থাকে এবং সময়মত শস্য জন্মাইবার বিশেষ আনুকূল্য হয়। জমি চষিবারও একটি উপযুক্ত সময় আছে। শুষ্ক মাটিতে যখন তখন চাষ দেওয়া যায় কিন্তু বৃষ্টি হইয়া মাটি সিক্ত হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মাটিতে 'যো' হয় ততক্ষণ তাহাতে কোদাল বা লাঙ্গল চালান উচিত নহে। কারণ নরম মাটিতে কর্ষণ করিলে কর্ষিত মাটি জড়াইয়া পরস্পর ঢেলা বাঁধিয়া যাইবে এবং বলদ ও কৃষাণের পায়ের চাপে মাটি অধিক বসিয়া যাইবে।

যে চাষী জমি কর্ষণের বিশেষতত্ত্ব জানে না তাহার চাষ করা বৃথা হয়। কেবল মূলধন, জমি ও কৃষাণ হইলেই চাষ হয় না। সূর্য্যালোকের, বাতাসের, বৃষ্টির জলের শক্তি যিনি অধিক পরিমাণে কাজে লাগাইতে পারিবেন এবং এই শক্তিগুলি নিজের ক্ষেতে মাটিতে নিহিত করিয়া লইতে পারিবেন তিনিই চাষে লাভবান হইতে পারিবেন। তাঁহারা মনে যেন থাকে যে কর্ষণ দ্বারা এই শক্তিগুলিকে অনেকাংশে করায়ত্ত করা যায়।

কয়েকপ্রকার ভাল জাতীয় কলা—বাঙলা দেশের কলাকে চাটিম, চাঁপা, কাঁটালি, কাঁচকলা ও বিচেকলা এই কয় শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়।

চাটিম—মর্ত্তমান, অমৃতমান, ঢাকার অমৃত সাগর, অগ্নিশ্বর, কাবুলী, কানাই-বাঁশী, মোহনবাঁশী কলা প্রভৃতি চাটিম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। চাটিম কলার গাছ খুব পক্কা, সহজে ঝড় বাতাসে পড়িয়া যায়। পাঁকমাটিতে এই গাছ বসাইলে গাছ খুব বাড়িয়া যায়। ইহরার গাছে বড় সহজে মাজরা পোকা ধরে এবং ঝড়ে অতি শীঘ্র নষ্ট করিয়া ফেলে। কাবুলী কলার গাছ খুব ছোট হয়। উর্দ্ধে ৫ কিম্বা ৬ ফিটের অধিক হয় না। ইহার গাছ সেইজন্য আট হাত অন্তর বসাইবার আবশ্যক নাই ৫।৬ হাত অন্তর বসাইলেই চলে। কলা খাইতে খুব মিষ্ট এবং সুঘ্রাণযুক্ত।

চাঁপা—বিটজবা, চিনি চাঁপা, চাঁপা প্রভৃতি তিন চারি প্রকার চাঁপা আছে। চাঁপা কলা মাত্রেই টকরস আছে, আস্বাদে ভাল। ইহার গাছ আরও পক্কা, একটু ঝড় উঠিলেই চাঁপাকলা গাছ আগে ভূমি সাত হয়। ইহার তেউড় বা চারা আট হাতের কম ব্যবধানে বসান চলে। সকল কলাগাছই বসাইবার সময় একটু গভীর গর্ত্ত করিয়া বসান উচিত এবং গোড়ায় জল বসা ও গোড়া আল্গা হইয়া পড়িয়া যাওয়ায় নিবারণের জন্য গোড়ায় রীতিমত মাটি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। চাঁপা, চাটিম প্রভৃতি পক্কা কলা গাছগুলিতে কাঁদি পড়িলেই বাঁশ বাঁধিয়া ঠেকো দেওয়া আবশ্যক।

কাঁটালি—কালিবউ, কাঁটালি প্রভৃতি কাঁটালি কলার মধ্যে পরিগণিত। কাঁটালি কলাতে টকরস আদৌ নাই। ইহা অতি পুষ্টিকর, হবিষ্য ও বিবিধ দেবকার্য্যে কাঁটালি কলাই সমধিক ব্যবহৃত হয়। ইহার গাছ বড় হয় বটে কিন্তু ইহার গাছ অপেক্ষাকৃত শক্ত, গোড়া অধিক পরিমাণে পোতা থাকিলে ঝড়ে সহজে পড়ে না। বাঁশের ন্যায় কলাগাছের ঝাড় ক্রমশঃ মাটির উপর উঠিয়া পড়ে সেইজন্য কলা কাটিয়া লইবার পর পুরাতন গাছগুলি এঁটে সমেত তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য এবং গাছের গোড়ায় মাটি দিয়া ভরাট রাখা কর্ত্তব্য। কাঁটালি কলাতে পোকা কম ধরে, ইহার কাঁদি খুব বড় হয়। অন্য কলা অপেক্ষা ইহার দর কম।

কাঁচকলা—ইহা কাঁচা তরকারিতে খাওয়া যায় কিন্তু অনেকে পাকা কাঁচকলা আদর করিয়া খাইয়া থাকে। কাঁচকলা খুবদরে বিক্রয় হয়, ইহার গাছ

শক্ত, অল্প ঝড়ে পড়ে না। কয়েক প্রকারের কাঁচকলা আছে। ঢাকাতে দুই এক জাতীয় কলা কেবল তরকারিতে খাইবার জন্য ব্যবহার হয়। ঐ কলাগুলিও কাঁচকলা জাতীয় তবে বাঙলার কাঁচকলার ঠিক অনুরূপ নহে। ঢাকায় রামপালে কালার চাষ বিখ্যাত।

বিচেকলা—ইহার কলায় খুব বিচি থাকে বলিয়া ইহার নাম বিচেকলা হইয়াছে। বাঙলা দেশে বিচেকলার অপর নাম ডউরে কলা। ইহা তরকারিতে খাওয়া যায় কিন্তু পাকাই লোকে খাইয়া থাকে। বিচেকলার শাঁস বিচিশূন্য করিয়া তাহার সরবত প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ঐ সরবতের বিশেষ ঠাণ্ডা গুণ আছে। ইহার গাছ খুব বড় হয়। ইহার কলা দেরীতে ফলে ও পাকে। ইহার কলা পাকাইয়া বিক্রয় করা অপেক্ষা ইহার থোড় মোচা বিক্রয় করায় লাভ আছে।

২৪ পরগণায় কলাচাষের বড় হতাদর। হুগলী জেলাতে বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বরে কলার রীতিমত আবাদ করা হইয়া থাকে। ঢাকার রামপালে কলার আবাদে চাষী-গণ বিশিষ্ট যত্ন লইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে কলার ক্ষেতে পাঁকমাটি ছড়াইয়া রীতিমত লাঙ্গল মই দিয়া চাষ করা হইয়া থাকে। কলাগাছে এদ্ব্যতীত গোয়ালের আবর্জ্জনা, ঘুঁটের ছাই প্রভৃতি মিশ্রিত সার দেওয়া হইয়া থাকে। কোথাও বা রেড়ী বা সরিষার খৈল সার দিবার ব্যবস্থা আছে। কলার একটি আয়ের জিনিষ এ কথা সত্য কিন্তু ২৪ পরগণার মত যদৃচ্ছাক্রমে চাষ করিলে তাদৃশ লাভ হওয়া কোন মতে সম্ভবে না। ঐ সকল স্থানের চাষীরা কলা চাষে এমন সুদক্ষ যে তাহারা কলার তেউড় গুলি এরূপ ভাবে সাজাইয়া বসাইবে যে কলা কাঁদিগুলি ঠিক এক দিকে পড়িবে। কলার তেউড়ের মূলদেশ বা এঁটের কাটা দিকটা যে দিকে রাখা হইবে কলাকাঁদি সেই মুখে পড়িবে। এ সন্ধান এ অঞ্চল লোকে রাখে না। সন্ধান রাখিলে তাহারা এতদঞ্চলে পূর্ব্ব ও দক্ষিণা প্রবল বাতাস হইতে কলা গাছগুলিকে রক্ষা করিবার উপায় করিতে পারিত। কলা তেউড় গুলির এঁটের কাটাভাগ পূর্ব্ব কিম্বা দক্ষিণ মুখ করিয়া বসাইলে তাহাদের এই উদ্দেশ্য কতক পরিমাণে সফল হইত। যে দিকে কলার কাঁদি পড়ে সেই দিকেই কলাগাছগুলি ঝুঁকিয়া পড়ে সুতরাং যে দিক হইতে প্রবল বাতাস বহে সেই দিকে সেগুলি ঝোঁকা ভাল।

এ অঞ্চলের কলাগাছ খুব বাড়িয়া যায়। গাছকে খুব বাড়িতে দিলে কাঁদি তত বড় হয় না সেইজন্য হুগলী জেলার চাষীরা অনেক সময় কলার তেউড় বসাইয়া গোড়া হইতে দুই কিম্বা আড়াই হাতে ঊর্দ্ধে তেউড়টি কাটিয়া দেয় এবং এই প্রকারে গাছের বাড় কমাইয়া রাখে।

এখানে আষাঢ়, শ্রাবণ মাস না হইলে কলা গাছ বসায় না কিন্তু যে সকল জায়গায় কলার রীতিমত আবাদ আছে সে সব স্থানে বৈশাখ মাসেই কলাগাছ বসাইবার প্রশস্ত সময়। বৈশাখ মাসে কলার তেউড় বসাইয়া তদ্বির করিতে পারিলে সদ্য বৎসরেই কলার রীতিমত কাঁদি পড়ে। কলার তেউড় বসাইবার আর একটি অভিনব প্রথা আছে—কোথাও কোথাও এই প্রথায় কলার আবাদ হইয়া থাকে। কলার তেউড়গুলি তুলিয়া মূলের উপর ৬ ইঞ্চি কিম্বা ৮ ইঞ্চ রাখিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। তৎপরে গর্ত্তমধ্যে সেগুলিকে হেট মুণ্ড করিয়া রোপন করিতে হইবে। ইহাতে বিশেষত্ব এই যে এই প্রকার রোপিত মূলগুলি নূতন তেউড় উল্‌টামুখে উর্দ্ধদিকে বাহির হয়। গাছগুলি খুব খর্ব্বাকৃতি অথচ তেজাল এবং চারি পাঁচটি তেউড় যাহা বাহির তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ ফাঁক থাকে। এতদঞ্চলের চাষীরা তেউড় বসাইবার সময় কিছুমাত্র বাছাই করে না রুগ্ন ও পোকাধরা তেউড়ও বসাইয়া থাকে। কলার এঁটেতে মাজরা পোকা ধরিলে কলা গাছের পাতা ছোট হইয়া যায় এবং গাছ বাড়িতে না পাইয়া মরিয়া যায়। কলার তেউড়ে মাজরা ধরা থাকিলে তাহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য অথবা অভাব পক্ষে পোকা ধরা অংশ বাদ দিয়া শোধন করিয়া বসাইতে হয়। আমাদের দেশের চাষীরা মামুলি খনার বচন শিখিয়া প্রায় ৮ হাত অন্তর কলাগাছ বসাইয়া থাকে কিন্তু নিপুণ চাষী যে কলার যেমন বাড় সে কলার গাছের সেই রূপ ব্যবধানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে কাঁটালি, কাঁচকলা ৮ হাত অন্তর বসানই কর্ত্তব্য কিন্তু চাটিম, চাঁপা আরও একটু নিকট নিকট বসান চলিতে পারে। কাবুলী জাতীয় কলার আরও ঘেঁস বসাইবার বিধান করা উচিত। প্রতি বিঘায় সেইজন্য আমরা ১২৫ টা কলা গাছ বসিতে পারে ধরিয়া লইতে পারি। এক বিঘা জমিতে কলাগাছ বসাইতে জমিত পাঁক মাটি ছড়ান, কলার তেউড়ের মূল্য, লাঙ্গল মই দিবার আর, গোড়া কোপান ও গোড়ার মাটি দেওয়া, কলাগাছে বাঁশে ঠেকা দেওয়া, জমির খাজনা, দেওয়া প্রভৃতি খরচ ৪০৲ টাকার অধিক হয় না। তাহার উপর এক জন রক্ষীয় মাহিনা ধরা কর্ত্তব্য। একজন লোক দশ বিঘা কলা বাগান হেপাজাত করিতে পারে। ইহাতেও বিঘায় ১০৲ টাকা খরচ পড়ে অতএব একটা কলা বাগানে রীতিমত আবাদ করিতে হইলে ৫০৲ টাকা ব্যয়। এক বৎসর পরে প্রত্যেক ঝাড় হইতে ১৲ টাকা হইতে ১৷০ টাকা হিসাবে আয় হওয়া সম্ভব। এ অঞ্চলের লোক এত হিসাব করিয়া কলার আবাদ করেও না, এবং সেইজন্য এত লাভ করিতেও সমর্থও হয় না। ভদ্রলোকের পক্ষেও কলা চাষ সহজ সাধ্য। সকল দিক দেখিয়া, বিশেষ তত্ত্ব লইয়া কলা চাষে প্রবৃত্ত হইলে লাভ অবশ্যম্ভাবী।

পোকার বাড় ও নিবারণোপায়

পোকার বংশ অতি শীঘ্র বাড়িয়া যায়। যে কোন প্রজাপতি প্রায় ৫০০ ডিম পাড়ে। ডিম হইতে আবার এক মাস কি দেড় মাসের মধ্যেই প্রজাপতি হয়। এই ৫০০ শতের যদি সকলগুলিই প্রজাপতি হয় এবং তাহার অর্দ্ধেক স্ত্রী প্রজাপতি ১২৫০০০ ডিম পাড়িবে। আবার এক মাস কি দেড় মাস পরে ৭৫০০০ স্ত্রী প্রজাপতি প্রত্যেকে ৫০০ ডিম পাড়িবে। তবে দেখা যাইতেছে ইহাদের সংখ্যা কত শীঘ্র বাড়িতে পারে। কিন্তু যেমন তাহারা শীঘ্র জন্মান তেমনি শীঘ্র মরে।

ঝড় বৃষ্টিতেও অনেক পোকা বিশেষতঃ অনেক পতঙ্গ নিহত হয়। অত্যন্ত শীতের সময় এবং অত্যন্ত গরমের সময় অধিকাংশ পোকাই কোন না কোন আশ্রয় লইয়া নিদ্রিত থাকে। এই সময় ইহাদের বংশ বাড়িতে পায় না। নিদ্রাকালে নানা কারণে তাহাদের মৃত্যু ঘটে।

খাদ্যাভাবেও অনেক সময় পোকা মরিয়া যায়। কেবল বর্ষাকালেই অনেক গাছ সতেজে জন্মে। তার পর শীতকালেও অনেক গাছ থাকে এবং অনেক নূতন গাছ জন্মে। তারপর অনেক গাছ পাতাই শুকাইয়া যায়। যে পোকা এমন গাছ খায় যাহা কেবল বর্ষাকালেই জন্মে তাহার বংশ কেবল বর্ষাকালেই বাড়িতে পারে অন্য সময় খাদ্যাভাবে বাড়িতে পায় না। যে সময় গাছ পাতা শুকাইয়া যায় তখন অনেক পোকারাই বংশ বাড়ে না।

অনিষ্টকারী পোকা যেমন সৃষ্ট হইয়াছে সেই সঙ্গে যাহাতে ইহাদের সংখ্যা খুব বাড়িয়া না যায় ঈশ্বর তাহারও উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। কাক, শালিক্, ময়না ফিঙে প্রভৃতি কত রকমের পাখী পোকা ধরিয়া খায়। টিক্‌টিকি গিরগিটি বেঙ মাকড়্সা প্রভৃতি আরও কত প্রাণী পোকা খাইয়া জীবন ধারণ করে। হিংস্রক পরভোজী ও পরবাসী পোকাতেও অনবরত কত পোকা নাশ করিতেছে। অনিষ্টকারী পোকাকে দমনে রাখিবার জন্য এই সমস্ত স্বাভাবিক উপায়। অতএব দেখা যাইতেছে স্বাভাবিক শত্রু, আবহাওয়া এবং খাদ্যাভাব এই তিন কারণে সাধারণতঃ পোকার সংখ্যা বাড়িতে পায় না।

আমরা অনেক সময় পোকার বাড়ের সুযোগ করিয়া দিই। একদেশ হইতে অন্য দেশে পোকা আমদানি করা তাহার দৃষ্টান্ত। যেমন বীজ আলুর পোকা বিদেশ হইতে আলুর সঙ্গে এদেশে আসিয়াছে।

অনেক সময় আমরা বড় বড় গাছ পালা কাটিয়া পোকার সংখ্যাবৃদ্ধির অনুকূল্য করি—

স্বাভাবিক গাছ অপেক্ষা কৃষিকার্য্য দ্বারা যে সমস্ত গাছ জন্মান যায় তাহারা কমতেজী। বনজঙ্গলের স্বাভাবিক গাছের পোকা প্রভৃতি হইতে অনিষ্ট কমই হয়। কমজোর হইলে সকলকেই সহজে রোগে ধরে।

অনেক সময় আমরা পাখী, টিকটিকি, বাদুড় প্রভৃতি মারিয়া পোকার শত্রু সংখ্যা কমাইয়া দিয়া থাকি। এই সম্বন্ধে 'ফসলের পোকা' নামক পুস্তকে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ কিরূপ বিশদ আলোচনা করিয়াছেন দেখুন—

"পোকা সর্ব্বত্রই আছে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ইহারা ডিম পাড়ে এবং ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়। সংখ্যায় বাড়িয়া যখন ফসলাদির ক্ষতি করে তখনই আমাদের নজরে পড়ে। পোকা মাটী বা জল হইতে আপনা আপনি জন্মে না, কিম্বা বাতাসে উড়িয়া আসে না বা কাহারও শাপ দ্বারা উৎপন্ন হয় না। নানা কারণে ইহাদের সংখ্যা বাড়িতে পারে। উপরে এই বিষয়ের কিছু আলোচনা করা হইয়াছে।

বুদ্ধিমান লোকে অনেক সময় পূর্ব্ব হইতে কীড়া ফসল আক্রমণ করিবে ইহা অনুমান করিতে পারে এবং পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাটের কাতরী পোকার কথা বলা যাইতে পারে। যদি এই কাতরী পোকার প্রজাপতিকে আলোর কাছে অনেক আসিতে দেখা যায় বা অনেক উড়িতে দেখা তাহা হইলে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে যদি অপর কোন খাবার না পায় তাহারা এই সমস্ত প্রজাপতি পাটের উপর ডিম পাড়িবে। বুদ্ধিমান লোক এই সময় পাটের উপর নজর রাখিয়া ইহাদের ডিম জড় করিবে এবং এইরূপে আপনার ফসল বাঁচাইবে। আরও এত বেশী প্রজাপতি দেখিয়া ইহা বোঝা উচিত যে পূর্ব্বে ইহাদের কীড়ার সংখ্যা ফসলেই হোক আর জঙ্গলেই হোক নিশ্চয়ই বেশী হইয়াছিল। হয়ত একটু চেষ্টা করিলেই কীড়াদিকে মারা যাইত।

পোকার উপদ্রব একেবারে নিবারণ করা সাধ্যাতীত। পোকা কখন আসিবে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। তবে পোকাদের সাধারণ আচরণ দেখিয়া বলা যায় যে যদি নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে একটু নজর থাকে তাহা হইলে অনেক পরিমাণে ইহাদের উপদ্রব নিবারিত হওয়া সম্ভব।

(১) ক্ষেতের পাশে বা মাঠের ফাঁকে আগাছার জঙ্গল থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। পড়া পতিতে কেবল ঘাস জন্মিতে দেওয়া উচিত, তাহা হইলে গোচরও হয় এবং পোকার বংশ বাড়িতে পায় না। আগাছার ঝুপি জঙ্গলই পোকার ঘর।

এই রকম জায়গায় কেবল ঘাস জন্মাইলে বা আম ইত্যাদি বড় বড় গাছের বাগান করিলে পোকারা আশ্রয় পায় না।

(২) ফসল কাটিয়া লইয়া ফসলের গোড়া, ডাঁটা বা ফল ভালই হউক আর খারাপ বা পচাই হউক ক্ষেতে পড়িয়া থাকিতে দিতে নাই। যাহা আবশুক ঘরে আনিয়া বাকী পুড়াইয়া দেওয়া উচিত।

(৩) একই ক্ষেতে বৎসর বৎসর একই ফসল উৎপন্ন করা উচিত নয়। অনেক পরিমাণ ক্ষেতের উপর এ বৎসর এক ফসল এবং পরবৎসর অন্য ফসল লাগাইলে পোকার উপদ্রব কম হইতে পারে। জমির পরিমাণ অধিক হইলে পাল্‌টি চাষে বিশেষ উপকার দর্শে। ২।৪ বিঘা জমির মধ্যে এরকম পালা করিলে প্রায় কোন ফল হয় না।

(৪) আমাদের দেশে যে অনেক রকম ফসল এক সঙ্গে লাগাইবার প্রথা আছে তাহা ভাল, কথায় বলে—

সরিষা বনে কলাই মুগ,
বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক।

অর্থাৎ আনন্দে বুক বাজাইয়া বেড়াও। মিশ্র ফসলে পোকার উপদ্রব কম হয়। এক ত পতঙ্গকে গাছ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ডিম পাড়িতে হয়। তারপর কীড়া খাইতে খাইতে পাশেই আর খাবার পায় না, মাটিতে নামিয়া খাবার খুঁজিয়া লইতে হয়; তখন বেঙ ইত্যাদির হাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা। আবার এক রকমের অনেক ফসলের মধ্যে যদি অপর রকম ফসলের একটী ছোট ক্ষেত থাকে, তাহা হইলে এই ছোট ক্ষেতে পোকার অত্যন্ত উপদ্রব হয়; অনেক সময় প্রায় সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলে। তবে যদি এই রকমের অনেক ছোট ছোট ক্ষেত মাঝে মাঝে ছড়ান থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি হয় না। ৫০০০ হাজার বিঘা ছোপার মধ্যে ১০ বিঘা কার্পাস চাষ করিলে কোন উপকার হয় না। তবে যদি এই ৫০০০ বিঘার মধ্যে ১০০০ বিঘা কাপাস ১০ বিঘা ১০ বিঘা করিয়া মাঝে মাঝে ছড়ান থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি হয় না।

(৫) অসময়ে কোন ফসল জন্মিলে পোকাদের সুবিধা হয়। কাপাস গাছের প্রায় সমস্ত পোকা ঢেঁড়স গাছ খাইয়া বাঁচিতে পারে। অতএব কাপাস যখন হয় তখন যদি ঢেঁড়স হয়, পোকার বংশবৃদ্ধির সুবিধা হয়। অতএব কাপাসের সময় ছাড়া ঢেঁড়স জন্মান উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায় এখানে ওখানে কোন রকমে বীজ পড়িয়া অনেক ফসলের গাছ জন্মে, ইহারাও পোকার বংশ বৃদ্ধির সহায়তা করে। অতএব এ রকম গাছ জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়।

ফাঁদফসল—পোকাদিগকে ফাঁদে ফেলিয়া বা ঠকাইয়া মারিবার জন্ম যে ফসল জন্মান যায় তাহাকে ফাঁদফসল বলে। ফাঁদফসল দুই রকম হইতে পারে,

(১) আদর ফসল বুনিবার আগে সেই ফসলের সামান্য চাষ করিতে হয়, খাবার পাইয়া যত পোকা এই সামান্য ফসলে পড়িবে, তখন পোকা সমেত এই সামান্য ফসল ধ্বংস করিতে হয়, তাহা হইলে আদত ফসল বাঁচিয়া যায়। (২) ফসলের সঙ্গে কোন এক রকম মূল্য হীন বা কম মূল্যবান গাছের বীজ বপন করিতে হয়। ফসলের সঙ্গে এই গাছ জন্মিবে এবং অনেক পোকা এই গাছ পাইয়া ফসলে তত নজর দিবে না। তার পর যখন আর আবশ্যক হইবে না তখন এই গাছ উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হয়।

(৬) ফসলে যে কোন পোকাই দেখা প্রথম প্রথম যখন ইহাদের সংখ্যা কম থাকে তখন বাছিয়া কেরোসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়াই হোক আর মাটীতে পুঁতিয়াই হোক মারিয়া ফেলিলে ইহাদের সংখ্যা বাড়িতে পায় না। এই উপায়ে অনেক অনিষ্টকারী পোকাকে না বাড়িতে বাড়িতে দমন করা যায়। আমাদের দেশে প্রায় কাহারও ৫০০০।৭০০০ বিঘার চাষ নাই। অধিকাংশ লোকেরই ২।১০ বিঘা লইয়া চাষ। অতএব নজর রাখিয়া এইরূপে পোকা বাছিয়া মারা খুব সহজ। ক্ষেতে মুরগী ছাড়িয়া দিলে মুরগীতে পোকা ধরিয়া ধরিয়া খায় এবং পোকার কুল নাশ করে। ফসলের উপর দুইটাই হোক আর দশটাই হোক যদি কোন পোকাকে পাতা কাটিয়া বা অন্য কোন রকমে সামান্য মাত্রও ক্ষতি করিতে দেখা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে মারা উচিত।"

ক্ষেতের মাটি উল্‌টু পাল্‌টু করিয়া চষিলে মাটির নিচের পোকা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবার সুবিধা হয়। বিষ ছিটাইয়া পোকা মারার পদ্ধতি আমাদের দেশে তত প্রচলিত না থাকিলেও ইউরোপ আমেরিকার ধনাঢ্য চাষীরা উক্ত উপায়ে পোকা নিবারণ করে। কোন কোন বিষ পোকার গায়ে লাগিলে পোকা মরিয়া যায় কোন কোন বিষ খাইয়া মরে। বিষ গুড়া ছিটান যায় কিম্বা জলে গুলিয়া ছিটান যায় বিষ ছিটাইবার অনেক যন্ত্রাদিও আছে। সমস্ত গুলির চিত্র 'ফসলের পোকা' নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে। পোকা মারার কতকগুলি কৃত্রিম উপায়ও করা যাইতে পারে। হাতজাল বা বাঁশের ডগার তলে বাঁধিয়া ক্ষেতের ফসলের উপর দিয়া টানিয়া গেলে পোকা মারা যায়। আলো দেখিয়া পতঙ্গ মাত্রেই ছুটিয়া আসে সুতরাং আলোর প্রলোভনে পতঙ্গ কুলকে নিকটে আয়ত্তাধীনে আনিয়া মারা নিতান্ত কঠিন নহে। ধোঁয়াতেও অনেক পোকা বিনষ্ট করা যাইতে পারে। ধুনা গন্ধক মিশ্রিত ধোঁয়াতে ক্ষেত্রের ও গোলাজাত শস্যে অনেক প্রতিকার হয়। এই কারণে বোধ হয় আমাদের প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে দোকান পাঠে, ঘর দুয়ারে, গোলা, গোশালায় ধুনার ধোঁয়া দিবার নিয়ম আছে।

জনৈক কৃষকবন্ধু।

পত্রাদি

শ্রীগোষ্ঠবিহারী কুণ্ডু—গিরিডী,

সাগু গাছ ও সাগুদানা প্রস্তুত সম্বন্ধে জানিতে চান—

সাগুদানা—গো, নারিকেল, তাল প্রভৃতি জাতীয় গাছকে ইংরাজী ভাষায় পাম বলে। সেগো (Sago Palm) জাতীয় পাম হইতে এই দানা পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে সাগুদানা বলে। এই জাতীয় পাম বড় হইলে তাহার ভিতর কলার খোড়ের মত মাজ জন্মায়। গাছটি খণ্ড খণ্ড কাটিয়া ফাড়িয়া মাঝ বাহির করিয়া লইয়া সেগুলিকে চূর্ণ করিতে হয়। অতঃপর জল দিয়া কাদা খাসার মত পদার্থ প্রস্তুত করিয়া জলে গুলিয়া ছোট বড় ছিদ্রযুক্ত ছাকুনিতে ছাকিয়া লইয়া ছোট বড় দানা সাগু, প্রস্তুত হয়।

সাগুর গাছ খুব অধিককাল যাবৎ বাড়িতে দিলে, তাহাতে যদি ফুল ফল হয়, তাহা হইলে তাহার ভিতরকার মাঝটি গাছের মধ্যেই শোষিত হইয়া যায়। ঐ রকম গাছ চিরিলে মাছ পাওয়া যায় না। গাছে ফুল ধরিবার কিছু পূর্ব্বেই গাছ কাটা উচিত।

সাগু চাউলের মত শ্বেতসার মাত্র। ইহা এই কারণে মানুষের খুব পুষ্টিকর খাদ্য। ইহার গুঁড়া হইতে রোগীর খাদ্যোপযোগী বিস্কুট তৈয়ারী হয়। সাগুদানা জলে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে খাওয়ান হইয়া থাকে। ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহার প্রচুর আবাদ আছে।

আজকাল বাজারে সাগুদানা বলিয়া যাহা বিক্রয় হয়, তাহা সাগুদানা নহে। ট্যাপিওকা বা ক্যাসাভা মূল হইতে এই দানা প্রস্তুত হইতেছে।

চীনা কপি—ইহা ঠিক কপি নহে, বাঁধাকপির মত আকারে কতকটা হয়। কিন্তু বাঁধাকপির ন্যায় বাঁধে না, শীঘ্র ফুটিয়া যায়। বস্তুতঃ ইহা এক প্রকার শাক বিশেষ। খাইতে সুমিষ্ট এবং বাঁধাকপির স্বাদগন্ধ ইহাতে আছে। অনেক স্থানে ইহা গবাদি জন্তুকে খাওয়াইবার জন্য চাষ করা হয়। বাঙলা ও কটকে ইহা ভালরূপ জন্মে। বিঘাপ্রতি ১০০ হইতে ১৫০ মণ পর্য্যন্ত ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার বীজ প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

কর্পূর বৃক্ষ—বাঙলায় কর্পূর বৃক্ষ বেশ বাড়ে। কলিকার সন্নিহিত নীলগঞ্জের একটি বাগানে অনেকগুলি কর্পূর গাছ আছে। গাছগুলির খুব শ্রী ও বৃদ্ধি হইয়াছে। সেগুলি উচ্চতায় ১০ কিম্বা ১২ ফিট হইবে। আসামে পার্ব্বত্য

প্রদেশে কর্পূর গাছ জন্মিয়া থাকে, কিন্তু এখান হইতে সিংহলের মত কর্পূর প্রস্তুত করিবার কোন উদ্যোগ আয়োজন দেখা যায় না।

কলিকাতায় রূপা আমদানি—গত সপ্তাহে কলিকাতায় বিলাত হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের রূপা আমদানি হইয়াছে। "কোলাবা" এবং "সোমালিন" নামক দুই খানি ষ্টীমারে ঐ রূপা আসিয়াছে। ঐ রূপা গালাইয়া টাকশালে টাকা প্রস্তুত করা হইবে। ৬নং জেটিতে ঐ সকল রূপার বাট নামান হয় এবং একখানি মোটার গাড়ী করিয়া ক্রমে ক্রমে ঐ রূপা টাকশালে লইয়া যাওয়া হয়। চীন দেশ হইতে শীঘ্রই দশ লক্ষ গিনি কলিকাতায় আমদানি হইবে। বলা বাহুল্য যে ভারত গভর্ণমেণ্টই এই সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য কলিকাতায় আমদানি করিতেছেন।

কেরোসিন তৈল—বিগত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর কোন্ দেশে কত গ্যালন কেরোসিন তৈল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা মার্কিন গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে ১৩,৭৫,৫০,০০০০০ গ্যালন তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক মার্কিন দেশেই ৮৮০১৩৫২০০০ গ্যালন তৈল পাওয়া গিয়াছিল। অবশিষ্ট তৈলের মধ্যে রুষিয়াতে ২,৯৫,৪১,১২,০০০, গ্যালিসিয়াতে ৫৩,২৩,০৮,০০০ ডচ ইষ্ট ইণ্ডিয়াতে ৪৬,৩৩,০২,০০০, রুমেনিয়াতে ৪৯,৮৩,৬৬,০০০ এবং ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ২৫,৭৭,৯৬,০০০ গ্যালন তৈল পাওয়া গিয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সমস্ত পৃথিবীতে যত গ্যালন তৈল উৎপন্ন হইয়াছিল, পরবৎসরে অর্থাৎ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাহা অপেক্ষা শতকরা ৯ গ্যালন অধিক তৈল উৎপন্ন হইয়াছে।

দধি প্রস্তুত প্রণালী—দধি প্রস্তুত করিবার পাত্র ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইতে হয়। পাত্রের গায়ে কোন প্রকার অপর জীবাণু থাকিলে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। একটি কটাহে দুগ্ধের সহিত কিছু জল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। দুগ্ধ জ্বাল দিয়া নামাইবার সময় দেখিতে হইবে যেন দুগ্ধে জলের ভাগ কিছুমাত্র না থাকে। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত পাত্র অল্প ইষদুষ্ণ দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ১ চামচে দধ্যম্ল মিশাইতে হয়। দধিপ্রস্তুত করিবার জন্য যে পুরাতন দধিটুকু দুগ্ধের সহিত মিশান যায় তাহাকে দধ্যম্ল বলে। মাটির পাত্রে দধি পাতা ভাল। দধ্যম্ল মিশাইবার সময় দধ্যম্ল পাত্রের গাত্রে একস্থানে অল্পে অল্পে মিশাইতে হয় এবং অবশেষে একবার সমুদয় দুগ্ধটি সেই চামচে দ্বারা নাড়িয়া দিতে হয়। দধ্যম্ল মিশাইবার পর পাত্রটি ইষদুষ্ণ স্থানে ঢাকিয়া রাখিলে এবং ৮ কিম্বা ১০ ঘন্টা নাড়া চাড়া না করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে দধি বসিয়া যাইবে। মাটির পাত্রে দধি পাতিলে দুগ্ধস্থিত জলীয়াংশ যাহা দধি বসিবার সময় বিচ্যুত

হইয়া পড়ে তাহা পাত্রের গাত্রে শোষিত হয় এবং দধি বেশ ঘন ক্াটারিকাটার মত হয়।

দধ্যম্লব্যতীত লেবুর রস, তেঁতুল প্রভৃতি অন্য অম্ল সংযোগে দধি পাতা যায় কিন্তু দধির অম্লে যে জীবাণু থাকে তাহাই অধিকতর উপকারী সেই দধ্যম্ল দ্বারা দধি পাতাই শ্রেয়ঃ।

দধির গুণ—দধিতে কেসিন বা ছানার ভাগ জমাট অবস্থায় থাকে বলিয়া দধি পরিপাক হইতে বিলম্ব হয় দুগ্ধ ইহা অপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক হইয়া থাকে। দধি কিন্তু অন্য ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে। দধি পাতিবার সময় দধ্যম্লের পরিমাণ অধিক হইলে সেই দধি ব্যবহারে অনিষ্ট হয় এবং এরূপ দধি খাইলে সর্দ্দি, কাশি, অম্লজনিত রোগ জন্মিতে পারে। বিশুদ্ধ দধি কিন্তু পরম হিতকারী আহার। ইহাতে যে জীবাণু থাকে তাহা শরীরের অনিষ্টকারী জীবাণুগণকে নষ্ট করিয়া শরীরের সমতা রক্ষা করে। দধিতে যে অম্ল থাকে তাহার ইংরাজী নাম Lactic Acid। এই ল্যাকটিক অম্লেরও অনিষ্টকারী জীবাণুর ক্রিয়া প্রতিহত করিবার ক্ষমতা আছে। এই কারণে দধি কিম্বা ঘোল নিয়মিত ব্যবহার করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায় এবং সহজে লোকে জরাগ্রস্থ হয় না।

দীর্ঘায়ু লাভের উপায়—উদ্ভিদ বল, জীব জন্তুবল, তাহাদিগকে অল্পে অল্পে বাড়িতে দিলে তাহারা তত অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে। যত অধিক দিন পর্য্যন্ত কোন জীব দেহের বৃদ্ধির গতি অপ্রতিহত থাকে ততদিন তাহার জীবন থাকে। কোন একটি শিশুকে বিশেষ লালন পালনে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলে তাহার দেহের বৃদ্ধি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হইয়া যাইবে এবং বৃদ্ধি ক্রিয়া রহিত হইয়া গেলেই ক্ষয় আরম্ভ হইবে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম এবং তাহার অকালে বার্দ্ধক্য আসিবে এবং ক্রমে আয়ু শেষ হইবে।

উদ্ভিদেরও এইরূপে অকালপক্কতা ও আয়ুর ক্ষয় হয়। রাত্রিকালে তড়িতালোকে রাখিলে বৃক্ষ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বটে। এইরূপে বাড়িয়া উঠিয়া তাহারা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং শীঘ্র মরিয়া যায়। স্বভাবের সঙ্গে অল্পে যাহা বাড়ে, তাহারা দীর্ঘকালে বাড়িয়া উঠে এবং অল্পে অল্পে ক্ষয় পাইয়া প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে লয়প্রাপ্ত হয়।

সার-সংগ্রহ

রাজধানীবিভাগে কৃষির উন্নতি

রাজধানীবিভাগের মধ্যে মুর্শিবাদ ও নদীয়া জেলায় প্রায়শঃ অল্প বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, এইজন্য এই দুইটি জেলাতে শস্যহানি ও অন্নকষ্ট উপস্থিত হইতে দেখা যায় ১৮৭৪ ও ১৮৯৭ সালের দুর্ভিক্ষের সময় এই দুইটী জেলার লোক বিশেষ কষ্টভোগ করিয়াছিল। ২৪ পরগণা, যশোহর ও খুলনা নামাল বলিয়া এবং তথায় অধিক বৃষ্টি হয় বলিয়া ওরূপ কষ্টের কারণ উপস্থিত হয় না। আমি যাহা বলিতেছি তাহা প্রধানতঃ নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বিবৃত করিতেছি।

এই বিভাগে যে পরিমাণে ভূমি আবাদ করা হয়, তাহার মধ্যে শতকরা ৪৩ ভাগে আমন ধান ও ২১ ভাগে আশু ধান্য বপন করা হইয়া থাকে। প্রায় তিন ভাগ মাত্র ভূমিতে গোধূম আবাদ করা হয়, তাহাও আবার প্রধানতঃ মুর্শিদাবাদে,—ছোলা চারি ভাগে, তিসি দুইভাগে, সরিষা তিন ভাগে এবং পাট ৩৷৷০ ভাগে। তামাক, আলু, তুঁত, ইক্ষু ও মটর কলাই প্রভৃতি রবিশস্যও এখানে বিশেষরূপ আবাদ করা হয়। নীলের চাষ ক্রমশঃই তিরোহিত হইতেছে সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ফল-বৃক্ষ সকলও এ বিভাগের একটি প্রধান আওলাত। কলিকাতা সহরের দুগ্ধ ও তরিতরকারী অধিকাংশ ২৪ পরগণা হইতেই সরবরাহ হইয়া থাকে, সুতরাং গবাদির খাদ্যের কথাও উপেক্ষা করা যায় না।

আমাদিগের দেশের কৃষকেরা চিরদিন, যে শস্য যে প্রথাতে আবাদ করিয়া আসিতেছে, তাহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে যে তাহারা চাহে না এ কথা সত্য ; কিন্তু যদি কোন প্রথা অবলম্বনে তাহাদিগের আবাদের অবস্থার উন্নতি হইবে ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদিগের সামর্থ্যের অতিরিক্ত না হইলে, নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তাহা অবলম্বন করিতে কখন অসম্মত হয় না।

তাহারা কোন নূতন তত্ত্ব শিখিতে আলস্য বা ঔদাস্য প্রদর্শন করে না; বরং যাহা শিক্ষা করে ক্ষমাতার অতীত না হইলে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কখন ত্রুটি করে না। গুটিপোকার পরীক্ষা কার্য্যে দেখা গিয়াছে যে পরীক্ষার ফল দেখিয়া এই পরীক্ষা কৌশল শিখিবার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। অণুবীক্ষণ দ্বারা গুটির বীজ পরীক্ষায় কিরূপ সুফল লাভ হয় বুঝিতে পারিয়া, একজন গুটি ব্যবসায়ী তাহাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ক্রয় করিয়া দিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীর হাতে টাকা আমানত করিয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে আমাদিগের কৃষিব্যবসায়ীদিগকে লোকে যেরূপ প্রাচীন প্রথার অনুরাগী বলিয়া মনে করে, প্রকৃত পক্ষে তাহারা সেরূপ নহে। তাহারা দরিদ্র বলিয়া অনিশ্চিত পরীক্ষায় অর্থ ব্যয় করিতে সাহস করে না, কিন্তু কোন বিষয়ে নিশ্চিত ফল দেখিতে পাইলে তাহারা তাহা প্রবর্ত্তন করিতে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। সরকারী কৃষিবিভাগের কোন কর্ম্মচারী যখন বহরমপুরে ছিলাম, তখন তাঁহার সংসার খরচের জন্য কিছু চাউল কিনিয়া রাখা হইয়াছিল। যাহাতে তাহাতে পোকা না ধরে, এ জন্য তাহাতে Carbon bisulphide দিয়াছিলেন। একজন কৃষক তাহা দেখিয়াছিল। তাহাতে চাউলে তিন বৎসর কোনরূপ পোকা ধরে নাই ও গুঁড়া জমে নাই দেখিয়া, সে জিজ্ঞাসা করে যে, গোধূম ও ভুট্টার বীজে ঐ পদার্থ মিশাইলে তাহা ঐরূপ রক্ষা পাইবে কি না, এবং তাহা বপন করিলে অঙ্কুরোদ্গম হইবে কি না? এ বিষয়ে অভয় লাভ করিয়া সে দশ পাউণ্ড Carbon bisulphide কিনিয়া দিবার জন্য তদ্দণ্ডে ১০৲ টাকা প্রদান করে। এই দশ টাকা ব্যয় অনর্থক হইবে না জানিয়াই সে তাহাতে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ইহাতে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইলে আমাদিগের কৃষকেরা উন্নত প্রণালী অবলম্বন করিতে অবহেলা করে না। এরূপ অবস্থায় দেশের জমিদারগণ, অথবা অন্য যাঁহাদের সামর্থ ও সুবিধা আছে, তাঁহারা যদি আপনাদিগের তত্ত্বাবধানে দুই তিন বৎসর কাল কোন প্রকার ফসলের পরীক্ষা করিয়া যদি তাহা অধীনস্থ বা নিকটবর্ত্তী স্থানের কৃষক-দিগকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে দেশের কৃষিকার্য্যের সহজে অনেক উন্নতি হইতে পারে। কৃষকদিগকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে দেশের কৃষিকার্য্যের সহজে অনেক উন্নতি হইতে পারে। কৃষকদিগকে জোর করিয়া কোন প্রথা প্রবর্ত্তন করাইলে কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ ফল প্রদর্শন করিতে পারিলে তাহারা আপনারাই যে নূতন প্রথা অবলম্বনে অগ্রসর হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরে দুইটি মাত্র ত্রুটি সংশোধনের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তদ্ব্যতীত এদেশের কৃষিপ্রণালীর আরও শত শত ত্রুটি বিদ্যমান আছে। দেশের কৃষিপ্রণালীর আরও

শত শত ত্রুটি বিদ্যমান আছে। দেশের ভদ্রলোকেরা যদি সেই সকল ত্রুটি সংশোধন করিবার উপায় কৃষকদিগকে শিখাইয়া দেন, তাহা হইলে দেশের অশেষ উপকার সাধিত হয়।

তামাক

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন কলিকাতার সন্নিকটে যে সকল তামাকের ক্ষেত্র আছে তাহাতে তামাকের সহিত অন্য একপ্রকারউদ্ভিদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার জন্য বারাসাত অঞ্চলে তামাকের আবাদ করা বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। এই উদ্ভিদ তামাকের শিকড় হইতে গজাইয়া থাকে। তামাকের ন্যায় কপি ও গোলাপ গাছ প্রভৃতি বিবিধ গাছের শিকড় হইতেও ইহাকে অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়। অতএব যাহাতে এই পরগাছা হইতে আসল ফসল ও গাছ সকলকে রক্ষা করিতে পারা যায়, সে জন্য প্রত্যেক কৃষিকার্য্যানুরাগী ব্যক্তির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে বহুদিনাবধি একই ভিটা বা জমীতে তামাকের চাষ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে আর অন্য ফসল রোপণ করা হয় না। তামাকের আবাদের সঙ্গে পরগাছারও আবাদ চলিয়া আসিতেছে সুতরাং তাহাতে তাহা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। যে তামাকের সহিত একবার পরগাছা জন্মায়, তাহার বীজ হইতে পুনরায় যে ফসল হইবে তাহাও ঐরূপ পরগাছা সংযুক্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অতএব ইহার প্রতিকারার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভূমিতে তামাক বপন করা আবশ্যক। কেবল তাহাই নহে, স্বতন্ত্র বীজও বপন করিতে হইবে। আমার বিবেচনায় বর্ত্তমানে পুষার আদর্শ ক্ষেত্রে যে তামাকের বীজ বপন করা হইতেছে, সেই বীজ সংগ্রহ করিয়া বপন করিতে পারিলে আর তামাকের সহিত পরগাছা গজাইবে না। এই নূতন আবাদে যদি কোন গাছে পরগাছা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সে গুলিকে বীজ জন্মিবার পূর্ব্বে ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ যত্ন পূর্ব্বক দুই তিন বৎসর আবাদ করিতে পারিলে উল্লিখিত অনিষ্ট নিবারিত হইবে। তামাকের ভূমিতে মধ্যে মধ্যে অন্য ফসল বপন করিয়া, উল্লিখিতরূপ উৎকৃষ্ট বীজ বপন করিয়া ও পরগাছাযুক্ত তামাকু উপড়াইয়া ফেলিয়া, কৃষকদিগকে তাহার সুফল প্রদর্শন করিতে পারিলে তাহারা আপনারাই ক্রমে ক্রমে ঐ প্রথানুসারে আবাদ করিবে।

কাশাভা বা শিমুল আলু

এদেশে অনাবৃষ্টির জন্য অনেক সময়েই শস্যহানী হইয়া থাকে এবং সে জন্য কৃষকদিগের যারপর নাই অন্ন কষ্ট সহ্য করিতে হয়। আফ্রিকা দেশে এদেশ অপেক্ষাও স্বল্প বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু সেজন্য তত্রত্যকার লোকের প্রধান খাদ্য

সিমুল আলু বা কাশাভার আবাদে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। আমার বোধ হয় আমাদের দেশের যে সকল স্থানে প্রচুর বৃষ্টি হয় না অর্থাৎ নদীয়া, মুর্শিদাবাদ জেলার মত স্থানে এই সিমুল আলুর আবাদ করিলে বড় ভাল হয়। ইহা যেমন যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে, তেমনি একটি পুষ্টিকারক ফসল। সুতরাং ধান না জন্মিলে ইহা খাইয়া লোকে সচ্ছন্দে দিন যাপন করিতে পারে। এই সিমুল আলু তুলিয়া কয়েক ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখিলে ইহার উপকার ছাল সহজে ছাড়ান যায় এবং তাহার পর কাঁচা শাঁস খাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত উহা ময়দা বা আটার মত পিষিয়াও খাওয়া যায় ও অনেক দিন ধরিয়া ঘরে রাখা যায়। (ক্রমশঃ)

বাগানের মাসিক কার্য্য।

কার্ত্তিক মাস।

আশ্বিন মাস গত হইলে, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শসা প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারী করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসূরী, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে।

সুল্পাদি—সুল্প, মেথি, কালজিরা, যৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না; কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়।

কার্পাস—গাছ কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বলুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়।

উচ্ছে—৪।৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার অধিক পুঁতিবে না;

পটোল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুঁতিবে। পুনঃ পুনঃ খুসিয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট।

পলাণ্ডু—কল সমেত এক একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুঁতিয়া দিবে এবং জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুড়িয়া দিবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এত দিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বীজ বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪ ৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকাকালে কলিচুণের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঙলাদেশের মাটি বড় রসা, এই কারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ খণ্ড। } কার্ত্তিক, ১৩১৯ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

মহুয়া বৃক্ষের চাষ

শ্রীগণপতি রায় লিখিত

উৎপত্তি

এই বৃক্ষকে সংস্কৃত ভাষায় মধুক বা মধুদ্রুম কহে। ইহার উপকারীতা নিতান্ত কম নহে। ইহাকে লাতিন ভাষায় Polyandria Monogynia of Lennœons কহে। ইহার বীজের নিম্নাংশ নলাকৃতি। উক্ত বীজ এক ইঞ্চি দীর্ঘ। ইহার ত্বক স্থূল এবং লোহিত বর্ণের; ইহা হইতে নয়টি ক্ষুদ্র পত্র বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ বৃক্ষাকারে পরিণত হয়। ইহার ফুল গুচ্ছাকারে বহির্গত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করে। উহা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা হইতে বহির্গত হইয়া থাকে, ফুলের আকার দেড় ইঞ্চি। ফুলগুলি নিম্নাভিমুখে নমিত; উহা হইতে বীজ উৎপন্ন হইলে ফুলগুলি আপনা আপনি পড়িয়া যায়।

বৃক্ষ

বৃক্ষ পূর্ণ বয়স্ক হইলে আম্র বৃক্ষের সমতুল্য হইয়া থাকে। বৃক্ষের মস্তক ঝোপের ন্যায় দৃষ্ট হয়। পত্রগুলি অণ্ডাকার (Oval) কিন্তু সামান্য তীক্ষ্ণ। শিকড়গুলি সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে; উহা ভূমধ্যে অধিক প্রবেশ করে না। ইহার গুঁড়ি শাখাশূন্যাবস্থায় অধিক দীর্ঘ হয় না। অর্থাৎ ৮।১০ ফিট এইরূপ দীর্ঘ হইয়া থাকে। কাষ্ঠ নিতান্ত অল্প কঠিন নহে; উহার বর্ণ লোহিত। ইহার ত্বক হইতে একপ্রকার সুনির্ম্মল নির্য্যাস বা আটা বহির্গত হয়।

ফল

ইহার ফল অদ্ভুত। উহা জামের সহিত তুলনা করা যায়। ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত বৃক্ষের পত্র পতিত হয়। মার্চ্চের প্রথমাংশেই পত্রশূন্য বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার প্রান্তভাগ হইতে পুষ্পোদ্গম হইতে আরম্ভ করে এবং তদ্দ্বারা বৃক্ষের অঙ্গশোভা বর্দ্ধিত হয়। ইহার ফল সাধারণতঃ বিবিধ আকারের দৃষ্ট হয়। ইহা ক্ষুদ্র আখরোটের আকার বিশিষ্ট কিন্তু কথঞ্চিৎ বৃহৎ, লম্বাকৃতি ও তীক্ষ্ণ। বৈশাখের মধ্যমাংশে উহার ফল পাকিতে আরম্ভ করে। ফল পতিত হইতে আরম্ভ করিলে অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। এইরূপ জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যমাংশ পর্য্যন্ত পতিত হইতে থাকে। ইহার খোসাটি (যাহাকে লাটিন ভাষায় Pericarpium কহে) অত্যন্ত কোমল। ফলগুলি পতিত হইবামাত্র ভগ্ন হইয়া যায়। পতিত হইলে তন্মধ্যস্থিত শাঁসাংশ সংপেষিত হইয়া থাকে। ঐ শাঁসাংশ তৈলাক্ত দ্রব্যবিশেষ। উহা মাখন বা ঘৃতের তুল্য দ্রব্য ; অবস্থাভেদে মাখন বা ঘৃতের সমতুল্য হইয়া থাকে।

খাদ্য

বিশুষ্ক এবং মরুপ্রদেশাদিতে মহুয়া বৃক্ষ অত্যধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের উপকারীতা তদ্দেশেই অধিক উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ সমূহের অধিবাসীগণ মহুয়ার ফুল শুষ্ক করিয়া অথবা সদ্য ফল তরকারীরূপে ব্যবহার করে। কেহ কেহ (ফল) উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করে। কেহ কেহ বা উহা রন্ধন সময়ে সিদ্ধ করিয়া লয়। উহা অত্যন্ত উপাদেয়, বলকারক খাদ্য বলিয়া গৃহিত হইয়া থাকে।

মদ্যাদি

পূর্ব্বোক্ত প্রদেশ সমূহের অধিবাসীগণ মহুয়ার ফল পচাইয়া এবং চুয়াইয়া উহা হইতে একপ্রকার তীব্র মদিরা প্রস্তুত করে। উহা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। উহার মূল্য এত অল্প যে উক্ত কাঁচি ৴১ সের মদ ৫ পয়সা মূল্যে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। ৫ পয়সা মূল্যের মদ সেবন করিয়া একব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে মত্ত হইতে পারে। উক্ত মদিরা পাটনা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। উহার ব্যবসায়ে বিলক্ষণ লাভবান হওয়া যায়। উক্ত দ্রব্য ভিন্নদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার ফল হইতে একপ্রকার ঘৃতের ন্যায় তৈলাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উহা স্বল্পায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ঘৃতে ভেজালরূপে ব্যবহৃত হয়। মেঠাই প্রভৃতিতে এইপ্রকার ঘৃতই অধিক ব্যবহৃত হয়। তরল অবস্থায় তৈলরূপে

ঔষধ

প্রদীপে প্রজ্জ্বলিত করা হয়। মহুয়ার তৈল বাহ্যিক ব্যবহারে ক্ষত আরোগ্য হয়। ক্ষত আরোগ্যের এমত অব্যর্থ মহৌষধ আর নাই। ইহা সকল প্রকার চর্ম্মসম্বন্ধীয় পীড়ায় (Cutaneous eruptions) অর্থাৎ ব্রণাদি নির্গমনে প্রযোজ্য। প্রথমতঃ ইহা সাধারণ তৈলের ন্যায় তরল অবস্থায় থাকে, পরিশেষে উহা ঘনীভূত হইয়া যায়। উহাকে ইংরাজীতে Coagulate হওয়া কহে। উক্ত তৈল ক্ষণকাল রাখিয়া দিলে স্বল্পতিক্তাস্বাদ অনুভূত হয়। পরে উহা হইতে পুতিগন্ধযুক্ত (Rancid) গন্ধ বহির্গত হয়। তখন উহা খাদ্যের অযোগ্য হইয়া পড়ে। পরন্তু যদ্যপি পূর্ব্বে এই তৈল পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে আর ঐরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

উক্ত তৈল বিশুদ্ধ এবং অশুদ্ধাবস্থায় বিভিন্নদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। পাটনা, দানাপুর প্রভৃতি নিম্নভূমিতে ইহার যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে।

আটা

মহুয়া বৃক্ষ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আটা সংগৃহিত হইতে পারে। উহা চৈত্র ও বৈশাখ মাসে সংগ্রহ করিতে হয়। তখন উক্ত বৃক্ষ ফল পুষ্পে পরিশোভিত হয়। যে সকল স্থানে মহুয়া বৃক্ষ স্বল্প দৃষ্ট হয়, তথা হইতে আটা সংগ্রহ করিলে বৃক্ষের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু যে সকল স্থানে উক্ত বৃক্ষের রীতিমত আবাদ করা হয়, তথায় নির্ব্বিঘ্নে আটা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। উহাতে অধিক ক্ষতি করিতে পারে না।

কড়ী প্রভৃতি

এই বৃক্ষের দ্বারা বীম বা কড়ী ও গৃহের অন্যান্য কার্য্যাদি করা বিধেয় নহে। উহা জমির উপরে ও ভূমধ্যে প্রোথিত থাকিয়া অধিক কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় দিতে পারে না। কিন্তু উহাদ্বারা জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিলে বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে। কেবল উক্ত কার্য্যের জন্যই মহুয়ার আবাদ করা যাইতে পারে। বর্ষাকালে এই কাষ্ঠের "ভেলা" বাঁধিয়া দূরদেশে লইয়া যাওয়া যায়। অনেকে এই কাষ্ঠের 'চালান' দিয়া যথেষ্ঠ লাভবান হইয়াছেন।

জন্মস্থান

এই বৃক্ষ অনুর্ব্বরা ও পার্ব্বত্য প্রদেশেই সমধিক জন্মিয়া থাকে। ইহার নিকট অপর ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইতে পারে না। বহু বৃক্ষ সমাকীর্ণ স্থানে উক্ত বৃক্ষ রোপণ করিবার দু, তিন মাস পরেই সন্নিকটবর্ত্তী অপর বৃক্ষাদি শুষ্ক হইতে থাকে ও অল্প দিন মধ্যে মরিয়া যায়। পাটনা, দানাপুর, বক্সার ও রামগড় প্রভৃতি স্থানেও

এই বৃক্ষ দীর্ঘাকৃতি হইয়া থাকে। ইহার জমি অধিক আর্দ্র হইলেও উক্ত বৃক্ষ উত্তমরূপে জন্মিতে দেখা যায়। কটক, পাচিৎ, রোটাস্ প্রভৃতি স্থান ইহার জন্ম স্থান। পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে এই বৃক্ষ প্রায় সর্ব্বত্রই স্বল্লাধিক্ জন্মিতে পারে।

বপনকাল ও মূল্যাদি

এই বৃক্ষ বর্ষাকালে রোপণ করিতে হয়। ৩০ ৪০ ফিট দূরে দূরে ইহা রোপণ করিবার নিয়ম। সপ্তম বৎসরের মধ্যে ইহার ফল পুষ্পে পরিশোভিত হয়। দশম বর্ষে ইহা হইতে অর্দ্ধ পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়। বিংশ বর্ষে বৃক্ষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়া গেলে বৃক্ষগুলি প্রায় শতবর্ষ জীবিত থাকে। এক একটি পূর্ণ বৃক্ষ ৪/ চারি মণ শুষ্ক পুষ্প প্রদান করিতে পারে। উহার মূল্য প্রায় ২৲ টাকা হইবে। উহাতে পাকি ৷৷৬ সের বা প্রায় কাঁচি ৷৹ ত্রিশ সের তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা এক বৎসরের হিসাব। সকল বৃক্ষে তুল্যরূপ ফল প্রদান করে না। সুতরাং তদ্দারা মূল্যেরও ন্যুনাধিক্য দৃষ্ট হয়। চিত্রা নামক স্থানে এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশে মহুয়ার অত্যন্ত পরিষ্কৃত তৈল প্রস্তুত হয়, এমত আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

রোপণের নিয়ম

প্রত্যেক বিঘায় আটটি করিয়া বৃক্ষ রোপণ করিতে পারা যায়। প্রতিবৃক্ষে ৷৹ আট আনা লাভ হইলে আটটি বৃক্ষে ৪৲ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তন্মধ্য হইতে খাজানা বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহাতে বিনাকষ্টে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারে। ইহাতে অপর খরচ আদি নাই। কেবল মাত্র উক্ত বৃক্ষ রোপণ করিয়া রাখিলেই হইল। এই বৃক্ষ অযত্নে বর্দ্ধিত হয়। উক্ত অযত্নে বর্দ্ধিত বৃক্ষের চাষ করিলে স্বল্পায়াসে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে. এবং দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া লোকের আর কষ্ট পাইতে হয় না। এই প্রকার অযত্নলব্ধ দ্রব্যের প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হইলে শুভ ফল প্রদান করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। যে দেশে এই সকল বৃক্ষ জন্মে তথায় লোকেরা ইহার প্রকৃত মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণেও শত সহস্র বৃক্ষ প্রান্তরে জন্মিয়া প্রান্তরেই বিশুষ্ক হইতেছে, লোকে তাহার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধিকরণে সমর্থ হয় নাই।

গয়ায় আলু ও কপির চাষ

হাইকোর্টের উকিল শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার লিখিত

গয়া একটি প্রাচীন নগর। হিন্দুর একটী মহা তীর্থ স্থান। এই জেলার বহু অংশ বনাকীর্ণ এবং পর্ব্বতমালায় পরিশোভিত হইলেও ইহা খুবই উর্ব্বর। মটর কড়াই, বরুই মুগ, ছোলা, গম, তিসি, কাপাস, তিল, ধান্য, ধনে, জীরা, খেসারি, কুরুট্টী, মক্কা, মেড়ুয়া, জিলোরা, বাজড়া, সরিষা প্রভৃতি সকল প্রকার ফসলই জন্মিয়া থাকে। বিগত দুই বৎসর হইতে আফিমের চাষ উঠিয়া যাওয়ায় প্রজাদের কিছু কষ্ট হইয়াছে। এ জেলায় প্রজার ন্যায় দীনদরিদ্র ও নিরীহ প্রজা কোন খানে আছে কি না তাহা সন্দেহ। এ জেলায় কৃষকগণ খুব পরিশ্রমী এবং আকাশের জলের জন্য ভগবানের মুখাপেক্ষী নহে। লাঠাকুড়ী বা মোটচালাইয়া পরিশ্রম করিয়া তাহারা যে ফসল উৎপাদন করে তাহা দেখিয়া আমাদের দেশের সৌখিন ও বাবু কৃষকদের ইহাদের কাছ হইতে অনেক শিখিবার জিনিষ আছে বলিয়া আমার মনে হয়। ধন্য এদেশের কৃষকের অধ্যবসায়। এ বৎসর এ জেলায় বড়ই দুর্ব্বৎসর। ভাদুই, খরিফ (হৈমন্তিক ধান্য) এবং জলাভাবে রবি খন্দ ফসল মোটেই উৎপাদন হয় নাই। সুতরাং এ বৎসর এখানে দুর্ভিক্ষের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। গয়া সহরের চতুষ্পার্শ্বে বহু তরিতরকারির ক্ষেত্র আছে। এইগুলি স্থানীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকগণ খাজনায় জমিদারের নিকট হইতে বিলি লইয়া বেশ তরিতরকারি উৎপাদন করে এবং তদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। গয়া হইতে অনেক কপি এবং আলু কলিকাতায় নীত হইয়া "পাটনায়ে" বলিয়া বিক্রিত হইয়া থাকে। পরেবা, মনকোশী, বিচ্ছি, ভুষড়া, সলেমপুর, মাড়নপুর, নাইলী, কেঁন্দুই, বুদ্ধ গয়া, খরখুবা, নরঙ্গা, নবাদা, কুজাপী কুজাপ, রামপুর, গয়ালবিঘা, চান্দোভী প্রভৃতি গ্রামে সহস্র সহস্র মণ আলু কলিকাতার বাজারে দরে বিক্রীত হইয়া কৃষকগণকে প্রভুত অর্থ দেয়। এদেশের এই চাষাগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। তাহারা ধনী এবং কাজেই সুখী। কপি স্থানীয় বীজে বা বিলাতী বীজে উৎপন্ন হইয়া থাকে। একখানি বেশ ভাল বীজের দোকান এখানে চলিতে পারে কিন্তু সে দিকে কাহারও নজর নাই। ফুল কপি Snowflake, Extra Early ইত্যাদি সকাল এবং বিলম্বিত জাতি সবই উৎপন্ন হয়। স্বাদ ও এই কপির তঁরকারি খুব মিষ্ট। খইল বা অপর বৈজ্ঞানিক সার দিবার প্রথা এ দেশে নাই। ছাই, অশ্বশালার ঝাঁটান জঞ্জাল, গোময়

সারই কপি বা আলু ক্ষেতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু গত কয় বৎসর হইতে এখানকার অসাধু ধনলোলুপ কলিকাতাগামী চাষাগণ ফল্গু নদী হইতে ঝুড়ী ঝুড়ী বিষ্ঠা খরিদ করিয়া আলু বা কপি ক্ষেতে সাররূপে ব্যবহার করায় ফল বড় হয় বটে কিন্তু তেমন সুস্বাদু হয় না, বরং দুরারোগ্য রোগের মূল রোপিত করিয়া থাকে। [illegible]বিষয়ে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণের আদৌ দৃষ্টি নাই। এই স্থানের রাস্তা, ঘাট, নর্দ্দমাও অত্যন্ত অপরিষ্কার, কাজেই বহুরোগের আকর হইয়া থাকে। আলু এবং কপির চাষ এদেশে বহুল হয়। "সাদা"-এ "খাশী" কাটা করিয়া কপি পোতা হইয়া থাকে। বাঁধাকপি খুব এ সহরের চতুষ্পার্শ্বে হইয়া থাকে। Early Drumhead, Cow-cabbage, গাজর, টমাটো, Landreth's Latesquare, Burpee's Early Queen, প্রভৃতি বহুপ্রকার বাঁধাকপি এখানে একটু নাবি হইয়া থাকে। এক একটি কপি একটি ঝুড়ির মত দেখা যায়। কয়েকবার আমি (Agricultural Show) কৃষিপ্রদর্শনীতে নিজ বাগানজাত কপি ও আলু পাঠাইয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে কপি এবং আলুর (blight) ধ্বসা রোগ ধরে; তাহা স্থানীয় অজ্ঞ কৃষকগণ (spray) আরক সিঞ্চন করিতে না জানায় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে কীটাণু ধ্বংস করিতে না জানায় অনেকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এ সকল বিষয়ে উত্তর আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন Experimented Station গুলি কৃষকগণের সহায়তার আদর্শ স্বরূপ। কেবল সাভর বা পুষায় স্থাপিত তত্বাগারে আমাদের এ বৃহৎদেশে কি হইবে। আমেরিকার মত প্রত্যেক জেলায় জেলায় পরীক্ষাক্ষেত্র Experimented Station প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশের কতক পরিমাণে উপকার সাধিত হইতে পারে। পরপ্রবন্ধে আলু কপির রোগের আলোচনা করিব।

জল চাষ

কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিত শ্রীযামিনীরঞ্জন মজুমদার প্রণীত।

ভূমিকা

কৃষিকার্য্য বলিলে ভারতীয় জনগণ একাল পর্য্যন্ত ভূমিকর্ষণ করতঃ ফলমূল শস্যাদি উৎপাদন বুঝিতেন, কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ছাগল, মেষ আদি পশু পালন হইতে মুরগী, হংস, বক প্রভৃতি পক্ষীর বংশবৃদ্ধি করণ সম্বুক, ঝিনুক, মৎস্যাহারী জলজন্তু প্রাণীর ও পাণীফল পদ্ম (হিঞ্চে) কলমি প্রভৃতি জলজ লতা আদি পর্য্যন্ত কৃষিবিজ্ঞানের অন্তর্ভূ'ত করিয়াছেন। কি উপায়ে সুজলা সুফলা বঙ্গের গৃহ পার্শ্বস্থ নালা ডোবা ভরাট পুষ্করিণী প্রভৃতি নিম্নতম স্থানে অনায়াসে জল চাষ করিয়া আমাদের আর্থিক উন্নতি করিতে পারি তাহাই এখানে বিবৃত হইল।

পাণীকচু বা শোলাকচু—কচু-শীতল, লঘুপাক, রক্তপিত্ত নাশক, শোথ নিবারক। ইহার গাছের চারার চেহারা অনেকটা মুখী কচুর ন্যায়। অন্যান্য কচুর ন্যায় মূল হইতে শীকড় (বই) বাহির হইয়া চারা উৎপাদন করে। এই চারাগুলি শীতের প্রারম্ভে নিচু জমীতে অর্থাৎ বৃষ্টি হইলে যেখানে জল দাঁড়াইতে পারে এরূপ স্থানে বসাইতে হয়। উত্তমরূপ কর্ষণ করিয়া ১॥০ দেড় হাত অন্তর চারা পুতিয়া দিতে হয় শীতকালে ইহার আর কোন পাইট করিতে হয় না। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হইলে কোদালীর দ্বারা গোড়া কোপাইয়া তৃণাদি পরিষ্কার করিয়া দিতে হয় পরে যেমন বর্ষা হইতে থাকিবে অমনি কচু বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। ঐ স্থানে ২ হাত পরিমাণ জল বাধিলেও কচু নষ্ট হইবার বা পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই। উহারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ বর্দ্ধিত হইয়া ডগা পাতা কচু সমেত গাছটী উর্দ্ধে তিন হস্ত পরিমিত হইতে পারে। পাতা ডগা কচু ও এই প্রত্যেক জিনিষই তরকারি রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ইহার চাষ হইয়া থাকে। বিঘা প্রতি খরচ বাদে ১০০৲ একশত টাকা আয় হইলেও হইতে পারে। ইহাতে খরচা বিশেষ কিছুই নাই। ২৲ দুই টাকার চারা হইলে ১/ এক বিঘা জমীতে চাষ চলিতে পারে। প্রথম বারের কর্ষণে ২ দুই দিনের হাল গরুর খরচা ৩৲ তিন টাকা ও ২ দুই বার জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়া কোপাইবার খরচা ২৲ দুই টাকা, কচু তুলিবার ইত্যাদি

অন্যান্য বাজে খরচ ৩৲ তিন টাকা ষ্টাণ্ডার্ড বিঘার মাপ ১৪৪০০ বর্গ ফিটে এক বিঘা। এখানকার বিঘার মাত্রা কিছু অধিক প্রায় ২০,০০০ বর্গ ফিট। এই মাপ ধরিয়া লইয়া লাভের মাত্রা বুঝিতে হইবে। যাহা হউক একুনে বিঘা প্রতি ১০৲ দশ টাকা খরচ করিয়া বাটীর পার্শ্বস্থ ডোবা জমিতে কচু চাষ করিয়া ১০০৲ একশত টাকা লাভের চেষ্টা ২০।২৫৲ টাকার গোলামী করা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে মনুষ্যত্ব ধ্বংশ হয় আর এইরূপ কৃষি কার্য্যে আত্মনির্ভরতা, স্বাবলম্বন, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবোচিৎ গুণ আনয়ন করে ও দেশের দারিদ্রতা দূর করিয়া সুখ সম্পদ ও স্বাস্থ্য দান করে।

কলমী—মধুর কষায় রস, গুরুপাক এবং স্তন্য, দুগ্ধ, শুক্র ও শ্লেষ্মার বর্দ্ধক। কল্মি শাকের ঝোল রাধিয়া খাইলে উহা গুরু পাক হয় না উহা Cruping Plants এর অন্তর্গত। ছায়াযুক্ত নরম জমিতেও হয় এবং অত্যধিক ভাষমান জলেতে উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। ইহা বিশেষ লাভ জনক না হইলেও যে জলাশয়ে মৎস্যের চাষ হইবে তাহার উপরিভাগে আচ্ছাদনরূপে ব্যবহৃত হইয়া মৎস্যগণের আহার ও জীবন ধারণের সহায়তা করতঃ সামান্য আয় হইয়া থাকে। সহরেতে নিতান্ত কম মূল্যেও বিক্রয় হয় না।

পোকার দৌরাত্ম্য

যাঁহারা কৃষি সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন তাঁহারা নিশ্চয়ই জানেন প্রতিবৎসর কীট-পতঙ্গ আমাদের শস্যের কত ক্ষতি করে। কৃষিক্ষেত্রে যাইবার প্রয়োজন নাই। কলিকাতার সহরেও ছাতের উপর যাঁহারা দুটি গোলাপ ফুলের গাছ করিতে গিয়াছেন অথবা বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে সখ করিয়া সজীর বাগান করিয়াছেন তাঁহারা কীটপতঙ্গের গাছপালা নষ্ট করিবার শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকিবেন। যেখানে গাছপালা শস্যাদি ভালরূপ জন্মায় সেই সব দেশেই কীটের উৎপাতও অধিক হইয়া থাকে। উত্তাপ ও সজলতা গাছের বৃদ্ধির পক্ষে যেরূপ অনুকূল পতঙ্গের বংশবৃদ্ধির পক্ষেও সেইরূপ। এই কারণে আমাদের দেশে কীটের উৎপাত অত্যন্ত বেশী। কত লক্ষ লক্ষ টাকার শস্য যে কীট দ্বারা প্রতিবৎসর নষ্ট হইতেছে তাহা ধারণা করা কঠিন। কোনও এক বৎসরে সমস্ত ভারতবর্ষে কীটপতঙ্গ যত টাকার শস্যের হানি করে তাহার যদি একটি হিসাব করিয়া সকলকে দেখানো যায় ত কেহ সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবে না। এত ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও কিরূপে তাহা নিবারণ করা যাইতে পারে সেদিকে কাহারও চেষ্টা নাই। কৃষকের মূর্খতা ও দারিদ্র্য বশত কীট দমন বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট—শস্য নষ্ট হইয়া গেলে কেবল নিজের কপালের দোষ দিয়াই ক্ষান্ত থাকে। গবর্ণমেণ্টও এ পর্য্যন্ত কীটের আক্রমণ হইতে শস্য রক্ষা করা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। আমাদের দেশেই কেবল এইরূপে কীট মানুষের এমন শত্রু হইয়া পড়িয়াছে কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকায় মানুষকেই কীটের শত্রু বলা যাইতে পারে। ইউরোপ অপেক্ষা আমেরিকাতেই কীট-পতঙ্গের উপদ্রব বেশী, সেই জন্য সেইখানেই কীটদমনের চেষ্টাও বেশী। আমেরিকার লোকদের সর্ব্বদাই কীটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইতেছে।

যেখানে যে গাছ অতি সহজেই জন্মায় ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে, আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেইখানেই সেই গাছের হানিকর পোকাও বহুসংখ্যায় আসিয়া জোটে ও গাছ নষ্ট করিতে থাকে। গাছপালা অনেকটা মানুষের মত, যতই তাহাদের বেশী উন্নতি করা যায় ততই তাহারা সহজে রোগাক্রান্ত হয়। বাগানে যত্নপালিত সৌখীন গাছ যেরূপ সহজেই মরিয়া যায়, বনজঙ্গলের গাছ সেরূপ সহজে মরে না। পৃথিবীর মধ্যে কালিফর্ণিয়ার ন্যায় বিখ্যাত ফলের বাগান আর কোথাও নাই, সমস্ত দেশটাই একটি বৃহৎ ফলের বাগান বলিলে হয়, কিন্তু ঐ কারণেই সেখানে পোকার উপদ্রবও বেশী ও নানান্ উপায়ে তাহাদের দমন করিয়া না রাখিতে পারিলে অমন দেশেও একটি ফল হয় না। পোকার আক্রমণের

বিরুদ্ধে এতই ভীষণ সংগ্রাম করিতে হয় যে কৃষকেরা নিজের চেষ্টায় কিছুই করিতে সমর্থ হয় না, State Board of Horticultureএর উপর এই সংগ্রাম চালাইবার ভার ; এই সমিতি হইতে বিস্তর ব্যয় করিয়া বহুসংখ্যক শিক্ষিত পর্য্যবেক্ষক দ্বারা কালিফর্ণিয়ার প্রত্যেক ফলের বাগান সর্ব্বদা পরীক্ষা করানো হয় ও অনিষ্টকর পোকার সন্ধান পাইলেই তাহার বিনাশের উপায় করা হয়। সেখানকার আইন অনুসারে এই পর্য্যবেক্ষকেরা সকলেরই বাগানে বিনা অনুমতিতেও ঢুকিতে পারে ও মালিকের অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে কোনও বিশিষ্ট উপায়ে পোকা ধ্বংস করাইতে বা পোকাধরা গাছ একেবারে পুড়াইয়া বিনষ্ট করিতে বাধ্য করিতে পারে।

যত রকম পোকা আছে তাহাদের মধ্যে স্কেল্ নামক একজাতীয় কীট বোধ হয় গাছের সব চেয়ে বেশী ক্ষতি করে। ইহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অভ্যস্ত না থাকিলে শুধু চোখে ইহাদের দেখিতে পাওয়াই কঠিন, ডাল বা পাতার উপর ইহারা একেবারে সংশ্লিষ্ট ভাবে লাগিয়া থাকে। কয়েক বৎসর হইল এই জাতেরই এক পোকা (San Jose Scale) আমেরিকার সমস্ত গাছের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিল, কালিফর্ণিয়ার সমস্ত কমলা লেবুর বাগান নষ্ট করিয়া দিয়াছিল, বহু লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছিল। যখন এই San Jose Scale দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল তাহাদের দমন করিবার আর কোন উপায় না দেখিয়া পর্য্যবেক্ষকগণ দেশের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক ফলের গাছ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কীটের নিদর্শন পাইলেই সেই গাছে বিষমিশ্রিত জল ছিটাইয়া বা বিষাক্ত ধোঁয়া দিয়া তাহাদের ধ্বংস করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে San Jose Scale আমেরিকায় এখন লুপ্তপ্রায়, অল্প যাহা আছে তাহাদের বাড়িতে দেওয়া হয় না বলিয়া গাছের আর কোনও অনিষ্ট করিতে পারে না।

প্রকৃতির এমনই কৌশল যে জীব জন্তুরই দুই একটি করিয়া শত্রু আছে, তাহা যদি না হইত তবে অল্পদিনের মধ্যেই কোনও একটি জীবের সহসা বংশ বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত পৃথিবী ভরিয়া যাইত। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে একটি মাত্র অতি ক্ষুদ্র ব্যাক্‌টিরিয়াম্ যদি অবাধে বাড়িয়া যাইতে থাকে তাহা হইলে ৭।৮ দিবসের মধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র ভরাট করিয়া ফেলিতে পারে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকৃতি জীবজন্তুদিগের পরস্পরের মধ্যে একটি যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার বিধান করিয়াছেন তাহা আমরা প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইতেছি, তবে কি করিয়া হঠাৎ এক একবার এইরূপ কীটপতঙ্গের প্রাদুর্ভাব হইয়া সমস্ত গাছপালা শস্য নষ্ট হইয়া যায়? মানুষই প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করে ও নিজেদের সুবিধার জন্য প্রকৃতির এই সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া দেয় বলিয়া এইরূপ ঘটে অতএব মানুষকেই আবার তাহার প্রতিকার করিতে হয়।

এক সময় কালিফর্ণিয়াতে white scales নামক এক প্রকার পোকার খুব প্রাদুর্ভাব হয় ও কোন উপায়েই তাহাদের মারিতে পারা যাইতেছিল না। এই সময়ে কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিলেন যে অষ্ট্রেলিয়াতে একরূপ ছোট পাখী আছে, তাহারা এই পোকার পরম শত্রু। ইহা জানিতে পারিয়াই অষ্ট্রেলিয়া হইতে হাজার হাজার এই লেডিবার্ড পাখী আনাইয়া কালিফর্ণিয়াতে ছাড়িয়া দেওয়া হইল ও অল্প সময়ের মধ্যেই white scales কমিয়া গেল। এই লেডিবার্ড পাখী কালিফর্ণিয়ার কৃষকের এখন এক প্রধান বন্ধু।

এইরূপ প্রকৃতির সাহায্য লইয়া পোকা মারাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও অল্পসময়-সাপেক্ষ—কিন্তু অনেক সময়ে কোনও কোনও পোকার শত্রু হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হয়। প্রকৃতির বিনা সাহায্যে মানুষকে পোকা মারিতে হইলে কত পরিশ্রম করিতে হয় পিয়ার্সন্ নামক পত্রে Great Fights with Insects প্রবন্ধে তাহার দুইটি বেশ দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

আমেরিকার অন্তর্গত জর্জিয়া প্রদেশে একপ্রকার বিশেষ অনিষ্টকারী পোকা আছে, তাহারা প্লাম্ ও পীচ গাছের বেশী অনিষ্ট করে, ইংরাজিতে ইহাদিগকে curculio Beetle কহে। ইহাদের কোনও উপায়ে সহজে মারা যায় না, কেবল এক উপায় আছে, গাছ ধরিয়া খুব ঝাঁকা দিলে তাহারা নীচে পড়িয়া যায় তখন কাপড়ের উপর ধরিয়া তাহাদের হাতে করিয়া মারিতে হয়। এইরূপ উপায়ে ইহাদের ধ্বংস করা কি শ্রমসাপেক্ষ তাহা একটি ঘটনা উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। জর্জিয়ার একটি ফলের বাগানে দুই লক্ষ পীচ ও পঞ্চাশ হাজার প্লাম গাছ আছে, পোকা লাগাতে ইহার প্রত্যেক গাছকে ঝাঁকা দিয়া ও নীচে কাপড় পাতিয়া পোকা ধরিতে হইয়াছিল। ২২ খানা কাপড় লইয়া খুব পরিশ্রম করিয়া দিনের মধ্যে ৪০,০০০ গাছের পোকা মারিতে পারা গিয়াছিল। কিন্তু একবার মারিলেই হয় না, বারবার এইরূপ করিতে হয়। এই একটি মাত্র বাগান হইতে পোকার উপদ্রব নিবারণ করিতে সর্ব্বসমেত দুই মাস লাগিয়াছিল ও এই সময়ের মধ্যে ১,৫০,০০০ পোকা ধরা হইয়াছিল।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা মাসাচুসেট্স্ প্রদেশে gypsy moth পোকা নিবারণ করিতে যে তুমুল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল তাহা আরও আশ্চর্য্যজনক ও বর্ণনাযোগ্য। এক সামান্য পোকার সহিত লড়িতে মানুষকে এমন নাকাল আর কখনও হইতে হয় নাই।

প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল লেওপোল্ড্ ট্রুভ্লো নামে এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক মাসাচুসেট্সের মেড্ফোর্ড্ নামে একটি ক্ষুদ্র সহরে বাস করিতেন। তিনি সেইখানে অন্যান্য কার্য্যের সহিত কীটতত্ত্বেরও চর্চ্চা করিতেছিলেন। একদিন কোনও ইউরোপবাসী বন্ধুর নিকট হইতে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিমিত্ত

একটি ক্ষুদ্র কাগজের বাক্সে gypsy mothএর কতকগুলি ডিম তিনি পাইলেন। অসাবধানতা বশত ডিম শুদ্ধ এই বাক্সটি তিনি খোলা জানালার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন। এক সময়ে বাতাস আসিয়া সেই ডিমগুলিকে জানালার বাহিরে বাগানে লইয়া ছড়াইয়া দিল। ট্রুভ্লো ডিমগুলির কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন—এক বৎসর পরে দেখিলেন তাঁহার বাগানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি শুটিপোকা বিচরণ করিতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে মারিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরের বৎসর দেখিলেন তাহারা তাঁহার বাগান ছাইয়া ফেলিয়াছে। অনন্যোপায় হইয়া এই পোকার কথা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন ও সকলকে সতর্ক থাকিতে বলিলেন, কারণ ইউরোপে এই পোকা বিস্তর অনিষ্ট করে তিনি জানিতেন। সতর্ক হওয়া দূরে থাকুক সকলে তাঁহার কথা তখন হাস্যজনক মনে করিয়া আদৌ কর্ণপাত করিল না। তিনি কিছুদিন পরে ফরাসীদেশে চলিয়া গেলেন, এই পোকার কথাও সকলে ভুলিয়া গেল, কেবল দুই একজন লক্ষ্য করিয়াছিল যে ইহারা ক্রমে ক্রমে মেডফোর্ড ছাড়িয়া নিকটে যে জঙ্গল আছে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহার পর প্রায় বিশ বৎসর গেল, পোকারা ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, যে সকল গাছ এই সময় তাহারা নষ্ট করিতেছিল, লোকে মনে করিল তাহা অন্য পোকার কাজ। অবশেষে ১৮৮৯ সাল উপস্থিত হইতে জিপ্সি মথ্‌দিগের তখন এতই বংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাহাদের খাদ্যের অনাটন হইল, তাহারা মেডফোর্ডের সন্নিকটে যথেষ্ট খাদ্য না পাইয়া অনেকদুর পর্য্যন্ত যাইতে লাগিল ও যে সব গাছ আক্রমণ করিতে লাগিল তাহাদের একটিও পাতা রাখিল না। আর মেডফোর্ডে ত তাহাদের সীমাসংখ্যা রহিল না, সমস্ত সহর আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রাস্তা, ঘাট, বাড়ী সব কালো হইয়া গেল। প্রকোষ্ঠ ঝাঁট দিয়া পোকা সরাইয়া তবে ঘরে প্রবেশ করিতে হইতেছিল। তাহাদের মৃতদেহে রাস্তা এত পিছল হইল যে লোকজনের যাতায়াত করা দুষ্কর হইল। ঘরের ভিতরেও তাহারা ঢুকিতে আরম্ভ করিল। রাশি রাশি পোকা পচিয়া এমন দুর্গন্ধ হইল যে সকলে মেডফোর্ড সহর ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। সাবানের জল, কেরোসিন তৈল প্রভৃতি নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগে তাহাদের মারিবার চেষ্টা হইল কিন্তু কিছুতেই তাহাদের দৌরাত্ম্য কমিল না, সংখ্যা বাড়িয়া চলিল। অবশেষে সকলে আবেদন করায় State Board of Agriculture হইতে এই পোকার ধ্বংস নিমিত্ত ১৫,০০০ টাকা মঞ্জুর হইল ও প্রায় একশত জন লোক পোকা মারিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল। এক বৎসর পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে এই পোকা ২৩০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া গাছপালা আক্রমণ করিতেছে। সে বৎসর ১,৫০,০০০ টাকা মঞ্জুর হইল। প্রথমে সেঁকো বিষ মিশ্রিত জল ছিটাইয়া ইহাদের

মারিবার চেষ্টা হইল। দেখা গেল মরা দুরের কথা, উৎকৃষ্ট আহার বলিয়া ইহারা সেঁকো খাইতে লাগিল। বহুদিন বিনা আহারেও ইহারা বেশ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, শীত গ্রীষ্ম কিছুতেই ইহাদের অনিষ্ট করিতে পারে না—এত কঠিন প্রাণ যে কোনও উপায়েই ইহাদের মারিবার সুবিধা হইল না। শেষে আবিষ্কার করা গেল যে পেট্রোলিয়ম্ তৈলের উষ্ণ বাষ্পের দ্বারা জিপ্‌সি মথ্ মারাই একমাত্র উপায়। পেট্রোলিয়ম্, দমকল ও লম্বা লম্বা নল লইয়া এই উপায় অবলম্বনে পোকা মারিবার জন্য অমনি হাজার হাজার লোক লাগিয়া গেল। দশ বৎসর ধরিয়া এই ভীষণ সংগ্রাম চলিল। এক এক বৎসরে চার পাঁচ লক্ষ করিয়া টাকা খরচ হইয়া গেল। যতদিন মাসাচুসেট্‌সে এই কাণ্ড চলিতেছিল অন্যত্র যাহাতে ইহারা না যাইতে পারে তাহার জন্যও লক্ষ্য রাখিতে হইয়াছিল। মাসাচুসেট্‌স্ ছাড়িবার আগে পর্য্যবেক্ষকগণ প্রত্যেক ট্রেণ, প্রত্যেক নৌকা বা ষ্টীমার দেখিয়া লইতেন। সম্প্রতি এই দুই এক বৎসর হইল এত পরিশ্রম এত অর্থব্যয় সার্থক হইয়াছে—মাসাচুসেট্‌সে এখন আর জিপ্‌সি মথ্ নাই। সামান্য কয়টি ডিম হাওয়ায় উড়াইয়া যাওয়াতেই এই অনর্থ ঘটিল! (প্রবাসী)

সরকারী কৃষি সংবাদ

নেটালে আনারসের আবাদ —

অনেক সময় দেখা যায় যে যখন ক্ষেতে আনারসের আবাদ হয় তখন ক্রমশঃ গাছ ঘন হইয়া জঙ্গল হইয়া পড়ে এবং গাছের ফল ছোট হয়। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে এবং সুকৌশলে চাষ করিলে ক্রমাগত ভাল আনারস উৎপাদন করা কখনই দুরাশা নহে।

এই বিষয়ের পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত করিবার জন্য নেটাল গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষা ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার সাহার্য্যে ও বিনা সারে আনারসের আবাদ করা হইয়াছিল। তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে একটু দক্ষতার সহিত আবাদ করিলে এবং রাসায়নিক সার প্রদান করিলে ফল নিশ্চয়ই ভাল হয়।

প্রথমতঃ আনারসের চাষের জন্য খুব তেজাল তেউড় নির্ব্বাচণ করা কর্ত্তব্য। রোগা সরু তেউড়ে গাছ তেজ করে না বা তদুৎপন্ন গাছে ফল বড় হয় না।

আনারসের চারি স্থান হইতে তেউড় বাহির হয়—(১) আনারস গাছের কাণ্ড হইতে, (২) শিকড় হইতে, (৩) আনারসের ফলের গোড়া হইতে, (৪) ফলের মাথা হইতে। সকল তেউড় হইতে নুতন গাছ উৎপন্ন করা যাইতে পারে কিন্তু

যে তেউড় কাণ্ড হইতে বাহির হয়, তাহা হইতেই সতেজ গাছ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে বড় বড় আনারস ধরে। শিকড়ের চারা প্রায়ই রোগা হয়। যদি অন্য তেউড় না মেলে তবে শিকড়ের চারার মূল দেশ দুই এক ইঞ্চ বাদ দিয়া এবং গোড়ার পাতা পাঁচ, ছয়টা ভাঙ্গিয়া দিয়া তবে বসাইতে হয়। পাতা ভাঙ্গিয়া দিলে এবং মূল শিকড়ের কিঞ্চিৎ বাদ দিলে তবে ঐ কাণ্ডস্থিত নুতন শিকড় মাটিতে জোর করিতে পারে। আনারসের মোথা বা ফলের গোড়ার তেউড় তত সুবিধা জনক নহে তবে শিকড়ের তেউড় অপেক্ষা ভাল এবং যেখানে নুতন প্রকারের আনারসের সংখ্যা বাড়াইয়া লইতে হইবে, সেখানে এই তেউড় লইয়াই আবাদ আরম্ভ করা হইয়া থাকে। এই তেউড় হইতে গাছ বাড়িতে ও তাহাতে ফল হইতে অনেক অধিক সময় লাগে। আরও দেখা গিয়াছে যে, যে আনারস গাছের অধিক তেউড় হয়, তাহার দুই একটা সতেজ তেউড় রাখিয়া বাকীগুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হয় এবং সেই তেউড় লইয়া আবাদ করিলে গাছ খুব শীঘ্র বাড়ে।

নেটালে আনারসের ক্ষেতে কোন্ রাসায়নিক সার ভাল তাহার পরীক্ষা করা হইয়াছিল,—

সলফেট অব এমোনিয়া প্রদান করিলে গাছ খুব শীঘ্র বাড়ে এবং গাছের বেশ সতেজ সুন্দর চেহারা হয়। বোন সুপার * দিলেও গাছের উন্নতি খুব হয়। অধিক মাত্রায় এই সার ব্যবহারের আবশ্যকতা দেখা যায় না। প্রতি একরে ১০০ পাউণ্ড বা ৫০ সের পরিমাণ এই সার প্রদান করিলেই সমান ভাবে আবাদের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই সকল সার অপেক্ষা পটাস সার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ পটাস প্রয়োগে সুমিষ্ট, রসাল, বড় এবং সুঘ্রাণযুক্ত আনারস উৎপন্ন হইয়া থাকে। অন্য সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলেও সেই মিশ্রণে পটাসের মাত্রা অধিক হওয়া কর্ত্তব্য। নাইট্রেট, কিম্বা ক্লোরাইড যুক্ত পটাস অপেক্ষা সলফেট পটাস অধিকতর কার্য্যকারী। ক্লোরাইড পটাসে আনারসের রঙ ভাল হয় না অন্য পটাস না দিয়া কাঠের ছাই দিলেও ভাল আনারস হয়। অন্য পটাসের সহিত তুলনায় কতদুর সমান ফল হয় তাহা অদ্যাপি নির্দ্ধারিত হয় নাই তবে দেখা গিয়াছে যে এই কাঠের ছাইয়ের সহিত যদি এমোনিয়া সলফেট ব্যবহার করা যায় তবে সে সার সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া গেল। এরূপ সার প্রয়োগে গোওকুইন নামক নেটাল জাতীয় আনারসের এক একটার প্রায় ৪ পাউণ্ড ওজন দাঁড়াইয়াছে। সারের পরীক্ষায় আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে একর প্রতি ১২০ পাউণ্ড এমোনিয়া সলফেট এবং ১০০ পাউণ্ড পটাস সলফেট প্রদান করিলে এমন সুঘ্রাণযুক্ত ফল উৎপন্ন হইবে যে তাহার তুলনা মিলে না।

* হাড়ের গুঁড়ার সহিত সলফিউরিক অম্ল সংযোগে প্রস্তুত হয়। "কৃষি রসায়ন" দেখুন।

ইহাও স্থির হইয়াছে যে ক্ষেতের ফলগুলি সব সমান ওজন, সমান রঙদার, সুগঠন সবগুলি শীঘ্র পাকিবে এবং অধিক দিন রাখিলেও পচিবে না। এরূপ করিতে হইলে এক একর পরিমাণ ক্ষেতে ১০০ পাউণ্ড বোন সুপার, ১০০ পাউণ্ড পটাস সলফেট এবং ৫০০ পাউণ্ড কাঠের ছাই দিতে হয়। যাঁহারা ব্যবসার জন্য চাষ করিবেন এবং যাঁহাদের আবাদ বড় তাঁহারা যেন এই মিশ্রসার প্রদান করেন।

আনারসের ব্যবসা করিতে হইলে আনারস কি প্রকারে বিদেশে রপ্তানি করা যায় তাহার চিন্তা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। নেটাল হইতে আনারস বাক্সে বন্ধ করিয়া ইংলণ্ডে পাঠান হইয়াছিল। খুব সুপক্ক ফল বিদেশে পাঠান যাইতে পারে না। জাহাজে চালানের জন্য পরিপুষ্ট হইয়াছে অথচ সবুজ রঙ ঘুচে নাই এমন ফল সংগ্রহ করিতে হইবে। ফলগুলি প্রথমতঃ ঘুঁড়ির কাগজের মত খুব পাতলা কাগজে মুড়িয়া মোটা কাঠের আঁস দিয়া প্যাক করা হইয়াছিল। সরু কাঠের আঁস অপেক্ষা মোটা কাঠের আঁসে প্যাক করিলে ফলগুলি অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে। ফলগুলি ইংলণ্ডে পৌঁছিলে তখন ফল দেখিতে বেশ, পথে যাইতে যাইতে বেশ পাকিয়া রঙ হইয়াছে কিন্তু ফলগুলি কাটিয়া দেখা গিয়াছিল যে তাহাদের মধ্যস্থলে সকলগুলিরই কাল দাগ হইয়াছে। কিন্তু যে ফলগুলি একটু রঙ ধরিলে ভাঙ্গা হইয়াছিল সেগুলি তত খারাপ হয় নাই। ফলগুলি ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া খোলা হইতে ২৩ দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। ফলগুলি জাহাজে বেশ বাতাসের স্থানে রাখিয়াও এই প্রকার খারাপ অবস্থা হইয়াছিল।

মানুষ ঠকিয়াই সাবধান হয়। ফলগুলি আর সবুজ অবস্থায় সংগ্রহ করা বন্ধ হইল। সুপক্ক ফল বেশ ভাল করিয়া প্যাক করিয়া জাহাজে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইল। জাহাজে ঠাণ্ডা ঘরে কোন ফল ফুলাদি পাঠাইতে খরচ অনেক পড়ে কিন্তু ভাল জিনিষের আদর সর্ব্বাগ্রে এবং তাহাতে দাম অধিক পাওয়া যায়। এইরূপে অধিক খরচ করিয়াও প্রতি ডজনে আমাদের বাঙলা হিসাবে দুই টাকা কিম্বা নয় সিকা লাভ হইয়াছিল। জাহাজে রপ্তানির জন্য এক সাইজের ফলগুলি বাছাই করিয়া লইতে হয়। ডগার দিক বা যে আনারসের মাথাগুলি বড় সে গুলি রপ্তানির জন্য বাছাই করা উচিত নহে। নেটাল হইতে যে আনারসগুলি পাঠান হইয়াছিল তাহার ওজন দুই পাউণ্ড আট আউন্স। সবুজ আনারস গুলি জাহাজে থাকা কালে প্রায় ৬ আউন্স হিসাবে কমিয়া গিয়াছিল কিন্তু যে সকল সুপক্ক ফল জাহাজের ঠাণ্ডা ঘরে পাঠান হইয়াছিল সেগুলি ওজনে খুব সামান্যই কমিয়াছিল মোটে প্রত্যেক ফলটা ১½ আউন্স মাত্র।

ফলগুলি তুলিবার সময় সতর্ক হইয়া তোলা কর্ত্তব্য কারণ ফলগুলি দাগী বা থেঁতো হইলে তাহার স্বাদ গন্ধ কমিয়া যায় এবং সেগুলি পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

নেটাল হইতে আনারস চালান দিয়া ইংলণ্ডে প্রতি ডজন ১০ সিলিঙ দাম উঠিয়াছে তাহাতে আমাদের বাঙলা হিসাবে লাভ দুই টাকা বা নয় সিকা। কিন্তু আনারসের কাটতি স্বস্থানেও কম নহে এবং স্থানীয় বাজারে আনারস বেচিলে কম লাভ থাকে না। এই কথা ভারতের পক্ষেও সত্য। এখানে চেষ্টা করিলে ভাল আনারস জন্মান কঠিন নহে এবং জাহাজে চালান দিয়া বিদেশে না পাঠাইতে পারিলেও যত পরিমাণ আনারস উৎপন্ন হউক না কেন এখানকার বাজারে বিক্রয় হইবার ভাবনা নাই।

ভাল আনারস উৎপন্ন করিবার জন্য নেটালে দোয়াঁস মাটিতে যেখানে সকালে রৌদ্র পাইবে এরূপ জায়গায় ইহার চাষ করা হয়। আনারসের ক্ষেতে তাহার ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া চষে এবং মাটি যতদূর সম্ভব ঢেলা বিহীন করা হয়। আনারসের তৈয়ারি ক্ষেত চষিবার সময় সাবধানে চষিবে, কারণ আনারসের গাছের অধিক শিকড় ছিড়িয়া গেলে ফল ছোট হয়। ক্ষেতে জলনিকাশের সুব্যবস্থা চাই এবং তলার মাটি কর্দ্দমাক্ত এমন ক্ষেত নির্ব্বাচন করা উচিত নহে।

অগ্রে নেটালে ৬ ফিট অন্তর সারি এবং সারিতে ৬ ফিট ব্যবধানে আনারস গাছ বসান হইত কিন্তু এখন নেটালবাসীগণ বুঝিয়াছেন যে তাহাতে বৃথা জমি পড়িয়া থাকে তাহারা এখন ২ ফিট অন্তর সারি এবং ২ ফিট ব্যবধানে গাছ বসাইতেছে।

নেটালবাসীগণ আনারস একটু বড় হইলেই তাহার গায়ের তেউড়গুলি ভাঙ্গিয়া দিত কিন্তু এখন তাহারা বুঝিয়াছে এরূপ তেউড় ভাঙ্গিলে ফল ছোট হয়। তাহারা এক ক্ষেতে তিন বৎসরের অধিককাল আনারসের চাষ করে না কারণ তাহারা হিসাব করিয়াছে যে প্রত্যেক বৎসর ফল প্রায় ৬ আউন্স মাত্রায় কমিয়া যায়। সেইজন্য তাহারা দুই বৎসর পর সমুদয় গাছ তুলিয়া ফেলিয়া আবার জমিতে চাষ, মই, সার দিয়া নূতন চারা বসাইয়া থাকিত।

নেটালে সেপ্টেম্বর হইতে নভেম্বর মাসের মধ্যে আনারসের তেউড় বসান হয়। তেউড় বসাইবার সময় তেউড়গুলির পাতার আঁসের মধ্যে মাটি ঢুকিলে গাছগুলি সতেজে বাড়িতে পায় না। গাছগুলি খুব তেজে বাড়িতে পাইলে বসাইবার সময় হইতে ১২ মাসের মধ্যে ফল প্রসব করে। যদি কোন গাছ অতি শিশু অবস্থায় ফল ধরিতে দেখা যায় তবে সে ফলটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা হইলে সেই গাছ হইতে অচিরে ভাল তেজস্কর তেউড় গজাইবে এবং তাহাতে সময়ে ভাল ফল ধরিবে।

নেটালের জল হাওয়া আনারসের চাষ উপযোগী এবং সেখানে জমির খাজনাদি এত অধিক নহে যে তথায় ইহার চাষের কোন বিঘ্ন ঘটিতে পারে। ভারতের মধ্যে বাঙলার জল হাওয়ায় আনারস বেশ সহজে জন্মায়।
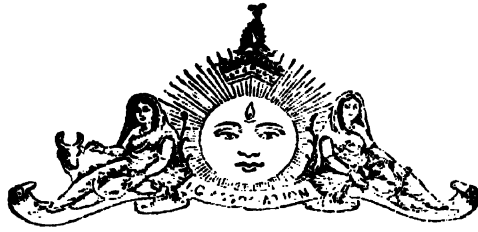
কার্ত্তিক, ১৩১৯ সাল।

মৃত্তিকার প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন

ফসল উৎপাদন করিতে হইলে স্বাভাবিক মৃত্তিকাকে দুই রকমে তৈয়ারী করিয়া লইতে হয়। একটী রাসায়নিক উপায়ে, অপরটি প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সাধন। জমিতে উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী সার প্রয়োগ এবং স্বাভাবিক ও কৃত্রিম নানাবিধ উপায়ে জমিস্থিত খাদ্যবস্তু উদ্ভিদগণের আহারোপযোগী অবস্থায় আনয়ন করা রাসায়নিক উপায়ের উপর নির্ভর করে। জমিতে সার প্রয়োগ করিলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়, ইহা চাষীমাত্রেই জ্ঞাত আছে। কিন্তু এই সার প্রয়োগ দ্বারা জমির উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইবার পূর্ব্বে জমির প্রাকৃতিক গঠন পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হয়। জমির প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে জমি খনন করিতে হয়, জমিতে পয়োনালা কাটিতে হয় এবং কখন কখন জমির মৃত্তিকা পুড়াইয়া লইতে হয়। সুতরাং জমির এই প্রকারের পাইট, জমি কারকিতের প্রথম কার্য্য এবং সার প্রয়োগাদি জমির উর্ব্বরতা বাড়াইবার চেষ্টা করা দ্বিতীয় কার্য্য।

জমির প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন করিতে হইলে প্রথমতঃ জমির পয়োনালা কাটিবার জন্য মনোযোগী হইতে হইবে। যে জমিতে জল বসে, সে জমিতে কোন ফসল হয় না। কয়েক প্রকার ধান জলা জমিতেই জন্মে এবং কতকগুলি উদ্ভিদ জলেই বাড়ে, কিন্তু ঐ সকল ধানের জমিও বৎসরান্তে একবার শুকাইলে তবে তাহাতে চাষের ভাল রকম সুবিধা হয়। এই হেতু ধান জমিতে জল ঢুকাইবার ও বাহির করিবার ব্যবস্থা থাকিলে মনোমত চাষ কারকিৎ করা চলে। জমির জলনিকাশের ব্যবস্থা করিলে সুধু যে চাষের সুবিধা হয় তাহা নহে, গ্রাম সমূহের এমন কি সমুদয় জেলায় আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন হইয়া জেলার স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। সুন্দরবনের অনেক জলা জমির

জল নিকাশের সুব্যবস্থা হওয়ায় এখন সেই সকল জমি হইতে অনেক শস্য উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে ঐ সকল জমিতে ছিটা ধান বুনন করিয়া অতি অল্পই ফসল মিলিত। ধান জমির কথা বাদ দিয়া অন্য ঈষদুচ্চ জমির কথা ধরিলে দেখা যায়, যে সকল জলবসা জমিতে পূর্ব্বে যাহা ফসল জন্মিত তাহা অতি অল্প বা কিছুই নহে। পয়োনালার ব্যবস্থা হেতু জমির নিম্নস্তরে জল শুষিয়া চলিয়া যাইতেছে, জমি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক হইয়া উঠিতেছে। যে পরিমাণে রস থাকিলে সুশৃঙ্খলায় চাষ হওয়া সম্ভব সেই রকম রস রক্ষা করার সুবিধা হইতেছে। এইরূপে ক্রমশঃ আব-হাওয়ার শৈত্য ঘুচিয়া যাইতেছে এবং স্থানটি অপেক্ষাকৃত গরম ও সুখপ্রদ হইয়া উঠিতেছে। যে সকল স্থানে নদী, খাল আছে, সেখানে জল নিকাশ সহজে হয়। জলে উত্তাপ সমভাবে রক্ষিত হয় এবং যেখানে জলের স্রোত আছে—জল গতিশীল—তথায় হাওয়ারও অধিক চলাচল আছে।

আমরা এখন ঠিক করিয়া লইলাম চাষের জমি তৈয়ারী করিতে হইলেই জল নিকাশের ব্যবস্থা আবশ্যক। কিন্তু জমি অযথা শুষ্ক হইয়া না পড়ে এটা যেন বেশ মনে থাকে। সেই জন্য সকল জমির এক ভাবে চাষ কারকিৎ করা চলে না। চাষী মাত্রেই জমির অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিয়া থাকে। যেমন মনে কর তোমার জমিটি যদি বেলে হয় এবং কোন জলস্রোতের দিকে ঢালু হয় এবং তাহার নিম্ন স্তর যদি কাঁকরযুক্ত হয়, তবে তোমার সে জমির জল নিকাশ করার ব্যবস্থা দূরে থাকুক তোমাকে জল রক্ষার বিধান করিতে হইবে। ঐ জমির রস রক্ষা হেতু হয়তঃ তোমাকে কাদামাটি আনিয়া উক্ত জমিতে ছড়াইতে হইবে। আবার দেখ যদি তোমাকে কোন কর্দ্দমযুক্ত জমিতে বাগান করিতে হয় এবং সেই জমির নিম্ন স্তরও যদি কর্দ্দমাক্ত হয়, তবে তাহার জল নিকাশের বন্দোবস্ত না করিলে তাহাতে চাষাবাদ করা সম্ভব হইবে না।

জমিতে জল শোষিত হইয়া যাহাতে সেই জল নিম্নস্তরে চলিয়া যায়, এই বিধানই চাষের পক্ষে ভাল, কারণ তাহা না হইয়া যদি জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকে এবং সেই জল বায়ুমণ্ডলে উবিয়া যায়, তাহাতে উপযুক্ত উত্তাপের হ্রাস করে।

তিন প্রকারে জমিতে জল সঞ্চিত হয়। ভূগর্ভস্থিত প্রস্রবণ, বৃষ্টিবারি অথবা উচ্চোচ্ছ্বিত পার্ব্বতীয় ঝরণা, এই তিন প্রকারে জমির জল যোগান হইয়া থাকে। জমিতে জলের আবশ্যক কিন্তু অধিক চাই না আবার অল্পও চাই না, সেই জন্যই পয়োনালা, সেই জন্যই জল নিকাশের বিধান। জমির কত উচ্চে জল, জমিতে কোথায় কতদূরে প্রস্রবণ আছে, কোন্ খানে কত বৃষ্টি হয় এই সকল স্থির করিয়া তবে পয়োনালা কি ভাবে নির্ম্মাণ করা উচিত, তাহা ঠিক করা যায়। এই জন্যই পয়োপ্রণালী নির্ম্মাণে একটু কৌশল, একটু বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক।

পয়োপ্রণালী গুলির গভিরতা জমির অবস্থা ও জমিতে জলের অবস্থান বুঝিয়া স্থির করিতে হয়।

জমির প্রকৃতিগত গঠন পরিবর্ত্তনের দ্বিতীয় উপায় জমির উপরের আগাছা কুগাছা তাহাদের সংলগ্ন মৃত্তিকার সহিত দগ্ধ করা। এই দগ্ধ মৃত্তিকা ও কাঠের কয়লার ছাই জমির সারের কার্য্য করে এবং জমির স্বাভাবিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। যদি বাগানের জমির মাটি কর্দ্দমাক্ত হয়, যদি তাহার নিম্নস্তরেও কর্দ্দম থাকে সে জমির মাটিতে চুণ দিলে জমির প্রকৃতি বদ্‌লাইয়া যায়। খুব কঠিন মৃত্তিকায় চাষ হয় না। কঠিন মৃত্তিকাকে আল্গা করিবার একমাত্র উপায় জমিতে চুণ প্রদান করা। খুব কঠিন আটাল মাটিতে সিলিকেট অব এলুমিনা নামক একটি পদার্থ থাকে। এই পদার্থটি উত্তাপে কতক পরিমাণে নরম হয় এবং এমতাবস্থায় জল ও বাতাস তাহার উপর নিজ প্রভুত্ব খাটাইতে পারে। এইরূপে এই কঠিন মৃত্তিকা সুধু তাহার কঠিনত্ব ত্যাগ করে তাহা নহে, তাহারা অধিকন্তু বায়ু ও বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের নিকট হইতে উদ্ভিদের শরীর পোষণোপযোগী অক্সিজেন বাষ্প, কার্ব্বনিক অম্ল ও অপরাপর রাসায়নিক সার ধার করিয়া লয়। চুণে মেটেল মাটি এমন কি কাঁকুরে মাটিও চুণ সংযোগে চাষযোগ্য হইয়া উঠে। চুণে মেটেল মাটি অধিক শক্ত হইলে তাহা ঘুটিঙে পরিণত হয়। ঘুটিঙ পুড়াইলে তাহা হইতে কার্ব্বনিক অম্ল বিমুক্ত হইয়া পড়ে। যাহা অবশিষ্ট থাকে, বায়ু সংযোগে চূর্ণ হইয়া যায় এবং মাটির সহিত মিশিয়া ইহা সারের কার্য্য করে।

জল নিকাশের জন্য জমিতে নালা করিলে যেমন জমির প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তেমনি গভীর কর্ষণেও জমির প্রাকৃতিক অবস্থার অদলবদল ঘটে। জমিতে চাষ দিলে জমিতে হাওয়া, উত্তাপ, জল, সহজে প্রবেশ করিতে পারে একথা আমরা ভাল করিয়া ইতিপূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, কর্ষণে সেই হেতু জমি উর্ব্বরা হয় এবং জমির প্রকৃতিরও বদল হয়। রাসায়নিক সার প্রয়োগে জমির উৎপাদিকা শক্তি খুব বাড়ে, কর্ষণে ঐ শক্তি নিতান্ত কম বাড়ে না।

দুগ্ধ—আগে খাঁটি দুধ মিলিত, পল্লীগ্রামের গৃহস্থ মাত্রেই দুই একটী গাভী পালন করিত। এখন আর তেমনটি দেখা যায় না। দুধ মেলা কঠিন হইয়া উঠিতেছে এবং যদি বা মিলে তবে তাহার মূল্য এত অধিক হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, সাধারণ লোকে সেই দর দিয়া খরিদ করিতে পারে না। এই কারণে দুধ, দধি, ঘৃত, মাখনে ভেজাল চলিতেছে—ইহাতে স্বাস্থ্য ও মনের স্বচ্ছন্দতা নষ্ট হইতেছে। দুগ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দুগ্ধ সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচিত প্রস্তাবনা পত্রান্তর হইতে প্রকাশ করিলাম।

বাঙলার গাভী, ষাঁড়, বলদ—বাঙলার গাভীগুলি প্রায় ১ সেরের অধিক দুধ দেয় না। বাঙলার বলদগুলি কাঁচা রাস্তায় ১৬ মণ এবং পাকা পাথর বা ইটের রাস্তায় বড় জোর ২০ মণ বোঝা টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

বাঙলার পশুচিকিৎসা বিভাগের উপদেশ এই যে, বাঙলার বিভিন্ন জাতীয় গবাদির যাহাতে মৌলিকত্ব রক্ষা হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে গবাদির অতিশয় হীনাবস্থা হইয়াছে, তখন সেই জাতীয় গবাদির মৌলিকতা রক্ষার আবশ্যকতা বিশেষ দেখা যায় না। বাঙলার গাভী মাত্রেই অতি অল্প দুধ প্রদান করে, বলদ মাত্রেই হীনবল, তখন তাহাদের উন্নতি না হইলে আর উপায়ন্তর কি আছে? আমি এই সব দেখিয়া অষ্ট্রেলিয়া দেশ হইতে বাচ্ছা ষাঁড় আনাইয়া পালিতে আরম্ভ করি এবং আমাদের চিরন্তন প্রথানুসারে ষাঁড়গুলিকে বাঁধিয়া না রাখিয়া গ্রামময় চরিয়া খাইয়া বেড়াইতে দিই। লোকের উপকার হইলে লোকে একটু ক্ষতিও সহ্য করে। ষাঁড়গুলি দ্বারা গ্রামের লোকে তাহাদের গাভীর পাল ধরাইয়া লইত, সুতরাং তাহারা ষাঁড়গুলিকে অবাধে চরিতে এবং কিছু কিছু ক্ষতি খ্যাসারত করিতে দিত। প্রথম প্রথম এই সকল ষাঁড় দ্বারা দেশী গাভীর গর্ভে যে সকল বাচ্ছা জন্মিতে লাগিল, তাহারা অল্পদিনেই মরিয়া যাইত। পরে যখন বুঝা গেল এবং সাধারণ কৃষক যখন জানিতে পারিল যে ইহাদের একটু বিশেষ যত্ন আবশ্যক এবং খাওয়ার তদ্বিরের প্রয়োজন, তখন বাছুরগুলিকে বাঁচান সহজ হইল। দেশীয় গাভীর গর্ভের এই ষাঁড়ের দ্বারা যে সকল বলদ জন্মিল সে গুলি অধিকতর বোঝা টানিতে সক্ষম হইল। দেশী বলদ ২০ মণ বোঝার অধিক টানিতে পারে না, কিন্তু ইহারা পাকা রাস্তায় ৪২ মণ টানিতে লাগিল। বোকনা বাছুরগুলি কিন্তু তাদৃশ দুগ্ধবতী হইল না। তাহাদের দুই তিন সেরের অধিক দুধ প্রায়ই হয় না। কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, রীতিমত খাওয়ার তদ্বির করিলে তাহারা ৮ কিম্বা ৯ সের দুগ্ধ প্রদান করিতে পারে। তাহাদের দুধে মাটা অধিক। এইরূপে শঙ্কর ভাবে উৎপাদিত বোকনা গুলি বিলাতী আমদানী গাভী অপেক্ষা অনেকাংশে তাতবাত ও কষ্ট সহিষ্ণু, কিন্তু নিভাজ দেশী গরুর মত তাহারা তাতবাত বা কষ্ট সহ্য করিতে পারে না। দেশী গরুর এক প্রধান গুণ এই যে, তাহারা মাঠে চরিয়া খাইয়া এবং দিনান্তে খৈল, ভুষী ও খড় মিশান জাব না খাইয়াও দুধ দেয়, এই সকল শঙ্কর গাভীগুলি তাহা দেয় না। এরূপ অবস্থায় অনাহারে ও অযত্নে মরিয়া যায়। ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারিলে তাহারা ভাল থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার ষাঁড় এবং দেশী গাভীর দ্বারা যে সকল শঙ্কর বলদ উৎপন্ন হইল, তাহাদের একটী দোষ এই দেখা গেল যে, তাহাদের ঝুটন বড় নহে। দেশী

কৃষকগণ মনে করিল তবে তাহারা গাড়ী টানিতে তাদৃশ মজবুত হইবে না, কিন্তু কার্য্যে দেখা গেল যে তাহারা গাড়ী টানিতে পারে এবং এই সকল বলদ লাঙ্গল টানিতেও খুব মজবুত এবং দেশী গরু অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে, বরং তাহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল।

এই সকল বিষয় দেখিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে অষ্ট্রেলিয়া হইতে ষাঁড় আনাইয়া যদি বাঙলায় গরুর উন্নতি করা যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। "জনৈক সুচাষী"—

[আমরা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি যে, দেশী গরুর অনেক গুণ আছে, যাহা বিলাতী আমদানী গরুতে নাই। আমাদের দেশের গরু তাতবাত সহিষ্ণু, অল্পাহারে টিকিতে পারে, মশা মাছির উপদ্রবে নিতান্ত ক্লিষ্ট হয় না, আবাস স্থান তাদৃশ পরিষ্কার না হইলেও অসুস্থ হইয়া পড়ে না। বিলাতী ষাঁড় ও ভাগলপুর গরুতে যে ষাঁড় উৎপন্ন হয় সেই ষাঁড় বাঙলায় আনিয়া তাতবাত সহিষ্ণু করিয়া লইতে পারিলে শস্যর উৎপাদনের অধিক উপযোগী হয়।] কৃঃ সঃ।

পত্রাদি

শ্রীশ্যামাকান্ত গুহ, চারিগাঁ, ঢাকা

লজ্জাবতী লতাদি, খেজুর, নারিকেল, আতা, পেয়ারা ও আলু

মহাশয়!

১। এমন কি গুণ আছে যে:—

স্পর্শ মাত্র লজ্জাবতী লতা এবং সন্ধ্যাসমাগমে মান্দার গাছের পাতা সঙ্কুচিত হয়?

২। শীতকালে সাধারণতঃ সকল গাছই রসহীন হয় কিন্তু খেজুর গাছের এবম্বিধ রসাধিক্যের কারণ কি যে, প্রতি রাত্রিতেই ৭।৮ সের পরিমাণ রস নির্গত হয়?

৩। নারিকেল গাছের সার কি? আমাদের এখানকার নারিকেল গাছ উপযুক্ত সময়ে ফলপ্রদান করে না কেন এবং অসময়ে কালগ্রাসে পতিত হয় কেন?

৪। আতা ও পেয়ারার কলম করিতে পারা যায় কি না? পারিলে কিরূপ কলম কাটা উচিত?

৫। কিরূপ মাটিতে এবং কোন্ সময়ে গোল আলুর চাষ হওয়া উচিত?

[১ লজ্জাবতী লতার পত্র বৃন্ত এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে উহার কোষগুলি অধিক পরিমাণে জল ধারণ করিতে পারে। কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হইলে অথবা বৃন্তে উত্তাপ লাগিলে বৃন্তের উপরিভাগের কোষসমূহ হইতে জল নির্গত হইয়া পত্রের

কোষ মধ্যে প্রবেশ করে। ইহাতে বৃন্তের আয়তন সঙ্কুচিত হয় এবং এই সঙ্কোচের জন্যই সমস্ত পাতাটি পড়িয়া যায় ও ছোট পাতাগুলি বন্ধ হইয়া যায়। আবার উত্তাপ হ্রাস হইলে, কিম্বা উদ্ভিদের স্বীয় ধর্ম্মে উক্ত জল নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিলে পাতা প্রসারিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আকার ধারণ করে।

পালিতা মাদার প্রভৃতি অনেকগুলি শিম্বীজাতীয় বৃক্ষের (Leguminosæ) পত্র সন্ধ্যা সমাগমে মুদ্রিত হইয়া থাকে। তেঁতুল, শিম, মুগ প্রভৃতি এই সমস্ত বৃক্ষের পত্রবৃন্তের সহিত আলোকের এরূপ সম্বন্ধ আছে যে আলোকের আধিক্য হইলে পত্রবৃন্তের বক্রশীল অংশ পত্রসমূহকে বিস্তার করিয়া দেয়, আবার আলোর ন্যূনতা হইলে, উক্ত অংশ এরূপভাবে বাঁকিয়া যায় যে পত্র সকল মুদ্রিত হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় আলোক কমিয়া যাওয়ার জন্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

আপনার ১নং প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর এইরূপ। এই সমস্ত বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে বৃক্ষের অবয়ব প্রভৃতি নির্ম্মাণ প্রণালী এবং তাহাদের সহিত বাহ্য বস্তু সমূহের সম্বন্ধ, এ সকল বিষয় বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে। নিম্নলিখিত দুইটি পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ পাইবেন।

1 Sach's Text book of Botany

English Edition translated by S. H. Venis, F. R. S.

2 Darwin's Movements of Plants.

২। বসন্তকাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বৃক্ষের নূতন পত্রোদ্গম হইবার কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যেক বৃক্ষে রস সঞ্চিত হয়। যে সমস্ত বৃক্ষ শীঘ্র বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যেমন সাধারণ শস্য প্রভৃতি, তাহাদের কাণ্ডে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ জল সঞ্চিত হইয়া থাকে। অপর পক্ষে তাল, খেজুর প্রভৃতি ধীরবর্দ্ধনশীল বৃক্ষ সমূহের কাণ্ডে অধিক পরিমাণ রস সঞ্চিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে খেজুর বৃক্ষের যখন রস লওয়া হয় তখন বৃক্ষের নিম্নস্থিত পত্রসমূহ ছাঁটিয়া ফেলা হয়। পত্র দ্বারা যে পরিমাণ রস শোষিত হইয়া থাকে, পত্রের সংখ্যা কমাইয়া ফেলায় তাহার মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হয় অথচ বৃক্ষের সঞ্চিত রস এবং মূল দ্বারা কর্ষিত রসের পরিমাণ প্রায় একই প্রকার থাকে। এই সমস্ত কারণে খেজুর, তাল প্রভৃতি বৃক্ষে অধিক পরিমাণে এবং অপরাপর বহুবিধ উদ্ভিদে অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে রস বহির্গত হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের কাণ্ডের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে রস বহন করিবার শক্তির পরিমাণ এবং রস সঞ্চারণের নিয়ম প্রভৃতি সম্বন্ধে উদ্ভিদবেত্তা পণ্ডিতদিগের মতদ্বৈধ রহিয়াছে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অনেক উদ্ভিদের শীতকালে পুষ্পদণ্ড কর্ত্তন করিলে রস বহির্গত হয়। এই রস বহির্গমন প্রণালী এবং বহির্গত রসের রাসায়নিক প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বৃক্ষের স্বভাবগত ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে।

৩। ৩য় সংখ্যা "কৃষকের" ৪৫ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন।

৪। পেয়ারার গুল কলম হয়। আতার কলম হয় না।

আলু চাষ সম্বন্ধে বহুবার কৃষকে আলোচিত হইয়াছে। সব্জী চাষ পুস্তকে উহার চাষের বিবরণী দ্রষ্টব্য।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়, চন্দনপুর গ্রাম, চন্দনপুর পোঃ, ভায়া গোবরডাঙ্গা।

মাননীয় কৃষক সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সম্পাদক মহাশয়!

নিম্ন লিখিত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বহু অনুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আশা করি আপনার দেশবিখ্যাত পত্রে এগুলি প্রকাশিত হইলে একটা না একটা অনুসন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

(১) কলিকাতার প্রখ্যাত ডাক্তার ৺জগবন্ধু বসু মহাশয় বলিতেন,, কাঁচিলা জাতীয় একপ্রকার ঘাসের মূল সেবন করিলে বিজাতীয় যকৃতগ্রস্থ Jaundice রোগী আরোগ্য লাভ করে। ঐ ঘাস নাকি পশ্চিম অঞ্চলে পাওয়া যায়। কাঁচিলা ঘাসের আকার কি প্রকার, ইহা বঙ্গদেশে পাওয়া যায় কি না, কোন্ সময় জন্মায়, ইহার বীজ কেহ দিতে পারেন কি না?

(২ চকৃমা নামে এক জাতীয় গাছ আছে, চকৃমা গাছের পাতা বাটিয়া যে কোন বেদনায় প্রলেপ দিলে বেদনা নিশ্চয়ই উপশম হয়। শুনিতে পাই এই গাছ মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে পাওয়া যায়। চকৃমা গাছ বাঙ্গালার অন্য কোন স্থানে জন্মায় কি না? এই গাছের বীজ কেহ সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন কি না? কৃষকে প্রকাশ করিলে বড়ই উপকৃত হইব।

(৩) শ্বেতকুঁচ উর্দ্ধশ্লেষ্মার উৎকৃষ্ট ঔষধ। এ দেশে শ্বেতকুঁচ বিরল। ইহার বীজ, বড় চারা পাওয়া যায় কি না, কিভাবে কোন্ মাটিতে কোন্ সময় লাগাইতে হয়?

হেম্পটন্ কোর্ট দ্রাক্ষা বৃক্ষ—এই বিখ্যাত দ্রাক্ষা বৃক্ষের বয়স কিঞ্চিদধিক ১৫০ বৎসর। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০ ফীট। ইহারা কাণ্ডের পরিধি ৩২ ইঞ্চি। কোন কোন ঋতুতে এই বৃক্ষে দ্বিশতাধিক দ্রাক্ষাগুচ্ছ জন্মে, প্রত্যেক গুচ্ছের পরিমাণ গড়ে ১৭ আউন্স অথবা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক টন। এই সকল ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ব্ল্যাক্ হামবার্গ জাতীয় এবং প্রধানতঃ ব্রিটনেশ্বরের ব্যবহারার্থ ই রক্ষিত হইয়া থাকে।

লেবুর গুণ—কয়েক জন পাশ্চাত্য ভৈষজ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, লেবুর রসে কলেরা বীজ নষ্ট করিবার অসাধারণ শক্তি আছে। কলেরার বীজ ইহাদ্বারা ১৫ মিনিটের মধ্যে বিনষ্ট হয়। সচরাচর পল্লিগ্রামে জল ফিল্টার অথবা উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু জলে লেবুর রস দিলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হয়। পল্লীগ্রামের যে সকল স্থানে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বা যেখানে মধ্যে মধ্যে কলেরা দেখা দেয় সেই সকল স্থানে জলের সহিত লেবুর রস দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সার-সংগ্রহ

আমাদের কৃষি

জাপানের উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত, য়েশো দ্বীপ হইতে কিউশিউ দ্বীপ পর্য্যন্ত ১৫০০ শত মাইলের কৃষি দেখিয়াছি। শীত এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কৃষি উভয়ই তথায় আছে। ধান, গম, যব, চা, রেশম, তামাক, ইক্ষু, নীল, কলাই, ভুট্টা, গোল আলু, রাঙ্গা আলু, কপি, বেগুন, উচ্ছে, লাউ, কুমড়া, আর্দ্রক প্রভৃতি সমস্তই সে দেশে বিস্তর জন্মে। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সাঙ্ঘাই, হঙ্কং, সিঙ্গাপুর, পিনাং এবং ব্রহ্মদেশের কৃষিতে যেটুকু বিশেষত্ব তাহাও দেখিয়া আসিয়াছি। বঙ্গকৃষি সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকিলেও এবার পুনরায় বঙ্গ এবং আসামের কৃষি দেখিয়া লইলাম। নিরক্ষর এবং নিঃসম্বল দীন দরিদ্র প্রজাগণ তাহাদের নিজ শক্তিতে যতটুকু সম্ভব তদনুরূপ চেষ্টার ক্রুট করিতেছে না। কিন্তু শিক্ষিত সমাজ এবং জমিদারদিগের নিকট তাহারা যে সাহায্য ন্যায্যমত দাবী করিতে পারে তাহার কিছুই পাইতেছে না। পক্ষান্তরে দরিদ্র প্রজাগণ করভারে এবং ঋণজালে জড়িত হইয়া উহাঁদের দ্বারা লাঞ্ছিত এবং দণ্ডিত হইতেছে।

প্রতিবৎসর সার্ভে জরিপে জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে কর এবং মাথট খরচাদি বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য ; কিন্তু আমাদের জমিদার মহাশয়গণের একটু চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে জমির উর্ব্বরতা এবং আয় বৃদ্ধি না পাইলে নিঃস্ব প্রজাগণ কি উপায়ে তাঁহাদের তৃপ্তি সাধন করিবে। জমিদারগণের পাইকের অভাব নাই, তহশিলদার, জমা নবিস, নায়েব প্রভৃতির অভাব নাই, আমিন নাজিরের অভাব নাই ; কিন্তু প্রজাদিগের দিকে তাকাইয়া দুই চারিটী উপদেশ দিয়া তাহাদের হিত করিবার জন্য কি কোন জমিদার সরকারে একটী কৃষিজ্ঞ কর্ম্মচারীও আছেন ? অথচ কৃষকদের দেয় রাজস্বই জমিদারদের একমাত্র অবলম্বন।

জমা খরচ সমান হইলে সাধু খালাস পায়। আমাদের প্রজাগণ জমা কাহাকে বলে জানে না। কাযেই খালাস পাওয়া দূরে থাকুক, অভাবের নিষ্পেষণে ব্যাধি, জরা, দুর্ভিক্ষে অকাল মৃত্যুর করাল কবলে প্রতি নিয়তই নিপতিত হইতেছে। শিল্প বাণিজ্য আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালায়, নাই বলিলেই হয়। একমাত্র কৃষির উন্নতিবিধান না করিলে দুর্ভাগ্য কৃষকসমূহের বিপদজাল নিবারিত হইবার নহে। সমগ্র জাপান যুক্তবঙ্গের চেয়ে ক্ষুদ্র, উহার আবার শতকরা ৮৪·৩ ভাগ পাহাড়াবৃত। অথচ এই সামান্য জায়গায় জাপানীরা পৌনে পাঁচকোটী লোকের খাদ্য, এবং কত কোটী টাকার রেশম উৎপাদন করিয়া থাকে। গবর্ণমেন্ট ঐ

পাহাড়াবৃত ক্ষুদ্র দেশে ৩১০ তিন শত দশ জন কৃষি প্রচারক, ১১৬ এক শত ষোল জন সারপরীক্ষক এবং ২০ জন কৃষি-রসায়নবিৎকে নিয়োগ করিয়া এবং ৪৬টী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রসারণ জন্য কত চেষ্টাই করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অনেক ভদ্রলোক বেসরকারী কোম্পানী গঠন করিয়াও কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট প্রতি জেলায় একটী অর্থাৎ মোট ৪৬টী কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন। ব্যাঙ্কগুলি সমস্তই রাজস্ববিষয়ক মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে।

বঙ্গীয় জমিদারগণ সহায় হউন ; একবার চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেশের দৈন্য দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হউন, শুধু বিলাসিতা-মোহে মুগ্ধ থাকিলে চলিবে কেন! আমাদের সরলপ্রাণ প্রজাগণ গবর্ণমেণ্ট, রাজা এবং রাজসরকার বলিতে আপনা-দিগকেই জানে ; প্রার্থনা, অনুনয়, বিনয়, আবেদন, নিবেদন, যাহা কিছু তাহারা আপনাদের নিকটই করিয়া থাকে, আপনারা তাহাদের অভাব অনুভব এবং মোচন না করিলে তাহারা কাহার নিকট দাঁড়াইবে ?

আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন অবশ্য ব্যয়সাপেক্ষ। ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও আমাদের জমিদারগণ অন্ততঃ প্রত্যেকে একটী করিয়া অনায়াসেই খুলিতে পারেন। যাহা হউক দুই একজন কৃষি-প্রচারক নিয়োগ করিতে অতি সামান্য খরচেরই দরকার। এই সামান্য খরচের জন্য জমিদারগণ দেউলিয়া হইবেন না, ইহাতে বিস্তর স্বার্থ নিহিত আছে। যে দেশে "রাজা" শব্দের সৃষ্টি, এবং যে "রাজা" শব্দে আপনারা অভিহিত হইয়া থাকেন অথবা অভিহিত হইবার জন্য লোলুপ, উহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একবার স্মরণ করিয়া দেখুন।

দুঃখের বিষয় আমি বঙ্গের অনেক বড় বড় রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যবসায়ী, মহাজন এবং ধনকুবেরের নিকট পর্য্যন্ত গিয়া আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি তাঁহারা তিমিরে ডুবিয়া আছেন। বাহ্যিক দু'চার কথায় নির্ব্বোধ এবং বাতুল ভুলিতে পারে সত্য কিন্তু আমরা ভুলিবার নই। আমরা কেন, নিরক্ষর প্রজাগণও কেবলমাত্র মিষ্ট কথায় তৃপ্ত হইবার নহে। যেহেতু তাহারা কার্য্যতঃ অনেক প্রত্যাশা করে।

আমাদের রাজসরকার প্রদেশে প্রদেশে এক একটী কৃষি আপিস খুলিতেছেন এবং প্রদেশবিশেষে কৃষি-স্কুলও দুই একটী খুলিতেছেন সত্য, কিন্তু উহা বিশাল ভারতের পক্ষে নিরতিশয় সামান্য। শিক্ষিত এবং ধনী ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে কৃষি-স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। কৃষকদিগকে সহজসাধ্য সাধারণ বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলি শিখাইতে হইবে। বলা বাহুল্য প্রকৃতিদেবী বঙ্গীয় কৃষকদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিয়াছেন বলিয়াই নানা বাধাবিঘ্ন সত্বেও

তাহারা কৃষিতে কৃতকার্য্য হইতেছে। ভাগীরথী, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের সাহায্যে এবং অজস্র বৃষ্টিপাতে বঙ্গীয় কৃষকগণ পয়ঃপ্রণালীর অভাব উপলব্ধি করিতে পারে না।

যতই বঙ্গ ছাড়িয়া পশ্চিমাঞ্চলে অগ্রসর হইতেছিলাম ততই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিশেষত্ব বেশ টের পাইতে লাগিলাম। বেহারের রুক্ষ মাটী নজরে পড়িল; কৃষক, কৃষকপত্নী শরীরের রক্ত জল করিয়া ঘাস উৎপাটন এবং জল সেচনাদি দ্বারা পরিচর্য্যা করিতেছে। এলাহাবাদ অঞ্চলে মাঠের অবস্থা দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল, এবং শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতার কথা মনে হইল। বোধ হয় এখানেও নদীর অনুগ্রহেই শ্যামল শস্যে মাঠ আবৃত হইয়া রহিয়াছে। কাণপুর, দিল্লী অঞ্চলেও শস্যের অবস্থা একরূপ ভালই দেখিলাম। কিন্তু দিল্লী ছাড়িয়া যতই পঞ্জাব, রাজপুতানাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, বিশাল মরুভূমির ভিতর দিয়া যখন গাড়ী চলিতে লাগিল, ক্রমেই হতাশ হইতে লাগিলাম। রোহতক এবং ঝিন্দ অতিক্রম করিয়া পাতিয়ালা রাজ্যের ভাটিণ্ডা সহরে গিয়া পঁহুছিলাম। রাস্তায় স্থানে স্থানে মরুভূমির নিম্নপ্রদেশে বজ্রা, ভুট্টা, তিল, শণ, বেশ জন্মিয়াছে। মাঝে মাঝে তুলা এবং ইক্ষুর চাষও দেখিতে পাইলাম।

ভাটিণ্ডা ছাড়িয়া যতই বিশাল মরু কেন্দ্রাভিমুখে চলিতে লাগিলাম ততই এক নব দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। জাহাজে চড়িয়া একরূপ সমুদ্রের বিশালত্ব সারি কুঞ্জপৃষ্ঠ অনুভব করিয়াছিলাম, আর গাড়ীতে চড়িয়া এই এক অন্যরূপ দেখিতে ভীষণ মরুসমুদ্রের বিশেষত্ব উপলব্ধি করিলাম। রাস্তায় সারি ন্যুব্জদেহ উট, ময়ুর, হরিণ, গর্দ্দভ, শূকর এবং অতি বড় বড় পাখীর ঝাঁক পাইলাম। স্থানে স্থানে যেখানে বৃষ্টির জল জমিয়াছে, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বেশ সবুজ শস্য জন্মিয়াছে। আজ তিন বৎসর যাবৎ রাজপুতনায় বৃষ্টি হইতেছে। কাযেই জমিতে রস থাকার দরুন এবং বালী মাটীর অবস্থা কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের দরুন স্থল বিশেষে শস্য, বিশেষতঃ বজ্রা বেশ সুন্দর জন্মিতেছে। এদেশে গরীব লোকের ইহাই প্রধান খাদ্য। ভাটিণ্ডা হইতে দক্ষিণাভিমুখে কিঞ্চিৎ অধিক দুইশত মাইল আসিলে বিকানীর সহর। রেলপথের দুই ধারেই কত পুরাতন দুর্গ পতিত রাজপুত জাতির অতীত গৌরব অদ্যাপিও স্মৃতিপথে জাগরূক করিয়া দিতেছে। স্থলে স্থলে অনেক দুর্গ ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

কৃষকগণ অতি পুষ্টকায়; বজ্রার রুটিতে উদরপূর্ত্তি করিয়া মরুভূমিতে প্রকৃতি-দেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও শস্যোৎপাদন করিতেছে। ভবিষ্যতে পাঠকগণকে বিকানীর অঞ্চলের কৃষি এবং স্থানীয় বিবরণাদি জ্ঞাপন করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীযদুনাথ সরকার, এম্, এ, এস্ (জাপান), (প্রবাসী)

রঙ করিবার গাছ গাছড়া

উত্তর সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই কাঁঠাল বৃক্ষ জন্মায়, ইহার কাষ্ঠে নানাপ্রকার আসবাব তৈয়ারি হয়। নানাপ্রকার খোদা দ্রব্য ও ক্রুসের তলা তৈয়ারি জন্য এই কাষ্ঠ বহুল পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে, ইহার ফল কি কাঁচা কি পাকা উভয় অবস্থাতেই আমাদের যত উপকারে লাগে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই, আবার অন্যান্য ফলের বীজ বা আঁটী যেমন ফেলিয়া দেওয়া হয়, ইহার তদ্রূপ নয়। কাঁঠাল বীজ, কেবল আমরা কেন, সাহেবেরাও আদর পূর্ব্বক খাইয়া থাকেন, কিন্তু খাদ্য ও আসবাব ছাড়া আরও কোন বিষয়ের জন্য কাঁঠাল কাঠ আবশ্যক তাহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য, কাঁঠাল কাঠে সুন্দর পীত রঙ তৈয়ার হয়, কাষ্ঠ ছাড়া কাঁচা ফল ও কখন কখন রং করিবার জন্য দরকার হয়। অযোধ্যায় ইহার ছাল এবং সুমাত্রা ও যব দ্বীপে ইহার শিকড় হইতেও এই দেশে ইহার ফল ও কাষ্ঠে নানাপ্রকার রঙ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অনেকে হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে ব্রহ্মদেশীয়দিগকে যে সকল রেশমী বস্ত্র পরিধান করিতে দেখা যায়, তাহার মধ্যে পীত বর্ণের বস্ত্র বা চাদরই অধিক। বিশেষতঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও পুরোহিত মাত্রেই পীত বসন পরিধান করিয়া থাকেন, এই পীত বর্ণ প্রধানতঃ কাঁঠাল কাঠ হইতেই তৈয়ারি হয়।

প্রোম, বাসিন ও পেগু জেলাত্রয়ে কাঁঠাল কাঠের সারভাগকে "পানে নাই" বলে, এই সারভাগ টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ও জলে সিদ্ধ করিয়া এবং ছাঁকিয়া পরে তাহাতে অষ্ট্রেলিয়া দেশোৎপন্ন "য়্যাপেল ওয়াট" নামক বৃক্ষের ছাল সিদ্ধ করিয়া অম্ল জলের কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিলেই পাকা পীত বর্ণ তৈয়ার হয়, ইহাতে রেশমী সুতা ছোপাইলে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে।

বঙ্গ দেশের মধ্যে রাজসাহী ও মালদহ জেলায় অনেক রঙ রাজ আছে, ইহারা কখন শুদ্ধ কাঁঠালের করাতের গুঁড়া, কখনও বা গুঁড়াও ফটকিরী একত্রে সিদ্ধ করিয়া রঙ প্রস্তুত করে। চট্টগ্রামে করাতের গুঁড়ার পরিবর্ত্তে কাঁঠালের ছাল এবং অসার অংশ বাদ দিয়া সার ভাগ টুকুকে গুঁড়া করিয়া সিদ্ধ করা হয়। ত্রিশ সের জলে পাঁচ পোয়া হইতে দেড় সের করাতের গুঁড়া অল্প ঢিমা জ্বালে সিদ্ধ করিয়া আন্দাজ বার সের থাকিতে নামাইয়া জলটুকু বেশ ঠাণ্ডা হইলে উহাতে রেশমী সুতা দুই ঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাখিতে হয়। দুই ঘণ্টা পরে সুতাকে নিংড়াইয়া ও ছায়ায় শুকাইয়া লইলেই পীতবর্ণ হয়, কিন্তু একবার ছোপাইলে ভাল রঙ হয় না। এজন্য উপর্য্যুপরি ২।৩ বার ঐরূপ করা দরকার। শুদ্ধ কাঠের রঙ অধিককাল স্থায়ী হয় না, এজন্য কাঠ সিদ্ধ করিবার সময় একটু ফটকিরী বা অপর কোন অম্ল

জল দেওয়া আবশ্যক। রঙ গাঢ় করিতে হইলে কিঞ্চিৎ হরিদ্রাও মিশাইতে পারা যায়।

ফটকিরী না মিশাইয়া অন্য প্রকারেও রঙ করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ যে কাপড় বা সুতা গুলিকে রঙ করিতে হইবে, তাহা গরম জলে একটু সাজিমাটী দিয়া সেই জলে ধুইতে হয়, তারপর তাহাকে শুকাইয়া আবার ফটকিরী জলে ডুবাইয়া শুষ্ক করিতে হয়, অবশেষে পূর্ব্ব কথিত গুঁড়া ও খুব ছোট ছোট টুকরা কাঠ সিদ্ধ করিয়া ঐ জলে সুতাগুলিকে আবার দুই বার ছোপাইয়া ছায়ায় শুষ্ক করিলেই আবশ্যকীয় রঙ প্রস্তুত হইতে পারে।

নীলবড়িও কাঁঠালের গুঁড়ায় সবুজ রঙ তৈয়ার হয়, ইচড়ের রস ও আইচের শিকড় একটু চুণের সহিত সিদ্ধ করিলে এক প্রকার লাল রঙ তৈয়ার হয়।

লটকানে ক্ষার মিশাইলে রঙ শীঘ্র গলিয়া যায়, কিন্তু বর্ণটা একটু হলদে হইয়া পড়ে, কিন্তু এইরূপ হলদে রঙযুক্ত রেশমকে ভিনিগার, ফটকিরীর জল বা লেবুর রসে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলেই উহা পুনরায় জরদা রঙে পরিণত হয়। বঙ্গদেশে কেবলমাত্র বীজ ভিজান বা সিদ্ধ করা জলে দেশী রঙরাজেরা রেশমী সুতা বা বস্ত্রাদি রঙ করে। সে রঙ অধিক দিন থাকে না। কোন কোন স্থলে ১ ভাগ বীজ ২৪ ভাগ জলে ৩।৪ ঘণ্টা ভিজিয়া নরম হইলে তাহা অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ১ অংশ জল মরিয়া গেলে জলটী নামাইয়া তাহাতে ফটকিরী ও কিঞ্চিৎ নারিকেল জল মিশাইয়া ও ছাঁকিয়া তাহাতেই বস্ত্রাদি রঙ করা হয়, কিন্তু এ সকল উপকরণ অপেক্ষা ফটকিরী ও লেবুর রসই রঙ স্থায়ী করিবার পক্ষে অধিক প্রয়োজনীয়।

পলাশ, লটকান, সাজিমাটী ও ফটকিরীতে জরদা রঙ প্রস্তুত হয়, কিন্তু ইহা অধিক দিন থাকে না। কমল গুঁড়ির সহিত লটকান মিলিত হইলে যে সুন্দর জরদা রঙ তৈয়ার হয়, তাহা অধিক কাল স্থায়ী হইয়া থাকে।

আচ বা দারুহরিদ্রায় রঙ করিবার পূর্ব্বে লটকানের ছাল সিদ্ধ করা জলে সেই বস্ত্রের "জমি" করিয়া লইলে আচের লাল রঙ ভাল রকম ধরে। সর্ব্বজয়ার বীজ খণ্ড খণ্ড করিয়া জলে সিদ্ধ ও কিঞ্চিৎ ফটকিরী মিশাইলে লাল রঙ প্রস্তুত হয়। আর শেফালিকা ফুলের হরিদ্রাভ বোঁটা গুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরে ফটকিরীসহ জলে সিদ্ধ করিলে সুন্দর পীতবর্ণ হয়। ইহাতে কাপড় ছোপাইলে দীর্ঘকাল রঙ থাকে।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত।

দুগ্ধ ও বীজাণু

আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ বালুকণার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু বায়ুস্থিত বীজাণু-সমূহের সংখ্যা নির্দ্ধারণ অসম্ভব। এই বীজাণু-সমূহ নগ্নচক্ষে অদৃশ্য, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ইহাদের অবস্থিতি অনুভব করা যায়। প্রত্যেক প্রকার বীজাণুর নিজস্ব বিশেষ কার্য্য আছে। এক প্রকার বীজাণুর কার্য্য অন্য কোন বীজাণু বা বস্তু দ্বারা, বা বীক্ষণাগারে রসায়নবিদের কোন যন্ত্র সাহায্যে তত সহজে, এবং অনেক স্থলে একেবারেই, সম্পাদিত হইতে পারে না। হস্ত পদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিহীন, এমন কি অনেক স্থলে অদেহবদ্ধ (unorganised) এই বীজাণুসমূহ কত প্রকারে আমাদের কাযে আসিতেছে, তাহা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে। বিভিন্ন প্রকার বীজাণুসমূহ স্থান এবং অবস্থাভেদে কি প্রকারে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহা অনেকস্থলে বিশদভাবে কিছুই নির্দ্ধারিত হয় নাই।

অনেক সময় বীজাণুসমূহের শরীর হইতে এক প্রকার জলীয় রস নির্গত হয় এবং উক্ত রস দ্বারাই তাহাদের কার্য্যকরী ক্ষমতা ক্রমে লোপ হইতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে তাহাদের বংশই সম্পূর্ণ বিনাশ পাইয়া থাকে।

বীজাণুসমূহের একটী বিশেষত্ব এই যে, উপযুক্ত বস্তু পাইলে তাহাদিগের সংখ্যা এবং কার্য্যকরী ক্ষমতা অতি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই বিষয়ে দুগ্ধ অতুলনীয়;

দুগ্ধে বীজাণুর বংশবৃদ্ধি

কারণ বীজাণুসমূহের বংশ দুগ্ধমধ্যে যেরূপে সহজে ও দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে অন্য কোন বস্তুর মধ্যে সেইরূপ পারে না। বার্গথেল (Bergtheil) কোন বিষাক্ত দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া ১ ঘণ সেণ্টিমিটার (1 cubic centimetre) বা ২০ ফোঁটা দুগ্ধে ১,৫০,০০০০০০০ এক শত পঞ্চাশ কোটী বীজাণু পাইয়াছেন। দুগ্ধে বীজাণুসমূহের সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, উক্ত দৃষ্টান্তটী হইতে সহজেই বুঝা যাইবে। যে সমস্ত বীজাণু দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া থাকে তাহাদিগকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

(১) দুগ্ধ বিয়োজনকারী বীজাণু; এই প্রকার বীজাণু বিষাক্ত নহে, সুতরাং নিরাপদ। ইহারা কেবল দুগ্ধকে বিয়োজিত (decomposed) করিয়া নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে।

(২) রোগবাহক বীজাণু; এই প্রকার বীজাণুসমূহ দুগ্ধের কোন রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটায় না। বিসূচিকা, সান্নিপাত জ্বর, ডিপ্‌থেরিয়া (Diphtheria) টিউবারকুলসিস্ (Tuberculosis) প্রভৃতি রোগের বীজাণু শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত। ইহারা অতিশয় অনিষ্টকারী।

বীজাণুসমূহের দুগ্ধের প্রতি এমনই একটা আকর্ষণ আছে যে, দুগ্ধকে বীজাণু শূন্য রাখা এক প্রকার অসম্ভব। আমেরিকার কলম্বিয়া প্রদেশে রাজকীয় নিয়মানুসারে, যে দুগ্ধের ১ ঘন সেণ্টিমিটার বা ২০ ফোঁটাতে ৫০০০ পাঁচ হাজারের অধিক বীজাণু নাই, উহা প্রথম শ্রেণীয় দুগ্ধ। কারণ, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিশেষ উপায় অবলম্বন করিলেও দুগ্ধে বীজাণুর সংখ্যা ইহা অপেক্ষা কম করা যায় না। ২০ ফোঁটা দুগ্ধে পাঁচ হাজার হইতে এক লক্ষ পর্য্যন্ত বীজাণু থাকিলে দুগ্ধ দ্বিতীয় শ্রেণীয় বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং উহা ব্যবহারের যোগ্য থাকে। কিন্তু প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে এক লক্ষের অধিক বীজাণু থাকিলে উহা ব্যবহার করা উচিত নহে।

বীজাণুর আক্রমণে দুগ্ধের বিকার

দোহনের পর রাখিয়া দিলে বায়ু হইতে অসংখ্য প্রকার বীজাণু ক্রমে দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া উহাদের রাজ্য বিস্তার করিতে থাকে এবং ঐ দুগ্ধও ক্রমে সন্ধিত (Fermented) হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। কয়েক ঘণ্টা পর পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে ঐ দুগ্ধের আপেক্ষিক গুরুত্ব পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরিবর্ত্তন ক্রিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে দুগ্ধ ক্রমে অম্লস্বাদবিশিষ্ট হইতে থাকে। তাহার কারণ এই যে দুগ্ধস্থ শর্করাভাগ এক প্রকার অণুবীজ (micro-organism) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আংশিকরূপে দুগ্ধজাম্ল বা দুগ্ধাম্লে (lactic acid) পরিণত হয়। উক্ত বীজাণুসমূহকে দুগ্ধাম্ল বীজাণু বা দধি বীজাণু (Lactic acid bacilli) বলা হইয়া থাকে। এই বিশেষ প্রকার বীজাণু ব্যতিরেকে আরও কয়েক প্রকার বীজাণু বা কিণ্ব (Ferment) দুগ্ধ-শর্করাকে দুগ্ধাম্লে (lactic acid) পরিণত করিতে পারে। স্থান ও অবস্থাভেদে কোনটির ক্রিয়া বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়; কিন্তু মোটামুটী বলা যাইতে পারে যে, সাধারণতঃ দুগ্ধাম্ল-বীজাণুর সংখ্যাধিক্য হেতু উহাদের ক্রিয়াই বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহাই উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বপ্রকারে দুগ্ধশর্করা হইতে দুগ্ধাম্ল উৎপত্তিকে দুগ্ধাম্ল-সন্ধান (lactic acid fermentation) বলা হয়।

বীজাণু রক্ষণ ও পরিবর্দ্ধন

উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজাণুসমূহের রক্ষণ ও বর্দ্ধন করিলে উহাদিগের আশ্চর্য্য ও দ্রুত বংশবৃদ্ধিক্ষমতা সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। পরীক্ষার জন্য অল্প পরিমাণ অম্লস্বাদবিশিষ্ট, অর্থাৎ দুগ্ধাম্ল বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত দুগ্ধের সহিত, এক সহস্র ভাগ জল মিশাইয়া তাহা হইতে এক বিন্দু লইয়া কিঞ্চিৎ শিরীস (Gelatin)এর উপরে ফেলিয়া কয়েক দিন রাখিয়া দিলে দেখা যাইবে যে ঐ দুগ্ধবিন্দু হইতে দুগ্ধাম্ল বীজাণুসমূহ দ্রুতভাবে বংশবৃদ্ধি লাভ করিয়া শিরিসের উপর সরু দণ্ডাকারে বিভিন্ন সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছে। বিপুলদর্শক কাচের (Magnifying glass) সাহায্যে উহাদের আকৃতি অনেকটা বাদামের ন্যায় দেখায়। বীজাণু-সমূহের বংশবর্দ্ধনের

পক্ষে শিরীস বিশেষ উপযোগী; বিশেষতঃ শিরীস দুগ্ধের ন্যায় তরল পদার্থ নহে বলিয়া বীজাণু-সমূহের অস্তিত্ব সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। (ক্রমশঃ)

বাগানের মাসিক কার্য্য।

অগ্রহায়ণ মাস।

সব্জীবাগান।—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতি সীম বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে কিম্বা যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপি চারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী।—বেগুন, শাকাদি, তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়।

ফুলের বাগান।—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসান্থিমম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া, আষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না। পাঁকমাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি-ক্ষেত্র।—মুগ, মসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোল আনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশুখাদ্যের মধ্যে মাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও

করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত বৃক্ষের নিম্নে আইল বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন; আলু ও বিলাতি সব্জীর বীজ লাগান এ মাসেও চলিতে পারে; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে; বিলাতি সব্জীর চাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয়; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটী লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টী গোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরান ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় গোময়, সরিষার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার, সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার এক ভাগ, পোড়া মাটি এক ভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভুসা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুসা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক পেকেট ভুসা যথেষ্ট, ভুসা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুঁড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটি ও গুঁড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ খণ্ড। } অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

লাঙ্গল প্রতি ভূমির পরিমাণ

ভারতীয় কৃষি সমিতির উদ্যান রক্ষক

শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

এদেশে সমস্ত লাঙ্গল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যথা, উত্তম, মধ্যম ও অধম।

উত্তম শ্রেণীর লাঙ্গলে বৈশাখ মাসে দৈনিক দুই বিঘা ও কার্ত্তিক মাসে দৈনিক দেড় বিঘা জমি চষিতে পারা যায়। এই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লাঙ্গলে আশু ধান্যের জমি হইলে ২০ বিঘা এবং আমন ধান্যের জমি হইলে ৩০ বিঘা পর্য্যন্ত বুনানি করিতে পারা যায়।

মধ্যম শ্রেণীর লাঙ্গলে বৈশাখ মাসে দৈনিক দেড় বিঘা ও কার্ত্তিক মাসে দৈনিক এক বিঘা চষিতে পারা যায়। মধ্যম শ্রেণীর লাঙ্গলে আশু ধান্যের জমি ১২ বিঘা আর যদি আমনের জমি হয়, তবে ২০ বিঘা পর্য্যন্ত জমি বুনানি করিতে সক্ষম হওয়া যায়।

যে লাঙ্গলের গবাদি পশু দুর্ব্বল অথবা কুড়ে, মাটো বা গড়ে হয়, তাহাকেই নিকৃষ্ট শ্রেণীর লাঙ্গল বলা যায়। লাঙ্গলের ভাল মন্দ গোরুর অবস্থার উপর নির্ভর করে। গোরু বলবান্ হইলে লাঙ্গল উৎকৃষ্ট হয়। দুর্ব্বল গোরুর লাঙ্গল নিকৃষ্ট বলিয়া ধরা যায়। যে গোরু আপন বশে চলে তাহাকে মাটো বলে। মাটো গোরু শত্র চেষ্টাতেও খরতর বেগে যাইতে পারে না। তবে কুড়ে যেমন নড়িতে পারে না, মাটো সেরূপ নহে, তাহাপেক্ষা একটু ভাল চলে। লাঙ্গল বহন করিতে করিতে

যে গোরু শুইয়া পড়ে, তাহাকে গড়ে বলে। নিকৃষ্ট লাঙ্গলে বৈশাখ মাসে দৈনিক পোনের কাঠার অধিক জমি চষিতে পারে না এবং সে চাষও উৎকৃষ্ট হয় না। উৎকৃষ্ট লাঙ্গলের চারিবার চাষে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা যেরূপ পরিচালিত হয়, নিকৃষ্ট লাঙ্গলের আট চাষেও সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। এই জন্য পাশাপাশি কোন কৃষকের ক্ষেত্রে সুবর্ণ ফলিয়া থাকে, আবার কোন কৃষকের বীজে অঙ্কুরই আইসে না। সমান জমিতে কেবল চাষ আবাদের দোষেই এরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, নিকৃষ্ট লাঙ্গলেও আশু ধান্যের জমি হইলে দশ বিঘা এবং আমনীয়া জমি হইলে ১৫ বিঘা পর্য্যন্ত বুনানি করা চলে।

যে সকল উচ্চ প্রদেশে কূর্ম্মপৃষ্ঠ, ক্রমনিম্ন, ও সমতল ক্ষেত্রের সংখ্যা অধিক, সেই সকল প্রদেশে আশু ধান্যেরই আবাদ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ক্ষেত্র সকল কোন সময়েই প্রায় জলমগ্ন হইতে দেখা যায় না; বৎসরের ছয় মাস কাল শুষ্কাবস্থায় অপর ছয় মাস কেবল জলসিক্ত মাত্র হইয়া থাকে। এই অবস্থার ক্ষেত্র সকলে চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে হেমন্ত কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই নানা জাতীয় আগাছা ও তৃণ বীজ সকল অঙ্কুরিত হইয়া সমুদয় স্থান আগাছায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তদ্ভিন্ন কেশে, কুশ, উলা, মুথা, দূর্ব্বা, প্রভৃতি চিরজীবি তৃণ সকলের সহিত ঐ সকল ক্ষেত্রের একপ্রকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বলিলে বলা যায়; কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, কি শীত, কোন ঋতুতেই তাহাদের বৃদ্ধির নিবৃত্তি নাই। ঐ সকল আগাছা ও বিবিধ তৃণাদি কোদাল, লাঙ্গল, নিড়ানী ইত্যাদি যন্ত্র দ্বারা বিবিধ কৌশলক্রমে মারিয়াও একেবারে নিঃশেষ করিতে পারা যায় না। বৃহৎ বৃহৎ ক্ষেত্র সকলের এক দিক আবাদ করিয়া অন্য দিকে যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ভাগ আবার তৃণাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এ প্রকার তৃণবহুল প্রদেশে প্রত্যুষ হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত লাঙ্গল বহিয়াও অবস্থা বিশেষে এক লাঙ্গলে দশ বিঘা বা বার বিঘার অধিক জমি আবাদ করা দুষ্কর হইয়া উঠে। আবার যেখানে পলি মাটির ক্ষেত্র অধিক আছে, তথায় এক লাঙ্গলে আট বিঘা হইতে ষোল বিঘা জমির আবাদ করিলেই বরং ভাল হয়।

আশু ধান্য বুনিবার পর ধান পাকিতে চারি মাস কাল গত হয়। ঐ চারি মাসের মধ্যে প্রথম দুই মাস মাত্র ধান ক্ষেতের পাইট করা চলে। ঐ দুই মাসের মধ্যে মৈ, বিদে, নিড়ানী প্রভৃতি সমস্ত কারকিৎ সমাপ্ত করিতে না পারিলে আশু ধান্যের অবস্থা উৎকৃষ্ট হয় না। সুতরাং অপর কৃষকের সাহায্য ব্যতীত অর্থাৎ [illegible]নগদা মজুর না হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে একজন কৃষাণের দ্বারা ১৫ বিঘা জমির নিড়ানী প্রভৃতি পারিপাট্য সাধন হইয়া উঠে না। অতএব আশু ধান্যের কৃষককে এক লাঙ্গলে অধিক ভূমি করিতে হইলে আবাদের পক্ষে অনেক

মুস্কিল হওয়া সম্ভব। তবে পলিমাটির আবাদ হইতে মেটেলের আবাদ দুই চারি বিঘা জমি বেশী হইতে পারে। পলি অপেক্ষা মেটেল মাটীতে ঘাসের সংখ্যা কিছু কম হইয়া থাকে। কিন্তু কার্ত্তিকে চাষের সময়ে পলির চাষা যে পরিমাণ জমিতে খন্দ বুনানি করিতে পারে, মেটেলের চাষা তাহা পারে না।

বৈশাখী চাষের সময় মেটেল মাটী সুবিধামত অধিক জমিতে চাষ দেওয়া যায়। কিন্তু বর্ষা কালে জলে জলে মেটেল মাটিতে আঠা ধরিয়া কার্ত্তিকে চাষের সময় অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠে, এবং কার্ত্তিক মাসের টানে তাহা শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া ও ফাটিয়া যায়। পলি এবং দোয়াঁশ মাটিতে বৈশাখী ও কার্ত্তিকে চাষ ভেদে কোন অবস্থান্তর ঘটে না, এবং পলি ও দোয়াঁশ মাটি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সরস থাকে।

এক জন কৃষাণ দ্বারা আশু ধান্যের জমি দশ বিঘা পর্য্যন্ত নিড়ানী ও কাটাই করা যাইতে পারে। এক লাঙ্গলে তদতিরিক্ত জমি আবাদ করিতে হইলে নগদা অতিরিক্ত মজুরের আবশ্যক হয়।

যে প্রদেশে কেবল মাত্র হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে, তথায় বিল ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ ক্ষেত্রই অধিক পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ হইতে হেমন্ত ঋতু পর্য্যন্ত বৎসরের প্রায় পাঁচ ছয় মাস কাল ঐ সকল ক্ষেত্র জলনিমগ্ন হইয়া থাকিতে দেখা যায়। এরূপ জলনিমগ্ন ক্ষেত্রে স্থলজ তৃণের অধিক প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না। তবে কয়েক প্রকারের তৃণ আছে, তাহাদের প্রকৃতি ঠিক আমন ধান্যের তুল্য। তাহারা স্থলে প্রথম জন্মিয়া, পরে জল সংযোগে বৃদ্ধি পায়। উচ্চ জলা ক্ষেত্রে ঐ সকল তৃণই অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু নিম্নতল বিল ক্ষেত্র সকলে নানা জাতীয় জলজ তৃণ ভিন্ন অন্য তৃণ জন্মাইতে দেখা যায় না।

আমন ধান্যের আবাদের সময় ঐ সকল তৃণ একবার নিড়াইয়া দিলেই তাহাদের সংখ্যা কম হইয়া পড়ে। অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা শীত ও গ্রীষ্ম সমাগমে শুকাইয়া যায়। ফলতঃ চৈত্র বৈশাখ মাসে আমনের জমি প্রায় পরিষ্কার অবস্থায় থাকে। এই জন্য আমনের জমি অপেক্ষাকৃত অল্প চাষেই সুন্দর আবাদ হইয়া উঠে। তজ্জন্য আশু ধান্য অপেক্ষা আমনের জমি কিছু বেশী আবাদ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। আর আমনের জমির পারিপাট্য সাধনের জন্য কৃষককে তাদৃশ তাড়াতাড়ি করিতে হয় না। কারণ আমন ধান্য প্রস্তুত হইতে প্রায় আট মাস কাল গত হয়। তন্মধ্যে পাঁচ মাস কাল আবাদ করা চলে। এই পাঁচ মাসের মধ্যে এক জন কৃষকের দ্বারা ১৫ বিঘা জমির আবাদ সুসম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু তদতিরিক্ত জমি করিতে হইলে নগদা মজুরের সাহায্য লওয়া আবশ্যক হয়। নগদা মজুরের সাহায্য বিনা ২০ বা ২৫ বিঘা জমির আবাদ নিষ্পন্ন হইয়া উঠে না।

শ্বেত-সার

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত

শ্বেত সার কি ?

অনেকেই পালোর বিষয় জানিতে চাহেন। অনেক শস্যাদি ও ফসল মূলের পালো আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য। মহামান্য ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পালো সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার লেখা অনুসরণ করিয়া পালো সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে অগ্রসর হইলাম। তাঁহার কৃত এই পালোর বিষয় আলোচনা দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইতে পারিবে। পালো বিষয়ে প্রবোধ বাবুও লিখিয়াছেন, তখন এ সম্বন্ধে বলিবার আর কিছু বাকী নাই। সুতরাং এ সম্বন্ধে কেবল কয়েকটী অন্য কথা আমি বলিব।

রাসায়নিক ভাষায় পালোকে শ্বেত-সার বলে। উদ্ভিদ্ শরীরে ইহা সঞ্চিত হয়। ঘাস জাতীয় উদ্ভিদের বীজে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। মূলের ন্যায় বস্তু,—যেমন গোল আলু, রাঙা আলু, ওল, আরোরুট,—এ সকল বস্তুতেও ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। তালজাতীয় বৃক্ষেও ইহা প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। তাল, নারিকেল, খেজুর প্রভৃতি গাছের মাথি শ্বেতসার ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাবু-দানাও শ্বেত-সার ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক প্রকার তাল গাছ হইতে সাবু দানা সংগৃহীত হয়।

চাউলের বারো আনা ভাগ শ্বেত-সার। একখণ্ড কাপড়ে চাউলের গুঁড়া বাঁধিয়া পুঁটুলিটী ক্রমাগত জলে ধুইলে, তাহার ভিতর হইতে এক প্রকার শ্বেতবর্ণের পদার্থ নির্গত হয় এবং জলটী দুধের ন্যায় শাদা হইয়া যায়। অশ্বত্থামার মা ইহাই ছেলেকে দুধ বলিয়া খাইতে দিয়াছিলেন। চাউল হইতে এই যে শ্বেতবর্ণের পদার্থ নির্গত হয়, ইহাই শ্বেত-সার। সুতরাং শ্বেত-সার প্রস্তুত করা কঠিন ব্যাপার নহে। চাউল, মকাই, আলু, আরোরুট প্রভৃতি বস্তুকে প্রথম চূর্ণ করিয়া, তাহার পর বার বার জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া, অবশেষে শুষ্ক করিলেই শ্বেত-সার হয়। অধিক পরিমাণে শ্বেত-সার প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কল আছে। চাউল-চূর্ণ-পূর্ণ পুঁটুলি জলে ক্রমাগত ধুইলে, তাহার ভিতর অবশিষ্ট আর কিছু রহিয়া যায় না। সে জন্য বুঝিতে হইবে যে, শ্বেত-সার ব্যতীত চাউলে অন্য কোন পদার্থ বড় আর কিছু নাই। গমের ময়দাও পুঁটুলি বাঁধিয়া এইরূপে জলে ধুইলে, তাহা হইতে শ্বেত-সার নির্গত হয়। ময়দা ধুইলে কিন্তু শেষকালে পুঁটুলিতে আর একটী

পদার্থ লাগিয়া থাকে। আটার মত ইহা কিছু চট্‌চটে। এই পদার্থকে গুলুটেন বলে। চাউলের গুলুটেন অতি সামান্যভাবে থাকে। যব, মকাই, জোয়ার, বাজরা এই সমস্ত ঘাসের বীজও শ্বেত-সার দিয়া গঠিত। এ সমুদায় বস্তুতেও গুলুটেন অতি সামান্যভাবে থাকে। গোল আলু, রাঙা আলু প্রভৃতি পদার্থও শ্বেত-সার দিয়া গঠিত। ইহাতে গুলুটেন নাই বলিলেই হয়। আলুতে জলের ভাগ অধিক। আলুর প্রায় বারো আনা জল।

খরিদদার কোথায়

আট বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় শিল্প-সমিতিকে রাঙা আলু ও আরোরুট হইতে শ্বেত-সার বাহির করিবার নিমিত্ত পরামর্শ দিয়াছিলেন। কানাডা নামক একপ্রকার বিদেশীয় শ্বেত-সার-পূর্ণ মূলেরও চাষ করিতে বলিয়াছিলেন। গোল আলু হইতেও শ্বেত-সার বাহির করিবার পরামর্শ দেন নাই। গোল আলু হইতে পালো বাহির করিতে, আমার বোধ হয়, খরচ অধিক পড়িবে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ কথা এই যে, পালো করিয়া হবে কি? কে তাহা খরিদ করিবে, কোথায় তাহা বিক্রয় করিব। শ্বেত-সার হইতে বিলাতে মদ হয়, কাপড়ের কলপ হয়, আটা হয়, কৃত্রিম হস্তী-দন্ত হয়। সেখানে এ বস্তুর খরিদদার আছে। আমাদের দেশে ইহার খরিদদার নাই। কোন একটী নূতন বস্তু চালাইতে হইলে, নিজে বিক্রয় স্থানে গিয়া অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। সেই জন্য বিলাতের আমেরিকার লোক আপন আপন দ্রব্যাদি লইয়া, পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। সেই জন্য এক ঘড়িওয়ালা আড়াই টাকায় এক একটী ঘড়ি বেচিয়া কলিকাতায় লালদিঘীর ধারে রাজভবন-সদৃশ বৃহৎ একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এরূপ অট্টালিকা তাঁহাদের বোধ হয়, পৃথিবীর সকল নগরেই আছে। কিন্তু আমাদের কোন একটা নূতন কাজে হাত দিবার যো নাই। কি বিদ্যা, কি জ্ঞান, কি ধন-উপার্জ্জন করিতে আমাদের বিদেশে যাইবার সাহসে কুলায় না। বিদেশে গমন করিলে আমাদের একঘরে হইবার ভয় আছে। কেরাণিগিরি দুর্ল্লভ হইয়া আসিতেছে। সুতরাং কুলিবৃত্তি ব্যতীত আমাদের আর অন্য উপায় নাই। অমৃত বাজার পত্রিকা সম্প্রতি হিসাব দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের ভদ্রলোকগণ ক্রমে নির্ম্মূল হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক আমার উপদেশ এই যে কোন একটা নূতন বস্তু প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, সে দ্রব্যের খরিদদার আছে কি না, অথবা তাহার খরিদদার করিতে পারিব কি না। আরোরুটের খরিদদার এ দেশে আছে। সে জন্য অনেক ভদ্রলোকে ইহার চাষ করিতেছেন, চাষীরা এখনও আরম্ভ করে নাই। যদি কাহারও বীজের

আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আগামী বৎসর ভারতীয় কৃষি-সমিতি তাহা দিতে পারিবেন। বীজ অবশ্য দাম দিয়া কিনিতে হইবে।

আমাদের আহার

চাউল, গম প্রভৃতি বস্তু প্রধানতঃ শ্বেত-সার দিয়া গঠিত। সুতরাং শ্বেত-সার মানুষের প্রধান খাদ্য। ধান, গম প্রভৃতি বীজ হইতে উদ্ভিদদিগের সন্তান উৎপন্ন হইয়া অর্থাৎ বীজ হইতে চারা বাহির হইয়া, তরুণ অবস্থায় ইহা দ্বারা প্রতিপালিত হইবে, সে জন্য উদ্ভিদগণ এই শ্বেত-সার সঞ্চিত করিয়া রাখে। গো-বৎসকে বঞ্চিত করিয়া মানুষ যেরূপ গরুর দুগ্ধ অপহরণ করে, সেইরূপ উদ্ভিদ শিশুদিগকে ভ্রূণ অবস্থায় বধ করিয়া, তাহার খাদ্য দ্বারা, আমরা আপনাদিগের শরীর পোষণ করি। মানুষ-শরীর পোষণের নিমিত্ত এই কয় প্রকার বস্তুর নিতান্ত প্রয়োজন; (১) যাহাতে মাংস গঠিত হয়; (২) যাহাতে অস্থি হয়; (৩) যাহাতে শরীরে উত্তাপ ও শক্তি হয়। এই কয় বস্তু ব্যতীত জলও অনেক পান করিতে হয়। গমে যে আটার ন্যায় পদার্থ থাকে, যাহাকে গুলুটেন বলে, তাহা দ্বারা মাংস গঠিত হয়। চাউলে সে পদার্থ অতি অল্পপরিমাণে থাকে; সে জন্য চাউলের গুঁড়া দিয়া আমরা রুটি করিতে পারি না। চাউলে এই পদার্থ অধিক নাই সে জন্য মাংস-গঠনের উপযোগী পদার্থ চাউলে ভালরূপ পাই না। দালে এ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে, এজন্য ভাতের সহিত আমরা দাল ভক্ষণ করি। তরকারীতে হাড় গঠন উপযোগী পদার্থ থাকে। চাউলের শ্বেত-সারে উত্তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়; তৈল ও ঘৃত হইতেও উত্তাপের উৎপত্তি হয়। আমাদের শরীরে মাংস, অস্থি, শক্তি প্রভৃতি সর্ব্বদাই ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। আহার দ্বারা সেই ক্ষয় দিন দিন পূরণ হইতেছে। ভাত হইতে শক্তি, তৈল ও ঘৃত হইতে উত্তাপ, দাল হইতে মাংস, তরকারী হইতে অস্থি অহরহ মনুষ্য শরীরে উৎপাদিত হইতেছে।

মুখের লালা

কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আহার,—শরীরের ভিতর পরিপাক না হইলে, এ সব কাজ কিছুই হয় না। শরীরের ভিতর পাকযন্ত্রে আহার পিষ্ট না হইয়া প্রথম তরল অবস্থায় পরিণত হয়। সেই বস্তু তার পর রক্তে পরিণত হইয়া, শরীরের নানাস্থান পোষণ করে। আহার তরল না হইলে তাহার দ্বারা শরীর পোষিত হয় না। কিন্তু আমাদের প্রধান আহার—শ্বেত-সার। ইনি সামান্য জলে দ্রবীভূত হইয়া তরল অবস্থায় পরিণত হন্‌না। আহার করিবার সময় মুখের ভিতর ভাত যখন চর্ব্বিত হয়, তখন ইহার সহিত মুখের লালা মিশ্রিত হইয়া যায়। লালার গুণে

শ্বেত-সার চিনিতে পরিণত হয়। চিনি জলে গলিয়া যায়। সুতরাং আমরা যে ভাত খাই, প্রথম চিনিতে তাহা পরিণত না হইলে, শরীরের কোন কাজেই লাগে না। সে জন্য ভাত মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভাতে জল দিয়া ফেলিয়া রাখিলেও, ইহার শ্বেত-সার, বায়ুস্থিত এক প্রকার বীজাণুর সহায়তায় প্রথম চিনিতে পরিণত হয়, তাহার পর সেই চিনি সুরায় পরিণত হয়। ভাত হইতে পচই অথবা মদ প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথম ইহাকে চিনিতে পরিণত করা চাই। গন্ধকের দ্রাবক যোগেও শ্বেত-সারকে চিনিতে পরিণত করিতে পারা যায়। সেই জন্য গন্ধকের দ্রাবকের সহায়তায় পরিত্যক্ত নেকড়া প্রভৃতি উদ্ভিদজাত পদার্থ হইতে চিনি ও মদ প্রস্তুত হয়।

চিবাইবার চাকর

আপন আপন সন্তান প্রতিপালনের নিমিত্ত উদ্ভিদগণ বীজে, পক্ষীগণ ডিম্বে, গো, মহিষ প্রভৃতি পশুগণ স্তনে যে খাদ্য সঞ্চয় করে, মানুষ তাহা অপহরণ করিয়া স্বদেহ পরিপোষণ করে। খাদ্য পরিপাকের নিমিত্ত পশুগণ উদরের ভিতর যে বস্তু সঞ্চয় করে, তাহাও মানুষ ছাড়িয়া দেয় না। কোন কোন পশুর পিত্ত দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত হয়। আহার পরিপাকের নিমিত্ত পেপসিন নামক আর একটী পদার্থ জীবের উদরে সঞ্চিত হয়। শূকরের পেপসিন অজীর্ণরোগের একটী প্রধান ঔষধ। খাদ্য পরিপাকের নিমিত্ত মুখের লালাও নিতান্ত আবশ্যক। যদি ষাঁড়ের পিত্ত লইলাম, যদি শূকরের পেপসিন লইলাম, তাহা হইলে মুখের লালা লইতে দোষ কি?

নাম করিলেই আমাদের গা শিহরিয়া উঠে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে,—যাহারা অন্য লোকের মুখের লালা সাদরে ভক্ষণ করে। লালার গুণে শ্বেত-সার শীঘ্র চিনিতে পরিণত হয়; তাহার পর সেই চিনি তরল হইয়া, শরীর পোষণের উপযোগী হয়। খাদ্যের সহিত শ্বেত-সার মিশ্রিত করিতে হইলে ভালরূপে চর্ব্বণ করা আবশ্যক। চর্ব্বণ করিতে পরিশ্রম হয়। বড় মানুষ লোক কি এত পরিশ্রম করিতে পারেন? সে জন্য কোন কোন স্থানে বড় মানুষ লোক তাঁহাদের খাদ্য চর্ব্বণ করিয়া দিবার নিমিত্ত চাকর নিযুক্ত করেন। সেই ভৃত্যেরা খাবার চিবাইয়া দেয়, তবে তাঁহারা ভক্ষণ করেন। শ্বেত-সার চিনিতে পরিণত হইলে, তাহার পর ইহা হইতে সুরা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কোন কোন স্থানে শস্য প্রথমে ভালরূপ চর্ব্বণ করিয়া, তাহার পর তাহা হইতে লোকে সুরা প্রস্তুত করে। এ সম্বন্ধে আমার আরও কিছু বলিবার রহিল। বারান্তরে তাহা বলিব।

দুগ্ধ ও বীজাণু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১০° সিঃ (10 Degree centigrade) শৈত্যে দুগ্ধাম্ল বীজাণু-সমূহের কোনও ক্রিয়া নাই। উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের উপর উহাদের ক্রিয়া আরম্ভ হয়; কিন্তু ১৬ সিঃ উষ্ণতা পর্য্যন্ত কার্য্যকরী ক্ষমতা অতি মৃদু থাকে। ৩৫ সিঃ হইতে ৪২ সিঃ পর্য্যন্ত উষ্ণতার মধ্যে উহাদের ক্রিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয় এবং উষ্ণতা ৪৫ সিঃ হইলে কার্য্যকরী ক্ষমতা পুনর্ব্বার সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। দুগ্ধকে ৭০ সিঃ পর্য্যন্ত উষ্ণ করিলে বীজাণু সবংশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশসমূহের বায়ুর স্বাভাবিক উষ্ণতা ১৫ সিঃ; কাযেই দুগ্ধাম্ল বীজাণুসমূহ দুগ্ধের উপর সহজে বিশেষ ক্রিয়া করিতে পারে না, এবং ঐ সকল স্থানে দোহনের ৮।১০ ঘণ্টা পরও দুগ্ধ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকে; এমন কি, সতর্কতার সহিত রাখিয়া দিলে, দোহনের ২।৩ দিন পরেও দুগ্ধের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। আমাদের দেশের বায়ুর স্বাভাবিক উষ্ণতা ৩০ সিঃ; কাযেই দোহনের পর অল্প সময়ের মধ্যেই বীজাণু-সমূহ দুগ্ধকে প্রবল ভাবে আক্রমণ করিয়া অম্লস্বাদবিশিষ্ট করিয়া ফেলে।

উষ্ণতাভেদে বীজাণুর ক্রিয়া

দুগ্ধস্থ শর্করাভাগ পূর্ব্ব প্রকারে দুগ্ধাম্লে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে অম্লের মাত্রা যখন একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে পৌছিবে, তখন দুগ্ধ জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিবে। পূর্ব্বোক্ত কারণেই দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে বায়ুর স্বাভাবিক শৈত্য নিবন্ধন দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত হইতে অধিক সময় লাগে; কারণ উক্ত অবস্থায় বীজাণু-সমূহ দ্রুত ভাবে কাজ করিতে পারে না। এই কারণেই আমাদের দেশে শীতকালে দধি প্রস্তুত করিতে হইলে, যে পাত্রে দধি প্রস্তুত হইতেছে, গোয়ালাগণ উহা চুল্লীর নিকটে রাখিয়া দেয়, অথবা লেপ কম্বল প্রভৃতি দ্বারা ঢাকিয়া উহাকে শৈত্যের সংস্পর্শে আসিতে দেয় না। শীতকালে দধি প্রস্তুত হইতে অন্ততঃ বার ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে দশ ঘণ্টায়ই উত্তম দধি প্রস্তুত হয়। থরনার (Thorner) দেখাইয়াছেন যে ১০০ একশত ভাগ দুগ্ধে অন্ততঃ ২০৭ ভাগ দুগ্ধাম্ল থাকিলে দুগ্ধ জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করিবে। দধি প্রস্তুত হইবার কারণ এই যে, অম্ল বর্ত্তমান থাকাতে দুগ্ধস্থ যে কেসিন (Casein) বা ছানা

দধি

ভাগ পূর্ব্বে দ্রব অবস্থায় ছিল, উহা চাপ বাঁধিয়া যায়। দুগ্ধস্থ চর্ব্বিভাগের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, শর্করাভাগ আংশিকরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া দুগ্ধাম্লরূপে (Lactic acid) থাকে। নিম্নে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও বিশুদ্ধ দধির বিশ্লেষণ-ফল দেওয়া গেল:—

বিশুদ্ধ দুগ্ধ				বিশুদ্ধ দধি	
প্রতিদ (Proteid)—	শতকরা	৪·২৮ ভাগ	...	শতকরা	৪·৭৭ ভাগ
চর্ব্বি (Fat)—	,,	৩·২৫ ভাগ	...	,,	৩·৫৭ ভাগ
দুগ্ধ শর্করা—	,,	৩.৯ ভাগ	...	,,	২·৮ ভাগ
দুগ্ধাম্ল (Lactic acid)	,,	০ ভাগ	...	,,	·৪ ভাগ
ধাতব পদার্থ	,,	·৯৮ ভাগ	...	,,	·৬২ ভাগ
জল	,,	৮৭·৩৪ ভাগ	...	,,	৮৭·৮৬ ভাগ
	মোট	১০০ ভাগ	...	মোট	১০০ ভাগ

দধি বীজাণু আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী নহে। যে দধিতে দধি-বীজাণু ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকার বীজাণু নাই, তাহাকেই বিশুদ্ধ দধি বলা যাইতে পারে। দোহনের পর দুগ্ধ রাখিয়া দিলে দধি-বীজাণুর সঙ্গে সঙ্গে বায়ুস্থ অন্য প্রকার বীজাণু-সমূহ দুগ্ধকে আক্রমণ করিবে। তন্মধ্যে কোন প্রকার রোগবাহক বীজাণুও থাকিতে পারে। ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত বিষাক্ত বীজাণুও বর্ত্তমান থাকিবে। অসিদ্ধ দুগ্ধজাত দধি আমাদের কোন মতেই ব্যবহার করা উচিত নহে। দুগ্ধকে সিদ্ধ করিলে কোন প্রকার বীজাণু থাকিতে পারে না। বায়ুর সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিতে পারিলে ঐরূপ দুগ্ধকে যতদিন ইচ্ছা অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। ইহাই দুগ্ধ সংরক্ষণ প্রণালীর মূলসূত্র। বীজাণু-সমূহ দুগ্ধকে আক্রমণ না করিলে দুগ্ধের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। কাযেই বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুত করিতে হইলে. দুগ্ধকে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া অল্প গরম থাকিতে উহাতে দধি-বীজাণু ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইয়ুরোপে দধি বীজাণুর (Lactic acid bacilli) এক প্রকার বটিকা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, এবং দধি প্রস্তুত করিবার জন্য সাধারণতঃ উহাই ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে দুগ্ধ সিদ্ধ হইবার পর তৎসঙ্গে অল্প পরিমাণে পুরাতন দধি "সাজা" দেওয়া হয়; অর্থাৎ, পুরাতন দধিতে যে জীবাণু ছিল, তাহা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। অনেক স্থলে কোনরূপ "সাজা" ব্যবহার না করিয়া, পূর্ব্বে যে পাত্রে দধি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেই পাত্র ধৌত না করিয়া পুনরায় তাহাতেই দধি প্রস্তুত করা হয়। পুরাতন দধি হইতে যে দধি-বীজাণু পাত্র-গাত্রে সংলগ্ন ছিল, উহারা ক্রিয়া আরম্ভ করে। কখনও বা পুরাতন দধি-পাত্র-ধৌত জল "সাজা" রূপে ব্যবহৃত হয়। শেষোক্ত কোন প্রকার প্রণালীই বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। তাহার

প্রচলিত দধি প্রস্তুত প্রণালী

কারণ এই যে, পুরাতন দধি-পাত্রে বা তৎ-ধৌত জলে বায়ু হইতে অন্যান্য প্রকার বীজাণুও সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারে ; অতএব উহা হইতে যে দধি প্রস্তুত হইবে, তাহা কখনও বিশুদ্ধ হইবে না। বিশেষতঃ দুগ্ধে দধি-বীজাণু ব্যতীত অন্য কোনও ক্ষতিকারক বীজাণু থাকিলে উত্তম দধি প্রস্তুত হইতে পারে না। যে দধি বিশুদ্ধ নহে তাহা খাওয়া অনুচিত।

বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুত প্রণালী

নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে বিশুদ্ধ দধি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। দধি প্রস্তুত করিবার পাত্র ফুটন্ত জলে (boiling water) উত্তম রূপে ধৌত করিয়া লইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পাত্র-গাত্রে, কোন বীজাণু সংলগ্ন থাকিলে ঐ প্রক্রিয়ায় ইহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অপর একটি পাত্রে দুগ্ধের সহিত কিছু জল মিশাইয়া উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধের পূর্ব্বের আয়তনের সমান করিতে হইবে। উক্ত দুগ্ধ পূর্ব্বোক্ত পাত্রে ঢালিয়া তৎসঙ্গে এক চামচ পরিমাণ বিশুদ্ধ পুরাতন দধি মিশ্রণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে ঢাকিয়া উষ্ণ স্থানে রাখিয়া দিবে। এইরূপ করিলে ৮ ১০ ঘন্টার মধ্যেই উত্তম দধি প্রস্তুত হইবে। চামচ টিকেও ব্যবহারের পূর্ব্বে গরম জলে দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করা উচিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দুগ্ধস্থ শর্করাভাগ দুগ্ধাম্লে পরিবর্ত্তিত হইয়া দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করে। দুগ্ধাম্ল ছাড়া অন্যান্য অম্লও উক্ত ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে। অনেক সময় দুগ্ধে একটু তেঁতুল ফেলিয়া দধি প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু উত্তম ও উপকারী দধি পাইতে হইলে দধি-বীজাণু ব্যবহার করাই শ্রেয়ঃ। তাহার কারণ এই যে, উক্ত বীজাণু সমূহের প্রক্রিয়া দ্বারা যে অল্প পরিমাণ দুগ্ধাম্ল প্রস্তুত হয়, উহাতে আমাদের পরিপাক-কার্য্যের যথেষ্ট সাহায্য হয়।

দধিতে কেসিন বা ছানার ভাগ জমাট অবস্থায় থাকা হেতু দধি পরিপাক করিতে দুগ্ধ অপেক্ষা কিছু অধিক সময় লাগে। দধিতে দুগ্ধাম্লের মাত্রা অধিক হইলেও পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় ; এবং তাহা হইতে সর্দ্দি, কাশি, বেদনা প্রভৃতি অম্লজনিত রোগও হইতে পারে।

দধির গুণ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দধি পরিপাক-ক্রিয়ার সাহায্য করে। ইহা ছাড়া দধির আরও একটি বিশেষ গুণ আছে। বীজাণুতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদিগের মতে, ৪০ বৎসর বয়সের পর মনুষ্যের অন্ত্রমধ্যস্থ জীবাণুসমূহের সংখ্যা ও কার্য্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে ; এবং উহারা ভুক্তদ্রব্যস্থ পচনশীল প্রতিদ (proteid) ভাগকে আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই পরাক্রমশালী হইয়া পড়ে ; এবং যখন আমাদের শরীরে কোন প্রকার পীড়া হয়, তখন এই সকল জীবাণু-সমূহ দ্রুতভাবে বৃদ্ধি পাইয়া নানাপ্রকার

রোগের বিষ উৎপাদন করে। অধ্যাপক মেচ্‌নিকফ্‌ (Metchni koff) এর মতে, মনুষ্যের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রমধ্যে এ সকল জীবাণুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং উক্ত বিষদ্বারা জর্জ্জরিত হওয়াতে, মানব-দেহে বার্দ্ধক্যজনক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। উক্ত অধ্যাপক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্তবার্দ্ধক্য আনয়নকারী জীবাণু-সমূহের বৃদ্ধি ও কার্য্যকরী ক্ষমতা দুগ্ধাম্ল (lactic acid) দ্বারা আংশিকরূপে প্রতিহত হইতে পারে। এই স্থলে মনে হইতে পারে যে, নিয়মিতরূপে দুগ্ধাম্ল (lactic acid) বাজার হইতে ক্রয় করিয়া সেবন করিলে, এই সকল দেহধ্বংসকারী জীবাণু-সমূহের আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা করা যাইতে পারে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বিশুদ্ধ লেকটিক এসিড্‌ সেবন করিলে তাহা অন্ত্রমধ্যে যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত জীবাণুসমূহ রাজ্য বিস্তার করিয়া শরীরের ধ্বংসসাধন করিতেছে ততদূর পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া পাকস্থলীর মধ্যেই রহিয়া যায়, এবং কাযেই ঐ জীবাণু-সমূহের উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না। কিন্তু উক্ত জীবাণু-সমূহের আবাসস্থানে যদি দুগ্ধাম্ল প্রস্তুত করান যায়, তাহা হইলে উহা জীবাণু-সমূহকে সহজেই আক্রমণ করিয়া উহাদের কার্য্যকরী ক্ষমতা কতক পরিমাণে নাশ করিয়া দিতে পারে। অধ্যাপক মেচ নিকফ্‌ দেখাইয়াছেন যে, বিশুদ্ধ দধি ভোজন দ্বারা এই কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। কারণ দধি ভোজন করিলে তন্মধ্যস্থ দুগ্ধাম্ল বীজাণুসমূহও (lactic acid bacilli) তৎসহ অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিবে এবং ঐস্থানে দধিস্থ অবশিষ্ট শর্করাভাগকে দুগ্ধাম্লে পরিণত করিবে। এই দুগ্ধাম্ল অন্ত্রমধ্যস্থ দেহক্ষয়কারী জীবাণু সমূহের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া অকালবার্দ্ধক্য ও অন্যান্য বিবিধ প্রকারের রোগ হইতে শরীরকে রক্ষা করে।

দধির গুণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, নিয়মিতরূপে বিশুদ্ধ দধি ভোজন করিলে অকাল বার্দ্ধক্য এবং বিবিধ প্রকার রোগের হস্ত হইতে কতক পরিমাণে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক মেচ্‌নিকফ্‌ ও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রত্যহ দুগ্ধাম্ল বীজাণু অন্ত্রমধ্যে প্রবেশ করাইলে, অর্থাৎ প্রত্যহ বিশুদ্ধ দধি ভোজন করিলে, মনুষ্য দীর্ঘজীবি হয় এবং ইন্দ্রিয়সকল সবল ও কার্য্যক্ষম থাকে। মেচ্‌নিকফ্‌ বুলগেরিয়া (Bulgaria) প্রদেশের অধিবাসীগণের আয়ুসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া উক্ত সত্য প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত ইউরোপের মধ্যে বুলগেরিয়াতেই দধির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলন এবং উক্ত প্রদেশের অধিবাসীবর্গ প্রত্যহ অন্যান্য আহার্য্য দ্রব্যের সঙ্গে অল্পাধিক মাত্রায় "টক দুগ্ধ" (বা দধি) পান করিয়া থাকে। সমগ্র বুলগেরিয়াতে ত্রিশ লক্ষ লোকের বাস; তন্মধ্যে ১০ জনের বয়স ১২৫ এর অধিক, ৮৮ জনের বয়স ১২০ হইতে ১২৫ এর

নিয়মিত দধিভোজন দীর্ঘজীবন-লাভের উপায়

মধ্যে, ২৩৪০ জনের বয়স ১১০ এর উপর। পৃথিবীতে বুলগেরিয়া সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবি মনুষ্যের দেশ। অনেক বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস যে, ঐ দেশের অধিবাসীগণ প্রত্যহ দধি ভোজন করে বলিয়াই তাহারা এত দীর্ঘজীবি হয়। মেচ্নিকফের উক্ত আবিষ্কারের পরে ইউরোপে দধিভোজনের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে, এবং অনেকেই নিয়মিতরূপে প্রত্যহ দধিভোজন আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত, যে বিশুদ্ধ দধিই উপকারী।

কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজের জীবাণুতত্ত্বের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বুলগেরিয়া প্রদেশে যে দধি-বীজাণু দুগ্ধকে দধিতে পরিণত করে এবং দুগ্ধাম্ল প্রস্তুত করে, তাহা হইতে আমাদের দেশীয় দধি-বীজাণু সম্পূর্ণ পৃথক এবং অধিকতর ক্ষমতাশালী।

আমাদের দেশের দধিবীজাণুর শ্রেষ্ঠতা

বুলগেরিয়ার দধি-বীজাণুর তুলনায় ইহারা প্রায় দ্বিগুণ দুগ্ধাম্ল প্রস্তুত করিতে পারে; কাজেই দ্বিগুণ তেজে অনিষ্টকারী বীজাণু-সমূহকে ধ্বংস করিতে থাকে। অর্থাৎ শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে আমাদের দেশের দধি ইউরোপীয় দধি অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, এদেশে দধি-বীজাণুর সহিত মিশ্রিত হইলে বিসূচিকার বীজাণু ১২ ঘণ্টায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং একদিন পর তাহাদের চিহ্নমাত্রও থাকে না। সান্নিপাত জ্বরের (Typhoid) বীজাণু দধির সহিত মিশ্রিত হইলে ৪৮ ঘণ্টায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দধিস্থিত কেসিন ভাগ জমাট অবস্থায় থাকা হেতু আমাদের পক্ষে, বিশেষতঃ রোগীদের পক্ষে, উহা পরিপাক করা কিঞ্চিৎ কষ্ট সাধ্য।

ঘোল

এইরূপ স্থলে দধির পরিবর্ত্তে ঘোল বা মাঠা ব্যবহার করা যাইতে পারে। ঘোলেও দধি বীজাণু থাকে। পেটের পীড়াতে ঘোল পরম উপকারী। কিন্তু একান্তই দধি ব্যবহার করিতে হইলে তৎসঙ্গে উত্তমরূপে জল মিশাইয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া উচিত।

ইয়ুরোপে অল্পদিন যাবৎ দধির গুণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে দধির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক ভোজ-ব্যাপারে দধি একটি প্রধান উপকরণ। বঙ্গদেশে বিভিন্ন স্থানে অতি উৎকৃষ্ট দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকা জেলায় গজারিয়া, তিল্লি, সুয়াপুর প্রভৃতি স্থানের দধি বিখ্যাত। প্রত্যেক জেলায় দধি প্রস্তুত প্রণালীতে অল্পাধিক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। বাজারের দধিতে অনেক অনিষ্টকারী বীজাণু থাকে। দধিপ্রস্তুত বিষয়ে এ দেশের গোয়ালাগণের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

হিন্দুশাস্ত্রমতে দধির গুণ

হিন্দু শাস্ত্র মতে দধির গুণ—"উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, স্নিগ্ধ, কষায়, গুরু, অম্লবিপাক, ধারক, রক্তপিত্তকারক, শোথ-নাশক মেধাবর্দ্ধক, কফপ্রদায়ক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতক নামক বিষম জ্বর, অতিসার, অরুচি, ও কৃশতার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী।"

প্রকারভেদে দধির গুণ

ভাব-প্রকাশের মতে দধি পাঁচ প্রকার যথা ঃ—(১) মন্দ দধি—"যে দুগ্ধ বিকৃত হইয়া কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়, অথচ অব্যক্তরস, অর্থাৎ সম্যক্ দধিরূপে পরিণত হয় নাই, এই জন্য আপনা হইতেই স্বীয় রস বিহীন হয়, তাহাকে মন্দ দধি বলে। ইহার গুণ—মল ও মূত্র নিঃসারক এবং ত্রিদোষজনক। (২) স্বাদু দধি—যে দুগ্ধ সম্যক্ গাঢ় হইয়া অতিশয় মধুর রস যুক্ত হয়, অম্লরস অনুভব হয় না, তাহাকে স্বাদু দধি কহে। ইহার গুণ—অত্যন্ত অভিষ্যন্দী, শুক্রজনক, মেধাবর্দ্ধক, কফকারক, বায়ুনাশক, মধুর, বিপাক এবং রক্তপিত্তের দোষনাশক। (৩) স্বাদ্বম্লদধি—যে দুগ্ধ গাঢ় হইয়া ঈষৎ কষায়যুক্ত, মধুর অম্ল স্বাদ হয়, তাহাকে স্বাদ্বম্ল দধি বলে। ইহার গুণ দধির সামান্য গুণের ন্যায়। (৪) অম্ল-দধি—যে দধি মধুরতা-বিহীন হইয়া অম্ল রস পায়, তাহাকে অম্ল দধি কহে। ইহার গুণ—অগ্নিসন্দীপক, রক্তপিত্তবর্দ্ধক, ও কফবর্দ্ধক। (৫) অত্যম্ল দধি—যে দধি দ্বারা দন্তহর্ষ, রোমহর্ষ, কণ্ঠাদিতে দাহ উৎপন্ন হয় তাহাকে অত্যম্ল দধি কহে। ইহার গুণ—অগ্নিদীপ্তিকারক ও রক্তপিত্তজনক।"

সুশ্রুতের মতে দধি সাত প্রকার—যথা স্বাদু, অম্ল, অত্যম্ল, মন্দজাত, পক্বদুগ্ধজাত, দধিরস, ও অসার। পক্বদুগ্ধ জাত দধি—পক্ব দুগ্ধ হইতে যে দধি হয়, তাহার গুণ—রুচিকারক, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত গুণকারী, পিত্ত ও বায়ু নাশক এবং ধাত্বাগ্নি সমূহের বলকারক। দধিরস—দধি মস্তু অর্থাৎ, দধি-নিসৃত জল তৃষ্ণা ও ক্লান্তি নাশক, লঘু, শরীরের দ্বার শোধনকর, অম্ল, কষায়, মধুর, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, কিন্তু তেজোবর্দ্ধক নহে। অসার দধি—দধি অসার হইলে (উহাতে চর্ব্বি জাতীয় ভাগ না থাকিলে—অর্থাৎ, টানা দুধের দধি হইলে), উহা রুক্ষ, মলরোধক, বায়ু বর্দ্ধনকর, লঘু, কষায় ও রুচিকর হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে হেমন্ত, শিশির ও বর্ষা এই তিন ঋতুতে দধি-ভোজন প্রশস্ত, এবং রাত্রে দধি-ভোজন নিষেধ।

অত্যম্ল দধির দোষ

বিশুদ্ধ দধির যে বিশ্লেষণ-ফল দেওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, তাহাতে কেবল মাত্র শতকরা ৪ ভাগ দুগ্ধাম্ল আছে, এবং অবশিষ্ট শর্করাভাগের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। ঐরূপ দধি উৎকৃষ্ট। অনেক দধিতে শতকরা ৮ ভাগ পর্য্যন্ত

দুগ্ধাম্ল থাকে। অত্যধিক অম্ল থাকা হেতু ঐরূপ দধির অহিতকর গুণ দর্শায় সুতরাং অত্যম্ল দধি ভোজন করা উচিত নহে।

দুগ্ধাম্ল বীজাণু দ্বারা দুগ্ধে কি কি পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহার আলোচনা করা গিয়াছে। আর এক জাতীয় বীজাণু দুগ্ধস্থ বিউটরিন (Butyrin ভাগকে আক্রমণ করিয়া ইহাকে আংশিকরূপে বিউটিরিক অম্ল নামক অম্লে পরিবর্ত্তিত করে। উক্তরূপ পরিবর্ত্তনকে বিউটিরিক অম্লসন্ধান (Butyric Acid Fermentation) বলা হয়। বিউটিরিক অম্লবীজাণুর ক্রিয়া প্রায় দুগ্ধাম্ল বীজাণু ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়; কিন্তু প্রথমতঃ অতি মৃদু ভাবে ক্রিয়া হয় বলিয়া উহা বিশেষ লক্ষিত হয় না। দুই দিন পর উহাদের ক্রিয়া অতি প্রবল ভাব ধারণ করে, এবং তখন দুগ্ধে এক প্রকার দুর্গন্ধ ও ক্ষারস্বাদ জন্মিয়া থাকে। সাধারণতঃ উহাকে "পচা" দুগ্ধ বলে। বিউটিরিক-অম্ল বীজাণুসমূহ অপকারী না হইলেও, পচা দুধ কখনও পান করা উচিত নহে।

পচা দুধ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, দুগ্ধস্থ শর্করাভাগকে দুগ্ধাম্লে পরিণত করিতে পারে, দুগ্ধাম্লবীজাণু ব্যতিরেকে এমন আরও কয়েক প্রকার বীজাণু দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া থাকে। যখন দুগ্ধ কেবল দুগ্ধাম্ল বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন দুগ্ধ-শর্করা হইতে দুগ্ধাম্লের সঙ্গে সঙ্গে কোনও মদ্যসার বা সুরাসারের (alcohol) উৎপত্তি হয় না। দুগ্ধ যখন অন্য কয়েক প্রকার বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে সন্ধিত হয়, তখন দুগ্ধ শর্করাভাগ কেবল দুগ্ধাম্লে পরিবর্ত্তিত না হইয়া অল্পাধিক মাত্রায় সুরাসারেও পরিবর্ত্তিত হয়। এই প্রকারে সুরাসারের উৎপত্তিকে সুরাসার সন্ধান (Alcoholic Fermentation of milk) বলা হইয়া থাকে। দুগ্ধস্থ শর্করাকে বিশেষ ভাবে এবং সহজেই সুরাসারে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, ডুক্লে (Duclaux) এবং কেসার (Kayser) এইরূপ কয়েক প্রকার বীজাণু আবিষ্কার করিয়াছেন।

দুগ্ধ-সুরা

পনীর প্রস্তুত কালে দুগ্ধস্থ চর্ব্বিভাগ ও প্রতিদ্ ভাগই ব্যবহৃত হয়। শর্করাভাগ পরিত্যক্ত জলীয় অংশে পড়িয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত বীজাণু দ্বারা ঐ জলীয় ভাগকে সন্ধিত করিয়া উৎকৃষ্ট "দুগ্ধসুরা" (Whey Wine) প্রস্তুতের চেষ্টা হইতেছে। যুক্তরাজ্যে প্রতি বৎসর পনীর প্রস্তুতের জন্য ২২,৪০,০০,০০০ গ্যালন বা ২,৮০,০০,০০০ মণ দুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত দুগ্ধস্থ জলীয় অংশের কিঞ্চিৎ ভাগ দুগ্ধশর্করা (Milk of sugar) প্রস্তুতের জন্য, এবং অবশিষ্ট ভাগ শূকরের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। এই জলীয় অংশকে সুন্দররূপে "দুগ্ধসুরাতে" পরিবর্ত্তিত করিতে পারিলে

একটী নূতন ব্যবসায় প্রচলিত হইবে। "দুগ্ধসুরা"তে শতকরা ৩ হইতে ৪ ভাগ পর্য্যন্ত প্রকৃত সুরাসার থাকে। বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ দধিতে কোন সুরাসার থাকে না।

তাতারগণ অতি প্রাচীনকাল হইতে দুগ্ধ হইতে কৌমিষ (Koumiss) নামে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কৌমিষ সাধারণতঃ ঘোটক বা উষ্ট্রদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। দশ ভাগ সদ্যঃ উষ্ট্র দুগ্ধের সহিত অল্প পরিমাণ চিনি মিশ্রিত করিয়া এক ভাগ পুরাতন বা অম্লস্বাদবিশিষ্ট (অতএব সন্ধিত) দুগ্ধ মিশাইয়া কয়েকঘণ্টা নাড়িয়া তাতারগণ উত্তম কৌমিষ সুরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। কৌমিষ সুরাতে শতকরা ১·৫ ভাগ হইতে ২ ভাগ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ সুরাসার থাকে। মাখন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে এইরূপ গো-দুগ্ধের সহিত কিঞ্চিৎ চিনি মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত বীজাণু দ্বারা সন্ধিত করিলে, অবিকল কৌমিষের ন্যায় এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করা যায়। ইহা শিশুদিগের পক্ষে উৎকৃষ্ট বলকারক খাদ্য।

ককেশাস্ প্রদেশে গো-দুগ্ধকে চর্ম্মনির্ম্মিত থলিয়াতে পুরিয়া সন্ধিত করিয়া "কেফির" নামক এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও মতে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে "কেফির" উৎকৃষ্ট কায করে। নিম্নে বিশুদ্ধ কৌমিষ্ ও কয়েক প্রকার প্রচলিত সুরার বিশ্লেষণ-ফল দেওয়া গেল :—

	১০০ ভাগে চর্ব্বির অংশ	১০০ ভাগে প্রতিদের অংশ	১০০ ভাগে শর্করার অংশ	১০০ ভাগে দুগ্ধাম্লের অংশ	১০০ ভাগে সুরাসারের অংশ	১০০ ভাগে জলের অংশ
বিশুদ্ধ দুগ্ধ	৩.৮	৪.৮	৪.১	০	০	৮৭.৩
কৌমিষ সুরা	২.০৫	১.১২	২.২০	১১.৫	১.৭৫	৯১.৮৩
কেফির সুরা	২.০	৬.৮	২,০	০.৯	০.৮	৮০.৪৯
উৎকৃষ্ট ব্রাণ্ডি (এক্সা নং ১)	......	......	......	......	৫১	......
পোর্ট মদ	......	......	......	......	১৮—২০	......
(বীয়ার Beer)	......	......	......	......	৫—৬	......
শ্যাম্পেন্ মদ্	......	......	......	......	১৫—২০	......

এই বিশ্লেষণ-ফল হইতে দেখা যায় যে, অন্যান্য প্রচলিত সুরার তুলনায় দুগ্ধ-সুরাতে বিশুদ্ধ সুরা-সারের অংশ অতি কম। কাজেই অন্যান্য সুরার ন্যায় দুগ্ধসুরার মাদকতা নাই; অথচ ইহা অতিশয় বলকারক এবং তেজোবর্দ্ধক।

দধির গুণ নানামুখে ব্যাখাত হওয়ায় এবং ইউরোপীয়গণ পর্য্যন্ত দধি ব্যবহারে প্রবৃত্ত বলিয়া আজ কাল আমাদের দেশে অনেকেই অত্যধিক দধি ব্যবহারে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু দধি ব্যবহারের বিধি আছেঃ—রাত্রে দধি ব্যবহার করিতে নাই, দধি ঘৃত কিম্বা শর্করা সংযোগে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমলকীর রস কিম্বা মুগের যূপ সংযোগে দধি ব্যবহারে অনেক উপকার দর্শে, উষ্ণ দধি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

ন নক্তং দধি ভুঞ্জিত ন চাপ্য ঘৃতশর্করম্।
নামদগযূপং, নাক্ষোদ্রং, নোঞ্চং, নামলকৈর্বিনা॥

কিন্তু শাস্ত্রে বলে বিষমজ্বরে, কুষ্ঠব্যাধিতে, উন্মাদরোগে, সেবা হইলে বিধি অতিক্রম করিয়াও দধি পান করিবে।] কৃঃ সঃ (ক্রমশঃ)

সরকারী কৃষি সংবাদ

ইংলণ্ড রাজ পরিবারের উদ্যান প্রিয়তা—

রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড তাঁহার পিতার মত বিশেষ প্রকার উদ্যান পরিচর্য্যায় রত ছিলেন। এডোয়ার্ডের মাতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া উইনসোর এবং বাগশোরানে দুইটি ক্ষেত্রের বিশেষ তত্বাবধান লইতেন এবং তথাকার উৎপন্ন সব্জী যাহাতে প্রদর্শনীতে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হয় তজ্জন্য তাঁহাকে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতে দেখা যাইত। তাঁহার স্বামী উদ্যান পালনে বিশেষজ্ঞ এবং তাঁহার যত্নে উইনসোর ক্ষেত্রের পরিসর অনেক বাড়িয়া যায় ও কালে উক্তক্ষেত্রে ফল, ফুল, সব্জী, বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত হইতে থাকে। উইনসোর ক্ষেত্রের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল, তাহার জল প্রণালী সমূহ ও ক্ষেত্র বিভাগের বন্দোবস্ত দেখিলে সহজে অনুমান করা যায় যে তিনি উদ্যান চর্য্যায় স্বভাবতঃ পারদর্শী।

রাজা এডোয়ার্ড সান্‌ড্রিংহাম ক্ষেত্রটি পাইয়া উদ্যানের আর একটি নূতন শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যান। গবাদি গৃহপালিত পশুকুলের নিজ ক্ষেত্রে বংশোন্নতির সুব্যবস্থা করিয়া যান। এই ক্ষেত্রটিতে যেমন কাজের মত কাজ হইত, তেমন ক্ষেত্রটির শোভা বর্দ্ধনের জন্যও বিশেষ যত্ন লওয়া হইত। তৎকালে উক্ত ক্ষেত্র, কি শোভায় কি কাজে আদর্শ ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড স্বহস্তে

অনেক কার্য্য করিতেন। বাগানের কোন স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তিনি স্বহস্তে নক্সা সংশোধন করিয়া দিতেন। ক্ষেত্রের সুদূর প্রান্তে কোথাও একটু রাস্তা করিতে হইবে বা কোথাও একটু বেড়া দিতে হইবে তাহা নিজে তত্ত্বাবধান করিতে ছাড়িতেন না।

উইন্‌সোর ক্ষেত্র সংলগ্ন 'স' ফার্‌মে মেষ গবাদির এরূপ বংশোন্নতি হইয়াছিল যে, সেই পশুগুলি যে কোন প্রদর্শনীক্ষেত্রে উচ্চ রকম সম্মান পাইত। ব্রিটিস্ সাম্রাজ্যের উপনিবেশ সমূহে এই সকল পশু তথাকার স্থানীয় পশুকুলের বংশোন্নতির জন্য প্রেরিত হইত ও গ্রেটবিটনে বহুতরক্ষেত্রে ঐ পশুকুল বিশেষ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে।

উইন্‌সোর দুর্গ সংলগ্ন একটি গোশালাও ছিল। তাহা হইতে রাজ পরিবারের দুধ, মাখন, ছানা সরবরাহ হইত। এই গোশালার গরুগুলি সব বাছাই, সব উৎকৃষ্ট। জেরসি ব্রীডের গরুর অদ্যাপিও বহু খ্যাতি আছে। এই গোশালায় শুকরও স্থান পাইয়াছিল, তবে শুকরের সংখ্যা অধিক ছিল না।

সান্‌ড্রিংহাম ক্ষেত্রের গো-পালের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ১৮৯৭ সালে একটি পশু প্রদর্শনীতে উক্ত ক্ষেত্রের একটি ষণ্ডকে প্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। এমেরিকায় একজন গোপালক এই ষণ্ডটি এক সহস্র গিনি মূল্যে খরিদ করিয়া স্বদেশে লইয়া যায়। আয়ার্‌ল্যাণ্ড দেশে ছোট ছোট গাভীগুলি এবং জেরসি ব্রীডের গোরুগুলি গো-শালার পক্ষে যে অতি আবশ্যক তাহা প্রতিপন্ন হয়।

গাভী, বলদ, ষণ্ড ব্যতীত তথায় ঘোড়া ও ভেড়াও প্রতিপালিত হইত। গুরুভার-বাহী শকট টানিবার ঘোড়ার প্রতি সপ্তম এডোয়ার্ডের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার ক্ষেত্রের শকট টানা ঘোড়াগুলি ঐ কার্য্যের বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত। এখানকার অশ্বশালা হইতে ঘোড়া, প্রদর্শনীতে পারিতোষিক এবং বিশিষ্ট আদর পাইত। এই ক্ষেত্র প্রতিপালিত মেষকুল ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ক্রমান্বয়ে প্রদর্শনী আদিতে শীর্ষস্থান প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে।

[বর্ত্তমান রাজা ও রাণী উদ্যানচর্য্যায় তাঁহাদেরই পথানুসরণ করিতেছেন এবং রাজকীয় ক্ষেত্র সমূহ তাঁহাদের নিজ তত্ত্বাবধানে ফল, পুষ্পে সুশোভিত। এই ক্ষেত্র সমূহের আয়ও আছে। ইহাতে প্রতিপালিত অশ্ব, মেষ, গবাদি হইতেও আয় হইয়া থাকে। ভারতের রাজা রাজোয়ারারা ঠিক এরূপ ভাবে উদ্যানচর্য্যায় রত নহেন। তাঁহাদের উদ্যান সমূহ পরের হাতে ন্যস্ত হয়, এই কারণে খরচ বিস্তর কিন্তু আয় হয় না এবং স্বচক্ষে দেখিয়া কোন কাজ করা যেন তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ নহে।] কৃঃ সঃ

গোশালা-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী—

১। গবাদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। তাহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ভৃত্যগণের শারীরিক ও পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক। গবাদির বাসস্থান সুপরিষ্কৃত থাকিবে। তথাকার ব্যবহারের বর্ত্তনাদিও অপরিষ্কার হইলে চলিবে না।

২। কোন প্রকার রোগগ্রস্ত—বিশেষ রোগটি সংক্রামক হইলে—তাহাকে গো-সেবায় কদাচ নিযুক্ত করিবে না।

বাসস্থান—

৩। গরু রাখিবার জন্য ঘরের আবশ্যক। ঘর ইষ্টক নির্ম্মিত বা কাঁচা হইতে পারে। গাছ তলায় বা সামান্য পর্ণাচ্ছাদনের নিম্নে গরু রাখা চলে না।

৪। গো গৃহে বায়ু চলাচলের জানালা চাই, তাহাতে আলো প্রবেশের পথ চাই। মেজেটি দৃঢ় ও মজবুত করিয়া নির্ম্মিত হইবে এবং মুত্র ও জলাদি বাহির হইবার পয়োনালা থাকিবে।

৫। গাভীগণকে শুইতে দিবার জন্য মলমূত্র লাগা বা ভিজা পাতুঞ্চে তৃণ ব্যবহার করিতে দিবে না।

৬। কোন প্রকার উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য গো-গৃহে রাখিবে না। গোবর যতবার সম্ভব সরাইয়া সারগর্ত্তে ফেলিবে। সার গর্ত্তটি গো-গৃহ হইতে কিছু অন্তর হইবে।

৭। পাকা ঘর হইলে গো-গৃহ বৎসরে দুইবার করিয়া কলিচুণ ফিরাইয়া লইবে। পয়োনালাগুলিতে সিমেণ্টের পলস্তারা থাকা আবশ্যক।

৮। দুধ দোহনের অব্যবহিত পূর্ব্বে গরুকে শুষ্ক খোসা ভুসি খাইতে দিবে না, কারণ তাহাতে ধুলা থাকে। ঐ ধুলা গরুর গাত্রে বা মুখে লাগিয়া তাহা দুধ দোহনের সময় দুধে পড়িতে পারে। ঐ প্রকার বস্তু খাওয়াইতে হইলে তাহা জলের ছিটা দিয়া অল্প ভিজাইয়া খাওয়ান ভাল।

৯। দুধ দোহার পূর্ব্বে গরুর ঘর সাফ করা ও ঘরে বাতাস লাগিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে ঘরের মেজেতে ঐ সময় জল ছিটাইতে হয়।

১০। গরুর ঘরত সাফ্ থাকিবেই, উপরন্তু দুধ যে ঘরে লইয়া জমা হইবে সেই ঘরও সুপরিষ্কৃত রাখা চাই।

গবাদির পরীক্ষা—

১১। গো-চিকিৎসকদ্বারা বৎসরে দুইবার গবাদির স্বাস্থ্য পরীক্ষা আবশ্যক।

১২। কোন গবাদির রোগাশঙ্কা হইলে তাহাকে স্থানান্তরে সরাইয়া ফেলা আবশ্যক। গবাদি ক্রয় করিয়া গোশালায় গবাদির সংখ্যা বৃদ্ধি কালে দেখিয়া লইবে

যেন নবাগত গাভীর কোন প্রকার রোগ না থাকে। বিশেষতঃ গবাদির সর্দ্দি, কাশী বা ফুসফুসের রোগ থাকিলে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

১৩। গরুগুলিকে দুধ দুহিতে বা গোয়ালে বাঁধিয়া খাইতে লইয়া যাইবার সময় তাহাদিগকে দৌড় করাইয়া লইয়া যাইবে না।

১৪। গরুগুলিকে কখন অতিরিক্ত দৌড় করাইবে না বা খুব চিৎকার করিয়া বা মারিয়া তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিবেনা বা তাহাদিগকে খুব ঠাণ্ডার সময় বা ঝড়ের সময় বাহিরে রাখিবে না।

১৫। হঠাৎ তাহাদের খাদ্যের কোন পরিবর্ত্তন করিবে না।

১৬। বেশ পেট ভরিয়া খাওয়াইতে হইবে। পচা সড়া কোন দ্রব্য খাইতে দিবে না। তাহাদের খাবার দ্রব্য বেশ মুখরোচক ও বলকারক হওয়া কর্ত্তব্য।

১৭। গবাদিকে প্রচুর জল খাওয়ান কর্ত্তব্য। জল এমন জায়গায় রাখিবে যেখানে সহজে গিয়া তাহারা জলপান করিতে পারে। সুপরিষ্কৃত টাট্‌কা জল খাওয়াইবে। খুব ঠাণ্ডা জল খাইতে দেওয়া ভাল নহে।

১৮। গোশালায় বিট্‌ লবণের চাঁই রাখা উচিত। গরুগুলি আবশ্যক মত তাহা চাটে।

১৯। পেঁয়াজ রসুনের মত কোন উগ্র গন্ধ দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে। এমন কি কপি, সালগম খাওয়াইতে হইলে তাহা দুধ দুহিয়া লইবার পরে খাওয়ান কর্ত্তব্য।

২০। গাভীগুলির সমুদয় গাত্র সুপরিষ্কৃত রাখিতে হইবে। পালানের লোম অতিরিক্ত বাড়িলে তাহা কাঁচি দিয়া ছাঁটিয়া দিতে হইবে।

২১। বাছুর হইবার ২১ দিন পরে তবে দুধ দুহিতে আরম্ভ করিবে। (ক্রমশঃ)

বঙ্গদেশে হৈমন্তিক ধান্যের আবাদ—১৯১২-১৩

বৈশাখ হইতে আব হাওয়া ধান চাষের অনুকূল। কেবল বৈশাখী অতিরিক্ত বৃষ্টি পাতে পূর্ব্ববঙ্গে ধানের বীজ বপনের একটু ব্যাঘাত জন্মিয়াছিল শ্রাবণ মাসে ধান রোপণের সময় বর্দ্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রামে একটু জলের অভাব অনুভূত হইয়াছিল। রাজসাহী এবং বগুড়াতেও বৃষ্টির অল্পতা হেতু তাদৃশ ভাল ধান হয় নাই।

বর্ত্তমান বর্ষে ধানের আবাদী জমির পরিমাণ—

প্রাদেশিক শাসন কর্ত্তাগণের অনুমান যে বর্ত্তমান বর্ষে ধানের আবাদী জমির পরিমাণ ১৫,০২৮,০০০ একর।

বিগত বর্ষের ধানের জমির পরিমাণ ১৪,৯৬৩,৯০০ একর ছিল সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বর্ত্তমান বর্ষে ৬৪,১০০ একর পরিমাণ ধানের আবাদ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু তথাপিও যাহা হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। ১৬,০৭১,৭০০ একর জমিতে ধানের আবাদ হইলে যেন পুর্ণমাত্রায় চাষ হইত।

ধান কাটা প্রায় সর্ব্বত্রই আরম্ভ হইয়াছে এবং যেরূপ দেখা যাইতেছে যে খুলনা এবং মালদহে পাঁচ সিকা, নোয়াখালিতে আঠার আনা, মেদিনীপুর ও মৈমনসিংহে সতেরো আনা, বাঙলার আর পনেরোটি জেলায় ষোল আনা, কোন কোন জেলাতে পনেরো আনা ফসল জন্মিয়াছে। রাজসাহীতে জলপ্লাবন হেতু ক্ষতি হওয়া সত্বেও বারো আনা ফসলের আশা করা যায়। ফলতঃ চাউলের বিগত বর্ষ অপেক্ষা পরিমাণ অধিক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বেহার এবং উড়িষ্যা বিভাগের বর্ত্তমানবর্ষের অগ্রহায়ণ মাসে শস্যের অবস্থা—

এই সময়ে বেহার ও ছোটনাগপুরের আবহাওয়া শীতল ছিল এবং স্বাভাবিক বৃষ্টি হইয়াছিল। পুরী এবং সম্বলপুরে বৃষ্টি এবং আবহাওয়া ঐরূপই ছিল। বেহারে হাজারিবাগ ও মানভূমে অপেক্ষাকৃত অধিক এবং পুরী, সম্বলপুর ও পালামৌয়ে অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টি হইয়াছে। এই বৃষ্টিতে রবি শস্যের উপকার হইয়াছে। যে সকল রবিশস্য বপন করা হয় নাই, তাহাও বপন করা, এবং ইক্ষু সকল কাটাই এবং মাড়াই হইতেছে। চাউলের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু নামিয়াছে। গবাদি পশুর অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। পশুখাদ্য এবং জল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে। উড়িষ্যার করদ রাজ্যে শস্য এবং গবাদি পশুর সংবাদ ভাল।

শিলচরে কৃষি—

এবার কৃষি ভাল হইয়াছে, ধান কাটা আরম্ভ হইয়াছে। চাষের অবস্থাও ভাল।

অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সাল।

ধানের আবাদ

আয়ারল্যাণ্ডবাসীর যেমন আলু, সেইরূপ ভারতবাসীর ধান খাদ্যের জন্য প্রধান সম্বল। ভারতের ৩৩ কোটী লোকের মধ্যে বোধ হয় ৩০ কোটী লোক ভাত খাইয়া থাকে। গ্রীষ্মমণ্ডলে যেখানে বর্ষার প্রকোপ আছে সেখানেই ধান চাষ হয়। ইয়ুরোপে ধান চাষ হয় না; ধান চাষ এসিয়া, এমেরিকা, জাপান, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, এবং যাভা প্রভৃতি দ্বীপে হইয়া থাকে। ধানের ফলনের অনুপাতে বলিতে হয় যে, শতকরা সিংহলে ১০, যাভায় ২০, মান্দ্রাজে ২৫, বাঙলায় ৩০, বোম্বাই প্রদেশে ৩৫, ব্রহ্মদেশে ৪০, এমেরিকায় ৫০, এবং জাপানে ৬০ পরিমাণ ধান জন্মে।

ধানের আদি জন্মস্থান এসিয়া মহাদেশ বলিয়াই বোধ হয়। এসিয়া হইতে ইহার চাষ চতুর্দ্দিকে বিস্তার লাভ করিয়াছে। বাঙলাদেশে এমন কি ভারতের অনেকেই ধানের চাষ সম্বন্ধে কিছু না কিছু কৌশল অবগত আছে। কৌশল আর কিছুই নহে—চাষীকে ভূমিকর্ষণের প্রতি নজর রাখিতে হয়, উৎপন্ন বাড়াইবার জন্য সার দিতে হয়, ভাল বীজ ধান সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়, জমিতে পরিবর্ত্ত চাষের বিধান করিতে হয়, কোন জমিতে কোন ধান জন্মিবে তাহা নির্ণয় করিতে হয়। এই সমস্তগুলি বিচার করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে কৃষকের গোলা ধানে পূর্ণ হয় এবং তাহার ধনও বৃদ্ধি হয়। ভারতের ঋষিরা ধানকেই ধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যে ধানের শীষে ২০টি ধান জন্মিত সেই শীষে যদি কেহ ৪০, ৫০ অথবা ১০০ শত ধান ফলাইতে পারে, সেই যথার্থ দেশের হিতকারী ও বন্ধু।

ধান ভারতের সর্ব্বত্র হয়। উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশেও ধান জন্মায়, সমতল বাগান জমিতেও ধান জন্মে আবার নিচু জলা জমিতেও ধান জন্মে। অতএব আমরা ধানকে উঁচু জমির ধান ও নিচু জলা জমির ধান এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে

পারি। এই দুই শ্রেণীতে যে কত প্রকারের ধান আছে তাহার গণনা করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। সব প্রকার ধানের নাম না জানিলেও চাষীমাত্রেরই কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ ধান হইবে, কিরূপ আবহাওয়ায় কোন্ ধানের বাড়বৃদ্ধি হইবে, কোন্‌টি পাহাড়িয়া ধান, কোনটি সমতল বা জলা জমিতে হইবে তাহা না জানিলে তাহার ধান চাষে বৃথা আয়াস মাত্র। পূর্ব্ব বঙ্গে এমন জলা আছে, যাহার জল আদৌ শুখায় না সেই জলাতে ধান ছিটাইয়া বুনন করিতে হয়। জল ও ক্রমশঃ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, ধান গাছও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া চলিল। ঐ সকল ধান গাছের বাড় খুব অধিক। যতই জল বাড়ুক না কেন ঐ ধান গাছগুলি জলের উপর মাথা তুলিয়া রাখিয়া তাহাদের স্বীয় প্রভুত্ব বজায় করিবেই করিবে। ঐ সকল ধান ফলিলে তাহাদের আমূল গাছ সমেত কাটা চলে না। কৃষককে বিচালি লাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ডগা কাটিয়া লইয়া সন্তুষ্ট হইতে হয়।

ধান চাষে কাল নির্ণয়ও চাই—সব ধান একই সময় হয় না। কোন কোন ধানের চাষ বর্ষা আরম্ভে আরম্ভ করা হয় এবং বর্ষার শেষেই পাকিয়া উঠে এবং কাটা শেষ হইয়া যায়, এই গুলিকে আশু বা বর্ষাতি ধান্য বলা হইয়া থাকে। অপর কতকগুলি বর্ষার সময় রোপণ করিতে হয়, হেমন্তকালে উহারা পাকিয়া উঠে। ইহাদিগকে এই কারণে হৈমন্তিক ধান বলিয়া নামকরণ করা হইয়াছে। বর্ষাতি ধানের আবাদ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ে আরম্ভ এবং ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিকে ধান গোলাজাত হয়। হৈমন্তিক ধানের আবাদ আষাড়, শ্রাবণে আরম্ভ এবং অগ্রহায়ণ, পৌষে কখন বা মাঘে শেষ হয়।

জলে যে ধান জন্মে তাহার জমি কাদা দোয়াঁস হইলেই ভাল হয়; কারণ কর্দ্দমাক্ত জমিতে জল থাকে। উঁচু জমিতে যে ধানের চাষ, তাহার জন্য দোয়াঁস এমন কি বেলে দোয়াঁস মাটিই উপযুক্ত। হালকা মাটি না হইলে ঐ ধানের বৃদ্ধি হয় না।

জমি যদি নিস্তেজ হয়, তবে উৎপাদিকাশক্তি বাড়াইবার জন্য সারের আবশ্যক। ধানের জন্য কি সারের আবশ্যক তাহা আমরা পরে বলিতেছি। উঁচু বা নিচু যে কোন ধানের জমিতে সার প্রয়োগে ধানের ফসল দ্বিগুণ বা চারিগুণ বাড়ান যাইতে পারে।

আশু ধানের মধ্যে অধিকাংশই উঁচু জমিতে হয়, দুই এক প্রকার আশু ধানের ক্ষেতে কিঞ্চিৎ জল থাকিলে ভাল হয়। আমন ধানমাত্রেই গোড়ায় জলের আবশ্যক। খুব সরু কতকগুলি পাহাড়িয়া ধান আছে, তাহারা আশু ধানের মত উঁচু জমিতেই হয়। ধান স্বভাবতঃ জলজ ঘাস কি না বা ধানের গোড়ায় জল থাকা অভ্যাস চাষের সুবিধা হেতু করিয়া লওয়া হইয়াছে কিনা তাহা এখন ঠিক

করিবার কোন উপায় নাই। ইহা কিন্তু স্থির যে ধান সরস জমি না হইলে হয় না। কোন ধানের বেশী জল কোন ধানের কম জল আবশ্যক। আবার জলেরও একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া চলা আবশ্যক সেই জন্য ধানক্ষেতে জল কমাইবার বাড়াইবার ও জল সেচনের সুবিধা করিয়া রাখিতে হয়।

ধানক্ষেতে যদি জল অধিক হয়, ধানগাছ হাজিয়া যাইতে পারে বা ক্ষেতের জল অধিক দিন বদ্ধ থাকিলে জল পচিয়া যাইতে পারে। পচা জলে ধান গাছ বাড়ে না—ধানের পাতা হলুদে হইয়া যায়। ক্ষেতে জল বাহির করিবার ও ঢুকাইবার ব্যবস্থা করিলে জল পচিতে পারে না।

যে জলা জমিতে জল বাহির করিয়া দিবার উপায় নাই—সেই ধানের ক্ষেতে হাড়-সার দিলে বিশেষ ফল দর্শে। হাড়ের গুঁড়াতে চূণ আছে। জল পচিলে অম্ল রসাত্মক হয়, চূণে এই অম্ল রস নাশ করে এবং তাহাতে গাছের অনিষ্ট নিবারণ হয়।

ধান জমি যখন শুকাইয়া যায়, তখন সেই জমিতে লাঙ্গল দ্বারা বার বার চষিয়া, সার দিয়া পুনরায় লাঙ্গল ও মই দিয়া সময় মত ধান্য চাষের জন্য ঠিক করিয়া রাখিতে হয়। জলা জমিতে সারের কার্য্য তাদৃশ উত্তমরূপে হয় না, কারণ জলে সারের সার পদার্থ অনেক পরিমাণে ইতস্ততঃ ভাসিয়া যায়, কিন্তু উঁচু বা নিচু শুষ্ক ধরণের জমিতে সার সমভাবে মাটির সহিত মিলিত হয় বলিয়া অধিকতর ফলদায়ক হয়।

ধানের ক্ষেতে তিন প্রকারের চাষ দেওয়া যায়।

(১) আশু ধানের বা উচ্চ ধানের ক্ষেতগুলিতে কোদাল বা লাঙ্গল দ্বারা মাটি তৈয়ারী করিতে হয়।

(২) একটু নিচু জমি যাহাতে বর্ষায় জল জমে কিন্তু শীতের শেষে শুখাইয়া যায়, তাহাতে কেবল লাঙ্গলদ্বারা চাষই সুবিধা জনক।

(৩) যে জমির জল কখন এককালে মরিয়া যায় না—তাহাতে জল কম থাকা কালে লাঙ্গল জুড়িয়া বলদ দ্বারা চষিয়া ও মাড়াইয়া কাদা করিয়া লইতে হয়। কাদার উপর সর পড়িয়া জমি সমতল হইয়া আসিলে তাহাতে ধান রোপণ বা ধান্য বপন করিতে হয়। ধান ক্ষেতের চারিপাশের জঙ্গল সাফ করিয়া রাখা বা ক্ষেতের আইল বাঁধিয়া ঠিক রাখা অতীব আবশ্যক। যখন যেখানে আবশ্যক সুবিধা মত জল ঢুকাইবার বা বাহির করিবার পয়োনালা রাখিতে হয়। ধানের ক্ষেত কোন বড় জঙ্গলের ধারে হইলে ক্ষেতের চারিদিকে অন্ততঃ ৩ বা ৪ হাত স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া রাখা উচিত। যেখানে বন্য শুকর, ছাগল, গরুর উৎপাত আছে সে সব স্থানে ক্ষেতে বেড়া দিয়া ঘিরিতে পারিলে ভাল হয় কিন্তু অতি বিস্তৃত ক্ষেতে বেড়া দেওয়া সহজ নহে। পাশাপাশি অনেক জমিতে একত্রে ধান চাষ হয় বলিয়া সকলেই সেই সময়ের জন্য গরু, ছাগল বাঁধিয়া ফেলে কিন্তু বন্যশূকরের হাত

হইতে নিষ্কৃতি নাই। কখন কখন তজ্জন্য ক্ষেতে পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

দ্বিতীয়বারে তত গভীর চাষের আবশ্যক নাই ৬ ইঞ্চি মাটি হইলেই হইল। এইবারে কৃত্রিম সার (Artificial manure) দিবার আবশ্যক হইলে উক্ত সার ছড়াইয়া দিয়া আবার লাঙ্গল মই দ্বারা সার মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি জমিতে জল ঢুকাইবার ও বাহির করিবার বন্দোবস্ত থাকিলে তবে সর্ব্বতোভাবে সুচারুরূপে চাষ হয়। এই সার দিবার পর জমিতে জল ঢুকাইতে হইবে, কারণ তাহা না হইলে জমি শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া যাইবে এবং জমিতে দেওয়া সারের ক্ষমতা অনেক কমিয়া যাইবে। যে সারের উদ্ভিদ মূলাদি পচাইবার এবং জমির অম্লরস নষ্ট করিবার শক্তি আছে সেই সারই বিশেষ উপযোগী। সার দিবার ১০।১২ দিন পরে একবার এবং তারপর ৫।৭ দিন পরে আর একবার চাষ দিবার আবশ্যক হয়। অতঃপর জমির জল ছাড়িয়া দিয়া জমি সমতল করিয়া, সেই নরম মাটিতে ধান্য বীজ রোপণ করিতে হইবে এবং ক্রমশঃ আবশ্যক মত জমিতে জল ঢুকাইতে হইবে।

ধান কাটা হইলে ক্ষেতে ছাগল গরু চরিতে দিতে হয়। তাহাদের মলমূত্রে জমির উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি হয়। পরে বর্ষারম্ভে জমিতে একটু জল বাঁধিয়া জমি নরম হইলেই লাঙ্গল দ্বারা জমিতে চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। এই বারের চাষে জমি অন্ততঃ ৯ ইঞ্চ গভীর কর্ষণ হওয়া আবশ্যক। এই চাষে জমিস্থিত ধানের গোড়া ও আগাছা প্রভৃতি মাটির সহিত উলটাইয়া মাটির নিম্নস্তরে পড়িয়া পচিতে আরম্ভ করে। এই সময়ের চাষের আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য, জমিতে হাওয়া না পাইলে জমিতে অম্লরসের বৃদ্ধি হইতে পারে। সেটা ধানের বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। জমিতে প্রথম চাষ দিয়া তিন সপ্তাহ সেই জমি ফেলিয়া রাখিবার বিধি আছে। বাঙলার চাষীরা একার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা প্রথমবার গভীর কর্ষণ করে এবং তাহাকে "জমি ভাঙ্গা" বলে এবং জমির "আব" বাহির হইয়া যাইবার জন্য কিছু সময় জমি ফেলিয়া রাখে।

বীজ ধানের ক্ষেত বা বীজতলার পাইটও উপরোক্ত প্রকারে করিতে হয়। জমির যে অংশ খুব তেজাল তাহাতে সারমাটি দিয়া সেই স্থানে বীজতলা প্রস্তুত করিতে হয়। কেবল চষিয়া খুঁড়িয়া জমি তৈয়ারি করিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল না। ভাল বীজ উৎপাদন করা নিতান্ত প্রয়োজন। বীজের গুণেই চাষ। বাঙলার চাষীর অধিকাংশই অলস স্বভাব। তাহারা জমি তৈয়ারি করিবার জন্য এতদূর কষ্ট স্বীকার করে না। তদুপরে তাহাদের রাসায়নিক সার প্রভৃতি জমিতে দিবার মত অর্থও নাই সুতরাং তাহারা সামান্যভাবে চষিয়া খুঁড়িয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা পায় তাহাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করে এবং এই হেতু তাহাদের দৈন্য ঘুচে না। (ক্রমশঃ)

বৃক্ষ-রোপণে উপকারীতা

নানাজাতীয় খাদ্যপ্রদ বৃক্ষ রোপণ দ্বারা কৃষিকার্য্যের সহায়তা সাধন এবং অন্যান্য যে সকল উপকার আছে, তাহারই কতকগুলি এস্থলে নির্দ্দিষ্ট হইল।

(১) গ্রীষ্মাধিক্য কমিয়া গিয়া শীত-গ্রীষ্মে ও দিবা-রাত্রিতে শীতোষ্ণতার তারতম্য অপেক্ষাকৃত হ্রাস হয়।

(২) মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত সরস থাকে।

(৩) দেশে বৃষ্টি অধিক হয়।

(৪) গভীর ভূ-গর্ভ হইতে বৃক্ষের মূল ও স্কন্ধদেশ বহিয়া, সারবান্ পদার্থ সকল রসের আকারে উর্দ্ধে উঠিয়া, পত্র সমুদায়ে বিস্তৃত হইয়া, ক্রমে ভূমির উপরিভাগে আসিয়া মিলিত হয়। বৃক্ষ জন্মাইয়া যেরূপ সহজে ভূমির উপরিভাগের স্তরকে সারবান্ করিতে পারা যায়, এরূপ অন্য কোন উপায়ে উহাকে সারবান্ করা যায় না। অর্থাৎ, বৎসর বৎসর শস্য কর্ত্তন দ্বারা যেমন কিছু কিছু সার পদার্থ ভূমি হইতে বাহির হইয়া যায়, তাহার পরিবর্ত্তে তেমনই ভূ-গর্ভ হইতে সারবান্ পদার্থ সকল বৃক্ষপত্র সহযোগে স্বতঃই ভূতলে আসিয়া পড়ে।

(৫) গাছ বড় হইয়া গেলে, অর্থাৎ রোপণের ৪ বৎসর পরে, এক বৎসর অন্তর শীতকালে প্রত্যেক গাছের কিছু কিছু শাখা ছেদন করিয়া দিলে, গাছেরও উপকার হয় এবং কৃষকও গোময় সাররূপে ব্যবহার করিয়া, ঐ সকল শাখা জ্বালাইবার জন্য ব্যবহার করিতে পারে।

(৬) বৃক্ষ হইতে যে আহার্য্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহার হ্রাস বা বৃদ্ধি কৃষকের পরিশ্রম বা মেঘের গতির উপর বিশেষ নির্ভর করে না। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দ্বারা যখন সমস্ত শস্য নষ্ট হয় তখনও খাদ্যপ্রদ বৃক্ষ হইতে খাদ্য সামগ্রী আহরণ করিতে পারা যায়।

(৭) বৃক্ষ সকল ঝঞ্ঝাবাতের প্রবল বাত্যা রোধ করিয়া অনিষ্টপাতের লাঘব করে।

(৮) বৃক্ষ দ্বারা মৃত্তিকার স্বভাব কালসহকারে পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ, নিয়স্থ শ্লথ মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কঠিন ও কঠিন মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত শ্লথ হয়।

(৯) বৃক্ষগুলি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগের স্থানে অন্য বৃক্ষ রোপণ করিয়া, বৃহদাকারের বৃক্ষগুলি ক্রমশঃ বিক্রয় করিলে, এককালে অনেক অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে; বিশেষ কোন দায় উপস্থিত হইলে, কৃষকগণ মহাজনের নিকট অর্থ ঋণ করিতে না গিয়া, অনায়াসে দুই চারিটী আম কাঁঠালের গাছ বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে।

(১০) দেশময় বৃক্ষ থাকিলে, বায়ু সঞ্চালিত হইয়া মহামারীর হেতুভূত অণু সকল, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িতে পারে না।

প্রাগুক্ত উপকারিতাগুলি সম্বন্ধে উপলব্ধি জন্মিলে, যে কৃষকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে ঐ সকল বৃক্ষ রোপণ করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। ভারতবর্ষের কৃষি উন্নতি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের পরামর্শদাতা ডাক্তার ভল্‌কার সাহেব প্রত্যেক গ্রামের সংশ্লিষ্ট এক একটী ক্ষুদ্র অরণ্য স্থাপন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। প্রত্যেক গ্রামের বহির্ভাগে কার্য্যোপযোগী বৃক্ষ রোপণ দ্বারা যদি এক একটী অরণ্য স্থাপিত হয়, তাহা হইলে যে সকল উপকারের কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত আর একটী বিশেষ উপকার এই ব্যবস্থা সহযোগে সাধিত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এ দেশে মৃত জন্তুদিগের শরীর ও শবদেহের অবস্থান সম্বন্ধে বড় অনিয়ম দেখা যায়। রক্ত, মাংস ও অস্থি উদ্ভিদের পক্ষে যেরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্যোপযোগী পদার্থ, এরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্যোপযোগী পদার্থ আর কিছুই নাই। মৃত জন্তুর শরীর ওষধিগণের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইলে, মৃত্তিকার উপরিভাগেই, অথবা অনতিনিম্নে উহাদিগের প্রয়োগ আবশ্যক হয়। এরূপ প্রয়োগ দ্বারা স্বাস্থ্যের হানি অবশ্যম্ভাবী। গ্রাম্য গো-ভাগাড়-গুলিতে মৃত জন্তুর শরীর অনাবৃত অবস্থায় মৃত্তিকার উপরিভাগেই রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা প্রত্যেক গ্রামে প্রবেশ করিবার সময়েই প্রায় দুর্গন্ধ অনুভূত হয় এরূপ দুর্গন্ধ স্বাস্থ্যনাশক। গ্রামে শবদেহ প্রোথিত করিবার বন্দোবস্তও নিতান্ত কুৎসিত। সকল জন্তুর মৃত দেহই মৃত্তিকার মধ্যে ৩।৪ হাত গভীর করিয়া প্রোথিত করা আবশ্যক। জন্তুদিগের মৃত শরীর প্রোথিত করিবার কারণ, যে কেবল স্বাস্থ্য হানির নিবারণ হয়, এরূপ নহে। ইহা অস্থি-সংরক্ষণের একটী সুন্দর উপায়। গো-ভাগাড়ে, অথবা ক্ষেত্রের উপর অস্থি সকল পড়িয়া থাকাতে, যে সে ব্যক্তি ঐ সকল কুড়াইয়া লইয়া অন্য দেশে রপ্তানি করিতেছে। অস্থির রপ্তানি দ্বারা এদেশের কৃষিকার্য্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। মৃতদেহ এরূপভাবে প্রোথিত হইলে, তৃণ, ওষধি, প্রভৃতি খর্ব্বাকারের উদ্ভিদ্ উহাদের সারভাগ গ্রহণ করিতে পারে না; কিন্তু বৃক্ষের শিকড় মৃত্তিকার মধ্যে ৩।৪ হাত ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়া, ঐ সকল সারভাগ গ্রহণ করিয়া, জন্তুগণের মৃত শরীর, পত্র ও ফলে পরিণত করিতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তরে বৃক্ষ-রোপণ ও জন্তুদিগের মৃতদেহ প্রোথিত করা, এই উভয় কার্য্যই যুগপৎ যাহাতে সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে গ্রাম্যসমিতি সকলের দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য।

কোন কোন বৃক্ষ জন্মাইতে গেলে, বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার অবলম্বন আবশ্যক করে। মেহগনির বীজের স্থূল ভাগটী মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া, সূক্ষ্ম ভাগটী মৃত্তিকার উপরিভাগে জাগাইয়া রাখিতে হয়; হিজলি বাদামের, রুটি ফলের ও

নারিকেলের চারা লাগাইবার সময়, মৃত্তিকায় লবণ প্রয়োগ করিতে হয়, ইত্যাদি। মনুষ্য ও গৃহপালিত জন্তুদিগের আহার্য্য বা নিত্য-ব্যবহার্য্য পদার্থ যে সকল বৃক্ষ হইতে আহরণ করিতে পারা যায়, কেবল সেই সকল বৃক্ষই গ্রামের বাহিরে জন্মাইবার উদ্যোগ করা উচিত। উদাহরণ স্থলে, আম কাঁঠাল, মহুয়া, জাম, খর্জ্জুর, নারিকেল, তাল, বাবুল, বেল, বাঁশ, ডুমুর, পেঁপে, লিচু, বিলাতী আমড়া, আতা, নোনা, বড় তুঁতগাছ, পঙ্গপাল সিম (Locust bean), হিজ্‌লি বাদাম ও রুটি ফলের গাছ (Bread-fruittree), এই কয়েকটী উল্লেখ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্র মধ্যে ওষধি জন্মাইয়া, কৃষকগণ শ্বেত-সার (starch), শর্করা, তৈল, শাক, সূত্র ও গৃহ-প্রস্তুতের উপাদান সকল, উৎপাদনের প্রয়াস পায়। এই সকল প্রকার পদার্থই প্রাগুক্ত বৃক্ষ সকল হইতে অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি দ্বারা ওষধি সকল নষ্ট হইয়া গেলে, বৃক্ষ হইতে এই সকল পদার্থ আহরণ করিয়া, দুর্ভিক্ষের সময় অনেকে জীবন ধারণ করিতে পারে।

সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, যে বৃক্ষ সকল কলম হইতে না জন্মাইয়া, বীজ হইতে জন্মানই কর্ত্তব্য। কলমের গাছ, যে গাছের কলম, ঠিক্ তাহারই অনুরূপ হয়। এই সুবিধাটী ব্যতীত কলমের গাছের প্রায় আর কোন সুবিধা নাই। আঁঠির আম-গাছের ফল অপেক্ষাকৃত উত্তমও হইতে পারে, অধমও হইতে পারে। মালদহ জেলার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কয়েকটী আম-গাছ আঁঠি হইতেই জন্মিয়াছে। আঁঠির গাছে ফল ধরিতে কিছু বিলম্ব হয় বটে; কিন্তু যত্ন করিলে ৫।৬ বৎসরের মধ্যেই আঁঠির গাছে ফল ধরাইতে পারা যায়। কলমের গাছে ১৫ ২০ বৎসর উত্তম ফল হইয়া, ক্রমশঃ ফলের পরিমাণ কমিয়া যায়। আঁঠির গাছে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক কাল ধরিয়া ফলোৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে। আঁঠি বা বীজ হইতে উৎপন্ন সকল প্রকার গাছ অপেক্ষাকৃত অধিক দিবস বাঁচে। এই সকল গাছ অধিক বড় হয়। উহাদের কাষ্ঠের মূল্যও অধিক। কলমের গাছ বীজ হইতে উৎপন্ন গাছ অপেক্ষা সহজে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মরিয়া যায়।

৺নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ হইতে সংগৃহিত।

মফস্বলে পানীয় জল—মফস্বলে বিশুদ্ধ পানীয় জল সংরক্ষার জন্য আমাদের পরম ভক্তিভাজন্ বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন। কেমন করিয়া মফস্বলে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ জন্য তিনি দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ লইয়া একটী কমিসনের সৃষ্টি করিয়াছেন। কমিসন সরল, সহজ ও আবশ্যকীয় উপায় নির্দ্দেশ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা এখনও এ উপায় নির্দ্ধারণে নিযুক্ত আছেন।

এক প্রকার উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, জেলা বোর্ড প্রত্যেক গ্রামে অন্ততঃ এক একটী করিয়া পুষ্করিণী খনন করাইয়া বা পুরাতন পুষ্করিণী ঝালাইয়া দিবেন। পুষ্করিণী খনন করিতে যে ব্যয় হইবে, জেলাবোর্ড তাহা যোগাইতে না পারিলে গবর্ণমেণ্ট তাহার কতকাংশ প্রদান করিবেন। এজন্য দেশের লোক গবর্ণমেণ্টকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন, সন্দেহ নাই। এজন্য গবর্ণমেণ্ট বা জেলা বোর্ডকে বহু ব্যয় বহন করিতে হইবে। সেইজন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে কয়েকটী উপায় নির্দ্দেশ করিতে চাই।

প্রথমতঃ—গবর্ণমেণ্টের সহিত জমিদারগণের যে সর্ত্তে জমিদারী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে জমিদারগণের খাস পুষ্করিণী বা ঐ প্রকার পুষ্করিণী সাধারণ প্রজার ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ—জমিদারগণ অনেক পতিত গোচরভূমি, এমন কি গ্রামের যাতায়াতের জন্য সাধারণের রাস্তাকেও নিজস্ব করতঃ আবাদী ভূমিতে পরিণত করিয়া প্রজাবিলি করিয়াছেন, তাহাতেও গ্রামের মনুষ্য ও পশ্বাদির স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে। এমন কি খাল বিলও ঐ প্রকার আবাদী ভূমির জল বদ্ধ হইয়া সাধারণের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে। এজন্য জমিদারগণ কি দায়ী নহেন? তাঁহাদিগকে পল্লীস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বাধ্য রাখা উচিত।

তৃতীয়তঃ—পল্লীগ্রামে বহু পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে। অনেক খাল বিল মজিয়া গিয়াছে। ঐ গুলির সংস্কার করাইয়া তৎসমুদায়ের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সাধারণ অধিবাসীর উপর আইন জারি করিয়া তাহার দৃঢ়তা রক্ষা করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করা উচিত।

পত্রাদি

বেগুন—কোন পত্র প্রেরক এ বৎসর প্রায় এক বিঘা জমিতে বেগুনের আবাদ করিয়াছেন। প্রথমাবস্থায় গাছে বড় পোকায় উপদ্রব করিয়াছিল—নূতন ডগা বাহির হইলেই, তাহাতে ছিদ্র করিয়া পোকা প্রবেশ করিত এবং তাহাতে ডগার উপরিভাগ ঝিমাইয়া পড়িত। এজন্য প্রতিদিন প্রত্যুষে যত ঝিমান ডগা দেখিতেন, তাহা কাটিয়া একত্র করিয়া জ্বালাইয়া দিতেন, এবং সন্ধ্যাকালে ক্ষেত্রের পার্শ্বদেশে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ধোঁয়া এমন স্থানে দিতে হয় যে বাতাসে তাহা লইয়া যাইতে পারে। আর সন্ধ্যাকালে দিলে সুবিধা এই যে, ধোঁয়া অধিক উপরে উঠিতে পারে না, কাজেই ভূপৃষ্ঠের উপরেই বিচরণ করে, ফলতঃ

ক্ষেত্রের মধ্যে ধূম প্রবেশ করিত। এইরূপে অনেকটা অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, পরে শীত পড়িলে আর বড় একটা উপদ্রব দেখিতে পান নাই।

তিসি বঙ্গদেশের সকল পল্লীগ্রামের একটা জিনিষ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই তাহার আবাদ, সে জিনিষটী মসিনা,—সাধারণে তাহাকে তিসি বলিয়া জানে। তিসির কারবার একটা খুব বড় কারবার। এই ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসরে কত লক্ষ মণ মসিনা ইউরোপে চালান যায়, তাহা চক্ষু নিতান্ত মুদ্রিত না রাখিলে সহজেই নজরে পড়ে; মসিনার তৈল নানারকম রঙ্গে নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপের ঘানিতে আমাদের দেশের মসিনা পিষিয়া যে তৈল প্রস্তুত হয় তাহাই আবার আমাদের দেশে আমাদের বিবিধ অভাব পূর্ণ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। মধ্য হইতে জাহাজ ভাড়া আর ঘানির খরচ বাবদ ইউরোপ বৎসর বৎসর লাখ লাখ টাকা আমাদের নিকট হইতে লইতেছে। এণ্ড্ ইউল কোম্পানি আদি দ্বারা এ দেশে মসিনার তৈল প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু এই ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করিবার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

বেজীতে সাপ কাটিয়া বন জঙ্গলে তাহারা বিষদূর করিবার জন্য কোন দ্রব্যে গাত্র ঘর্ষণ করে এরূপ একটা প্রবাদ আছে। কেহ সে দ্রব্যটি দেখে নাই, ইহাও রাষ্ট্র আছে। কিন্তু আজ কাল জানা গিয়াছে, তাহা "কেঁচো"! সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে কেঁচোর দুচারি ফোটা রস খাওয়াইয়া আমরা প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়াছি। আপনার অবগতির জন্য ইহা বলিলাম। আবশ্যক অনুসারে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন, জানি না যদি সফল হয়, তবে বড়ই আনন্দের কথা। এজন্য লোক হিতার্থে সংবাদ পত্রে প্রকাশ করিলাম।

উদ্ভিদ ও প্রাণী—উদ্ভিদ কেবল যে প্রাণীদিগের খাদ্যরূপে তাহাদের শারীরিক পুষ্টি ও উন্নতি সাধন করে তাহা নহে, অন্য উপায়েও প্রাণী জগৎ উদ্ভিদ জগতের নিকটে অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ। আমেরিকার চিকাগো নগরের ডাক্তার উইলিয়াম, এ, ইভান্স বলেন যে, প্রাণীর উপর উদ্ভিদ জগতের প্রভাব বড় সামান্য নহে। একশত বৎসরের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে এই প্রভাব সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইদানীং বড় বড় জনাকীর্ণ নগরে যে অধিবাসীদিগের মৃত্যু-সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে, নগরের নিকট হইতে উদ্ভিদের তিরোভাবই তাহার অন্যতম কারণ, ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেক জাতীয় জীব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করেন। ঐ বিলোপের কারণ অনুমান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উদ্ভিদ বিশেষের অবনতি বা তিরোভাবই ইহার প্রধান হেতু। কেবল মানব সম্বন্ধে যে এই কথা বলা চলে তাহা নহে, সকল প্রকার প্রাণীর সম্বন্ধেই নিঃসংশয়ে এই কথা বলা যাইতে পারে।

সার-সংগ্রহ

বন্য পক্ষী ও পশুরক্ষা বিধায়ক আইন

১৯১২ সালের ৮ আইন

যেহেতু কোন কোন বন্যপক্ষী ও পশুকে রক্ষা ও নিরাপদ করিবার উৎকৃষ্টতর বিধান করা বিহিত ; অতএব এতদ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল :—

(১) এই আইন বন্যপক্ষী ও পশুদিগের রক্ষাবিধায়ক ১৯১২ সালের আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

(২) ইহা ইংরাজাধিকৃত বেলুচিস্থান, সাঁওতাল পরগণা এবং স্পিটি পরগণা সমেত সমগ্র ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

আইনের প্রয়োগ (১) তফশীলের নির্দ্দিষ্ট পক্ষী ও পশুরা যখন তাহাদের বন্য অবস্থায় থাকে তখন সেই সকল পক্ষী ও পশুদিগের প্রতি এই আইন প্রথমতঃ বর্ত্তিবে।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় তফশীলের নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন অপর যে কোন প্রকারের বন্যপক্ষী বা পশুকে রক্ষা কিম্বা নিরাপদ করা বাঞ্ছনীয় হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া সেই প্রকারের বন্যপক্ষী কিম্বা পশুর প্রতি এই আইনের বিধান প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

শিকার বন্ধ রাখিবার কাল :—এই আইন যে প্রকারের বন্যপক্ষী কিম্বা পশুর প্রতি প্রযুক্ত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া, এমন কোন প্রকারের বন্যপক্ষী বা পশুর নিমিত্ত বা সেই প্রকারের স্ত্রী বা অপরিণতবয়স্ক বন্যপক্ষী বা পশুর নিমিত্ত, তদধীন সমস্ত প্রদেশের মধ্যে কিম্বা তাহার কোন অংশের মধ্যে, সমস্ত বৎসর বা তাহার কোন অংশ শিকার বন্ধ রাখিবার কাল বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারিবেন ; এবং এই আইনের অন্তর্গত পরবর্ত্তী বিধানসমূহের অধীনে, তদ্রূপ শিকার বন্ধ রাখিবার কালের মধ্যে, ও ঐ বিজ্ঞাপনের নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে—

তদ্রূপ কোন পক্ষী কিম্বা পশু ধৃত করা, অথবা ঐরূপ শিকার বন্ধ রাখিবার কাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ধৃত করা হয় নাই এমন তদ্রূপ কোন পক্ষী বা পশু বধ করা যাইতে পারিবে না।

ঐরূপ শিকার বন্ধ রাখিবার কাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ধৃত কিম্বা নিহত হয় নাই, এমন তদ্রূপ কোন পক্ষী বা পশু কিম্বা তাহার মাংস বিক্রয় করা কিম্বা ক্রয় করা কিম্বা বিক্রয় ক্রয় করিবার জন্য প্রস্তাব করা কিম্বা অধিকারে রাখা চলিবে না।

ঐরূপ শিকার বন্ধ রাখিবার কালের মধ্যে ধৃত কিম্বা নিহত তদ্রূপ কোন পক্ষী হইতে পালক সমূহ সংগৃহীত হইয়া থাকিলে, তদ্রূপ পালকসমূহ বিক্রয় করা কিম্বা ক্রয় করা কিম্বা বিক্রয় বা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করা কিম্বা অধিকারে রাখা যাইতে পারিবে না।

দণ্ড :—যদি কোন ব্যক্তি বিধান লঙ্ঘন করতঃ কোন কার্য্য করেন কিম্বা করিবার চেষ্টা করেন তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে এই ধারামতে দোষী সাব্যস্ত থাকিলে, ঐ ধারামতে তাঁহার বিরুদ্ধে পুনরায় অপরাধ প্রমাণিত হইলে, প্রথম বারের পর প্রতিবার ঐ অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য তাঁহার এক মাস কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

বাজেয়াপ্ত করণ :—এই আইনমতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে, যে মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন তিনি, যে পক্ষী কিম্বা পশুসম্বন্ধে ঐ অপরাধ কৃত হইয়াছে সেই পক্ষী বা পশু কিম্বা সেই পক্ষী বা পশুর মাংস বা অন্য অংশ, সরকারে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ অপরাধের নিমিত্ত অপর যে দণ্ডের বিধান আছে, ঐ বাজেয়াপ্তকরণ তদতিরিক্ত হইতে পারিবে।

অপরাধের বিচারাধিকার :—প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিম্নতর কোন আদালত এই আইনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

অব্যাহতি প্রদান করিবার ক্ষমতা :—যে স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপকারার্থ এই পথ অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় হয়, সে স্থলে ঐ গবর্ণমেণ্ট যে সকল সঙ্কোচ ও সর্ত্ত ধার্য্য করেন তদধীনে, যে কার্য্য বিধি অনুসারে অবৈধ বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহা করিবার অধিকারদায়ক লাইসেন্স কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারিবেন।

রক্ষণ :—আত্মরক্ষার্থে কিম্বা অপর কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তি কোন বন্যপশু ধৃত বা বধ করিলে, কিম্বা সরল বিশ্বাসে সম্পত্তিরক্ষার্থ কোন বন্যপক্ষী কিম্বা পশু ধৃত কিম্বা নিহত হইলে, এই আইনের কোন কথা তৎপ্রতি প্রযোজ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

রহিতকরণ :—বন্যপক্ষী রক্ষাকরণবিষয়ক ১৮৮৭ সালের আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

বন্য পক্ষী যথা :—বন্য পেরু বাষ্টার্ড, পাতিহাঁস, চরস (হিন্দী), বন্যকুক্কুট, তিতিরপক্ষী, সাণ্ড গ্রাউজ (বন্ তিতুর), চিত্রিত কাদাখোঁচা, স্পারকাউল, বন্য মোরগ, বক, বোক (egrets), রোলার এবং মাছরাঙা।

বন্য পশু যথা :—কৃষ্ণসার, গর্দ্দভ, বাইসন, মহিষ, হরিণ, গ্যাজেল, মায়জ হরিণ, ছাগল, খরগোষ, বৃষ, গণ্ডার ও মেষ।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

পৌষ মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক্-সব্জী বীজ বপনকার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারস্লী (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হইবে। গোড়া খুঁড়িয়া এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্র।—আলুর গাছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় কিন্তু ফসল কোদালি দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকি গুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। আলু তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে। আলু ক্ষেত্রে এমাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ খণ্ড। } পৌষ, ১৩১৯ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

জল চাষ

শুশনিশাক ইহা স্নিগ্ধ গুণসম্পন্ন ও নিদ্রাকারক অনেকেই ইহা আদর করিয়া ব্যবহার করেন—শুশনি লতা জলাশয় কিম্বা পুষ্করিণীর ধারে জন্মিয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে জলাশয়ের ধারে ইহার লতা বসাইয়া দিলে সহজেই হইয়া থাকে, মধ্যে মধ্যে জল ছিটাইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পাইট নাই। ইহা হইতেও সামান্য আয় হইতে পারে, হাটে বাজারে আদরের সহিত বিক্রয় হইতে দেখা যায়। হিঞ্চা এই জাতীয় শাক অত্যন্ত উপকারি, আয়ুর্ব্বেদে ইহার অনেক গুণ বর্ণনা আছে, ইহার মত স্নিগ্ধ গুণ সম্পন্ন ও উপকারী শাক আর নাই বলিলেও চলে, হিঞ্চা শাকের লতা ফাল্গুন, চৈত্র মাসে জলাশয়ের ধারে বসাইয়া দিলেই হইবে।

পাণিফল—যে সকল জলাশয়ে কিম্বা পুষ্করিণীতে মৎসের চাষ হয় না তাহাতে পাণিফলের চাষ করিলে বেশ লাভ হইতে পারে।

পাণিফল বেশ লাভ জনক চাষ ইহা অনেকেই জানেন, পাণিফল কাঁচা বিক্রয় হয়, অথবা ইহার পালো করিয়া বিক্রয় করিলে আরও অধিক লাভের সম্ভাবনা, পাণিফলের পালো হইতে অনেক রকম খাদ্য প্রস্তুত হয়। শিশুকে কিম্বা রোগীকে খাওয়াইবার জন্য সাগু, বার্লি, এরারুটের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শরীর পোষণ কি কোন কোন ব্যাধি নিবারণের উপাদানগুলি এই ফলে এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান যে এতদ্দেশবাসী জনসাধারণ ইহার উপকারিতার বিষয় অবগত হইতে পারিলে অনেকে পাণিফলের চাষে এবং ব্যবসায়ে লাভবান হইতে পারেন আয়ুর্ব্বেদে পাণিফলের উপকারিতার বিষয় অনেক লিখিত আছে ভাবপ্রকাশে শৃঙ্গাটিকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

শৃঙ্গাটকং জলফং ত্রিকোনফল মিত্যাদি।
শৃঙ্গাটকং হিমং সাদ্বগুরু বৃষ্যং কষায়কম্॥
গ্রাহি শুক্রানিল শ্লেষ্মপ্রদং পিত্তাস্র দাহনুৎ।

শৃঙ্গাটক, জলফল, ত্রিকোনফল, এই কয়েকটি উহার নাম। পাণিফল শীতবীর্য্য কষায় মধুর রস, গুরু ও শীরের উপচয় কারক, ধারক শুক্র জনক বায়ুবর্দ্ধক এবং পিত্ত রক্ত দোষ ও দাহ নাশক কবিরাজেরা অতিসার আমাশয় রোগের জন্য পাণীফলের পালো ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জল চাষের মধ্যে পাণিফলই অধিক লাভজনক, পুরাতন পুষ্করিণীতে কিম্বা যে বিল ভরাট হইয়া গিয়াছে এইরূপ জলাশয়ে ইহার চাষ ভাল রূপ হয়। ফাল্গুন, চৈত্র মাসে ইহার চারা লাগাইতে হয়, যেখানে পাণিফলের চাষ করিতে হইবে পানা, ঝাঁজি ইত্যাদি অগ্রে পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিৎ নতুবা গাছের বেশ তেজ হয় না। বৈশাখ মাস হইতে ফল ধরিতে আরম্ভ হয়। স্রোতের জলে ইহা কখন হয় না বাঁধা জলে হয়। ইহা ভিন্ন পদ্ম [illegible]কে ইত্যাদি নানাপ্রকার জলজ লতাও জল চাষ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে ইহার মৃণাল লোকে তরকারি করিয়া খায় শালুক ফুলের বীজ হইতে খৈ তৈয়ারী হইয়া থাকে এই খৈ দেখিতে শাগুদানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইহাকে ভেঁটের খৈ বলে।

পদ্ম—পাঁক পড়া জলা ভূমিতে হয় বলিয়া ইহার নাম পঙ্কজ চার হইতে ৬ ফুট জলের নিচে মূল প্রথিত হইলেও তাহা হইতে গাছ বাহির হইয়া পদ্মের মৃণালগুলি [illegible] ভাসিতে থাকে পাতাগুলি যেন এক একখানি থালার মত জলে ভাষমান দৃষ্ট হয় এবং প্রতি গ্রন্থিতে পুষ্প উদ্গত হইয়া জলাশয়ের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। পদ্মের পাতায় আহার করা চলে পদ্মের বীজ হইতে চারা তৈয়ার করিতে হইলে বীজগুলি পৌষ, মাঘ মাসে একটি গামলায় বা টপে বপন করিতে হয় চারা ফুটিলে এক একটি গামলা হইতে গামলান্তরে চালিয়া নাড়িয়া একটু বাড়াইয়া লইয়া গ্রীষ্মের সময় জলাশয়ে গামলাসমেত বসাইয়া দিতে হয় দোয়াঁস মাটি ও গোবর ইহার সার রূপে ব্যবহার করা হয়।

শোলা—অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও লাভজনক বস্তু, ইহা ২ ইঞ্চ ডায়মেটার ছাল পাতলা অল্প শাখাপ্রশাখা বিশিষ্ট, শোলা পতিত জলা জমিতে হয়, চাষ করিতে হইলে ইহার বীজ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে যে সকল নিম্ন জমিতে বারো মাস জল থাকে তথায় ছড়াইয়া দিলেই গাছ হয়, ইহার কোন তদ্বির করিবার আবশ্যক নাই বর্ষার জল পড়িলেই গাছ বেশ সতেজ হইতে থাকে আমাদের দেশে জেলেরা মৎস ধরিবার সময় জাল ভাসাইবার জন্য সোলার আঁটি করিয়া ব্যবহার করে এবং ভেলা বাঁধিয়া তাহাতে চড়িয়া মাছ তাড়া দেয়, শোলা বঙ্গদেশ, আশাম, সিলেট ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে জন্মায় ব্রহ্মদেশে ইহার ছাল হইতে আঁশ বাহির

করা হয়, বাঙ্গালাদেশে শোলার পীতভাগ পাতলা কাগজের মত কাটিয়া প্রতিমা সাজাইবার গহনা আদি এবং সাহেবদের টুপী তৈয়ারি করে। মান্দ্রাজে খেলানার গোশকট আদি প্রস্তুত হয়, বাঙ্গালা দেশেও শোলা হইতে অনেক রকম খেলানা তৈয়ারি হয়। শোলার পীত স্পঞ্জের মতন বলিয়া অস্ত্র চিকিৎসায় ঘা বাড়াইবার জন্য ব্যবহার করা হয়। অতএব শোলা যে একটি বিশেষ লাভজনক কৃষি সে বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।

দুগ্ধ ও বীজাণু

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কখনও কখনও দুগ্ধ স্বতঃই নীলবর্ণ ধারণ করে। এরেন্‌বার্গ (Ehrenberg) দেখাইয়াছেন যে, সাইনোজেনাস্ নামক এক প্রকার বীজাণু (Bacillus cynogenous) দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া উক্তরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটন করে। এই বীজাণু-সমূহ দেখিতে মেটে নীলবর্ণ এবং সরু দণ্ডের ন্যায়। ইহারা অপকারী নহে। হিউফ্ (Heuppe) উক্ত বীজাণু-মণ্ডিত খাদ্য বিভিন্ন প্রাণীকে খাওয়াইয়া তাহাদের দেহে কোন প্রকার রোগলক্ষণ বা বিষক্রিয়া প্রাপ্ত হন নাই। দুগ্ধপাত্র নিয়মিতরূপে ফুটন্ত জল দ্বারা ধৌত করিলে এই বীজাণুসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এতদ্ব্যতীত নানা প্রকার বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দুগ্ধ পীত, রক্ত, সবুজ বা বেগুণে বর্ণ ধারণ করিতে পারে। এইরূপ স্থলে বীজাণুসমূহের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পূর্ব্ব প্রবন্ধলিখিত সাধারণ সাবধানতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বৃষ্টির দিনে কখনও কখনও দুগ্ধ পাতলা আঠার আকৃতি ধারণ করে। ইংরেজীতে ঐরূপ দুগ্ধকে 'রোপী' (Ropy milk) বলে। এই দুগ্ধ এত ঘন এবং আঠা হয় যে, এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে ঢালিতে গেলে তরল পদার্থের ন্যায় না পড়িয়া উহা গাঢ় তৈলের ন্যায় পড়ে। দুই তিন প্রকার বীজাণু দ্বারা ঐরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে পারে। বায়ুর উষ্ণতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধ পুনরায় স্বাভাবিক তরলতা প্রাপ্ত হয়। দুই এক স্থলে দেখা যায় যে, দুগ্ধে একটি তিক্ত স্বাদ থাকে। লেইব্‌সার (Leibscher) দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ স্থলে গাভীর বাঁট-নিঃসৃত কয়েক ধার দুগ্ধই কেবল তিক্তস্বাদবিশিষ্ট থাকে। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ব্বরূপ দুগ্ধবিরসকারী বীজাণুসমূহ গাভীর বাঁট হইতে দুগ্ধে প্রবেশ করে। এইরূপ অবস্থায় গোশালা এবং গাভীর পালান তিন চারি দিন

দুগ্ধ বিবর্ণকারী বীজাণু সমূহ

পর্য্যন্ত কার্ব্বলিক এসিড্ দ্বারা ধুইয়া শোধন করিয়া দিলে এই সকল বীজাণু বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

আমাদের দেশে দুগ্ধ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইতে হইলে গোয়ালাগণ দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে কয়েকখানা খেজুর পাতা বা মরিচ ফেলিয়া রাখে। তাহাদের বিশ্বাস, ঐ পাতা দুগ্ধকে অম্লস্বাদ হইতে দেয় না, অর্থাৎ দুগ্ধবিয়োজনকারী বীজাণু সমূহের ক্রিয়া প্রতিরোধ করে। কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। ঐ পাতা ব্যবহার করার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, ঐরূপ করিলে দুগ্ধপূর্ণ ভার লইয়া দ্রুত গমনকালে পাত্রস্থ দুগ্ধ ঝলকাইয়া পড়িতে ও মথিত হইতে পারে না।

গোয়ালাগণের দুগ্ধসংরক্ষণ-প্রণালী

কোন কোন গাছের পাতার দুগ্ধকে ঘন করিবার ক্ষমতা আছে। কাযেই, দুগ্ধে জল মিশাইয়া ঐরূপ পাতা ফেলিয়া রাখিলে আপেক্ষিক গুরুত্ব বর্দ্ধিত হওয়াতে জলমিশ্রিত দুগ্ধও স্বাভাবিক দুগ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। লিস্‌বোয়া (Lisboa) বোম্বাই প্রদেশে এই কার্য্যে এরারুট গাছের পাতা ব্যবহৃত হইতে দেখিয়াছেন। এরারুট গাছের পাতার দুগ্ধকে ঘন করিবার ক্ষমতা আছে।

বায়ু-সংস্পর্শে রাখিয়া দিলে পূর্ব্ববর্ণিত নির্দ্দোষ বীজাণুসমূহ ব্যতীত নানাপ্রকার রোগবীজাণুও দুগ্ধকে আক্রমণ করিয়া বিষাক্ত করিতে পারে। সংক্রামক রোগবাহক বীজাণুসমূহ দুইপ্রকারে দুগ্ধে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, গাভীর কোন প্রকার সংক্রামক ব্যাধি থাকিলে, দোহনকালে উহার উধঃ বা দেহ হইতে ঐ রোগের বীজাণু দুগ্ধে প্রবেশ করিয়া তাহাদের রাজ্য বিস্তার করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বায়ু হইতে বিসূচিকা, সান্নিপাত জ্বর, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি রোগের বীজাণু দুগ্ধে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। দেশে কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব থাকিলে শেষোক্ত উপায়ে দুগ্ধ পান করিলে শীঘ্রই বিষাক্ত বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। কাজেই সাবধানতার জন্য দুগ্ধ উত্তমরূপে ফুটাইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে পান করা উচিত। হিন্দু শাস্ত্রকারগণও এই বিষয়ে বিশেষ বিধি করিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুতে দুগ্ধের ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, "দুগ্ধ অগ্নিতে পাক করিলে লঘু হয় এবং নারীদুগ্ধই অপক্কাবস্থায় হিতকর। অপক দুগ্ধের মধ্যে ধারোষ্ণ (অর্থাৎ দোহনের পর স্বভাবতঃ যতক্ষণ উষ্ণ থাকে) দুগ্ধই গুণবিশিষ্ট ; দোহনের পর শীতল হইলে বিপরীত গুণ দর্শায়।" উত্তাপপ্রদানে বীজাণুসমূহ ধ্বংস পাইয়া থাকে। কত উত্তাপে কোন বীজাণু বিনষ্ট হয় তাহা নিম্নে দেওয়া গেল—(অবশ্য দুগ্ধকে ফুটাইলে দুই এক মিনিট মধ্যেই সর্ব্বপ্রকার

দুগ্ধে রোগবাহক বীজাণু

তাপ প্রয়োগে বীজাণুর ধ্বংস

বীজাণু বিনষ্ট হইয়া যায়। বীজাণুশূন্য দুগ্ধপানে কোন প্রকার রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না।):—

যক্ষ্মা বীজাণু	৭৭ সিঃ (77 Cent)	...	১০ মিনিটে
সান্নিপাত জ্বরের বীজাণু ...	৮৫ সিঃ	...	" "
দুগ্ধাম্ল বীজাণু	৮৫ সিঃ	...	" "
বিসূচিকা বীজাণু	৬০ সিঃ	...	" "
টিউবারকিউলসিস্ বীজাণু ...	৬০ সিঃ	...	" "
পচনকারী ও অম্ল উৎপাদনকারী সর্ব্বপ্রকারের বীজাণু ...	৪৬ সিঃ	...	" "

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুগ্ধকে বীজাণুশূন্য করার প্রণালীকে "দুগ্ধ অনুর্ব্বরা (Sterlise) করা বলে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে দুগ্ধকে বীজাণুশূন্য বা "অনুর্ব্বরা" করিতে হইলে ১৫ হইতে ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত উত্তম রূপে ফুটাইয়া যাহাতে বায়ুর সংস্পর্শ না ঘটে, এরূপভাবে আটকাইয়া রাখা হয়।

উক্তরূপ সংরক্ষিত দুগ্ধ সদ্যঃ দুগ্ধের মত গুণকারী কি না সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের মতভেদ আছে। তাহার কারণ এই যে—(১) যদিও উত্তাপ-প্রয়োগ হেতু বিসূচিকা, সান্নিপাতিক জ্বর, ডিপথেরিয়া ও টিউবারকিউলসিসের বীজাণু অতি শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, কিন্তু ঐরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা শিশুদিগের উদরাময় রোগের বীজাণুসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। কারণ উহারা দুই ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত জলের স্ফুটন তাপ (boiling tempeoature) সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। ঐ বীজাণুসমূহ দুগ্ধে পেপ্‌টোন্ (Poptone) প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগের উদরাময় রোগ আনয়ন করে।

দুগ্ধের অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগের দোষ

(২)—সদ্যঃ দুগ্ধেরও বীজাণুনাশক ক্ষমতা আছে। অর্থাৎ, সদ্যঃ দুগ্ধ পান করিলে উহা শরীরস্থ অন্যান্য অপকারী বীজাণু-সমূহকে আংশিকরূপে বিনষ্ট করিতে পারে। দুগ্ধের উক্ত ক্ষমতা দোহনের কয়েক ঘণ্টা পর পর্য্যন্তও বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু দুগ্ধে তাড়াতাড়ি অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে উহার পূর্ব্ববর্ণিত বীজাণুনাশক গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

(৩) উত্তাপহেতু দুগ্ধস্থ "অণ্ডলালময় ভাগ" (Lacioalbumin) জমাট বাঁধিয়া দুগ্ধের উপর সর পড়িতে থাকে। কাজেই উহা পরিপাক করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য হয়।

(৪) অত্যধিক তাপে দুগ্ধস্থ কেসিন (casein) ভাগের প্রকৃতি ও পরিবর্ত্তিত হয় এবং ছানা বাঁধিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়।

(৫) খাদ্য দ্রব্যস্থ শ্বেতসার (starch) ভাগকে পরিপাক করিতে পারে, পূর্ণবয়স্কদের মুখস্থিত লালাতে এইরূপ একপ্রকার বীজাণু আছে। কিন্তু শিশুদের লালাতে এইরূপ কোন বীজাণু নাই। উক্ত কার্য্য করিতে পারে এইরূপ একজাতীয় সদ্যঃ দুগ্ধেও থাকে, এবং উহা শিশুদের পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করে। দুগ্ধে উত্তাপ প্রয়োগ কালে উহারা সহজেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; কাযেই শিশুদের পরিপাক ক্রিয়ার কোন সহায়তা করিতে পারে না।

(৬) স্বাভাবিক দুগ্ধে চর্ব্বিভাগ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু উত্তাপ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে উহা বিন্দু বিন্দু ভাবে পৃথক হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে এবং কাযেই তখন উহা পরিপাক করা কঠিন হইয়া পড়ে।

(৭) অত্যধিক তাপ-প্রয়োগে দুগ্ধস্থ শর্করাভাগও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উক্ত কারণেই ঘন দুগ্ধে বা ক্ষীরে একপ্রকার গন্ধ অনুভূত হয়।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে, অসিদ্ধ দুগ্ধ কোন মতেই পান করা উচিত নহে, অথচ অতি মাত্রায় সিদ্ধ করিলেও দুগ্ধের গুণ ঈষৎ কমিয়া যায়। দুগ্ধকয়েক মিনিট পর্য্যন্ত উত্তমরূপ গরম করিয়া পান করাই শ্রেয়ঃ। উত্তপ্ত করার পর অধিকক্ষণ গত হইলে, উহাতে পুনরায় কোন প্রকার বীজাণু প্রবেশ লাভ করিতে পারে। হিন্দু শাস্ত্র মতে "দুগ্ধ জ্বাল দিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে হইবে। জ্বাল দিবার পর তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সেই দুগ্ধকে অতপ্ত বলিয়া জানিবে। এই দুগ্ধ দূষিত হয়। দুগ্ধে তাহার চতুর্থ ভাগ জল মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া পান করিলে হিতকর হয়।"

দুগ্ধ পান বিধি

দুগ্ধকে বীজাণুশূন্য এবং সংরক্ষিত করিবার জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে কি কি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা হইয়া থাকে, ইত্যাদি বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

শ্রীঅমুকূলচন্দ্র সরকার।

সরকারী কৃষি সংবাদ

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রধান শস্য—১৯১১-১২

ধান—ধান জমির পরিমাণ ১,৪৫১,১০২ একর; প্রতি একরে গড় ৮৯৩ পাউণ্ড হিঃ মোট ফলন ৫৭৮,৬৮২ টন।

গম—গমের জমির পরিমাণ ৯৪২,৯৮২ একর; একর প্রতি গড় ৩৫৭ পাঃ হিসাবে মোট ফলন ১৫০,১০০ টন।

যব—যবের জমির পরিমাণ ৩৬,৩৬৭ একর; প্রতি একর ৫৬৭ পাঃ হিসাবে মোট ফলন ৯,২০২ টন।

জোয়ার—জোয়ারের জমির পরিমাণ ৫,৮৭৮,০২৩ একর; গড়ে প্রতি একরে ৩৪৭ পাঃ হিসাবে ৯১০,১৩৯ টন।

বাজরি—বাজরির জমির পরিমাণ ৪,৩৬১,৮৮৮ একর; গড়ে প্রতি একরে ১৭৫ পাঃ হিসাবে ৩৪০,৪৩৬ টন।

ভুট্টা—ভুট্টার জমির পরিমাণ ১৬৩,৪৬৫ একর; গড়ে প্রতি একরে ৩৭৬ পাঃ হিসাবে ২৭,৪২৩ টন।

তুর—তুরের জমির পরিমাণ ৪৫৮,০৬৯ একর; একর প্রতি গড় ৩৯০ পাঃ হিসাবে ৭৫৯,৬৯০ টন।

ছোলা—ছোলার জমির পরিমাণ ৩৭২,১৪৬ একর; গড়ে একর প্রতি ২৩৫ পাঃ হিসাবে ৩৯,১২৩ টন।

অন্যান্য কলাই—অন্যান্য কলায়ের জমির পরিমাণ ১,৪২৪,৮৬৯ একর; গড়ে একর প্রতি ২০০ পাঃ হিসাবে ১২৭,৫১০ টন।

সিন্ধু প্রদেশের প্রধান শস্য—১৯১১-১২

ধান—জমির পরিমাণ ১,০৮৮,৬৫৫ একর; প্রতি একরে গড়ে ১,০০০ পাঃ হিসাবে ৪৮৪,৮০৭ টন।

গ[illegible]—গমের জমির পরিমাণে ৩৬৮,৪৪২ একর; গড়ে একর প্রতি ৮৪৪ পাঃ হিসাবে [illegible]৩৮,৯৩৪ টন।

[illegible]—যবের জমির পরিমাণ ১৮,৭৬৭ একর; গড়ে একর প্রতি ৬৩৩ পাঃ হিসাবে ৫,৩০৬ টন।

জোয়ার—জোয়ারের জমির পরিমাণ ৩৮৯,৩৮৫ একর; গড়ে একর প্রতি ৬০৩ পাঃ হিসাবে ১০৪,৭৫৮ টন।

বাজরি—বাজরির জমির পরিমাণ ৪১৪,৯৩৫ একর; একর প্রতি গড়ে ৫৯৪ পাঃ হিসাবে ১০৬,৩৪০ টন।

ভুট্টা—ভুট্টার পরিমাণ ১,৮৩৩ একর; প্রতি একরে ১,০৬৪ পাঃ হিসাবে ৪৭৪ টন।

তুর—তুরের জমির পরিমাণ ৭৯ একর; একর প্রতি ২২৭ পাঃ হিসাবে ৮ টন।

ছোলা—ছোলার জমির পরিমাণ ৭৬,৪৩৯ একর; একর প্রতি গড়ে ৩০৯ পাঃ হিসাবে ১০,৫৩৩ টন।

অন্যান্য—অন্যান্য কলায়ের জমির পরিমাণ ২২৭,৫৯৪ একর; গড়ে একর প্রতি ২৯৮ পাঃ হিসাবে ৩০,২৯২ টন।

ভারতের আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে কয়েক দ্রব্য—

মাছ—ভারতের নদ নদী, হ্রদ, খাল, বিল ও সমুদ্র উপকূলে মাছ অতি বিস্তর ছিল, এখন কিন্তু ভারতবাসীর মাছ, খাইতেই কুলায় না। একেই মাছ জন্মিতেছে কম তাতে আবার রপ্তানি আছে, বিগত বর্ষে ১৩১৯ সালের বৈশাখে ৭৬৩,৫২১ টাকার নোনা মাছ চীনে সংরক্ষিত ও অন্যান্য রকমে রপ্তানি হইয়াছে কিন্তু দেখা যায় যে উক্ত বৎসরে বৈশাখ মাসে ৩০,০৬৫৪, টাকার মাছ ভারতে আসিয়াছে।

ফল—ভারতের নিজস্ব ধন যাহা অনায়াসে এখানে জন্মায় এরূপ ফল শাক সব্জী উক্ত বৎসরে এক পয়সারও বিদেশে রপ্তানি হয় নাই, কিন্তু বিদেশ হইতে প্রায় উন চল্লিশ হাজার টাকার ফল ১৩১৯ সালের বৈশাখে ভারতে আসিয়াছে। এবং ১২,৩৭১,১৬৫ টাকার চা রপ্তানি ও ১২০৪৯০ টাকার চা আমদানী হইয়াছে।

তামাক—তামাক তৈয়ারি হইবার মত জমি বিস্তর আছে নদ নদীর চর ভরাটি জমিতে প্রচুর তামাক জন্মিতে পারে, তথাপি দেখিয়া বিস্মিত হই যে বর্তমান বর্ষের বৈশাখে কিঞ্চিদধিক ৬ লক্ষ টাকার তামাক ভারতে আমদানী হইয়াছে। রপ্তানি অতি সামান্য ১,৬০,৭১২ টাকার তামাক মাত্র।

চিনি—ভারতের আখে চিনি, তালের রসে চিনি, খেজুর ও তালের রসে চিনি কিন্তু জার্ম্মনির এক বিটের চিনিতেই মাত, তার উপর জাভাও মরিসসের

ইক্ষু চিনি আছে। মরিসসের মত ইক্ষু চাষ ভারতে একটাও নাই তাই ভারতে বিগত বৈশাখে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকার চিনি আমদানী হইয়াছে। উক্ত সময়ে ভারত হইতে মোটে ১৪ লক্ষ টাকার চিনি রপ্তানি হইয়াছে।

শস্য কলাই ময়দা—ভারত হইতে বিগত বর্ষে ৬ কোটি টাকার কলাই শস্য ময়দা এক মাসে রপ্তানি হইয়াছে এবং ষোল লক্ষ টাকার ময়দা ও কলাই আদি একমাসে আসিয়াছে।

মসালা—একমাসে মসালা ১৬ লক্ষ টাকার আমদানী হইয়াছে এবং রপ্তানি ২০ লক্ষ টাকার।

সূতা প্রভৃতি বয়নোপযোগী দ্রব্য—এক মাসে সূতা প্রভৃতি দেড় কোটি টাকার আমদানী হইয়াছে এবং ৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকার তাঁতের বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে ধান্য—ব্রহ্মদেশে এবার ধান্যের আবাদ কিরূপ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ দুইবার আনুমানিক হিসাব প্রকাশ করিলেন। প্রথম আনুমানিক হিসাবে তাঁহারা জানাইয়াছিলেন যে, নিম্ন ব্রহ্মে ১৬টি প্রধান জেলাতেই সাধারণতঃ ধান্যের চাষ হইয়া থাকে—এই ১৬টি জেলায় এ বৎসর ২ কোটি ২৫ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ৮৬ বিঘা জমিতে ধান্যের চাষ হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল জেলা হইতে সংশোধিত রিপোর্ট পাইবার পর দ্বিতীয়বার কর্ত্তৃপক্ষ যে আনুমানিক হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে জানা যাইতেছে যে প্রায় ২ কোটি ৩৭ লক্ষ, ১৪ হাজার ৯৫৮ বিঘা জমিতে ধান্যের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ইহা অপেক্ষা ১২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬৬১ বিঘা কম জমিতে ধান্যের চাষ হইয়াছিল।
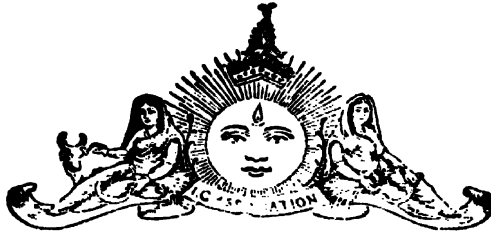
পৌষ, ১৩১৯ সাল।

চাট্‌নি ও চাট্‌নি প্রস্তুত করণ

বহুকাল হইতে নানা দেশে বিবিধ প্রকারের চাট্‌নি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোধ হয় মান্ধাতার আমল হইতে চাট্‌নির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

ভারতের লোকের শেষ পাতে অর্থাৎ ভোজন শেষ করিবার সময় একটু অম্লমধুর রসাত্মক দ্রব্য ভোজন করা চাই। বাঙলার লোকে প্রথমতঃ উচ্ছের সুক্ত, নিমঝোল, তার পর ডাল, ডালনা, কালিয়া, ঝোল প্রভৃতি কটু রসাত্মক ব্যঞ্জন, তদন্তে অম্ল এবং সর্ব্বশেষে মধুর রসের দ্রব্যাদি দ্বারা ভোজন সমাপন করিয়া থাকে। পশ্চিম প্রদেশে অনেক স্থলে কিন্তু অগ্রে মিষ্টান্ন, তদন্তে লুচি তরকারি খাইয়া থাকে। কিন্তু কি বাঙলা, কি পশ্চিমাঞ্চল সর্ব্বত্রই চাট্‌নি ব্যবহারের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। রোমান ইতিহাসে পড়া যায় যে, রোমীয়গণ প্রথমেই চাট্‌নি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তাঁহারা বলেন যে প্রথমে চাট্‌নি খাইলে ক্ষুধা ও জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়। বাঙলায় চাট্‌নি প্রস্তত হইতে পারে না এমন ফল, মূল বা শাক সব্জী নাই বলিলেই হয়। উচ্ছে, করলা, কুমড়া, কপি, লঙ্কা, সালগম, বীট, কচু, আদা, ওল, টমাটো, বীটপালম, চুকাপালম, আম, আনারস, জলপাই, করমচা, প্রভৃতি বহুতর ফল, মূল ও শাক সব্জীর মুখরোচক চাট্‌নি প্রস্তত হইয়া থাকে।

ইউরোপীয়গণ কতকগুলি শাক সব্জীর চাষ ফলতঃ চাট্‌নির জন্যই করিয়া থাকেন। তাঁহারা মাংস বা মাছ রাঁধিবার সময় কপি, সালগম, বীট, পিঁয়াজ প্রভৃতি যাহা কিছু ব্যবহার করেন তাহাই তাঁহাদের নিকট সালাদ আখ্যা পায়। তাঁহারা আমাদের বাঙলার মত ঝোলে আলু, কাঁচকলা, বেগুন ব্যবহার করেন না। কাঁচকলাত ভারতের বিশেষতঃ বাঙলার একচেটিয়া জিনিষ। ইউরোপে ইহার চেহারা কেহ দেখে নাই। বেগুন আলুও তথায় সালাদের মত ব্যবহার হয় না।

তাঁহারা সালাদের জন্য সালগম, স্পাইনাক, বিট, লেটুস্, ক্রেশ, পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, সুগন্ধী মসালা শাক যেমন মারজোরাম, সেজ, ল্যাভেণ্ডার, থাইম প্রভৃতির চাষ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের মত ইউরোপীয়গণ সালাদ প্রস্তুতের জন্য তৈল, আদা, লবণ, চিনি কিম্বা মধু প্রভৃতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অম্ল মধুর চাটনিতে প্রায়ই লঙ্কা, পেঁয়াজ বা রসুন ও চিনি, সরিষা হলুদগুঁড়া, লবঙ্গ, ছোট এলাচ, দারুচিনি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বিলাতি চাট্‌নিতে শির্‌কা বা ভিনিগারের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিলাতী চাট্‌নি প্রস্তুত কারক বলেন যে সরিষাগুঁড়া, সরিষা তৈল এবং শির্‌কা উত্তম চাট্‌নির অঙ্গ। তাহাতে সিদ্ধকরা ডিমের কুসুম দিতেও পারা যায়। ডিমের কুসুম গুঁড়াইয়া চাট্‌নির সহিত মাখাইয়া দিতে হয়।

আমাদের দেশের মত ইউরোপীয়গণ লৌহ কটাহে চাট্‌নি প্রস্তুত করেন না। লৌহ কটাহে চাট্‌নির রঙ খারাপ এবং লৌহে অম্লরস সংযোগে কষ বাহির হইয়া স্বাদেরও বৈলক্ষণ্য হইতে পারে। ইউরোপীয়গণ এইজন্য ইহার পরিবর্ত্তে কাচ কিম্বা এনামেল পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইউরোপীয়গণ আগে যত শাক সব্জীর সালাদ প্রস্তুত করিতেন এখন আর তত করেন না, এখন তাঁহারা ক্রেশ, জলক্রেশ, লেটুস্, এণ্ডিভ, স্পাইনাক, শসা এই কয়টি হইতেই সালাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। খাইবার সময় তাঁহারা সিদ্ধ আলু, সিদ্ধ কপি, আর্টিচোক, সিম, মটর প্রভৃতি মিশাইয়া লন।

বাঙলা দেশে মটর ও সিমের চাট্‌নি বড় কেহ করে না কিন্তু পশ্চিমা লোকে ইহার বেশ সুস্বাদু মুখরোচক চাট্‌নি বানাইয়া থাকেন। পশ্চিমা লোকে আহারের সময় অন্য ব্যঞ্জনের বদলে চাট্‌নিই বেশী খাইয়া থাকেন। ইউরোপীয়গণ আলু, কপি, সালগম, পিঁয়াজ, মাছ কিম্বা মাংস একত্রে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া [illegible] হলুদ, লঙ্কা, প্রভৃতি মশলা সংযোগে রাঁধিতে জানেন না। তাঁহারা আলু আলাদা সিদ্ধ করেন, মাংস বা মাছ পৃথক সিদ্ধ করেন, পিঁয়াজ সিদ্ধ করিয়া লইয়া পরে খাইবার সময় এক ডিসে আবশ্যকমত দুইটি বা তিনটী জিনিষ মিশাইয়া লন। তাহাতে অতঃপর সালাদ মিলিত হইল, তাহাতে সস্ যাহাকে আমরা বাঙলায় অন্নের ঝোল বলিতে পারি তাহা মিশাইয়া দেওয়া হইল। ফরাসদিগের সালাদও মন্দ নহে। একটি ফরাসি সালাদের কথা বলিতেছি। লেটুস্ দুই প্রকারের আছে— ক্যাবেজ লেটুস্ এবং কস্ লেটুস্। তাঁহারা কস্ লেটুস্ গুলি লইয়া বোঁটা বেশ পাতা ঘেঁসিয়া কাটিয়া ফেলেন। অবশেষে জলে ধুইয়া, পাতা ছাড়াইয়া একটি কাচ কিম্বা এনামেল পাত্রে রাখিয়া তাহার সহিত অলিভ তৈল, ভিনিগার ভালরূপে মিশাইয়া লন। আবশ্যক মত লবণ, ঝালের নিমিত্ত গোলমরিচের গুঁড়া ও লবণ

প্রদান করিয়া থাকেন। চাট্‌নিটি আরও মুখরোচক করিবার জন্য পেঁয়াজ কুচাইয়া দিয়াও থাকেন। ইঁহারা চাট্‌নির দ্রব্যগুলি বড় সিদ্ধ শুক্‌না করিবার দিকে যান না। ভিনিগারে ও লবণে জরিয়া যতটুকু নরম হইতে পারে, হয়। ঐ সকল দ্রব্য যে এই প্রকারে প্রস্তুত হইলে যে কম নরম হয় বা কম সুস্বাদু হয় তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশের চাট্‌নি অধিকাংশই সিদ্ধ শুক্‌না করিয়া তৈয়ারি হইয়া থাকে। হয় সিদ্ধ করা বা শুক্‌না করা যেন বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু বাঙলায় চাট্‌নির রাজা কাসুন্দি, কাঁচা আম থেঁতো করিয়া রসাল অবস্থায় সরিষা গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, সরিষার তৈল ও আরও কত কি মেথী, জিরে প্রভৃতি ১২ খান মশলায় প্রস্তুত হইয়া থাকে যদিও ইহাতে আগুনের উত্তাপ লাগে না, তথাপি দেখা যায় যে সব মশালা মাখাইয়া ক্রমাগত কয়েকদিন রৌদ্রের তাপে রাখিতে হয়। আসল কথা এই যে, যে কোন উপায়ে হউক তাপে পক্ক করিতেই হইবে।

আমের সদ্য চাট্‌নি—আম ফালা ফালা করিয়া লইয়া, সেই ফালাগুলি থেঁতো করিতে হইবে। তাহার সহিত আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, সরিষার তৈল, কাঁচা লঙ্কা বাটা ও লবণ মিশাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া খাইতে দিলে লোকে তাহার স্বাদ কখন ভুলিতে পারে না। যাঁহারা মিষ্ট প্রিয়, তাঁহারা অল্প চিনি মিশাইয়া লইতে পারেন। লবণ, ঝাল ও মিষ্টের পরিমাণ যাহার যাহা রুচি তদনুসারে ঠিক করিয়া লইতে হয়।

ইংরাজগণ প্রায়ই লেটুস্ সালাদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। লেটুস্ সালাদ সহজে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইংরাজের নিকট ইহা বহু প্রচলিত। বাস্তবিক দেখা যায় যে, তাঁহারা যে কোন জিনিষ দিয়া সালাদ তৈয়ারি করুন না, তাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লেটুস্ থাকিবেই। এই জন্যই বোধ হয় ইংরাজিতে লেটুসের নামই সালাদ হইয়াছে।

আমরা যেমন আমাদের দেশে চাট্‌নিতে মাখাইবার জন্য সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরূপ ইউরোপীয়গণ অলিভ তৈল এবং ভিনিগার (যাহাকে বাঙলায় আমরা সিরকা বলি) ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সিরকা ভাল না হইলে চাট্‌নিতে দুর্গন্ধ হয়। বেশ ভাল সিরকা বা সুরাসার ব্যবহার করা চাই। চাট্‌নি সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ মিঃ সিডনি স্মিথ বলেন যে চাট্‌নিতে যতটুকু তৈল দিতে হইবে তাহার তিন ভাগের এক ভাগ ভিনিগার দেওয়া আবশ্যক। ভিনিগার যত কম ব্যবহার করিয়া কাজ সারা যায় ততই ভাল কিন্তু তৈল যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া চাই। এ বিষয়ে আমরা ইউরোপীয়গণের সহিত একমত হইতে পারি। কিন্তু ইউরোপীয়গণের মধ্যে অনেকে এক্ষণে তৈলের পক্ষপাতী নহেন। যদি তৈল ব্যবহার একেবারেই অমত হয় তাহা হইলে ভিনিগারে

গোলমরিচ গুঁড়া, লবণ এবং আবশুক মত চিনি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া সেই মিশ্রণটি অবশেষে যে বস্তুর চাট্‌নি হইবে তাহাতে ঢালিয়া দিতে হয়। বিলাতের লোকে কখন কখন তৈল, সরিষার গুঁড়া, ভিনিগার, লবণ ও চিনির সহিত দুধ, ডিমের কুসুম ও দুধের পনির ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইউরোপে অনেক ভাল চাট্‌নি প্রস্তুত হয় সত্য কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহারা সিদ্ধ হস্ত তাহা বলা যায় না। ভারতের চাট্‌নির নাম করিলে যেন জিহ্বা দিয়া জল পড়িতে থাকে, কিন্তু রুচিভেদে বোধ হয় আমাদের দেশের চাট্‌নি আমাদের ভাল লাগে, ইউরোপের চাট্‌নি তাঁহাদের মুখপ্রিয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইংরাজদিগের পক্ষে লেটুস্ সালাদের জন্ত একটি প্রধান দ্রব্য। এই লেটুস্ কিন্তু গ্রেট ব্রিটনে ভালরূপে জন্মান যায় না। ইংরাজী লেটুস্ অপেক্ষা ফরাসী লেটুস্ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও খাইতে সুস্বাদু। ফরাসী ক্যাবেজ ও কস্ লেটুস্ উভয় প্রকারই খুব ভাল। ফরাসীরা সর্ব্ব বিষয়ে খুব সৌখীন, তাঁহাদের চাষ আবাদও সৌখীন ধরণের। তথায় লেটুস্ উভয় প্রকারই খুব ভাল। তথায় লেটুস্ চাষ কাচ আচ্ছাদনের মধ্যে অতি যত্নে সম্পাদিত হয়। সাধারণ জমি হইতে উচ্চ ভূমিতে লেটুস চাষের ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করা হয়। তাহাদের লেটুসে কোন ক্রমে পোকা লাগিতে পারে না। ঐ ফরাসী লেটুস যখন সযত্নে প্যাক করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছে তাহা দেখিতে এক জিনিষই সুন্দর। ইংরাজী লেটুসের এত যত্ন লওয়া হয় না সুতরাং তাহা তত ভালও হয় না।

ফরাসীরা আলুর সালাদ করিয়া থাকেন। ফরাসী দুই তিন রকম সালাদের পরিচয় দিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব।

টমাটো সালাদঃ—টমাটোগুলি ফালা ফালা করিয়া কাটিয়া তাহাতে বড় পেঁয়াজের চাকা চাকা কাটা কয়েক খণ্ড দেওয়া হয়। তাহার উপর পার্শলি শাক কুচা, তদুপরি চিনি দিয়া তৈল ও ভিনিগার ঢালিয়া দিতে হয়। যাহাদের পেঁয়াজে বাধা আছে তাহারা পেঁয়াজ অনায়াসে বাদ দিতে পারে, কিন্তু পেঁয়াজ দিলে যেন সালাদ মজে ভাল।

আলুর সালাদঃ—সিদ্ধ আলু ফালা ফালা কুটিয়া তাহার সহিত তৈল ও ভিনিগার মিশাইতে হয়। ইহাতেও পার্শলি কুচান মিশান হয়। তাহার পর অবশেষে ঝাল গোল মরিচের গুঁড়া ও লবণ দিবার প্রয়োজন। আলু ফালাগুলি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া না যায় এরূপ সতর্কভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া মশালাগুলি মাখান কর্ত্তব্য।

আলুর চাট্‌নি ফরাসীগণ গরম গরম খাইতে ভাল বাসেন—সেই সময় ইহা খাইতে অধিকতর সুস্বাদু।

কলার সালাদ :—চারি ছয়টা পাকা কলা ছাড়াইয়া তাহাতে এক পোয়া আন্দাজ বাদাম বাটা মিশাইতে হইবে। ইহাতে অবশেষে লবণ, গোল মরিচের গুঁড়া ও লেবুর রস দিলেই সালাদ প্রস্তুত হইয়া গেল।

ফরাসীরাও আমাদের মত চাট্‌নিতে সরিষার তৈল ঢালিয়া থাকে। আমরা যেমন চাট্‌নিতে সব মশলা মাখাইয়া লইয়া তদুপরি খানিকটা তৈল ঢালিয়া দিই এবং তাহার উপর লবণ ও লঙ্কা গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া থাকি ইহারাও তদ্রূপ করিয়া থাকেন। পার্থক্য এই যে ইঁহারা লঙ্কার তত ভক্ত নহেন। তাহার বদলে গোল মরিচ গুঁড়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইউরোপীয়গণ এখন অনেকে ভিনিগারের বদলে লেবুর রস ব্যবহার করিতেছেন। আমরা ভিনিগার কিম্বা লেবুর রস কদাচিৎ ব্যবহার করিয়া থাকি। চাট্‌নি টক করিতে হইলে কাঁচা কিম্বা পাকা তেঁতুল আমরা ব্যবহার করি।

মেদিনীপুর-কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী—আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে মেদিনীপুরে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী হইবে, এই প্রদর্শনীর যাবতীয় কার্য্য সুসম্পাদনার্থ অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন। বিগত ২রা সেপ্টেম্বর, আমাদের মেদিনীপুরের বর্ত্তমান লোকপ্রিয় কালেক্টর মিঃ ব্র্যাডলীবার্ট মহোদয়ের সভাপতিত্বে যে সভাধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতেই আগামী মাঘ মাসে শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজার দিন, প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাহার পর তিন মাসেরও অধিককাল গত হইয়া গেল, এখনও টাকা আশানুরূপ সংগৃহীত হইল না। আর দু'টী মাস মাত্র আছে, আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়, প্রদর্শনীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যিনি যাহা দিবেন, তিনি তাহা প্রদর্শনীর কোষাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ পাল, উকিল মহাশয়ের নিকট যেন অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন।

আর একটী কথা—মেদিনীপুরে কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী নূতন নহে। প্রদর্শনীর উপকারিতা মেদিনীপুরবাসী অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। প্রদর্শনীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শিত হয়, তজ্জন্য সকলেরই অন্তরের সহিত চেষ্টা করা উচিত। এইজন্য মেদিনীপুরবাসী মাত্রেই উদ্যোগী হউন।

দেশীয় গাছ-গাছড়া—আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর গত হইতে চলিল একবার বলিয়াছিলাম—দেশীয় গাছ-গাছড়াও ইংলণ্ডীয় চিকিৎসায় স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে, ব্রিটীশ ফার্ম্মকোপীয়ার অন্তর্ভুক্ত হইতেছে; সুতরাং ভবিষ্যতে যে দেশীয় গাছ গাছড়ার আদর বর্দ্ধিত হইবে, পাউডার, টিঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ প্রকার মূর্ত্তিভেদের জন্য এই সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ইউরোপ ও আমেরিকায় নীত হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের মেদিনীপুর জেলার প্রধানতঃ জঙ্গল-খণ্ডে এই সকল গাছ-গাছড়া স্বভাবতঃই রাশি রাশি জন্মিয়া থাকে। এইজন্য আমরা সেই সময়েই আমাদের মেদিনীপুরের কোন উদ্যোগী-পুরুষকে জঙ্গল-খণ্ড হইতে ঔষধের গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিয়া ব্যবসায় খুলিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।

আমাদের কথায় আমাদের প্রিয়তম মেদিনীপুর জেলার কেহই কর্ণপাত করেন নাই। তাহার পর বড়ই আনন্দের বিষয়—কলিকাতার "বেঙ্গল-কেমিক্যাল ওয়ার্কস" ও "ইণ্ডিয়ান্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস" গোলঞ্চ, অশ্বগন্ধা ও বাকস প্রভৃতি গাছ-গাছড়া হইতে এক্‌ষ্ট্রাক্ট ও টিঞ্চার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দেশের পরম উপকার সাধিত করিতেছেন এবং আপনারাও লাভবান্ হইতেছেন। জানি না উক্ত কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ দ্বয়ের উদ্যোগী পুরুষ-সিংহগণ কোন্ স্থান হইতে গাছ-গাছড়া ও মূলাদি সংগ্রহ করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস—যদি তাঁহারা মেদিনীপুরের জঙ্গল-খণ্ড হইতে প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়া ও মূলাদি সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অনেক কম মূল্যে, তাঁহাদের প্রস্তুত ঔষধ বিক্রয় করিতে সমর্থ হইবেন।

যাক্, যে কথা বলিব বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, নিম্নে তাহাই বলিতেছি। জনৈক সাহেব, আমাদের কার্য্যালয়ে আসিয়া, অশ্বগন্ধা, শালপাণি, বিশল্যকরণী, মুশাকানী, চাকুলে, বিছুটী, শতমূলী, অনন্তমূল, লালচিতা, বাকস ও শিমূল প্রভৃতি শতাধিক গাছ-গাছড়া ও ফল-মূলের ছাপান-ফর্দ্দ দেখাইয়া অতি বিনীতভাবে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, এই সকল দ্রব্য মেদিনীপুর জেলার কোন্ জঙ্গলে বা কোন্ স্থানে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়?" তিনি জর্ম্মনীর কোন ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানীর এজেণ্ট। তিনি কলিকাতাস্থ "বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্" এ গিয়াছিলেন এবং কয়েক শিশি ঔষধও ক্রয় করিয়াছেন দেখিলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন যে যদি তাঁহারা ঐ সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হন; তাহা হইলে ঐ সকল গাছ-গাছড়ার এক্‌ষ্ট্রাক্ট বা টিঞ্চার প্রস্তুত করিয়া সুলভ মূল্যে ভারতে বিক্রয়ার্থ পাঠাইতে পারিবেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও ভাব-ভঙ্গীতে অদম্য উৎসাহের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম। ঐ সকল ছাপান ফর্দ্দে গাছ-গাছড়ার বিস্তৃত বিবরণ (অর্থাৎ কি প্রকারের গাছ, গাছের বর্ণ কিরূপ, ফল কিরূপ, ফুল কিরূপ, পাতা কিরূপ ইত্যাদি) লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মনে হইল যেন কোন অভিজ্ঞ বৈদ্য ঐ সকল বিবরণ লিখিয়া দিয়াছেন। আমরা ঐ তালিকাস্থ অধিকাংশ গাছ-গাছড়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অনভিজ্ঞ। যাহা হউক, আমরা তাঁহাকে জঙ্গল-খণ্ডের পশুনিদার—মেসার্স ওয়াটসন্ কোম্পানীর চাঁদড়া, রত্নেশ্বর ও শীলদা প্রভৃতির কাছারীতে এবং লালগড় ও রামগড় প্রভৃতি স্থানে গাছ-গাছড়ার অন্বেষণে যাইবার [illegible]

বলিলাম। মিঃ হার্ব্বার্ট্ স্মিথ ঐ সকল স্থানে কোন্ পথে কি উপায়ে পাওয়া যায় তদ্বিষয় লিখিয়া লইয়া, আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চার্লস এঞ্জেল নামক জনৈক সাহেবও গাছ-গাছড়ার অন্বেষণে আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন। সে বোধ হয় আজ সাত আট বৎসরের কথা। তাহার পর হার্ব্বাট স্মীথ সাহেব আসিয়াছেন। মিঃ চার্লস এঞ্জেলের সংবাদ, মিঃ স্মীথ কিন্তু কিছুই জানেন না বলিলেন। ইউরোপীয়গণের কেমন উদ্যম, কেমন উৎসাহ, কেমন অধ্যবসায়, কেমন ব্যবসায়-বুদ্ধি!—"মেদিনী বান্ধব"।

তাতার লোহার কারখানা—পরলোকগত পারস ধনকুবের তাতার প্রতিষ্ঠিত "তাতা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী"র বার্ষিক কার্য্যবিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত একবৎসরে এই কারখানার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে প্রায় আড়াই কোটী টাকা ব্যয়িত হইয়াছে; ইহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, উহা একটী কত বড় অনুষ্ঠান। গত বৎসর প্রত্যহ গড়ে এই কারখানায় সাড়ে ছয় হাজার লোক কাজ করিয়াছে। এই কারখানার লৌহ নিম্নলিখিত স্থান সমূহে বিক্রীত হইতেছে—ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ষ্ট্রেট্ সেটেলমেণ্ট, সিংহল, জাভা, চীন, মাঞ্চুরিয়া, জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড ও ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্। গত বৎসর এই কারখানার সর্ব্ববিধ ব্যয় বাদে প্রায় দুই লক্ষ টাকা লাভ হইয়াছে। কারখানায় যে লৌহ প্রস্তুত হইতেছে, তাহা পাশ্চাত্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কারখানার লৌহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই কারখানায় প্রস্তুত লৌহ বাজারে ক্রেতাগণ খুব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছে। পৃথিবীতে প্রায় সমুদয় দেশ হইতেই কারখানায় অর্ডার আসিতেছে। ভারতবাসিগণও অপর কোন দেশ হইতে ব্যবসায় বুদ্ধিতে হীন নহে, উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলে তাহারাও ব্যবসায় পরিচালন ক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় দিতে পারে।

বাঙ্গালীর অভিনব উদ্যম—বাৎসরাধিক পূর্ব্বে শ্রীহট্টে "কৃষি শিল্পোন্নতি কোম্পানী লিমিটেড" নামে একটী কোম্পানী গঠিত হয়। ইহার পরিচালকগণ অন্যান্য সকল পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আসাম বেঙ্গল রেলপথের নিকট তিন সহস্রাধিক পরিমিত ভূমিখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত একখানি বাগান ক্রয় করিয়া অভিনব উদ্যমে ফলের চাষ আরম্ভ করেন। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের দুই জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এই উদ্যান ও উদ্যানোৎপন্ন ফলমূল দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালীর বিভিন্নমুখীন প্রতিভা এইরূপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

পত্রাদি

আটালু ধরার প্রতীকার—

বোধ হয় বর্ত্তমান বর্ষে গবাদি জন্তুর গায়ে অত্যধিক আটালুর আক্রমণ হইতেছে, কারণ আমরা চারি বা ততোধিক স্থান হইতে আটালু নিবারণের উপায় জানিবার জন্য পত্র পাইয়াছি। আটালু—লাগা গবাদি পশুর গা কার্ব্বলিক সাবান বা কেরোসিন তৈল মিশ্রিত সাবান জলে ধোয়াইলে আটালু অনেক কমিয়া যায়, কিন্তু এই রক্তবীজের বংশ এককালে নির্ব্বংশ করা বড় কঠিন। আটালুর স্বভাব এই যে তাহারা গো, মেষ, মহিষাদির গাত্রের রক্ত খাইয়া স্ফীত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায় এবং ক্রমশঃ অল্পে অল্পে চলিয়া মাটিস্থিত ঘাসপাতা বা খড়কুটার উপর স্তূপাকারে ডিম পাড়ে। সেই স্তূপাকার ডিমের সংখ্যা হয় না এত ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটিয়া আটালু হইয়া আবার জন্তুর গাত্রে ধরে। একটা আটালু মৃত্যুর হাত এড়াইলে রক্ষা নাই, তাহা হইতে সহস্র সহস্র আটালু উৎপন্ন হয়, সেই জন্য একটা আটালু দেখিতে পাইলেও তাহাকে আগুণে ফেলিয়া পুড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য। এই কারণে পল্লীগ্রামে এখনও দেখা যায়, বাটীর কর্ত্তা গরু বাছুরের গায়ের আটালু বাছিবার সময় পাশে আগুণের মালসা লইয়া বসেন। আটালুগুলি আগুণ মালসায় ফেলিয়া পুড়াইয়া ফেলাই উদ্দেশ্য।

তামাকের জল, কেরোসিন ইমলসন্ প্রভৃতি কত কি আটালু নিবারণের ঔষধ "ফসলের পোকা" নামক পুস্তকে বর্ণিত আছে। এই সকল ঔষধে উপকার হয় বটে, কিন্তু এই সকল ঔষধ কতকটা ব্যয়সাধ্য এবং ঔষধ প্রয়োগে একটু কষ্টও আছে। পল্লীগ্রামে একটা সহজ ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। পারিজাত—যাহাকে চলিত ভাষায় পালতে মাদার বলে সেই গাছের ছাল জলে বাঁটিয়া গরু বাছুরের গায়ে মাখাইয়া দিলে দুই দিনে আটালুর উপদ্রব নিবারিত হইবে।

কাসাবা বা শিমুল আলু—

রামনগর হইতে একজন পত্র প্রেরক জানিতে চাহিতেছেন যে কাসাবা কয় প্রকারের আছে এবং সকল প্রকার কাসাবা এদেশে পাওয়া যায় কি না?

দুই রকমের কাসাবা এদেশে আমরা দেখিতে পাই—একটি তিক্ত কাসাবা, অপরটি মিষ্ট কাসাবা। উভয় কাসাবার চাষ করাই চলিতে পারে। তিক্ত কাসাবার যদিও একটি বিষাক্ত রস আছে, কিন্তু কাসাবা সিদ্ধ করিলে ইহার এই বিষগুণ চলিয়া যায়, সুতরাং উভয় কাসাবাই আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে।

নিচুর কোঁকড়া রোগ—

অমূল্যধন সরকার, বশীরহাট,—লিচুগাছের পাতা কোঁকড়াইয়া গাছ খারাপ হইয়া যাইতেছে তাহার প্রতিকার জানিতে চাহেন।

লিচু গাছে এ রোগ দেখা দিবামাত্র কোঁকড়ান পাতাগুলি ডাল সমেত কাটিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। ঐ গাছের তলায় পতিত পাকা পাতাগুলিও কুড়াইয়া পুড়ান আবশ্যক। রোগ গাছময় ছড়াইয়া পড়িলে প্রতিকার কঠিন হইয়া পড়ে। রোগাক্রান্ত গাছে 'স্প্রে'পিচকারী দ্বারা ধৌত করিতে পারিলে উপকার হয়। ইহাতে কিন্তু ব্যয় আছে।

গাছ ধৌত করিবার জন্য নিম্ন লিখিত আরোক প্রশস্ত,—

নরম সাবান	...	...	১০ সের
গন্ধক গুঁড়া	...	...	১ „
জল	...	...	৭॥০ মণ

প্রথমতঃ অল্প ফুটন্তজলে সাবান দিয়া সাবান গলাইয়া লইয়া তাহাতে গন্ধক গুঁড়া ফেলিয়া দিয়া লেইমত করিয়া লইতে হয়। তৎপরে অল্পে অল্পে অবশিষ্ট জল মিশান উচিত।

অনন্ত মূল—

ফকিরচাঁদ চক্রবর্ত্তী, মহুলিয়া; সিংভূম।

অনন্ত মূল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় লিখিয়াছেন—তথাকার বনে জঙ্গলে অযত্নে জন্মে। কি দরে বিক্রয় হয়—চাষে লাভ আছে কি না জানিতে চাহেন।

মাটি হইতে তোলাই খরচ কত এবং রেলে কলিকাতায় পাঠাইতে খরচ কত ইত্যাদি বিশেষ খবর কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রস্তুত কারক বেঙ্গল কেমিক্যাল ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস ও ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ওয়ার্কসের কর্তৃপক্ষকে পত্রদ্বারা জানাইবেন।

যাহা অযত্নে অতি সহজে হয় তাহার চাষে অধিক কিছু লাভ হইবে এমন বোধ হয় না।

বিঘাপ্রতি বীজের পরিমাণ—

আমরা ইতি পূর্ব্বে 'কৃষকে' প্রতি বিঘায় কোন বীজ কত পরিমাণে বপনের আবশ্যক তাহার একটি মোটামুটি তালিকা দিয়াছিলাম। তাহাতে কতিপয় পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন সে তালিকা লিখিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক বীজের আবশ্যক হয়। তদুত্তরে আমরা বলি যে, আমাদের তালিকার পরিমাণ সম্বন্ধে কিছুমাত্র ভুল নাই। আমরা ঝাড়া বাছা বীজের কথাই বলিয়াছি তাহাতে একটিও

অপুষ্ট বীজ থাকিবে না। শস্য বীজ মাত্রেই যে গুলি জলে ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ডুবিয়া যায় সেই বীজই সুপুষ্ট। এরূপ বীজ সমস্ত অঙ্কুরিত হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ সুপুষ্ট অপুষ্ট বীজ মিশ্রিত থাকে, সুতরাং তাহা অধিক মাত্রায় বপন না করিলে কাজ হয় না। আবার ধান সম্বন্ধে দেখা যায় যে চাষীরা প্রতি গর্ত্তে গোছা গোছা বীজ বপন করিয়া থাকে। প্রতি গর্ত্তে একটি বা আবশ্যক মত চারি ছয়টি বীজ গাছ রোপণ করিলেই যথেষ্ট হয়। তাহা হইলে এতটা বীজ ধান নষ্ট করিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু দেখা উচিত যে বরং কিছু বীজ নষ্ট হওয়াও ভাল তথাপি যেন কম না হয়।

বাঙলায় বিজ্ঞান চর্চ্চার নবযুগ—দেশে বিজ্ঞান চর্চ্চার উন্নতির জন্য মহাত্মা মিঃ টি, পালিত তাঁহার জীবনেরউপার্জ্জন দান করিয়াছেন—এমন লোককে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে যাহাতে তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। গত ৩০ শে নভেম্বর সিনেটের এক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি আলোচিত হইবার কথা ছিল (১) মিঃ পালিতের অসামান্য দানের কথা স্মরণ করিয়া সিনেটের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন (২) সিনেটের কোন প্রকাশ্য স্থানে মিঃ পালিতের জীবন্ত তৈলচিত্র রাখা হইবে (৩) প্রস্তাবিত বিজ্ঞানাগারের সম্মুখে মিঃ পালিতের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইলে মিঃ পালিতের প্রতি প্রকৃতই গৌরব প্রদর্শন করা হইবে।

বাঙ্গালার নদনদী—রেলপথ নির্ম্মাণে ও অন্যান্য নানাকারণে বাঙ্গালায় অধিকাংশ নদনদী মজিয়া যাইতেছে। গড়াই নদীতে সেতুনির্ম্মাণের পর উহার খরস্রোত প্রহত হওয়াতে গড়াইয়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, পদ্মার সেতু নির্ম্মাণ শেষ হইলে উহার অবস্থা যে কিরূপ হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না, এদিকে আবার ইচ্ছামতীর উপর আর একটী সেতুনির্ম্মাণের আলোচনা হইতেছে; সম্ভবতঃ শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে। বাঙ্গালার এই সকল নদনদী মরিয়া গেলে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

মহিষ-দুগ্ধ—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন যে গরুর দুগ্ধ অপেক্ষা মহিষের দুগ্ধ অনেক উপকারী। মহিষের দুগ্ধে অনেক মাখন উৎপন্ন হয়।

স্বদেশী প্রদর্শনী—কলিকাতার ধর্ম্ম সমবায় লিমিটেডের তত্বাবধানে যে সুপ্রশস্ত প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই প্রাসাদের নিম্নতলে স্থায়ীভাবে একটী স্বদেশী প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই প্রদর্শনীতে স্বদেশী দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইবে। আগামী জানুয়ারী মাসে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইবে।

আমদানী ও রপ্তানী—গত অক্টোবর মাসে কলিকাতা বন্দরে প্রায় ৬৭ লক্ষ টাকার জিনিষ কম আমদানী হইয়াছে। কিন্তু কলিকাতা বন্দর হইতে এবার ১৭৪ লক্ষ টাকার জিনিস বেশী রপ্তানী হইয়াছে। রপ্তানী জিনিস সমূহের মধ্যে পাট ৫৪ লক্ষ, পাট নির্ম্মিত দ্রব্য ৭৩ লক্ষ, চা ১৭ লক্ষ এবং চর্ম্ম ২০ লক্ষ টাকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাণিজ্য কলেজ—বোম্বাই সহরে এক "বাণিজ্য-কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হইবে, বাণিজ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষাদানই উদ্দেশ্য। এতৎকল্পে বোম্বাইয়ের অন্যতম প্রসিদ্ধ সদাগর স্যার চিনু ভাই মাধবলাল বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের হাতে একলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইহার সুদে উপদেশক নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে; তিনি বাণিজ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। এই উপদেশের বিষয় গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্দেশ অনুসারেই স্থিরীকৃত হইবে। এই কলেজে এক পুস্তকালয়ও থাকিবে; তাহাতে বাণিজ্য সম্পর্কীয় বিবিধ গ্রন্থ সংরক্ষিত হইবে। যতদিন না উপদেশক সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে, ততদিন স্যার চিনু ভাইয়ের প্রদত্ত টাকার সুদে পুস্তকাদি সংগ্রহ বা কলেজ সম্পর্কীয় অন্যান্য কার্য্য চলিতে থাকিবে।

মৎস্য টাট্‌কা (তাজা) রাখার উপায়—বরফের পরিবর্ত্তে কারবণিক এসিডের গ্যাস (Carbonic Acid Gas) দ্বারা মৎস্য টাট্‌কা রাখিবার এক প্রকার নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই নূতন উপায়ে বরফের খরচার ৮ ভাগের ১ ভাগ খরচায় মৎস্য টাট্‌কা রাখিতে পারা যায়। কেবলমাত্র একটী কারণে এই প্রণালী কার্য্যে পরিণত করা যাইতেছে না। এই নূতন প্রণালী রডল্‌ফ (H. T. Roudolph Hemming, Cheltenham) নামক একজন আইনজ্ঞ দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে। মাছ টাট্‌কা রাখিতে হইলে, মাছ হইতে সমস্ত হাওয়া বাহির করিয়া দিলে মাছ টাট্‌কা থাকে। নিম্নলিখিতরূপে মাছ হইতে সমস্ত হাওয়া বাহির করিয়া দিতে পারা যায়। একটী আবদ্ধ পাত্রে মাছ রাখিয়া ১ বর্গ ইঞ্চে ৬০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০ সের পরিমিত চাপে এই গ্যাস পাত্রে প্রবেশ করাইতে হয়। ইহার সফলতা প্রমাণের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

গোবর ও গোমূত্র সংরক্ষণ—যেরূপ ভাবে পল্লীগ্রামে গোবর সঞ্চিত হয় তাহাতে মূত্রের ভাগ অতি কমই থাকে, ও বাহিরে ফেলিয়া রাখার দরুণ উহার সারাংশ অনেক পরিমাণে ধুইয়া যায়। যত্নপূর্ব্বক সঞ্চিত ও সংরক্ষিত গোবর ও মূত্রের গুণ সাধারণ গোবরের অপেক্ষা বেশী।

আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানে জ্বালানি কাষ্ঠের অভাবে লোকে ঘুঁটে ব্যবহার করে। গোবর জ্বালাইলে উহার অভ্যন্তরস্থ অধিকাংশ সার পদার্থ নষ্ট হয়, ছাই মাত্র থাকে। ছাইয়েও সার থাকে, কিন্তু গোবরের অপেক্ষা কম। গোবর সার ও গোবরের ছাই সার পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, ছাই অপেক্ষা গোবর ক্ষেতে দিলে ফসল মাত্র ১৷৷০ বা কখন কখন দুইগুণ বাড়িয়া যায়। সুতরাং গোবর মিলিলে আর গোবরের ছাইয়ের অপেক্ষা করা উচিত নহে। যেখানে গোবর পুড়াইতে হয়, তথায় অগত্যা ছাই ব্যবহার করিতেই হইবে। যেখানে জ্বালানি কাঠ বা পাথুরে কয়লা সস্তা পাওয়া যায়, সেখানে গোবর কদাচ জ্বালাইয়া নষ্ট করা উচিত নহে। যত্ন করিলে বেড়ার ধারে, ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে অথবা স্বতন্ত্র জমিতে জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য নানা রকম গাছ জন্মাইতে পারা যায়।

আমাদের দেশে সারের উদ্দেশ্যে গোমূত্র রাখিবার কোন ব্যবস্থা নাই। বস্তুতঃ গোবরের অপেক্ষা গরুর চোনায় বেশী সার পদার্থ থাকে। সুতরাং যাহাতে গোমূত্রের অপচয় না হয় উহার ব্যবস্থা করা উচিত। গরু চরিতে গিয়া যে মূত্র পরিত্যাগ করে, উহা ধরিয়া রাখা অসম্ভব, কিন্তু গোয়ালের ভিতর যে চোনা পড়ে উহারও অধিকাংশ মাটীর ভিতর চলিয়া যায় ও নষ্ট হয়, ইহা আক্ষেপের বিষয়। ইচ্ছা করিলে গোমূত্রের সারাংশ অল্প আয়াসেই ধরিয়া রাখা যায়। গোয়াল ঘরের মেজের উপর এক স্তর ধূলা মাটী ছড়াইয়া রাখিয়া দিলে, উহাতে চোনা শুষিয়া লয়। এক স্তর মাটীতে যত পারে চোনা শুষিয়া লইলে, উহা সরাইয়া আর এক স্তর গুঁড়া মাটী ছড়াইয়া দিতে হয়। ভিজা মাটী শুকাইয়া বার বার উহার ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোয়াল ঘরের মেজের মাটীতেও অনেক চোনা শুষিয়া লয়, মধ্যে মধ্যে চাঁচিয়া লইলে এই মাটীও উৎকৃষ্ট সারের কাজ করে। কোন কোন লোকে এইরূপে চোনার সার সংগ্রহ করিয়া থাকে; কিন্তু এই প্রথা আপাততঃ অতি বিরল।

আমাদের দেশের লোকে ভাল করিয়া গোবর রাখিতে জানে না, অথচ জানিয়াও রাখে না। সাধারণতঃ দেখা যায় গোয়ালের বাহিরে একটা গোবরের গাদা থাকে, উহার উপর রোজ গোবর ফেলা হয়; রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য চালা বা কোনরূপ আচ্ছাদন থাকে না। ফলে এই হয়, গোবরে যে সার পদার্থ থাকে, উহার অধিকাংশ বৃষ্টিতে ধুইয়া যায়, অথবা রৌদ্রের তেজে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। যদি একটা বড় গর্ত্ত করিয়া উহাতে গোবর রাখা যায়, বৃষ্টি ও রৌদ্র না লাগে এরূপ

ভাবে গর্ত্তের উপর এক খানা চাল তুলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোবরের সারাংশের প্রায় সমস্তই সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। চাল ঘরের চালের মত পুরু করিয়া না ছাইলেও চলে। দুচার ফোঁটা বৃষ্টি এবং সামান্য রৌদ্র পাইলে ক্ষতি না হইয়া বরং উপকার হয়। গোবরস্তূপ খুব শুকাইয়া গেলে অল্প জলের ছিটা দিয়া সরস করিতে হয় এবং গোময় পচাইবার জন্য তাপের আবশ্যক, সেইজন্য সামান্য রৌদ্র পাওয়া ভাল। বৃষ্টির জল গড়াইয়া গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ না করে, এই হেতু গর্ত্তের চারিধারে আইল বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রত্যহ গোয়াল হইতে গোবর আনিয়া গর্ত্তে ফেলিতে থাক, মধ্যে মধ্যে কোদাল দিয়া গোবরের স্তূপ সমতল করিয়া পিটাইয়া দেও। দেখিও যেন বেশী আলগা না থাকে। গর্ত্তের চারিধারে ও তলায় খুব আটাল মাটী পুরু করিয়া লেপিয়া দিলে ভাল হয়, কেননা তাহা হইলে গোবরের রস চারি পাশের ও তলার মাটীর ভিতর সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইরূপ দুইটী বা ততোধিক গর্ত্ত থাকা উচিত, কারণ পুরাতন গোবরের সহিত নূতন গোবর মিশান ঠিক নহে। গর্ত্ত ভরিয়া গেলে গোবরের উপর এক স্তর মাটীর আচ্ছাদন দিলে ভাল হয়; নতুবা সারের কিয়দংশ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে।

গরুর এঁষো রোগ—এই প্রদেশে এঁষো রোগের অনেক নাম আছে, যথা—আইষু, বাদলা, খুরা, চপকা, খুরেফুটা, সবথার। এই রোগ এক প্রকার সংক্রামক জ্বর, জ্বরের সহিত জিহ্বা, খুর ও পালানে ফোষকা বাহির হয়। জিভ্ গরম হইয়া উঠে, গরু ঠোঁঠ চাটিতে থাকে ও মুখ হইতে লালা পড়ে। ২০ ঘণ্টার মধ্যে ফোষকাগুলি ফাটিয়া লাল কাঁচা ঘা জন্মে; ঘা গুলি আয়তনে দুয়ানির মত। ঘার দরুণ গরু খাইতে পারে না ও খোঁড়াইয়া হাঁটে। বসন্ত রোগে যেরূপ অতিসার অথবা আমাশয় থাকে, আইষু রোগে সেরূপ থাকে না। যত্ন করিলে গরু ১৫ দিনে আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু যত্নের অভাব হইলে অথবা রোগী গরুকে খাটাইলে, জ্বর বাড়িয়া উঠে, পা ফুলিয়া পড়ে, ফোড়া জন্মে, খুর খসিয়া পড়ে, এবং রোগী ১০ দিনের মধ্যে মরিয়া যায়।

চিকিৎসা ও পথ্য।—রোজ দুইবার নিম্নলিখিত ঔষধ দিয়া মুখ ধুইয়া দেও:—

ফিট্‌কিরি ১½ তোলা ও জল ১০ ছটাক।

পায়ের সমস্ত ময়লা ধুইয়া নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ কর, তাহা হইলে খুরের ঘায়ে মাছি বসিয়া পোকা পড়িতে পারিবে না:—

আল্‌কাতরা ৪ ভাগ ও তারপিন্ ½ অর্দ্ধ ভাগ। অথবা—

চা খড়ি চূর্ণ	২ ছটাক	ভাল করিয়া চূর্ণ করিয়া ঘায়ের উপরে ছিটাইয়া দিবে।
কাঠের কয়লা গুঁড়া	½ ,,	
ফিট্‌কিরি	¼ ,,	

শুদ্ধ পাতলা করিয়া রাঁধা ভাত ও নরম ঘাস খাইতে দিবে।

নিবারণের উপায়।—পীড়িত গরুকে সুস্থ গরু হইতে দূরে একটী স্বতন্ত্র ঘরে রাখিবে। যে পাত্র পীড়িত গরুতে চাটিয়াছে, সে পাত্র সুস্থ গরুতে চাটিলে তাহারও ব্যারাম হইবে। সুতরাং ব্যারামী গরু আর সুস্থ গরুকে কদাচ একপাত্রে খাওয়াইবে না। গামলা, খুঁটি ইত্যাদি যে কোন জিনিষ পীড়িত গরুর সংস্পর্শে আইসে, সমস্তই চুণ মিশ্রিত ফুটন্ত জল দিয়া ধুইবে।

সার-সংগ্রহ

বৈজ্ঞানিকের আশঙ্কা

বৈজ্ঞানিকদল বলেন,—গাছপালাই দেশ বিশেষের উত্তাপবৃদ্ধির কারণ; যে দেশে যত গাছপালা, কোন প্রতিকূল অবস্থায় অবস্থিত না হইলে সাধারণতঃ সেই দেশে গরমের মাত্রা অধিক। ইহার কারণ আমরা পরে আলোচনা করিব।

গাছপালা দেশবিশেষের আবহাওয়ার উপর কার্য্য করিবে, শুনিতে একটু আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বিজ্ঞানের দিক্‌দিয়া আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা সপ্রমাণ হইবে। গাছপালারা যে কেবল দেশ বিশেষের আবহাওয়াকে নিয়ত পরিবর্ত্তিত করিতেছে, তাহা নহে, ইহা পৃথিবীর মোট উত্তাপের মাত্রার উপর নিয়ত কার্য্য করিতেছে। বৈজ্ঞানিকেরা আশঙ্কা করিতেছেন, এই উত্তাপের সামঞ্জস্যের অভাবে পৃথিবী এককালে বহু প্রাচীন অবস্থায় ফিরিয়া যাইতেও পারে।

এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের প্রধানযুক্তি হইতেছে, বায়ুতে কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড (Carbon dixode) নামক কার্ব্বনের (Carbon) একটি যৌগিকের (Compound) প্রাচুর্য্য।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, যে সকল পদার্থ আলোক এবং আলোকপ্রদ উত্তাপ পরিচালনা করিতে সমর্থ নহে। যেমন কাঁচ, কাঁচখণ্ডের ভিতর দিয়া কেহ যদি সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন ঐ কাঁচ কখন্ উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে সূর্য্যরশ্মির পথকে প্রতিহত করিতে পারিবে না। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি কাঁচের ঘর করিয়া এই কলিকাতার Botanical garden এ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের গাছপালা রক্ষিত হইয়া থাকে। কাঁচ-গৃহের ভিতর দিয়া অনায়াসে উত্তপ্ত সূর্য্যরশ্মি বেশ করিয়া

মাটীকে উত্তপ্ত করিতে পারে; সন্ধ্যা হইলে পৃথিবী দিনের উত্তাপ বিকিরণ করিতে থাকে এবং তাহা শূন্যে চলিয়া যায়, কিন্তু কাঁচের গৃহ-আবদ্ধ ভূমি খণ্ড যে উত্তাপ ত্যাগ করে তাহা কাঁচের ঘরেই আবদ্ধ রহিয়া যায়—কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাঁচ আলোক বিহীন উত্তাপ-পরিচালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। এইরূপে মৎস্য ব্যবসায়ীর কৌশলনির্ম্মিত পিঞ্জরের ন্যায় কাঁচ আলোকরশ্মিকে প্রবেশ দান করে কিন্তু ধরণীত্যক্ত উত্তাপকে কাঁচ কখনও ছাড়িয়া দেয় না।

সর্ব্বপ্রথমে পণ্ডিতপ্রবর টিণ্ডল্ সাহেব (Tyndall) কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইডের, কাঁচের ন্যায় এই পরিচালন কর্ম্মটি আবিষ্কার করেন। পরিচালন ব্যাপারে কার্ব্বন ডাইঅক্সইড ও কাঁচ সম-ধর্ম্ম বিশিষ্ট। বায়ুমণ্ডলে (Atmosphere) সাধারণতঃ তেরো-ভাগের একভাগ কার্ব্বন ডাইঅক্সাইডে পূর্ণ। এই কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড্ সূর্য্যরশ্মিকে কোনক্রমে বাধা দিতে পারে না, কিন্তু দিনান্তে এবং অপর যে কোন সময়েই হউক পৃথিবী যখন উত্তাপ ত্যাগ করিতে থাকে, তখন কার্ব্বন ডাইঅক্সোইড তাহা শূন্যে চলিয়া যাইতে দেয় না; ঠিক কাঁচের ঘরের মতই তাহা সমস্ত পৃথিবীকে একটি আবরণ দান করে। সুতরাং যে সকল স্থানে কাঃ ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অধিক, সেই সকল স্থানে উত্তাপের মাত্রাও অধিক হইয়া পড়ে। বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন (Nitrogen) ও অক্সিজন (oxygen) কাঃ ডাইঅক্সাইডের ন্যায় উত্তাপ পরিচালক নহে।

প্রথম প্রশ্ন হইতে পারে, কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইডের উৎপত্তি কিরূপে হয়? সাধারণতঃ কোন দ্রব্যের দহন (Combustion) দ্বারাই এই বাষ্পের উৎপত্তি দেখা যায়। তন্মধ্যে পাথুরিয়া কয়লা জিনিসটা বহু প্রাচীন যুগের গাছপালার রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই নহে। কোন এক আদিমযুগে যখন পৃথিবীতে কেবল গাছপালারই জন্ম ছিল, ভূমিকম্প বা অন্য কোন নৈসর্গিক কারণে বহু বৃক্ষযুক্ত ভূমিভাগ এককালে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। মৃত্তিকালুপ্ত সেই বনভূমি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়া কালো পাথুরিয়া কয়লার আকার ধারণ করিয়াছে। আজকালকার বৃহৎ বৃহৎ কয়লার খনিগুলি প্রাচীন যুগের এক একটি বৃহৎ বনভূমির রূপান্তরিত অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বনভূমি যত বৃহৎ হয় কলার খনি ততই গভীর দেখা যায়।

যে যুগে এত গাছপালার জন্ম ছিল, তখন পৃথিবীর অবস্থা নিশ্চয়ই এখনকার ন্যায় ছিল না। তখন বায়ুমণ্ডলে এত বাষ্প ছিল যাহা উদ্ভিদের পুষ্টি সাধন করিতে শক্তিশীল। বৈজ্ঞানিক ভূস্তর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পৃথিবীর সেই শৈশবকাল বর্ত্তমান কাল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পৃথিবী এককালে শীতলতা প্রাপ্ত হয় নাই; ধীরে ধীরে শীতল হইয়াছে।

গাছপালার যুগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল এবং উদ্ভিদ জন্মের প্রাচুর্য্যের নিমিত্ত বায়ুতেও পূর্ব্বোক্ত কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইডের প্রভূত প্রাচুর্য্য লক্ষ্য হইত। কারণ উদ্ভিদশরীর গঠনে বাষ্পটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য। বৃক্ষ যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বৃক্ষদেহে উক্তবাষ্প প্রচ্ছন্নভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কয়লা বা কাঠ পোড়াইলেই আমরা তাহার পরিচয় পাই।

আজকাল আমরা খনি হইতে সেই রূপান্তরিত বৃক্ষদেহ পোড়াইয়া বায়ুমণ্ডলকে নিয়ত কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড বাষ্প দ্বারা কলুষিত করিতেছি। পৃথিবীতে দহনকার্য্যের মাত্রানুযায়ী বাতাসের কারণ ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ কমবেশী হইয়া পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্নস্থানের কয়লাখনির হিসাব লইয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

দেশের নাম	কয়লা-খনির জমির পরিমাণ
চীন্ ও জাপান একত্রে	২০০,০০০ বর্গমাইলে
যুক্ত রাজ্য	১৯৪,০০০
ভারতবর্ষ	২৭,০০০
এশিয়া সাম্রাজ্য	৯০০০
গ্রেট ব্রিটেন্	৩৬০০
জার্ম্মণি	১৮০০
ফ্রান্স	১৪০০
স্পেন	১২০০০

উল্লিখিত তালিকার বর্গমাইলব্যাপী যে বিস্তৃত কয়লাস্তূপ ভূগর্ভে সঞ্চিত হইয়া আছে, এক সময়ে যখন তাহা সম্পূর্ণ দগ্ধ হইয়া বায়ুমণ্ডলে প্রচুর কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড রূপে পরিবর্ত্তিত হইবে, তখন এ পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য থাকিবে কি না আশঙ্কা করিয়া পণ্ডিতগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিকগণের এই আশঙ্কা কেবল যে কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইডের বিষসঞ্চার ধর্ম্মের জন্য, তাহা নহে, উত্তাপ পরিচালনে ইহার পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মবিশেষটিই এই আশঙ্কার মূলভিত্তি। পরীক্ষা দ্বারা তাঁহারা দেখিয়াছেন, যে দেশের বায়ুতে বিষাক্ত কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড বাষ্পের পরিমাণ অধিক, সেই দেশের আবহাওয়া সাধারণতঃ অন্যান্য দেশ হইতে অধিক উষ্ণ। বায়ুমণ্ডলের শতাংশের একাংশ সাধারণতঃ উক্ত বাষ্পটি অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। বায়ুতে এই পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি হইলে পৃথিবী উষ্ণ বা শীতল হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড বাষ্পটি পৃথিবীর উত্তাপকে শূন্যে চলিয়া যাইতে দেয় না; সুতরাং ইহা পৃথিবীর উপর একখানি পর্দ্দার ন্যায় কার্য্য করিতেছে। সূর্য্যোত্তাপের আসিকে বাধা দেয় না বটে; কিন্তু পৃথিবীত্যক্ত উত্তাপকে ছাড়িয়া দেয় না। এই জন্যই ইহার বৃদ্ধি হইলে দেশের অধিকতর উত্তাপের বৃদ্ধি

হইয়া পড়ে। মেরু প্রদেশে কাঃ ডাইঅক্সাইড নাই বলিয়াই সেস্থান শীতপ্রধান, মেরু প্রদেশ ছাড়াইয়া ক্রমশঃ কাঃ ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি অনুসারে উত্তাপ মাত্রারও বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে। সমগ্র পৃথিবীতে দিন দিন যতই পাথুরিয়া কলয়ার প্রচলিত হইতেছে, বায়ুমণ্ডলে কাঃ ডাইঅক্সাইড বাষ্পের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিতেছে। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা বিভিন্নদেশের আকাশে যে পরিমাণ কাঃ ডাইঅক্সাইডের বাষ্প হিসাব করিয়াছেন, তাহা সত্যই ভীতিপ্রদ; কিন্তু সে ভীতি আমাদের সুদুর ভবিষ্যৎ বংশের জন্য বলিয়াই নিস্তার। কোন্ দেশে কোন্ বৎসরে কত টন্ কয়লা পোড়ানো হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

দেশের নাম

খৃষ্টাব্দ	আমেরিকার যুক্তরাজ্য	গ্রেট ব্রিটেন্
১৮৪৫	৪০০১০০ টন	৩১০০০০০ টন
১৮৬৪	৫০০০০	৯০০০০০
১৮৭৪	২০০০০	১২৫০০০০
১৮৮৪	৫০০০০	১৬০০০০
১৮৯৪	৬০০০	১৬৪০০০০
১৮৯৯	১৫০০০০	১৬০০০০০

চীন, জাপান, ভারতবর্ষ, এশিয়া, জর্ম্মাণি, ফ্রান্স, স্পেন, বেলজিয়ম্ প্রদেশের কয়লা ব্যয়ের পরিমাণও কতকটা উক্ত তালিকানুরূপ।

দহন ব্যাপারটি বায়ুর অক্সিজেনের বিনাশ এবং বায়ুতে কাঃ ডাইঅক্সাইডের সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। উক্ত তালিকাহিসাবে কয়লা দগ্ধ হইলে বায়ুতে কি পরিমাণে কাঃ ডাইঅক্সাইড বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় তাহা সহজেই অনুমেয়।

আজকাল কয়লার খনি হইয়া বায়ুতে অধিক পরিমাণে কাঃ ডাইঅক্সসাইড বাষ্প সঞ্চিত হইতেছে। তা ছাড়া শ্বাসপ্রশ্বাসেও পাথুরিয়া কয়লার প্রচলনে বায়ুর কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড বাষ্প দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। এই প্রচুর বাষ্প আকর্ষণে সঞ্চিত হইয়া ঠিক একটি পর্দ্দার ন্যায় কার্য্য করিতেছে। পৃথিবীও এই কারণে দিন দিন উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর সমস্ত কয়লার খনি নিঃশেষ হইয়া যাইলে, পণ্ডিতগণ আকাশে এত প্রচুর পরিমাণ কার্ব্বন্ ডাইঅক্সাইড বাষ্পের অস্তিত্ব অনুমান করিতেছেন যে তখন পৃথিবীতে মানুষের রাজত্ব শেষ হইয়া তাহা প্রাচীনকালের ন্যায় পুনর্ব্বার প্রবল উষ্ণ হইয়া উঠিবে সুতরাং সে সময় গাছপালা ব্যতীত পৃথিবীতে অন্য কোন প্রাণী বা জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। পৃথিবীর এই বিপদের আশঙ্কায় পণ্ডিতগণ মানবসভ্যতার কয়লা প্রধান উপকরণ গুলি একান্ত বর্জ্জনীয় বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন; কিন্তু মানুষ সেই সুদূরকালের কথা চিন্তা করিতেছে না। ভবিষ্যৎ-আশঙ্কা দেখিয়াও মানবসভ্যতার এই ঔদাসিন্য জানিন, বৈজ্ঞানিকের চোখে কতদূর সমীচীন। শ্রীআনন্দ রায়। (বঙ্গবাসী)

মফঃস্বলে জলকষ্ট

দূরীকরণের চেষ্টা

(১)

নদীয়ার চুয়াডাঙ্গা সবডিভিসনের অন্তর্গত লোকনাথপুর একখানি গণ্ডগ্রাম। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষক এবং যে কয়েকঘর মধ্যবৃত্তি গৃহস্থ আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই উদরান্ন-সংস্থানের জন্য বিদেশবাসী। এই গ্রামে প্রায় তিন শত ঘর লোকের বাস। গ্রামের প্রান্তস্থিত এক বহু প্রাচীন জলাশয় হইতে এই গ্রামে জল সরবরাহ হইয়া থাকে। এই লোকনাথপুরের "বিল" সুপেয় ও স্বাস্থ্যকর জলের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ছিল। এখন তাহা স্বপ্নের কথা হইয়াছে। এই গ্রামের পূর্ব স্বাস্থ্য এত উত্তম ছিল যে, পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত আত্মীয়-স্বজন এই গ্রামে আসিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতেন। ম্যালেরিয়ার বিভিষীকা-মূর্ত্তী এ গ্রামে কখনও দেখা যায় নাই। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ যখন দারুণ বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইত, তখনও এগ্রাম সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকিত। এই জলাশয়ই তাহার একমাত্র কারণ। পূর্ব্বে নীলকরদিগের সময়ে তাঁহাদের যত্নে ইহার অবস্থা উন্নত ছিল। তাঁহাদের প্রস্থানের পরও কয়েক বৎসর ইহার জলনিকাশ ও বর্ষাকালে বন্যার জল-প্রবেশের জন্য একটা কাটা খাল ছিল। জমিদার মহাশয়দিগের অযত্নে ও কৃষিকার্য্যের প্রাবল্যে এই খাল এখন ভর্ত্তি হইয়া বিলের গর্ভ হইতে উচ্চ হওয়ায় কয়েক বৎসর হইতে ইহাতে আর বর্ষাকালেও জল আসে না। এবং এই জলকষ্টের কারণ ও ইহা দুরীকরণ জন্য গ্রামস্থ লোকেরা চেষ্টাও করিয়াছিলেন কিন্তু কোন ফলই হয় নাই। ক্রমে এই চিরকালের জলসরবরাহকারী জলাশয়টি মজিয়া গেল। ফলে ক্রমে ক্রমে ম্যালেরিয়া বিসূচিকা প্রভৃতি রোগ আসিয়া তাহাদের অধিকার স্থাপন করিতে লাগিল। গ্রাম্য মধ্যবৃত্ত ভদ্র-সন্তানগণ তৎকালীন সবডিভিসন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের শরণাপন্ন হইয়া অনেক কষ্টে গ্রামে কএকটি ইন্দারা প্রস্তুত করিয়া লইলেন। কিন্তু ইহাতে জল-কষ্ট নিবারণ হইল না। গ্রামস্থ সাধারণ লোকে সেই বিলের অস্বাস্থ্যকর ও দুর্গন্ধযুক্ত জল পান করিতে লাগিল। সেই ঘোর রক্তবর্ণ বিশিষ্ট পচা জল পান করিয়া এবৎসর অনেক লোক আমাশয় বিসুচিকা প্রভৃতি রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

এই সকল দুর্ঘটনা ঘটায়, দারুণ জল কষ্টে প্রপীড়িত হইয়া গ্রামস্থ কএকটি সহৃদয় যুবক এই জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহাদের উদ্যোগ, আয়োজনও যথেষ্ট। তাঁহারা কয়েকটি সভা আহুত করিয়া কৃষকদিগকে ইহার উপযোগিতা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই বৃহৎ ব্যাপার

কার্য্যে পরিণত করিতে অন্ততঃ চারি পাঁচ হাজার টাকার প্রয়োজন। তাই তাঁহারা একটি "লিমিটেড কোম্পানি" গঠিত করিয়া ইহার অংশ বিক্রয়ের দ্বারা কার্য্য করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এবং জলাশয়টি জমিদার মহাশয়ের নিকট হইতে মৌরসী করিয়াও লইয়াছেন। অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধে কয়েকটি সভা সমিতিতে অংশ ক্রয়ের জন্য অনেকে মেম্বর-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছেন। টাকা সংগ্রহ কোন প্রকারে হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু কিভাবে এই কার্য্য করিতে হইবে ও এই বৃহৎ ব্যাপার কার্য্যে পরিণত করিতে কাহার কাহার শরণাপন্ন হইতে হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। তবে আশা করা যায় যে এ বিষয় কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত হইলে ইহার ব্যবস্থা হইবে। শ্রীতারিণীচরণ বসু লোকনাথপুর জয়রামপুর নদীয়া।

(২)

মহেশতলা গ্রাম একটি স্বাস্থ্যকর জায়গা বলিয়া লোকের মনে এতদিন ধারণা ছিল এবং এজন্য স্থানীয় লোক গৌরব করিতে পারিত। কিন্তু গত ৩।৪ বৎসর হইতে তাহাদের সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, মহেশতলা এক্ষণে এরূপ অস্বাস্থ্যকর হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকে পলাইতে পারিলে বাঁচে। এখন প্রত্যেক বাড়ীতেই রোগীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গ্রামের স্বাস্থ্যহানির একমাত্র কারণ একটা হাজা মজা খাল। খালটী, স্থানীয় জমীদার "বন্দ্যোপাধ্যায়" মহাশয়দিগের, ইহাঁদের দ্বারাই প্রজাবিলী করা আছে। প্রত্যেক প্রজা নিজ নিজ অংশ চিহ্নিত করিবার ছলে বেশ লম্বা চওড়া বাঁধ দিয়াছে। কাজেই যেখানকার জল সেই খানেই শুকায়। ইহা বাদে বিলাতী পানার জন্য খালটীর আরও দুর্দ্দশা হইয়াছে। পয়সা খরচের ভয়ে প্রজারা এই সকল আবর্জ্জনা কখন ও পরিষ্কার করে না। খালটী যাহাদের নিকট বিলীকরা আছে; তাহারা প্রায় অধিকাংশই জাতিতে পোদ এবং অশিক্ষিত! এরূপ প্রজাদিগের মধ্যে স্বাস্থ্যতত্বের কথা বুঝাইয়া কোনই ফল নাই। জমীদারসকাশে প্রতীকারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই সদাশয় নবীন [illegible] কর্ত্তা লর্ড কারমাইকেল মহোদয় আমাদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন এবং তাঁহার গোচরে আনিলে আমরা সফলমনোরথ হইতে পারিব, এই আশায় আমাদের দুরবস্থার কথা আপনার গোচরে আনিলাম।

শ্রীকানাইলাল ঘোষ, মহাদোনগর মহেশতলা, ২৪ পরগনা। (বসুমতী)

———

আমাদের কৃষি ও শিল্প

বঙ্গদেশের, শুধু বঙ্গদেশের বলি কেন এই সমগ্র ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবি। কৃষির উন্নতি অবনতির উপরই তাহাদের সুখসচ্ছন্দতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। ইহারাই সমগ্র দেশের খাদ্য যোগাইতেছে, অথচ ইহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা ভাবিতেগেলে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। ইহাদের পরিশ্রমজাত শস্যের দ্বারাই সকলের উদর পুর্ত্তি হয় অথচ ইহাদের দিকে তাকাইবার লোক নাই। দেশের অনেক লোকই এখন শিক্ষিত হইতেছে। শিক্ষাভিমানে অনেকেরই হৃদয় স্ফীত। কিন্তু এই শিক্ষা শুধু চাকুরি করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা, আপন আপন নীচ বিলাস বৃত্তি চরিতার্থ করা ব্যতীত অন্য কোনও মহৎ উদ্দেশ্য নিয়োজিত হইতে বড় একটা দেখা যায় না। দেশে অর্থাগমের পথ সুপ্রশস্ত করা, কৃষির উন্নতি বিধান করা, স্বাধীনভাবে নিজ জীবিকা উপার্জ্জন করা প্রভৃতি উদ্দেশ্য বর্ত্তমান শিক্ষায় সংসাধিত হয় না অন্ততঃ হইতেছে না ইহা নিশ্চয়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষি ও কৃষককুলের উন্নতি ব্যতিরেকে এদেশের কিছুতেই মঙ্গল নাই ইহা অনেকেই বোধ হয় উপলব্ধি করিতে পারেন। যাহাদিগকে আমরা নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া থাকি তাহাদিগের অবস্থা উন্নত না হইলে, তাহাদের হস্তে প্রচুর অর্থ না আসিলে উচ্চশ্রেণীর অবস্থা কেবল চাকুরি দ্বারা চিরকাল সমভাবে রক্ষিত হইবে না, হইতে পারে না। রাজ অনুগ্রহে এবং যশ খেতাব ও পদমর্য্যাদা লাভের নিমিত্ত অনেকেই অনেক স্থানে স্কুল কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় মনোযোগি হইয়াছেন। কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে তাহাতে কেবল কেরাণী কুল সৃষ্টি হইতেছে বৈতো নয়? দেশের সাধারণ লোকদের ভিতরও এই প্রকার শিক্ষা প্রচারের একটা ধুয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই প্রকার শিক্ষা দেশের পক্ষে কতদুর কল্যাণকর হইবে তাহা কেহ একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বর্ত্তমান শিক্ষা যে যে সমাজেই প্রবেশ লাভ করিয়াছে সেইখানেই নিজ নিজ ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া চাকুরির একটা অদম্য পিপাসা জাগ্রত করিয়া দিয়াছে।

ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে চাকুরি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার চীৎকারে কর্ণ বধির করিয়া দিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে। অথচ প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নিজ নিজ ব্যবসায়, যত্ন ও চেষ্টার অভাবে, দিন দিন লোপ পাইতে বসিয়াছে। এইরূপে দেশের শিল্পিকুল চাকুরির লোভে নিজ পায়ে নিজে কুঠারমারিতে প্রস্তুত।

যাহা হওয়া স্বাভাবিক তাহাই হইতেছে। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন জনসাধারণ যে তাহাদিগের সেই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন

করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? এ বিষয়ে যে গবর্ণমেণ্ট কতক পরিমাণে দায়ী নহেন তাহা নহে। দেশের জমীদারবর্গও এবিষয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন। ভাষাশিক্ষার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন, কৃষি ও শিল্পশিক্ষার নিমিত্ত ততটা করিয়াছেন কি? কৃষি ও শিল্প শিক্ষার অভাবে দেশের কৃষক ও শিল্পিকুল ক্রমশঃই দরিদ্র ও হীনবল হইয়া পড়িতেছে। গবর্ণমেণ্টের উপযুক্ত যত্ন ও উৎসাহ দানের অভাবে লোকে এই সকল কার্য্যকে অপমানজনক মনে করিয়া ইহা ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। একজন কৃষক বা শিল্পির ছেলে এখন রাজ সম্মান অর্থাৎ চাকুরীর জন্য লালায়িত। তাই বলিতে-ছিলাম গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই এই সকল কার্য্যকে সম্মান জনক করিয়া তুলিতে পারেন, অন্ন সমস্যা ও ইহাতে অনেকটা মীমাংসিত হইবে আশা করা যায়।

কৃষি শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে না পারিলে আমাদের কৃষক ও শিল্পিকুলের পরিত্রাণ নাই। জাপান একটি ক্ষুদ্র দেশ, উহার আবার শতকরা ৮৪·৩ ভাগ পাহাড়াবৃত অথচ এই সামান্য জায়গায় জাপানিরা পৌনে পাঁচকোটী লোকের খাদ্য এবং কোটী কোটী টাকার রেশম উৎপাদন করিয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট ঐ পাহাড়াবৃত ক্ষুদ্র দেশে ৩১০ জন কৃষিপ্রচারক ১১৭ জন সার পরীক্ষক এবং ২০ জন কৃষিরসায়ন চিকিৎসক নিয়োগ করিয়া এবং ৪৬টী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রসারণ জন্য কতটা চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত অনেক ভদ্রলোক বেসরকারী কোম্পানী গঠন করিয়াও কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়াস পাইতেছেন। গভর্ণমেণ্ট প্রতিজেলায় এক একটী কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছেন, ব্যাঙ্কগুলি সমস্তই রাজস্ব বিষয়ক মন্ত্রীর তত্বাবধানে।

আমাদের সরকার বাহাদুর দুই এক জায়গায় যে দুরারিটী কৃষি স্কুল ও ক্ষেত্র না খুলিয়াছেন তাহা নয়। এত বড় একটা দেশে দুই চারিটা স্কুলে বা পরীক্ষা ক্ষেত্র কি কাজ করিবে! সুসভ্য উন্নত গবর্ণমেণ্টের এরকম দুচারিটা না থাকিলে নয় তাই যেন আছে। কিন্তু অন্যান্য সভ্য দেশে এই প্রকার শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যত টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন তাহার শতাংশের একাংশও এখানে ব্যয় হয় কি না সন্দেহ।

গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর পুলিশ কর্ম্মচারী ডিপুটী মুনসেফ প্রভৃতি রাজ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেন না। কত উকিল, কউন্সিলির সৃষ্টি হইতেছে, কত মুনসেফ, ডেপুটী বাড়িতেছে, কত স্বাস্থ্য রক্ষক কত শক্তি রক্ষক কিন্তু কৃষি প্রচারক বা কৃষি প্রদর্শক নাই। কৃষি রক্ষাই সব রক্ষা—খাইয়া বাঁচিলে তবে শক্তি বা স্বাস্থ্য, দেশের জন সাধারণের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল করিয়া তুলিবার উপায় নির্ণয় করাও কি গবর্ণমেণ্টের অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে

পরিগণিত নয়? এবং তাহা করিতে গেলে কি প্রথম ও প্রধানতঃ কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধানের প্রতি দৃষ্টি পতিত হয় না? আবার এই দুইটী বিষয়ই এরূপ উপেক্ষিত যে কোন সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা কোন ক্রমেই শ্লাঘার বিষয় হইতে পারে না। তাই বর্ত্তমানে পুঁথিগত বিদ্যার মাত্রা আর অধিক পরিমাণে প্রসারিত করিতে না যাইয়া কৃষি ও শিল্প শিক্ষা যাহাতে বিস্তার লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশের জমিদারদিগের মধ্যে অনেকেই গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের অনুকরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একটু বিশেষ মনোযোগী হইলে তাহারাও এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে প্রভুত পরিমাণে সাহায্য করিয়া উহার কার্য্য অনেকটা অগ্রসর করিয়া দিবে ইহা বলা বাহুল্য। (ত্রিপুরা হিতৈষী)

বাগানের মাসিক কার্য্য।

মাঘ মাস।

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া, সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভূয়ে শসা, করলা, তরমুজ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোবর, ছাই ও মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে, ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহত ভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।
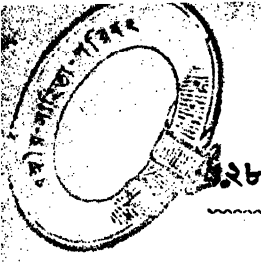
বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটিগুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সার মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে, তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া, তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পূরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান।—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, মল্লিকা ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস্, ফ্লক্স, ডেজি, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী যথা,—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ খণ্ড। } মাঘ, ১৩১৯ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

আবাদের তাৎপর্য্য

মৃত্তিকা, জল, তাপ ও বায়ু সংযোগে বৃক্ষ লতাদির বীজ অঙ্কুরিত হইয়া একাংশ মূলরূপে ভূগর্ভে প্রবেশ করে, অপরাংশ ঊর্দ্ধ দেশ ভেদ করিয়া উঠিতে থাকে। তদনন্তর মূলাংশ দ্বারা ভূগর্ভস্থ শক্তি আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষ লতাদির কাণ্ড দেশে উৎক্ষিপ্ত হয়, এবং ক্রমে ঐ শক্তি শাখা প্রশাখা ও পত্রাদি সর্ব্বত্রে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু অল্প আবাদি বা অপকৃষ্ট ক্ষেত্রে জাত উদ্ভিজ্জের মূল কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া শীঘ্র ভূগর্ভে বিস্তৃত হইতে পারে না। তজ্জন্য সম্পূর্ণ অবয়বের উপযুক্ত মত তেজাকর্ষণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া, উদ্ভিজ্জ শ্রেণী নিতান্ত ক্ষুদ্র অবয়ব ধারণ করে। সুতরাং শাখা প্রশাখা সকল প্রসারিত হয় না ও পুষ্প ফলেরও বিস্তর অন্যথা ঘটে। আর ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিজ্জ সকল একস্থানে বর্ত্তমান থাকিলে, পরস্পর তেজাকর্ষণের বিলক্ষণ বিরোধ উপস্থিত হয়। দোষ পরিহারার্থ ক্ষেত্রের উৎকৃষ্টরূপ আবাদ করিয়া দিতে হয়।

আবাদের প্রধান অঙ্গ হল-প্রবাহ। পুনঃ পুনঃ হল-প্রবাহে মৃত্তিকার কঠিনত্ব দূর হইয়া মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কোমল হইয়া উঠে এবং তৃণাদি আগাছা সকল বিলুপ্ত হইয়া যায়। তথায় শস্য বীজ বপন করিলে, সুকোমল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া শস্যমূল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে এবং বিজাতীয় উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর অভাব প্রযুক্ত নির্ব্বিরোধে যথোপযুক্ত তেজাকর্ষণ করিয়া আপনারা বর্দ্ধিষ্ণু হইয়া উঠে ও সময়মত প্রচুর পরিমাণে শস্য প্রসব করিয়া থাকে। বীজ বপনের পর ক্ষেত্রে যে তৃণাদি বহির্গত হয়, তাহাও শস্যাদির পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারী। ঐ সকল নিপাতের জন্য বৈ, বিদে, নিড়ানী ইত্যাদি যন্ত্র [illegible] ব্যবহার করা যায়।

এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, গ্রামে, প্রান্তরে ও অরণ্যে যে সকল বৃক্ষ লতাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রায়ই অনাবাদি ক্ষেত্রে জন্মিয়া থাকে, অথচ তাহাদের অবয়ব নিতান্ত নিস্তেজ নহে ও পুষ্প ফলেরও অত্যন্ত অভাব হয় না। কিন্তু কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ আপত্তি অনায়াসে নিরাকৃত হইতে পারে। অনাবাদি ক্ষেত্রে যে সকল বৃক্ষ লতাদি জন্মে, তাহাদের মধ্যে অনেক জাতীয় উদ্ভিজ্জ দীর্ঘায়ু ও বৃহদাকার। তাহাদের সফলতার সময় তিন, চারি বা ততোধিক বৎসর। ঐ কালের মধ্যে বৃক্ষ লতাদির মূলাগ্র প্রথমতঃ অতি সঙ্কোচভাবে ভূগর্ভে কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া নিম্ন দেশে প্রবেশ করিতে থাকে। সূর্য্যোত্তাপে ভূপৃষ্ঠ যেরূপ পরিশুষ্ক ও কঠিন হয়, ভূগর্ভে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিতে না পারায় সেরূপ হইবার সম্ভব নাই। সূর্য্য রশ্মির অভাবে তথাকার মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস ও কোমল থাকে। ঐ কোমল মৃত্তিকায় অবতীর্ণ হইলে, বৃক্ষমূল তাহা অনায়াসে ভেদ করিতে সক্ষম হয় ও বহুস্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তখন সম্পূর্ণভাবে তেজাকর্ষণ করিয়া বৃক্ষ সকল বিলক্ষণ তেজস্বী হইয়া উঠে, এবং ক্রমে বৃক্ষের শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত হয়।

বৃক্ষতলে তৃণ ও আগাছা যাহা জন্মে, তাহাদিগের মূল বৃক্ষমূলের সমস্থান-ব্যাপী নহে। জাতি বিশেষে ভূপৃষ্ঠ হইতে পাঁচ সাত বা ততোধিক হস্ত নিম্নতল পর্য্যন্ত বৃক্ষমূল অবতীর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু তৃণ ও আগাছার মূল ভূপৃষ্ঠের অর্দ্ধহস্ত হইতে দুই হস্তের অধিক নিম্নে আর গমন করে না। সুতরাং মূল দ্বারা তেজাকর্ষণের পরস্পর কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। এইজন্য গ্রামে প্রান্তরে ও অরণ্য মধ্যে আগাছা ও তৃণ সমাকীর্ণ অনাবাদি ক্ষেত্রে নানা জাতীয় দীর্ঘায়ু তরু লতাদি জন্মিতেছে। ঐ বৃক্ষতলের মৃত্তিকা যদি উত্তমরূপ আবাদ করিয়া দেওয়া যায়, তবে বৃক্ষের তেজ অনেক বৃদ্ধি পায় সন্দেহ নাই। যদি বৃক্ষতলের মৃত্তিকা সর্ব্বদা কঠিন ও সমপৃষ্ঠ হইয়া থাকে, তথায় বৃষ্টি বারি পতিত মাত্রেই মৃত্তিকার গাত্র ধৌত করিয়া স্থানান্তরে নিঃসৃত হইয়া যায়। ঐ বৃক্ষতল খনন করা থাকিলে, মৃত্তিকার কঠিনত্ব দূর হয়; তদুপরে পতিত বারি রাশি অনায়াসে কোমল মৃত্তিকা ভেদ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করে এবং তৎসঙ্গে ভূপৃষ্ঠের কিয়দংশ তেজ অধোনিমগ্ন হইয়া বৃক্ষের তেজ বৃদ্ধি করিতে পারে।

আচট জমিতে যে সকল তৃণ ও আগাছা জন্মে, তাহাদিগকে আমরা আজন্মকাল সেই ভাবেই দেখিয়া আসিতেছি। আমরা তাহাদিগকে যে অবস্থায় অবলোকন করি, তাহাই তাহাদের পূর্ণ অবয়ব মনে করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ঐ সকল তৃণ ও আগাছা আবাদি জমিতে হইলে তাহারা দ্বিগুণেরও অধিক বর্দ্ধিত

হইতে পারে। আমাদের কৃষি ক্ষেত্রে যে সকল তৃণ আগাছা জন্মে, তাহাদের প্রতি দৃষ্টি পাত করিলে এবিষয় বেশ বুঝিতে পারা যায়।

তৃণ ও আগাছার মধ্যে ওষধি বাচক উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর প্রকৃতি বৃক্ষ লতাদির তুল্য নহে। তাহাদিগের জাতি বিশেষে আয়ুর পরিমাণ তিন মাস হইতে এক বৎসর। কচিৎ কাহারও বা কিঞ্চিৎ অধিককাল দেখিতে পাওয়া যায়। এই অল্প কালের মধ্যে তাহাদিগের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ফল প্রসব ও জীবনান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ওষধিবাচক অচিরস্থায়ী উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর মূল সকল ভূগর্ভের যত দূর অধিকার করে, তাহার ঊর্দ্ধতম সীমা অর্দ্ধ হস্ত হইতে দেড় হস্ত মাত্র। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভূপৃষ্ঠ সূর্য্যোত্তাপে সর্ব্বদাই পরিশুষ্ক ও কঠিন হইয়া থাকে। সুতরাং ওষধিবাচক উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর মূলাধিকৃত মৃত্তিকা স্বভাবতঃ কোমল নহে বলিয়া, শিকড় গুলি আদৌ বিস্তৃত হইতে পারে না। এই জন্য স্বভাবোৎপন্ন ওষধিবাচক উদ্ভিজ্জ সকল নিতান্ত অপূর্ণাবস্থায় অবস্থিতি করে। আর এই জাতীয় উদ্ভিজ্জ শ্রেণী অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া আছে।

কৃষি ক্ষেত্রে, ধান্য, গোধূম, তৈলখন্দ, দাইল খন্দ, কার্পাস, তামাকু, ইক্ষু, পাট প্রভৃতি যে সমস্ত শস্য উৎপন্ন হয়, তত্তাবতই প্রায় ওষধিবাচক। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি সমুদয় তৃণ ও আগাছারই তুল্য। ঐ সকল উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর মূলও সমস্থান-ব্যাপী। তাহারা একস্থানে থাকিলে তেজাকর্ষণ করিতে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং কর্ষণের দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকার কঠিনত্ব দূর করিয়া না দিলে, ধান্য, গোধূম ইত্যাদি কৃষি-জাত উদ্ভিজ্জ সকল, তৃণসমাকীর্ণ অনাবাদি ক্ষেত্রে মূল বিস্তার করিতে না পারিয়া নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। গাছ দুর্ব্বল হইলে ফলোৎপাদনের বিঘ্ন হইয়া যায়। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন না হইলে, কৃষক-দিগের পরিশ্রমের পুরস্কার ও কৃষিকার্য্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। লাভের জন্যই কৃষিকার্য্য, কিন্তু ক্ষেত্রে ফসল না হইলে লাভ হওয়া ত দূরের কথা, বরং মূলধন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়।

যে কৃষক অনাবাদি ক্ষেত্রে শস্য-বীজ বপন বা রোপণ করে ও উপযুক্ত সময়ে শস্য ক্ষেত্রের পারিপাট্য সাধনে অসমর্থ হয়, সে আশানুরূপ ফল লাভে বঞ্চিত হয়, এবং লোকসানের দায়ে ও উৎসাহ ভঙ্গ যন্ত্রণানলে তাহার অন্তর্দাহ হইতে থাকে। সে অনল কিছুতেই নির্ব্বাপিত হয় না। এ সম্বন্ধে কৃষকেরা একটি বচন বলে; যথা, "ভগ্ন কৃষি, হৃদয় রোগ। কুলটা ভার্য্যা, পুত্র শোক। বিমাতার কারণে বৈরী বাপ। সহনে ব্রাহ্মণ, এ পঞ্চতাপ।"

এই নিমিত্ত পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষেত্রের উৎকৃষ্টরূপ পারিপাট্য সাধন করিতে হইলে-যদি এক হালে বার বিঘার উর্দ্ধ বুনানী না হয়, সেও বরং শত গুণে ভাল, তথাপি কোন কৃষক যেন অনাবাদি বা অল্প কর্ষিত ক্ষেত্রে শস্য বীজ বপন বা রোপণ না করে।

ক্ষেত্র কর্ষণের স্থূল স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইল। এক্ষণে এস্থলে বীজ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে।

কার্ত্তিকে চাষ

বৈশাখ মাসে যে লাঙ্গলে দেড় বিঘা জমি চষিতে সক্ষম হয়, কার্ত্তিক মাসের চাষের সময় সেই লাঙ্গলে দিনমানে এক বিঘার অধিক জমি চষিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ হইতে কার্ত্তিক মাসের দিন কিছু ছোট হইয়া যায়, এবং বর্ষার জলে মাটিতে আঠা ধরিয়া মাটি অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠে। বৈশাখি চাষের সময় পরিশুষ্ক মাটিতে জল পাইয়া চাষে চাষে মাটি যেমন গোলালো হইয়া যায়, কার্ত্তিক মাসের চাষে বর্ষা খাওয়া নরম মাটি সেরূপ গোলালো হইয়া উঠে না। কার্ত্তিক মাসের প্রতি চাষের পর মৈ ঘর্ষণ করিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়; তথাপি মাটি বেশ সমান হয় না, অনেক গুটি থাকিয়া যায়। বিশেষতঃ এঁটেল মাটিতে অধিক ঢেলা হইয়া থাকে, তাহা কিছুতেই গুঁড়া হয় না। যাহা হউক, বৈশাখ মাসের চাষ হইতে কার্ত্তিক মাসের চাষে কৃষককে দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে হয়, তথাপি বৈশাখ মাসে এক লাঙ্গলে যত জমি বুনানী করা হয়, কার্ত্তিক মাসে তত হয় না। তবে যেখানে সেচনের সুবিধা ও ছিটানের উপায় আছে, সেখানে হইতে পারে, কিন্তু অন্যত্র নহে। কিন্তু আমাদের দেশে সর্ব্বত্র সেচনের সুবিধা নাই; যে বৎসর কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জল না হয়, সেবার উচ্চ ভূমি মাত্রেই পতিত থাকিয়া যায়। আশ্বিন মাসের মধ্যে যাহা বুনানী হয়, জলাভাবে তাহাতেও শস্য ভাল জন্মে না।

ধান্য বুনানীর নিমিত্ত ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে যে সকল ক্ষেত্রে চাষ দেওয়া যায়, শীত ও গ্রীষ্ম প্রভাবে ঐ সকল ক্ষেত্র প্রায় পরিশুষ্ক অবস্থায় থাকে। সুতরাং এই দেবমাতৃক দেশে খন্দ কর্ত্তনের পর যোয়ের প্রতীক্ষা করিতে হয়। কিন্তু যে খন্দ বুনানী দ্বারা করা যায়, তাহার কোন্ জমিতে আশু ধান্য ও কোন জমিতে আমন ধান্য বুনানী করা হইয়া থাকে। স্থানে বিশেষে কোথাও বা কিছু পরিমাণে

পচান জমিও থাকা সম্ভব। আর যে প্রদেশে ধান্য বুনানী করা হয় না, তথাকার সমস্ত জমিতেই প্রায় বারমেসে চাষ দেওয়া থাকে।

বর্ষার পর ভাদ্র আশ্বিন মাসে নিচু বিল ক্ষেত্র সকল জলনিমগ্ন হইয়া থাকে এবং উচ্চ ভূমি মাত্রেই বেশ সরস থাকিতে দেখা যায়। ঐ সময় পচান ও বারোমেসে চাষের জমিতে অধিক পরিমাণে চাষ দিয়া রাখা যাইতে পারে। আর আশু ধান্যের জমিতে এক দিকে যেমন ধান্য কর্ত্তন করিতে হয়, অন্যদিকে তেমন সকাল সন্ধ্যায় দোয়ার চাষ ও দুই পালা মৈ দিয়া রাখিতে হয়। ধান্য কর্ত্তনের পর ক্ষেত্রে এক দিবসের জন্য গোরুর পাল চরাইতে দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু প্রত্যহ ঐ সকল ক্ষেত্রে গোরু বিচরণ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

নরম মৃত্তিকা গবাদি পশুর পদদলিত হইলে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। ইতর ভাষায় তাহাকে "চেঙ্গটা ধরা" বলে। এইরূপ মাটি লাঙ্গলের ফালে কাটিয়া উঠে না ও ভাল পরিচালিত হয় না; এবং যে অত্যল্প মাটি পরিচালিত হয়, তাহা শিলাখণ্ডের ন্যায় কঠিন হইয়া থাকে, মৈ দিয়া ভাঙ্গা যায় না। চেঙ্গটা মাটিতে শস্য বীজ বপন করিলে গাছ অধিক তেজস্বী হয় না। অতএব কার্ত্তিকে চাষের মাটি পশুবর্গের পদদলিত হইয়া যাহাতে চেঙ্গটা না ধরে, তদ্বিষয়ে কৃষকদিগের দৃষ্টি রাখা আবশ্য কর্ত্তব্য।

এইরূপ মাটি উত্তমরূপ পরিশুষ্ক হইয়া পুনর্ব্বার জলসিক্ত হইলে এই দোষ শুধরাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু কার্ত্তিকে চাষের সময় এরূপ প্রতীক্ষা করা শুভকর নহে। বিশেষতঃ ধান্য কর্ত্তনের পর অনতিবিলম্বে ক্ষেত্রে দোয়ার চাষ দিলে মাটি যেমন 'যো' বাঁধিয়া উঠে, গৌণকল্পে দশ বা চাষেও মাটি সেরূপ পরিচালিত ও পরিপাটি হয় না। ধান্য কর্ত্তনের পর ক্ষেত্রে যত শীঘ্র চাষ দেওয়া যায়, চাষের পক্ষে ততই সুবিধা হইয়া থাকে।

ধান্য বুনানীর সময় অগ্রে নিচু ও বিল জমিতে বুনানী করিয়া পশ্চাৎ উচ্চ ভূমি সকল বুনানী করা হয়; কিন্তু প্রকৃতির গতিক্রমে খন্দ অনুসারে অগ্রে উচ্চ ক্ষেত্র সকল বুনিয়া পরে নিম্ন ভূমি সকল বুনানী হইয়া থাকে। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে বিল ও নিচু ক্ষেত্র মাত্রেই প্রায় জলময় থাকে, তদনন্তর নিম্ন ক্ষেত্রের জল শুখাইয়া যেমন মৃত্তিকায় যো ধরিতে থাকে, অমনি দোয়ার তোয়ার চাষ দিয়া বুনানী করিতে সমর্থ হওয়া যায়। ঐ সময় যদি উচ্চ ক্ষেত্র বুনানী করিবার অপেক্ষা থাকে, তবে এক ক্ষেত্রের বা টানাযুলো যোয়ে খন্দ বীজ বুনানী করিবার বিধি নাই। খন্দের বীজ ঠিক ভরা 'যো'য়ে বুনানী করিতে হয়। কিন্তু জল সেচনের উপায় থাকিলে, তাহার যো, পর্ যো দেখিবার তত আবশ্যক হয় না। এদেশে

জল সেচনের তত সুবিধা নাই এবং কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টিরও বড় অভাব হইয়া পড়ে, সেই জন্ত কার্ত্তিকে চাষে কৃষকদিগকে বিশেষ সতর্ক হইয়া কায করিতে হয়।

আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ক্ষেত্রে যে চাষ দেওয়া যায়, তাহাতে যে কেবল মাত্র খন্দেরই উপকার হইয়া থাকে এমন নয়, উহাতে বৈশাখী চাষেরও বিস্তর আনুকূল্য হইয়া থাকে। হেমন্ত ও শীত ঋতুতে ক্ষেত্রে অধিক চাষ দেওয়া থাকিলে, বৈশাখ মাসে অতি অল্প চাষেই মাটি বিলক্ষণ গোলালো হইয়া উঠে। বিশেষতঃ আশু ধান্তের ক্ষেত্র সকল হেমন্ত বা শীত কালে উত্তমরূপ চষা না থাকিলে, ধান্ত ভাল জন্মে না। সুতরাং খন্দের এয়ামে আশু ধান্তের ক্ষেত্র সকল পরিপাটি করিয়া চষিতে হয়; তাহাতে ধান্ত ও খন্দ উভয়েরই উপকার দর্শে।

হৈমন্তিক ধান্ত সুপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত যে সকল বিলান ক্ষেত্রের যো উথরাইয়া যাওয়া সম্ভব, ঐ সকল ক্ষেত্রের জল নিঃসরণ সময়ে ধান্ত বর্ত্তমান থাকিতে, পলির উপর খন্দ বীজ ছিটানী করা যাইতে পারে। পতিত মাত্রেই বীজ গুলি পলির মধ্যে অর্দ্ধভাগ বসিয়া যায়। এইরূপ যো পরীক্ষা করিয়া খন্দের বীজ ছিটান করা কর্ত্তব্য। ছিটানে যব, গম ও ছোলা তত প্রশস্ত নহে। কিন্তু যো মত ছিটাইতে পারিলে, মসিনা, রাই, মটর, তেওড়া, মশুর, কলাই প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। বিলান ক্ষেত্র ও নূতন চরের মাঠ ভিন্ন অন্যত্রে ছিটান করিলে বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। সুকোমল মৃত্তিকা হইলে কোন কোন কুড়ী ক্ষেত্রেও ছিটান করা যাইতে পারে; কিন্তু চুণে এঁটেলে নহে। আর যে সকল ক্ষেত্রের ধান্য পরিপক্ক হওয়া পর্য্যন্ত যো থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তথায় ছিটান না করিয়া চাষ বুনানী করাই কর্ত্তব্য। নিম্ন ভূমিতে উৎকৃষ্ট গম জন্মে।

পুনাতে পেয়ারার আবাদ

বোম্বাই প্রদেশে পুনার নিকট তিনটি গ্রামে পেয়ারার অতি বিস্তর আবাদ দেখিতে পাওয়া যায়। কম হইলেও এতদঞ্চলে কমবেশ প্রায় ৫০০ শত পেয়ারা বাগান দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক বাগানে কম করিয়া ধরিলেও ৪০০ শত হইতে ১০০০ হাজার গাছ আছে।

হিঙ্গনা ও ইরান্দাভিন্ এই দুইটি গ্রামের মধ্য দিয়া খাল চলিয়া গিয়াছে সুতরাং এই দুইটি স্থানে সেচের জলের সুবিধা আছে। অপর আবাদ কোথ্রুড গ্রামে। এখানে খালের জলের সুবিধা নাই। কুপের জলে এই গ্রামের বাগান্ গুলির সেচের কার্য্য হয়। এই গ্রামটি অপর দুইটি গ্রাম অপেক্ষা কিছু উঁচুতে অবস্থিত, সুতরাং খাল কাটিয়া সেখানে জল লইয়া যাওয়ার একটু অসুবিধা আছে। এই স্থান গুলি চতুর্দ্দিকে পাহাড়ে ঘেরা থাকায় বায়ুর গতি একটু বাধা পেয়ে এই সকল পেয়ারা বাগানের ভিতর প্রবেশ করিতে বাধ্য হয়। ফলের বাগানে হাওয়া চলাচল যে চাই, অতএব এই সকল স্থানে বাগান হওয়ায় সুবিধাই হইয়াছে।

এই সকল স্থানের পেয়ারা বাগান গুলি খুব নূতন নহে। সর্ব্বাপেক্ষা নূতনটির বয়স গণনা করিলে ৫ বৎসরের কম দেখা যাইবে না। নূতন বাগান আর হইতেছে না, কারণ এখানে জলের সুবিধা নাই।

এই সকল বাগানের জল সেচন বিধি পূর্ব্বক বা আবশ্যকমত হয় না—কেন না কোথ্রুডে কুপের জলে নির্ভর সুতরাং কষ্টসাধ্য বলিয়া ঠিক মত বা ঠিক সময় মত জল পড়ে না। অন্য দুইটি স্থানে খালের জলের সুবিধা থাকিলেও খাল হইতে সর্ব্বদা সময় মত জল পাওয়া যায় না সুতরাং চাষীরা জল যখন পায় তখন অধিক জল লইয়া থাকে। জল সেচন কখন আবশ্যকের অতিরিক্ত হওয়া বা আবশ্যকানুরূপ না হওয়া এতদুভয়ই খারাপ।

এখানকার মাটি কাল ও হাল্কা—নিচের স্তরে এক বা দেড় ফুট পর্য্যন্ত বোদ মাটি আছে। ইহাতে পেয়ারার আবাদ ভাল রকমই হইতে দেখা যায়।

শাদা ও গোলাপী দুই রকমের পেয়ারা দেখা যায়। ফলের শাঁসের রঙ অনুসারে দুইটি থাকে বিভাগ করা হইয়াছে। শাদা পেয়ারারই অধিক গাছ আছে। শাদা, গোলাপী দুইটি রকমের পৃথক্ আবাদ নাই। যে বাগানে ১০০০ হাজারটা পেয়ারা গাছ আছে তাহাতে গোটা কুড়িমাত্র গোলাপী পেয়ারা গাছ দেখা যায়, বাকী সব শাদা পেয়ারার গাছ। মিশ্রিত বীজ বপন করা যায় বলিয়া বা

পাখী প্রভৃতি খাইয়া বীজ ছড়াইয়া দেয় বলিয়া দুটা দশটা গোলাপী পেয়ারা গাছ জন্মিয়া যায়।

শাদা পেয়ারারই কদর অধিক কেন না শাদা ফলগুলি অধিক কাল যাবৎ ঠিক থাকে এবং খাইতে অপেক্ষাকৃত মিষ্টতর। গোলাপী পেয়ারা দেখিতে সুন্দরও নহে তাহার রূপ যেমন গুণ তেমনই। পাড়িয়া দুই দিন রাখিলেই গায়ে কাল দাগ ধরিল এবং খাইতে বিস্বাদ হইয়া গেল। শাদা পেয়ারার রূপ যত থাকুক্ আর না থাকুক্ গুণ আছে সুতরাং তাহার আদর অধিক এবং বাজারে বেশী দরে লোকে কেনে। পাকিলে শাদা পেয়ারার রূপ খোল্‌তাই হয়, তখন উজ্জ্বল কাঁচা সোণার ন্যায় হলুদে বরণ ধারণ করে। এখন বাজারের লোকে গোলাপী পেয়ারা চিনিবে কিসে ? জহুরিতে জহরত চিনিয়া লইতে পারে আর বাজারে যাহারা কেনা বেচা করে, তারা ভালমন্দ ফল চিনিয়া লইতে পারিবে না এটা সম্ভব নহে। কেমন এক রকমের মেটে মেটে সজে রঙ দেখিয়াই ধরে যে সেই গুলিই গোলাপী পেয়ারা।

এখন এখানকার পেয়ারা আবাদ করিবার প্রণালী কিরূপ তাহার আলোচনা করা যাউক।

গাছ থেকে বড় বড় সুপক্ক পেয়ারা পাড়িয়া লইয়া কিছু দিন রাখিয়া দেওয়া হয়। এই পেয়ারা গুলির গাত্রের ছাল একটু পচিয়া ও পেয়ারা গুলি নরম হইয়া উঠিলে সেই গুলিকে হাতে চটকাইয়া জল ফেলিয়া বীজগুলি ছাঁকিয়া লওয়া হইয়া থাকে। অতঃপর বীজগুলি ছাই মাখাইয়া রৌদ্রে শুকান হয়। গাছ ফল শেষ হইয়া যাইবার সময় সময় ফল বাছাই করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

১০ ফিট × ১০ ফিট একটা চৌকা বা পটি বেশ ভাল রূপে কোপাইয়া ঢিল ডেলা ভাঙ্গিয়া পুনরায় সমতল করিয়া লইয়া গ্রীষ্ম কালে তাহাতে চারা প্রস্তুত করণার্থ বীজ বোনা হইয়া থাকে। এই বীজ তলার উপরের মাটি দুই দিক হইতে হাত দিয়া কতকগুলি সরাইয়া আনিয়া মাঝ খানে একটা আইলের মত জমা করিয়া রাখে। তার পর এই আইলের দুই পার্শ্বের দুই টুকরা বীজ তলাতে ছাই ছড়াইবে। আধ সের ছাই এই দুই টুকরা জমিতেই যথেষ্ট, তার অধিক আর আবশ্যক হয় না। এই বার মাটি অল্প অল্প চাপিয়া দিয়া তার উপর ছড়াইয়া দিয়া আবার অল্প অল্প চাপিয়া তার উপরিভাগে ঐ যে মাঝখানে মাটি জমাইয়া রাখিয়াছ সেই মাটি ছড়াইবে। বীজের উপর দুই ইঞ্চের অধিক মাটি কোন মতে চাপা দিবে না। বীজ বপনের এই চৌকাতে জল সেচন করা হইয়া থাকে, খালের বা কূপের জলে চৌকাটি পরিপূর্ণ করিয়া ভিজাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। চাষীরা এখানে বীজের ক্ষেতের চারি দিকে বেড়া দিয়া রাখে। সাধারণতঃ বাবুল গাছের ডাল পুতিয়া দিয়া বেড়ার কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

বীজ হইতে চারা অঙ্কুরিত হইতে তিন সপ্তাহ কাল সময় লাগে। যত বীজ বপন করা হয় সব যদি ফুটে, তাহা হইতে প্রায় দেড় হইতে দুই হাজার চারা উৎপন্ন হয়। কিন্তু অনেক বীজ ফুটে না, দুই আউন্স বীজে প্রায়ই ১২০০শত হইতে ১৫০০শত চারার অধিক চারা পাওয়া যায় না। এখানে প্রায় ১০ টা বাগান আছে, যেখানে চাষীরা বিক্রয়ের জন্য চারা প্রস্তুত করে। গাছ বসাইবার সময় বা নূতন বাগান তৈয়ারি করিবার সময় লোকে ইহাদের নিকট হইতে চারা খরিদ করিয়া লয়। যাহারা চারা বিক্রয় করে, তাহাদের চারা প্রস্তুতের বীজ তলাগুলি লম্বে চওড়ায় বড়।

বর্ষার শেষভাগে রুগ্ন চারাগুলি ইহারা বীজ ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহার উদ্দেশ্য এই যে রৌদ্র বাতাস পাইয়া অপর গাছগুলি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। অগ্রহায়ণ মাস নাগাইত চারাগুলি প্রায় ১ বা ১॥ ফুট বাড়িয়া উঠে। তখন তাহাদিগের তেজ বাড়াইবার জন্য আর এক পন্থা করা হইয়া থাকে। আধসের ছাগল নাদী জলে গুলিয়া গাছগুলির উপর ছড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। বীজ তলার আর একটি কার্য্য বলিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। যখন রোগা গাছগুলি তুলিয়া ফেলে, সেই বীজতলায় আগাছা থাকিলে তাহাও তুলিয়া ফেলিয়া দেয়। বীজতলার এখন আর কোন বিশেষ পাইট অবশিষ্ট রহিল না- মাঝে মাঝে ১০ দিন অন্তর জল দিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত চালাইতে হয়।

পেয়ারার ডাল গুলি বাঁকাইয়া বাঁধা হইয়াছে। তাহার ফলে--ফুল অধিক হইয়াছে। ডালগুলি মাটি হইতে অধিক উচ্চ না হওয়ায় ফল পাড়িবার সুবিধা হয়।

অতঃপর যে ক্ষেতে নূতন আবাদ করিবে তারও পাট কিছু চাই। গরমের সময় সে ক্ষেতটি ইতিপূর্ব্বেই দুইবার চষিয়া রাখা হইয়াছে। তখন আলো বাতাস লাগিয়া মাটি খুব তেজস্কর হইয়া উঠে। এখানকার চাষীরা মাটির চাপ গুলি গুঁড়া করিয়া ভাঙ্গিয়া মই ও বিদে দিয়া সমতল করে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই এ সব কার্য্য সমাধা হইয়া যায়। এই সময় আশেপাশে, গভীরতায় ২ ফিট্ হিসাবে গর্ত্ত করিয়া গাছ বসাইবার যোগাড় করা হইয়া থাকে। এক একরে ৪০০ শত গাছ বসান যায়। প্রত্যেক গাছ ১০ ফিট ব্যবধানে বসান হইয়া থাকে। দুই লাইন গাছের মাঝখানে পয়োনালা থাকে। এই পয়োনালাগুলি চওড়ায় ১॥ ফুট।

আষাঢ় মাসে বৃষ্টি পড়িলেই এই সকল গর্ত্তে গাছ বসান হইয়া থাকে। মূল শিকড় ছিঁড়িয়া না যায়, চারা উঠাইবার ও গাছ বসাইবার জন্য বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক গর্ত্তে অর্দ্ধ সের হিসাবে গোয়ালের সার ও ছাই দিয়া তাহার উপর গাছ বসাইবার রীতি, গর্ত্তের বাকী অংশ মাটি দ্বারা পূর্ণ করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক গর্ত্তে দুইটি হিসাবে চারা বসাইবার নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। গাছ বসাইবার পরই জল সেচন আবশ্যক। তার পর মাঝে মাঝে জলের আবশ্যক হইলে ১০ দিন অন্তর জল দিলে কিছু ক্ষতি হয় না। জলের সুবিধা না থাকিলে আবাদ ভাল হয় না। এখানে কূপ খননে ব্যয় অধিক সেইজন্য জলাভাবে অনেক বাগান নষ্ট হইয়া যায়। গাছ গুলি বসাইয়া মাটির টপ বা গাম্‌লা চাপা দিয়া কিছুকাল রাখিলে শীঘ্র গাছগুলি ধরিয়া বসে। মাটির টপগুলির হাওয়া চলাচলের জন্য উপরে ছিদ্র থাকা আবশ্যক। খুব রৌদ্রের সময় ব্যতীত অন্য সময় গাছ ঢাকিয়া না রাখাই ভাল।

পেয়ারার আবাদ আরম্ভ করিয়া যত দিন পর্য্যন্ত না গাছ গুলি বড় হয় ততদিন অন্যান্য শস্যের আবাদ করা চলে। যাহারা কেবল বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া চলে তাহারা শসা, কুমড়া প্রভৃতি সামান্য চাষ ভিন্ন অন্য কিছুই করিতে পারে না। যাহারা সেচের জলের সুবিধা করিতে পারে এবং চাষের জন্য ব্যয়ে কাতর নহে, তাহারা মাটবাদাম ও অন্যান্য কলাই, লুসার্ণ প্রভৃতি মোটামুট চাষ করে। তিন বৎসর কাল এই প্রকার গাছের ফাঁকে চাষ করা চলে। এখানে পশু খাদ্যের খুব টান সেই জন্য পেয়ারা বাগানে লুসার্ণ চাষে খুব লাভ হইতে দেখা যায়। শুঁটিধারী শস্যের চাষেও আর এক লাভ এই যে, এ উদ্ভিদের মূল দ্বারা জমিতে অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন সঞ্চিত করিতে থাকে। লুসার্ণ ঘাষের বাড় খুব। এক মাস পরেই একবার কাটা চলে। তিন বৎসরের মধ্যে ৮ বার ঘাষ কাটিয়া লওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে কিন্তু সার দিতে হয় ও আগাছা কুগাছা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। লুসার্ণ চাষে কিন্তু একটা ভয় আছে, লুসার্ণ ঘাষে এক প্রকার পোকা লাগে তাহা পেয়ারা গাছে ছড়াইয়া পড়িতে পারে।
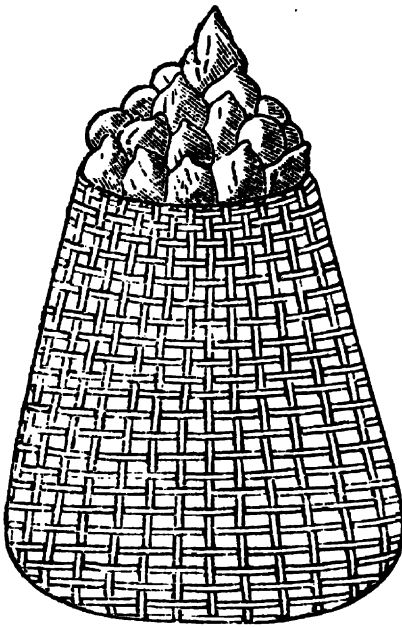
পেয়ারা পূর্ণ ঝুড়ি

চতুর্থ বৎসরে গাছের ফল পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে গাছে ফল ফলিতে পারে কিন্তু বিক্রয়ের উপযুক্ত নয়। পেয়ারা গাছে ফুল সর্ব্বদাই হয়। পাইট ও তদ্বিরের গুণে যখন তখন ফল ফলান যায়। দুই সময় ফল ফলাইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে—একবার বর্ষায় ও আর একবার শীতের সময়। বর্ষায় ফলাইতে হইলে শীতের শেষে গাছ গুলির গোড়া খুলিয়া দিয়া শিকড়ে হাওয়া ও রৌদ্র লাগাইতে হয়। ছোট ছোট গুচ্ছ গুচ্ছ শিকড়গুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়। দুই মাস গাছের গোড়াগুলি খোলা থাকে এবং ঐ সময় গোড়ায় জল দেওয়া হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসে সার, মাটি দিয়া গোড়াগুলি বাঁধিয়া দিতে হয়। বৃষ্টির জল পড়িয়া অতঃপর মাটি সিক্ত হইবার পূর্ব্বে গাছের পাতাগুলি পড়িয়া যায়। এই সময় জলে গোড়া সিক্ত হইলে গাছে ফুল ও ফল ধরিতে আরম্ভ করে। বর্ষায় এই ফল শেষ হইয়া যায়। আর একবার, আম্র মুকুল হইবার সময় পেয়ারা বাগানের কারকিৎ ও মেরামত আরম্ভ করা যায়। এই সময় কারকিৎ আরম্ভ করিলে গ্রীষ্মকালেই ফল পাকিতে আরম্ভ করে। পয়সার অভাবে সব সময় চাষীরা ভালভাবে কারকিৎ বা মেরামত করিতে পারে না। সময়ে গাছের গোড়া খোঁড়া ও সার দেওয়ার বিলম্ব ঘটে তাহাতে ফলের পরিমাণের ও গুণের তারতম্য ঘটে। চাষীরা বাজারে ফলের টান দেখিয়া অবস্থা বুঝিয়া গ্রীষ্মে বা শীতে ইচ্ছামত ফল ফলায় এবং তদনুসারে সময়মত কারকিৎ ও মেরামত আরম্ভ করে। আশ্বিন মাস হইতে গোড়া খোঁড়া আরম্ভ করিলে এবং মাঘ মাস পর্য্যন্ত গোড়া খোলা রাখিয়া দিলে অনেক সময় দেখা যায় বাকী বৎসরের সারা সময়টা গাছে ফল পাওয়া যায়। চাষীরা অধিকাংশ সময় সারা বৎসর বাজারে ফল আমদানী করিবার জন্য বাগানের গাছের অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কারকিৎ মেরামত করে। ফল পাড়িবার বিশেষ বন্দোবস্ত দেখা যায়। আঁকুশির মাথায় একটা থলে বা জাল লাগাইয়া লইয়া সেই আঁকুশি দ্বারা পেয়ারাগুলি গাছ হইতে পাড়া হইয়া থাকে। কারণ সুপক্ক ফলগুলি গাছ হইতে মাটিতে পড়িলে ফলগুলি খারাপ হইবার সম্ভাবনা। দুপুর বেলাই ফল পাড়ার সময়। বাগানের একধার হইতে আরম্ভ করিয়া এক এক লাইন গাছ হইতে ফল পাড়িতে পাড়িতে

সারা বাগান চলিয়া যায়। আহৃত ফলগুলি বাগানের মাঝ খানে স্তূপাকারে জমা করিয়া তাহা হইতে ছোট বড় বাছাই করিয়া ঝুড়ী বোঝাই করা হইয়া থাকে। এই ঝুড়ীগুলিরও একটু বিশেষত্ব আছে। ঝুড়ীগুলি উঁচু এবং মুখ সরু তাহার কারণ ছোট ফলগুলি ঝুড়ীর তলায় রাখিয়া বড় ফলগুলি মুখের কাছে সাজান হইয়া থাকে। ঝুড়ীগুলিরদাম তিন আনা কিম্বা চৌদ্দ পয়সা। ঝুড়ীতে পেয়ারা বোঝাই করিবার পুর্ব্বে তাহার তলায় প্রায় ৬ ইঞ্চ পুরু করিয়া পেয়ারা পাতা সাজাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। ছোট বড় ঝুড়ী আছে। ছোট ঝুড়ীতে ১৮৮ টা এবং বড় ঝুড়ীতে ৩৭৬ টা পেয়ারা বোঝাই করা যায়। একটা ছোট ঝুড়ীর পেয়ারা ১।০ পাঁচ সিকা বা ১।৵০ এক টাকা ছয় আনায় বিক্রয় হয়। স্ত্রীলোকেরা এখানে মুটিয়ার কার্য্য করে। দুরতা অনুসারে এক আনা দেড় আনায় তাহারা মোট গুলি বাজারে পৌঁছাইয়া দেয়।

একটা মোটামুটি হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে উদ্যান পালক প্রত্যেক গাছ হইতে ৸০ কিম্বা ৸৵০ চোদ্দ আনার পয়সা পায়। যে ফল বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতে পারে সে ১৲ টাকা বা ১৵০ আঠার আনা পাইতে পারে। অনেক সময় উদ্যান পালকগণ সমস্ত বাগানে গাছ পিছু গড়ে ১৲ এক টাকা লইয়া বাগানের ফল বিক্রয় করিয়া ফেলে।

বাগানের ডাল পালা যাহা ছাঁটিয়া ফেলা হয় তাহা জ্বালানি কাঠ হয়।

এখানকার পেয়ারা বাগানে আর একটি সুন্দর নিয়ম আছে, পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে গাছ গুলি বাড়িয়া উঠিলে গাছের ডালগুলি বাঁকাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে এক সুবিধা এই হয় যে, ফলগুলি নিম্ন দিকে থাকে পাখী আদিতে বড় নষ্ট করিতে পায় না। দ্বিতীয় সুবিধা এই যে, এইরূপে যে ডালগুলি বাঁকাইয়াছে সেই বাঁকের মুখে মুখে অনেক ছোট ছোট ডাল বাহির হয় ও সেগুলিতে খুব ফুল ফল হয়। তৃতীয় সুবিধা যে সমস্ত ফলগুলি হাতে পাওয়া যায় সুতরাং পাড়িতে ক্লেশ হয় না।

উদ্যান পালকগণ চতুর্থ বৎসরে চারি শত গাছ হইতে ফল বিক্রয় করিয়া ৩০৲ টাকা মাত্র পাইতে পারেন, তৎপর বৎসর ১৩০৲ ষষ্ঠ বৎসরে ১৫০৲ তার পর ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয় করিতে পারেন। দশ হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দর মিলিয়া থাকে। পনেরো বৎসরের পর গাছগুলি কম জোর হইয়া যায় কিন্তু ক্রমাগত যত্ন পূর্ব্বক গোড়া খোঁড়া, মেরামত করা, সারমাটি দেওয়া ও জল সেচনের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলে ফলে নিতান্ত কম হয় না, কিন্তু তথাপি দেখা যায় যে এই সময় ফল ছোট হইতে থাকে এবং মাত্রায় কম হইয়া পড়ে। তথাপিও দেখা গিয়াছে যে একই বাগান ক্রমান্বয়ে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত চলিতেছে।

পেয়ারা গাছের এক মহাশত্রু ছত্রক রোগ। ইহাকে ইংরাজীতে Mealy bug বলে। ফলগুলি যখন ছোট, যখন গুপারির মত তখন গাছের পাতার উল্টা পিঠে ঐ ছাতা দৃষ্ট হয়। প্রথমে ছোট ডিম দেখা যায়, তার পর সমুদয় পাতা ও গাছের অন্যান্য অংশ কাল দাগে ভরিয়া যায়। ফলের রঙ খারাপ হইয়া যায়। ফলগুলি যেন শুকপ্রায় দেখায়। শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু এম, আর, এ, এস, লিখিত।

ভারতে গোজাতির অবনতি

প্রথম ভাগ

হাইকোর্টের উকিল শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার লিখিত

ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গোজাতি

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি সুডৌল বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘাকার ইহাদিগের কাণগুলি তীরের ফলার ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র, কিন্তু বিলাতী গাভীর কর্ণ প্রায় গোলাকার। দেশীয় গাভীর চোয়ালের নিম্ন হইতে (Dewlup) ঝুল আরম্ভ হইয়াছে, বিলাতী গাভীর ঝুল (Dewlup) বুকের নিম্নভাগে দোদুল্যমান; ইহাদিগের চক্ষুদ্বয় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ জ্যোতির্ম্ময় এবং পূর্ণায়তন, তাই হোমার বলিয়াছেন, "Ox-eyed Juno"। বিলাতী গাভির কপালটী লোমাবৃত নহে। বিশ্রামকালে কুকুদ্‌যুক্ত গোজাতি বাইসনের মত মস্তক অবনত করিয়া থাকে। দেশীয় গোজাতির হাম্বা রব এবং বিলাতীর ডাক গম্ভীর বেলো। Taurus (কুকুদ্‌হীন) ও Jibin (কুকুদ্‌যুক্ত)। এই জাতীয় গোজাতি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আছে। ডাকইন Bos Indicusএর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঝুঁটযুক্ত গোজাতি টাস্‌মেনিয়া অষ্ট্রেলিয়াতে পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু নির্ব্বাচন এবং বৈজ্ঞানিক "ক্রসিং" এর গুণে কুকুদ্‌টি ২।৩ শতাব্দীর মধ্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। অধ্যাপক বিউইক্ তাঁহার "Deliniations of the ox tribe" নামক পুস্তকে ঐ মতের সম্পূর্ণ পোষকতা করেন। ভিসি সাহেব ও তাঁহার "Deliniations of the ox tribe" নামক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় গোজাতির বংশ জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, পারস্য, আরব, কেপ্-কলোনী প্রভৃতি দেশে বর্ত্তমান। এডেনের গোজাতির স্থলে কুকুদ্ আছে। ওয়ালেস্ বলেন, কেপ্‌কলোনীতে তিন প্রকার বলদ বর্ত্তমান। তাহারা খুবই কার্য্যপটু এবং পরিশ্রমী। ভারতের বড় জাতীয় গোজাতি (High Class Indian breeds) গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুসংখ্যায় আফ্রিকা, দক্ষিণ এবং উত্তর আমেরিকা প্রদেশে, ষ্ট্রেট সেটেলমেন্ট, ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে প্রেরিত হইয়াছে। ১৯০৯ সালের অক্টোবর মাহায় ভারতীয় কৃষি জর্ণালে এডিনবরার অধ্যাপক ওয়ালেস্

উত্তর আমেরিকার চিকাগো হইতে এই বিষয়ে পত্র লিখেন। হিসার, হান্সি, গুজরাট (সিন্ধ) কৃষ্ণা নেলোর, মণ্টগোমেরি এবং গির জাতির, গোজাতীয় গাভীই আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রধান। তৃতীয় ভাগ ভারতীয় কৃষি জর্ণালের ২৬৬ পৃষ্ঠায় পঞ্জাবের মণ্টগোমেরি জাতীয় গাভীর বিষয় সবিশেষ উল্লেখ আছে। উহাদের মধ্যে "কাচি" জাতীয় গোজাতির বিষয় ও উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহারা মণ্টগোমেরির সমজাতীয় এবং চেনাব জেলার জঙ্গলবাসী কৃষকগণ ইহাদিগকে পালন করিয়া থাকে। ইহারা প্রচুর দুগ্ধবতী এবং বলদগুলি কষ্টসহিষ্ণু হয়, কিন্তু মণ্টগোমেরি অপেক্ষা অধিক বড় এবং ওজনে ভারি হইয়া থাকে। গুজরাটী জাতির মধ্যে "ধানি" এক sub-bried, ইহারা খুব পরিশ্রমী এবং গুজরাটের সৈন্ধব লবণের পার্ব্বত্যপ্রদেশেই বহুল জন্মিয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই শ্বেতবর্ণের হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার উপর লাল বা কাল রঙ্গের গোল গোল বুটী (গুল) থাকে। ইহাতে ইহাদের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

দেহের গঠন (anatomical structure):—হজ্‌সন্‌ সাহেব বলেন যে, দেশী গরুর খুর ছাগলের ন্যায় চেরা এবং প্রায়ই ১৪ যোড়া অস্থি পঞ্জরে আছে কিন্তু বিলাতী গোজাতির ১৩ যোড়া পঞ্জরের অধিক কদাচ দেখিতে পাওয়া যায় না। বন্য কি পালিত গোজাতি রোমন্থনকারী স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহার পেটে ৪টি থলী আছে। ইহাতেই খাদ্যসামগ্রী পরিপাক লাভ করিয়া শেষাবস্থায় রক্তরূপে পরিণত হয়। গোজাতি উদ্ভিদ্‌ভোজী, মাংসাসী নহে। ইহাদের সম্মুখে আটটি দাঁত জন্মায়। তাহাতেই ইহাদের বয়স নির্ণয় করা যায়। জলবায়ুর গুণে বাছুরের ২॥০৩ বৎসরে দুগ্ধদাঁত (milk teeth) ভগ্ন হইয়া থাকে। সমকের ৮টি দাঁতকে "মোলর্স" বলে। এই গুলির দ্বারাই গোজাতির বয়স নির্ণয় করা যায়। অস্মদেশীয় বাছুরের ৬ মাসের মধ্যেই দুগ্ধদাঁতগুলির উদগম হয়। দুই বৎসরে দুগ্ধদন্তগুলি এক এক করিয়া ভাঙ্গে এবং "molars" দেখা দিয়া থাকে। মোলার্সগুলি চিরস্থায়ী permanent দন্তপংক্তি। ৪॥০ বা ৫ বৎসরে আটটি দাঁতই জন্মিয়া থাকে। তখন গরু (mouth is said to be full) অর্থাৎ পূর্ণবয়স্ক বলিয়া পরিগণিত হয়। জেবুর জন্মকালীন দন্তোদগম হয় না, কিন্তু টরাস্‌ জাতীয় বিলাতী গোজাতির দন্তের সহিত জন্ম হয়। ভারতীয় গোজাতি লম্বা লম্বা পদযুক্ত হইয়া থাকে এবং উক্ত দেশে বিলাতীর ন্যায় মাংস পেশী তেমন সুডৌলভাবে সংস্থাপিত নহে। ভাল জাতীয় গাভীর পঞ্জর পরিপুষ্ট এবং গোলাকার; বক্ষের নিকট ঘেরটিও সমধিক। গোজাতির "সাইজ" (আকার গঠন) খাওয়া, যত্ন, স্থানীয় অবস্থা এবং জাতির (breed) গুণে পরিবর্ত্তিত হয়। "হাম্পের" পর হইতে লেজ পর্য্যন্ত দেশীয় গোজাতির "স্লোপ sudden এবং abrupt অর্থাৎ শরীরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র;

বিলাতী বা টরাইন্‌দের "হাম্প" বা কুকুদ্‌ নাই; তাহাদের লেজ পর্য্যন্ত সোজা এবং পশ্চাদ্ভাগটি সমকোন বিশিষ্ট (at right angles) আমাদের দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে "কুকুদ্‌"টি যত বড় বা ক্ষুদ্র হইবে ষাঁড়ের শক্তিরও ঐ সঙ্গে হ্রাস বৃদ্ধি হয়। আমাদের দেশের গোজাতি সাধারণতঃ মস্তক দেহ অপেক্ষা সামান্ত অবনত করিয়া বিচরণ করিয়া থাকে যেহেতু ইহাদের শরীর হইতে ঝুঁটির নিম্ন ভাগ ও ঘাড়টি ঈষৎ ঢালু। এই অবনত ভাগে অস্মদ্দেশে লাঙ্গলের "জুয়াট" চাপান হয়। বড় জাতীয় (breed) গোজাতির কর্ণগুলি খুব লম্বা লম্বা, ইহার দ্বারায় মাছি তাড়াইবার সুবিধা হয়। কানগুলি প্রায়ই ছুচ্‌ মত হয় কিন্তু "টরাইনদের" কান গোল হইয়া থাকে। আমাদের দেশের গোজাতির সৌন্দর্য্য সমধিক ঝুলের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহা গলায় টুঁটীর নিম্নস্থ চামড়ায় দোদুল্যমান ঝিল্লি। চোয়ালের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইয়া প্রায় বাঁট পর্য্যন্ত ইহা ঝুলিতে থাকে। বিলাতে গোজাতির মধ্যে ইহা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে ঝুল আমাদের দেশীয় গোজাতির মধ্যে দৃষ্ট হয়। কোন কোন গোজাতির মধ্যে নাভিদেশে আসিয়া ইহা অধিকতর পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। জাতি অনুসারে ইহার হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়। অধ্যাপক ওয়ালেস্‌ সাহেব ইহাকে "শীদ্‌" (sheath) নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের দেশীয় গোজাতির মধ্যে আর একটি বিচিত্রতা এই যে তাহাদের শিঙের মধ্যবর্ত্তী অংশটুকু বহির্ভাগে ঈষৎ গোলাকার, কিন্তু টরাইনদের ঐ অংশটুকু ঘন লোম গুচ্ছ বিশিষ্ট এবং ভিতর ভাগে গোলাকার হইয়া থাকে (concave) শিঙ্‌গুলি ভিন্ন ভিন্ন (breed) ব্রিড্‌ এ ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। সিন্ধু বা গুজরাটী গোরুর শিঙ্‌ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও উর্দ্ধদিকে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মহীসুর, নিলগিরী ও মাদ্রাজী গরুর শিঙ্‌ খুব বড় বড় হয় এবং গুজরাটীর মত উপর দিকে উঠিয়া থাকে কিন্তু ক্ষুদ্র জাতীয় অর্থাৎ বিহার এবং বঙ্গদেশীয় গোরুর শিঙ অর্দ্ধ গোলাকৃতিভাবে উত্থিত হইয়া অর্দ্ধ গোলাকার বৃত্তরূপ ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু বিলাতী গোজাতির শিঙ্‌ অতি সুন্দর এবং উপরের খাপটি প্রায়ই কটা বর্ণের হয়। ভারতীয় গোজাতির খাপটি সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণের এবং গোল প্রায় কম গাভীরই হইয়া থাকে। অধ্যাপক বুকানন ও হামিল্টনের মতে বঙ্গীয় গোজাতির সিঙ্‌গুলি মস্তকের বহির্দিকে নিম্নভাগে বক্র এবং কখন কখন এত বক্র রূপে জন্মায় যে গৃহস্থকে উহা কাটিয়া দিয়া তাহাদের চক্ষুদ্বয়কে রক্ষা করিতে হয়। পাঠকগণ নিজ গৃহপালিত গাভীর সহিত ইহা মিলাইয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতে পারেন। কারণ আমাদিগের দেশ নিঃস্ব হইলেও মা লক্ষ্মীর কৃপায় প্রত্যেক চাষা গৃহস্থ নিজ গৃহে এখনও ২।১টী গাভী পোষণ করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন গোজাতির শিঙদ্বয়ের মধ্যে একটী উচ্চ

মাংসপিণ্ডযুক্ত হার দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই দেশীয় গোজাতির মধ্যে ইহার অস্তিত্ব কিছু বেশী। ইহাকে "নিম্বুরা" বলে। কোন কোন জাতির মধ্যে ইহা একেবারে থাকে না। লেজগুলি সিধা এবং সচরাচর চামরযুক্ত হয়। ইহাদের মুখের অভ্যন্তরে উপরের চোয়ালের দন্তপংক্তি আদৌ থাকে না। ইহাদের মুখে লোম নাই বরং মুখ বড় এবং প্রশস্ত হইয়া থাকে। ইহারা সেমেলিয়া জাতীয় সেইহেতু ইহাদের চারিটী বাঁট থাকে। পায়ের খুরগুলি বিভক্ত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহাদের চর্ম্ম মসৃণ এবং চক্‌চকে, টরাইনদের চর্ম্মের উপর গাঢ় মোটা মোটা লোম জন্মে যেহেতু তাহাদের জন্ম শীতপ্রধানদেশে। দার্জ্জিলিং, নাইনীতাল, মুসুরী, সিমলা প্রভৃতি দেশীয় গোজাতির লোম ঐরূপ মোটা মোটা। জেবুর ইহার ঠিক বিপরীত, কারণ তাহাদের গ্রীষ্মপ্রধানদেশে বাস। দেশী গরুর রং লাল, কাল, শাদা, পাঁশুটে, শ্যামলী, বুটিদার, গাঢ় ব্রাউন, লাইট ব্রাউন ইত্যাদি হইয়া থাকে। কোন কোনটির চর্ম্ম, খুর এবং শিঙ কাল, কোন কোনটির চকোলেট্ ও দেখিতে পাওয়া যায়। গরু আমাদের দেশে হাটে বা মেলায় বিক্রয় হয়। আমাদের কলিকাতার নিকট চিৎপুরে, রাজার বাজারে, খিদিরপুরে, মেদিনীপুরের অন্তর্গত ঘাঁটালে বহু গরু ও বলদ বিক্রয় হইয়া থাকে। বলদ খরিদ করিতে হইলে হাঁটাইয়া উঠাইয়া বসাইয়া, লেজ মলিয়া দন্ত পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করিতে হয়। ইহার সঙ্কেত এই পুস্তকে পরে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। ভারতের মধ্যে হরিহরছত্রের মেলায় বহু গো, মেষ, বলদ, ছাগল, হস্তী, ঘোড়া প্রত্যেক বৎসর কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার সময় বিক্রয় হইয়া থাকে। বিহার প্রদেশে হরিহর ছত্রের মেলার ন্যায় আরও কয়েকটি মেলা হইয়া থাকে। গয়ায় কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এবং বিষুব সংক্রান্তির সময় পশু মেলা হইয়া থাকে। বহরমপুর এবং অন্যান্য স্থানে এইরূপ গো মেলা হইয়া থাকে, তাহার বিষয় যথা :—আমাদের দেশের গোজাতির রঙ প্রায়ই এক রঙা এবং যদিও দোরঙা থাকে, তবে একটী রঙের লোমও অপর রঙের সহিত এরূপ (symmetrically) মিশ্রিত হইয়াছে যে, গরুটিকে দেখিলেই বোধ হয় যে এক রঙা। ইহা ভারতীয় গোজাতির বিশুদ্ধতা জ্ঞাপক। অপর পক্ষে বিলাতী গরুর গায়ের রঙ প্রায়ই মিশ্রিত এবং এই ছাপ ছাপ রঙগুলি খুব স্পষ্ট ও উজ্জ্বল (abrupt and remarkable অর্থাৎ prominent.)। ইহা তাহাদের শঙ্করের (cross-breed) দ্বারা উৎপন্ন ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। ইহাকেই পাশ্চাত্য অধ্যাপকগণ ভঙ্গরঙ "broken color" নামে অভিহিত করিয়াছেন। দেশীয় গোজাতি খুবই নম্র ধীর এবং কষ্ট-সহিষ্ণু। গ্রীষ্মকালের রৌদ্রে ইহারা অনায়াসে শকট বহন করে, লাঙ্গল টানে, মোট আকর্ষণ করে; বিলাতী গোজাতির মত প্রায়ই গাছের ছাওয়া অন্বেষণ করে না। দেশী

গাই ২৭০ দিনে গর্ভ ধারণ করে, কিন্তু বিলাতী টরাইনগণ ৩০০ দিবসের কমে কদাচ সন্তান প্রসব করিতে পারে না। এ বিষয়ে যদ্‌বক্তব্য তাহা "গো জনন" পর্য্যায় পরে আলোচিত হইয়াছে।

অতঃপর আমি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গোজাতির বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহাদের উৎকর্ষতা এবং অপকর্ষতার বিষয় আলোচনা করিব। আমি স্বয়ং চাষা না হইলেও চাষার জাতি। গোজাতির দিকে অতি শৈশবাবস্থা হইতেই বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি। আমার অভিজ্ঞতা এবং কন্টিনেণ্টাল, বিলাতী ও আমেরিকান হার্ড বুক, বুলেটিন, রিপোর্টাদি পাঠে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। ক্রমশঃ গো-সেবা, গোপালন, গোশালা নির্ম্মাণ, গো-চিকিৎসাদির বিষয় সবই এক এক করিয়া আলোচনা করিব। পাশ্চাত্য প্রদেশে যেমন প্রত্যেক জেলায় জেলায় বা দেশে দেশে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় গোচাষ হয় সেইরূপ আমাদের দেশে নাই। কারণ, আমাদের দেশে গোচাষ বা গোপালন এতই অবহেলিত (neglected) হইয়াছে যে কোন কোন দেশের গোজাতি সর্ব্বতোভাবে খুবই হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে (deteriorated)। তাহার কারণ আমার বোধ হয় দুই বা তিনটি। ১ম, খাদ্যের অভাব; ২য়, বহুকালাবধি আমাদের দেশে গোজাতির বিষয় আলোচনা হয় নাই, এবং সে কারণ (different breds) ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিশেষরূপে তালিকাভুক্ত হয় নাই।

অপর কারণ যে কৃষি প্রধান দেশে গোপালনে সম্যক্ আস্থা প্রদর্শিত না হওয়ার তত্তৎ দেশীয় গোজাতির হীনাবস্থা ও হ্রাস হইয়াছে। হ্রাসের অপর কারণ "কশায়ের ছুরী"। সেই কারণে আজ কাল ভারতবাসীগণ গোজাতির রক্ষার জন্য এবং ভারতে যথেচ্ছা গোহত্যা বিরুদ্ধাচরণ ও রহিত করিবার জন্য বিলাতে আন্দোলন করিয়া গোহত্যা আইন বদ্ধ করাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। টাকায় চারি সের গো দুগ্ধ ভারতে কি কখন ছিল? সকল সভ্যদেশে গোহত্যা আইন বদ্ধ আছে কিন্তু দীন ভারতে তাহা নাই। আমাদের রক্ষাকর্ত্তা ও সহায় একমাত্র রাজা।

এই খানে একটি আবশ্যকীয় কথার উল্লেখ প্রয়োজন। গোপালন (cattle breeding) ভারতের মধ্যে সেই সেই দেশে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে যেখানে কৃষি উন্নতি লাভ করিতে [illegible]র্ষ হয় নাই। এইজন্যই ভারতের কোন কোন গোজাতি ভ্রমণশীল (nomad tribes)এর দ্বারায় খুবই উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, যেহেতু তাহারা পার্ব্বত্য বা বন্য বা উষর ক্ষেত্রে কৃষির উৎকর্ষতা লাভে বঞ্চিত হইয়া গোচাষে বা গোপালনে (cattle breeding) কৃতকার্য্য হইয়া সমধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছে। মণ্টগোমেরী ও ঝান্সী ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। গোপালন জাতি

সম্বন্ধে বিধি জানিবার জন্য আইসা টুইডের ("Cow-keeping in India") "ভারতে গোপালন" যত্ন সহকারে পঠনীয়। যাহা আমরা আমাদের নিজের দেশে করিতে অসমর্থ বিদেশী লোকগণ তাহা আমাদের জন্য করিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেও আমরা তাহা দেখিয়াও নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে শিখি না, ইহাই আমাদের বিশেষ দুঃখের কারণ। আমাদের দেশের গোজাতিকে রক্ষণে ও প্রতিপালনে আমরা অসমর্থ কিন্তু বিলাতে ভারতীয় গোজাতির রক্ষার জন্য ৪৫নং কুরথোপ্ রোডে, হ্যামস্টেড লণ্ডন এন্, ডবলিউ, এক সমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহা বোধ হয় আমাদের দেশের কম লোকই অবগত আছেন। ইহার নাম ("British Association for the Protection of Indian Cattle."") ভারতীয় গোরক্ষার জন্য বিলাতি সভা" মিঃ কে,এস্, জাসাওয়ালা ইহার সম্পাদক। ধন্য আমাদের নিস্পৃহতা, এবং বিরাগ (indifference) !!! যাহার দুগ্ধ খাই, যে আমাদের লাঙ্গল কর্ষণ করিয়া খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করে, তাহার প্রতি আমারা নিষ্ঠুর ব্যবহার করি, পেট ভরিয়া খাইতে দিই না, অত্যন্ত খাটাই, প্রহার করি, ইত্যাদি। যে ভারতের গোজাতি এক সময়ে পৃথিবীর গোকুলের শীর্ষ স্থানীয় ছিল এখন তাহাদের বংশধরগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। এখন ভারতে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গো আছে তাহা দেখা যাক।

১। মহীশূর জাতীয়ঃ—

মহীশূর দেশীয় বলদ পরিশ্রমী, বলিষ্ঠ, বৃহদাকার বিশিষ্ট এবং গোজাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহারা যেমন দ্রুতগামী এবং চঞ্চল তেমনি শকট কামানাদি টানিতে পটু। গাভিগুলি দুগ্ধবতী আদৌ হয় না। দিনান্তে বহু চেষ্টাতে ১ বা ১।৹ সের দুগ্ধ দেয়। সেইজন্য এই জাতীয় গাভিকুল বাথান গাভির জন্য পালন একেবারেই উপযোগী নহে (As dairy cattle they are of no value.)। ভ্রমণশীল (nomad) গোজাতি তাহাদের অপেক্ষা উত্তম জাতীয় গোজাতির সহিত বা মহীশূর দেশীয় প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোজাতির "শঙ্কর" সন্তান উৎপাদন করাইয়া মহীশূরের গোজাতির সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছে। মহীশূর দেশে দুই জাতীয় প্রসিদ্ধ গোজাতি আছে।

১। নাহ দানা বা মহীশূরের দেশীয় ও স্থানীয় গোজাতি

২। দাহ দানা বা ঐ দেশীয় বৃহৎ গোজাতি

১। নাহ দানার সংখ্যা অধিক এবং স্থানীয় কয়েকটি জাতিকে বেষ্টন করে। ইহাদিগের গঠন দুর্ব্বল অসামঞ্জস্য এবং গাত্রের রঙ্ বিভিন্ন প্রকারের। মহীশূর দেশে ইহারাই কৃষকের "বলদ" জাতীয় অর্থাৎ ইহাদিগের দ্বারাই ঐ দেশের কৃষকগণ চাষ করিয়া থাকে। ইহারা অধিক দুগ্ধবতী না হইলেও ঐ দেশের গাভিজাত সামগ্রী এই জাতীয় গাভি হইতেই সমধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের উৎপত্তি বন্য গোজাতি হইতে হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

তাহাদিগের সচরাচর কোনই যত্ন করা হয় না এবং তাহাদিগের জাতীয় অবনতি হইতে রক্ষা করাইবার কোনরূপ চেষ্টাও এদেশের লোক করে না। মনুষ্য জাতি ইহাদিগকে খাটাইয়া স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করে কিন্তু ইহাদিগের প্রতি আদৌ কোনরূপ দৃষ্টি রাখে না; আমরা এতই স্বার্থপর জাতি। ক্ষুদ্র জাতীয় নাহ দানা ষাঁড়গণ অবাধে দেশীয় গাভির সহিত বিচরণ করে এবং সহবাসের কোনরূপ বাধা না থাকায় হীন জাতীয় গোজাতির উদ্ভব সংঘটিত হয়। কিন্তু কাভেরী নদের তীর দেশীয় উর্ব্বর ভূমিতে, নক্কাবল্লীতালুকে, কোন কোন সংগতিপন্ন কৃষক উত্তম জাতীয় ষাঁড়ের সাহায্যে গোউৎপাদন করিয়া থাকে। তাহার ফলে ৩।৪ পুরুষ এইরূপ স্বাভাবিক নির্ব্বাচন (natural selection)এর দ্বারা যে গোজাতি উৎপাদন করা হইয়া থাকে তাহারা প্রায়ই বলিষ্ঠ ও উত্তম জাতীয় গাভি হইয়া থাকে। মহাবলেশ্বর, চেট্টা, চিত্তল, ক্রুগ প্রভৃতি স্থানের গোজাতিগণকে এই কার্য্যে ব্যবহৃত করা হইয়া থাকে। এই প্রকারে বেশ জানা যাইতেছে যে যত্নে নির্ব্বাচন দ্বারা এবং ষণ্ড বাছিয়া গাভি উৎপাদন করিতে পারিলে অধঃপতিত দেশীয় গাভি জাতিকে খুব উন্নত অবস্থায় আনয়ন করা যাইতে পারে। আশা করি মিঃ অতুলকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি বিলাত ফিরত কৃতবিদ্য মহাশয়গণের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়িবে। গভর্ণমেণ্টের অর্ডনান্‌স্ ডিপার্টমেণ্টে "অমৃত মহল" জাতীয় বলদের বহুল ব্যবহার থাকায়, মহীশূর দেশীয় এই জাতীয় গোজাতির উন্নতি শনৈঃ শনৈঃ সাধিত হইতেছে। গুজরাট দেশীয় গোজাতির বংশেরও উন্নতি কম হয় নাই।

নাহদানা গোজাতির গুণাগুণাদি :—ইহাদিগের মস্তকটি বেঁটে এবং সুডৌলযুক্ত কপাল বিশিষ্ট। কপালটি ভিন্ন ভিন্ন রঙ্‌ বিশিষ্ট হয় এবং মোটা থর্ব্বাকৃতি হইতে লম্বা ডৌল পর্য্যন্ত দেখা যায়। চক্ষুগুলি ছোট হইলেও খুব চঞ্চল এবং শক্তি ব্যঞ্জক। গলাটি মাফিকসই লম্বা কিন্তু কোন কোনটিতে কৃশত্ব হইয়া থাকে। কানগুলি ছোট এবং দাঁড়ান। ঝুলগুলি পাতলা এবং ছোট ঝুট্‌গুলি সুন্দর ঝাঁকড়াল, পা গুলি সুডৌল এবং মাফিকসই কিন্তু কোন কোনটিতে লম্বাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পায়ের চেটো বা খুর ছোট এবং সম এবং অসমান অংশে চেরা। পঞ্জরগুলি বেশ সুগোল; কোন কোনটিতে চেপ্টাও দৃষ্ট হয়। যোনীটি থস্ থসে এবং ঝোলা। লেজগুলি জাতি বিশেষে লম্বা এবং খাট হইয়া থাকে। স্কন্ধ এবং জংঘাগুলি বেশ শক্ত; চৌড়া এবং বলিষ্ঠ। গায়ের রং প্রায়ই কাল হইয়া থাকে কিন্তু অপরাপর রংএরও দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাইজ ছোট এবং মেজাজ নম্র। ইহারা দক্ষিণ ভারতে চাষ ও বলদের কাজে (as beasts of burden) বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২। দাহদানা বা মহীশূর দেশীয় বৃহৎ গোজাতি :—এই উৎকৃষ্ট গোজাতি[illegible] ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে কিন্তু অমৃত মহল, মধবেশ্বর, বেট্টা [illegible]

তাহাদের (allied and kindred breeds) সমধর্ম্মী গবাদিকে বেষ্টন করে। এই জাতীয় গো বংশের "রক্তের" বিশুদ্ধতা খুব যত্নে সংরক্ষিত করা হইয়াছে এবং হীন জাতীয় গাভীদের সহিত ইহা কদাচ মিশ্রিত হইতে দেওয়া হয় না, কাজেই এই জাতীয় গোজাতির অদ্যাবধি হীনাবস্থা (deteriorate) না করায় গভর্ণমেণ্টের ফৌজে ইহার বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ফৌজে সিন্ধ বা গুজরাটী গোজাতির অধিকতর ব্যবহার এবং ইহাদের সুখ্যাতিও নাহদানা অপেক্ষা সমধিক। এই জাতীয় হীনবীর্য্য দুর্ব্বল ষাঁড়গণকে "বলদ" করা হয় এবং গাভীগুলি "ডাকিলে" এই জাতীয় ভাল তেজস্কর এবং দূর সম্পর্কীয় ষাঁড়ের দ্বারায় পাল দেওয়া বা "শাবক" উৎপাদন করান হয়; কাজেই "রক্তের" বিশুদ্ধতা সকল প্রকারেই রক্ষিত হইয়া থাকে। এই উৎকৃষ্ট জাতির গোজাতি নির্ব্বাচনের ফল। চাষীগণ (breeders) দুগ্ধ, সাইজ, বল, চেহারা, বলিষ্ঠ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং মনোহারি রঙ্গের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গাভির "পাল" ধরান বা ষাঁড়প্রদর্শন করাইয়া থাকে। এই জাতীয় গাভিগুলি প্রায়ই "বছর বিয়ানী," "দুবৎসর-বিয়ানী" এবং "তিন বৎসর অন্তর বিয়ানী।" এই জাতীয় কোন কোন গাভি দুই দন্ত উদ্গমের পূর্ব্বেই "বলদ" লইয়া থাকে, কোন কোনটি ২ দন্ত উদ্গমের পরে, কোনটি পুনশ্চ তাহার বহু পরেও "পাল" লয়। মোট কথা এই যে জাতি অনুসারে এই জাতীয় গাভি দ্বিদন্তোদ্গমের পূর্ব্ব হইতে সকল দন্ত বাহির হইবার ২।৩ বৎসর পর পর্য্যন্তও "ষাঁড়" গ্রহণ করিয়া থাকে। এই জাতীয় বলদ ৫ বৎসরের পরে বাজারে বিক্রিত হইয়া থাকে এবং এই সময়ে তাহারা কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। ১২।১৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইহারা বেশ কাজ করিয়া থাকে। এই জাতীয় গাভিগুলি প্রায়ই সাদা রঙের হইয়া থাকে। বলদগুলি খুব দ্রুতগামী এবং অল্প ভোজী।

দাহদানা জাতীয় গোজাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে "অমৃতমহাল।" ইহারা ভারতীয় যাবতীয় গোজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই জাতির গোজাতি গভর্ণমেণ্টের হন্সুর ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগের সিঙ্ এবং বলিষ্ঠ গঠনের দ্বারাই শত শত গাভির মধ্য হইতে অনায়াসে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহারা কদাচ দুগ্ধবতী গাভি নহে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বকনাগুলি ৩ হইতে ৪ বৎসর বয়সে "ষাঁড়" লইয়া থাকে এবং ৭।৮টি বিয়ান দেয়। শাবকগুলিকে ৫।৬ মাসে মাতৃদুগ্ধ ছাড়ান হইয়া থাকে এবং ৫ হইতে ১২ মাসের মধ্যে নবেম্বর মাহায় মুষ্ক ছেদন করা হইয়া থাকে। ইহারা সুগঠিত এবং সৌষ্ঠবযুক্ত সুগঠন মস্তক ধারণ করে। ইহারা খুব দ্রুতগামী এবং ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে হায়দার আলি এবং টিপুসুলতান ইহাদিগেরই সাহায্যে ইংরাজগণের সহিত যুদ্ধে এত ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোলা ও তৎজাতীয়

গোজাতির সংমিশ্রনে বর্ত্তমান অমৃত মহাল জাতীয় গোজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। বিজয়নগর রাজের প্রতিনিধি চিক্কা দেবরাজ ওয়াডেয়ার মহারাজের দ্বারা ১৬ খৃষ্টাব্দে এই গোজাতির প্রথম চাষ আরম্ভ হয়। ইহাদের আদিম নাম "বেণী-চাভেদী," তাহা "অমৃত মহালে" পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

হালিকার, হাগালবাদী এবং চিত্তল দ্রুগ জাতীয়ের রক্ত হইতে বর্ত্তমান "অমৃত মহাল" উৎপন্ন হইয়াছে। এই জাতি আজমপুর এবং মালভাল্লী বংশীয় জাতি লইয়াও গঠিত। উপরোক্ত পঞ্চশ্রেণীর মধ্যে হালিকার জাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাদিগের সিঙ্ প্রায় অর্দ্ধ দুর পর্য্যন্ত সমান উঠিয়া পশ্চাৎদিকে বাঁকিয়া যায়। সিঙ্গুলি খুব বড় বড় হওয়ায় মাথাটি প্রকৃত বড় না হইলেও বড় দেখায়। সিঙ্গুলি খানিক দুর পর্য্যন্ত সিধা উঠিয়া তার পর বিপরীত দিকে বৰ্দ্ধিত হয় এবং পিছন দিকে বাঁকিয়া থাকে; ইহাতেই ইহাদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সিঙ্গুলির গোড়ার নিকট খুব মোটা এবং আগার নিকট সরু, ধারাল এবং তীক্ষ্ণ হয়।

ইহাদের মেজাজ খারাপ এবং অস্থির, বিশেষতঃ অচেনা লোকের সমক্ষে ইহারা বড়ই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। উত্তম জাতীয় অমৃত মহাল বলদের দাম ৮০৲ হইতে ১৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে কিন্তু সচরাচর ইহাদের দাম ৫০৲ হইতে ৬৫৲ টাকা হইয়া থাকে। সচরাচর গাভির দাম ৪০৲ হইতে ৯০৲ কিন্তু উত্তম জাতীয়ের (well-bred)এর মূল্য ৬০৲ হইতে ৯০৲ টাকা; ভাল ষাঁড়ের মূল্য প্রত্যেকটা ৪০০৲ টাকা। বাছাই নাহদানা এবং অমৃত মহালের সংমিশ্রণে একপ্রকার গোজাতির উদ্ভব হইয়াছে তাহারা অমৃত মহাল অপেক্ষা কোন ক্রমেই হীন নহে ইহাদিগকে "দ্বাস্তা গোসু" জাতি বলে। অমৃত মহাল বংশের মধ্যে হালিকার জাতীয়গণ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। খাঁটী অমৃত মহালদের মত ইহাদের পেটের ঘের মানানসই, স্কন্ধ চৌড়া এবং বলিষ্ঠ, ঘাড় মাংসপেশীতে পূর্ণ, দেখিলেই বোধ হয় যেন শকট বহন করিবার জন্ত ইহাদের জন্ম। কুনীজল, গুচী এবং নাগমঙ্গলের হালিকর প্রসিদ্ধ। মহীশূর জেলার এই সকল তালুকে ইহাদের চাষ বহুল হইয়া থাকে। হাসন এবং তমুকার জেলায়ও ইহাদের জন্মস্থান বলা যাইতে পারে।

সরকারী কৃষি সংবাদ

বঙ্গে রবিশস্য—

বিগত বর্ষে রবিশস্যের আবাদ ভাল রকম হয় নাই। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে অসময়ে নদীর জল বাড়িয়া পূর্ব্ববঙ্গে নদীর চরে যে সকল রবি খন্দ হয় তাহার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। বর্ত্তমাণ বর্ষে সে রকমের কোন বিঘ্ন ঘটে নাই। বপন সময়ে এবং পরে সময়মত সুবৃষ্টি হওয়ায় রবি খন্দ অতি সুন্দর জন্মিয়াছিল কিন্তু শেষ রক্ষা হইল না, মাঘের শেষ ভাগে বৃষ্টি বাদলে বঙ্গে কলাই, সরিষা, মুগ ও মসুরির কতকটা ক্ষতি কারক হইয়াছে। বিগত বর্ষে পৌষের শেষ হইতে আদৌ আবশ্যকমত সুবৃষ্টি হয় নাই। তার পর ফাল্গুন মাসে যখন বৃষ্টি হইল তখন তাহাতে কোন উপকার দর্শিল না বরং অপকার হইল। এই জন্যই বলে "শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্"। বর্ত্তমান বর্ষে কি পরিমাণ ফলন দাঁড়াইয়াছে এখন স্থির নির্ণয় হয় নাই। বিগত বর্ষে চৌদ্দ আনা মাত্র ফসল জন্মিয়াছিল।

আলু—

এই সময় আলু তুলিবার সময়। বাঙলার মধ্যে হুগলী ও বর্দ্ধমানে আলুর চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। ফাল্গুনের প্রথমে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বৃষ্টি হওয়ায় আলুর ক্ষতি হইয়াছে। এই সময় আলুতে জল পাইয়া আলু দাগী শস্যের পরিমাণ কম হইয়াছে। এই আলু অধিক রাখা যায় না—রাখিলে পচিয়া নষ্ট হয়। বিগত তিন বৎসর কত পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং শস্য সমুদয়ের কলিকাতা আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ আলোচনা করিলে একটা ধারণা হইতে পারে।

কলিকাতায় আমদানী।	১৯০৯-১০	১৯১০-১১	১৯১১-১২
চাউল	১৯,৬০৭,৫৮২	১৭,২০১,০৯৭	২০,৭৩৪,৫০০
গম ও ময়দা	৮,১৮০,৯৫১	৮,৭৯৭,৯১৫	৯,০৯৩,৫২৮
ছোলা কলাই	৫,৬৬৯,৪৬২	৭,২৫৬,৩৮১	১১,২৩৫,৮৮১
অন্য খাদ্য শস্য	১,০৯৩,৪০৫	৪১৯,১৮৪	৪,২৫৮,৫২১
পাট	৩৪,৫৫১,৪০০	৬৩,৬৭৪,৫৭৭	৪৫,৩২২,৪৩০
থলে	১৮৫,০৯৮,৬৯৯	১৬৫,২৮২,২৬১	১৭৬,৯১৬,৯৬৭
তিসি	৪,২৯২,১২৩	৬,৩৯৮,৯৯১	৭,১৫৫,২২৯
সরিষা, রাই	৪,৬৫৫,৫৩২	৪,৮৮৪,০৮৩	৪.৫২৭,৭৯৩

কলিকাতা হইতে রপ্তানি।	১৯০৯-১০	১৯১০-১১	১৯১১-১২
মণ	মণ	মণ	মণ
চাউল	৭,৩৪২,০৩৬	১০,৬০২,৭৩৭	১৫,৪৫৮,৭১২
গম ও ময়দা	৪,০৩৫,২০২	৫,২১৮,০৮৯	৫,২৮০,২০৫
ছোলা, কলাই	১,৮৩৫,২৭৫	৩,৪১৩,২১৮	৭,৬৮৭,৬৫২
অন্য খাদ্য শস্য	৭০৮,০৩৫	১১৮,৬৪৩	৪,০২৪,৮০৪
পাট	১৮,১৮৬,৬৫৬	১৪,৯৮২,৪০১	১৮,৩৯৭,৪০৮
থলে	৯২০,৮৮৫,৪৯২	৯১৯,০৬২,৫৮৮	৭৯৩,২৫৬,৫৩৪
তিসি	৩,৯২৯,৭৪৮	৬,১৮৭,২৭৭	৭,৫৯৮,৩৮৭
সরিষা, রাই	১,৫০৯,৭৮৪	৮৫৬,৭৭১	৩২৬,৯৬১

উক্ত তালিকা দৃষ্টে বুঝা যায় যে রাই ও সরিষা ব্যতীত সমস্ত জিনিষের রপ্তানি বাড়িতেছে। তিসি, চাউল, ছোলা, কলাই ও অন্যান্য খাদ্য শস্যের রপ্তানি বিগত তিন বৎসরের মধ্যে বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১০-১১ সাল অপেক্ষা ১৯১১-১২ সালে পাটের রপ্তানি বিশেষ বাড়িয়াছে, দ্রব্যাদির দাম কমা বাড়া অনেকটা চাউলের দর কম বেশীর উপর নির্ভর করে। বিগত তিন বৎসর চাউলের দাম সর্ব্বত্রই কিছু কম ছিল। আউস ধানের চাউল কোন কোন স্থানে ২॥০ আড়াই টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছে, সরু আমন ধানের চাউল ৫৲ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। মুর্শীদাবাদে আউস চাল ৩৲ টাকা মণ দর ছিল কিন্তু নদে জেলায় সেই চাউলের দর ৪।৵০ চারি টাকা সাত আনা ছিল।

পাটের দর খুব চড়িয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র দার্জ্জিলিঙ ও খুলনায় ৫॥০ টাকা দরে পাট পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা, মৈমনসিংহে পাটের দর ৮৲ টাকা, ফরিদপুর বাখরগঞ্জে ৬৲ টাকার উপর, প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৮॥০ টাকা।

বিগত কয়েক বর্ষ সমালোচনায় আর একটি বিশেষ অভাব বোধ করা যায়, ভাল দুধের বড়ই অভাব হইতেছে এবং দুধের দাম উত্তোরোত্তর বাড়িতেছে, সরকারী রিপোর্টে ইহার তিনটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গাভী সকলকে বলদ ধরাইবার জন্য উপযুক্ত বলদের অভাব, দুধের দর অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় বাছুরকে আর উপযুক্ত দুধ খাইতে দেওয়া হয় না। পশু খাদ্যের অভাব হওয়ায় গরু পুষিতে অনেক খরচ পড়িয়া থাকে। গবাদির পশুর খরিদ দরও দুই গুণ চড়িয়া গিয়াছে।

মাঘ, ১৩১৯ সাল।

গাছের হস্তলিপি

আচার্য্য বসুর নূতন আবিষ্কার—কেমন করিয়া গাছ আপনার জীবনের কার্য্য, কাগজ কলম ধরিয়া লিখিয়া দেয়

সমস্ত উদ্ভিদজাতির ভিতরে চৈতন্যবোধ আছে, তাহারা বাহ্য চেষ্টা দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু সুখ দুঃখের অনুভব করে। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, প্রাণীদিগের শরীরের মধ্যে যেমন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হইয়া থাকে, উদ্ভিদ্‌দিগের দেহমধ্যেও সেই প্রকার অতি ক্ষীণ স্পন্দন অনুভূত হয়। মানবের হৃদয়ের ন্যায় তাদের শরীরের একটি যন্ত্র প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। প্রাণীদিগকে বিষ প্রয়োগ করিলে উহাদের শরীরে যেরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হয়, উহাদিগকে বিষপ্রদান করিলে উহাদের শরীরেও সেইরূপ ক্রিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত রস পান করিলে উদ্ভিদ্‌গণ অতি ভোজনকারী প্রাণীর ন্যায় কতকটা অলস হইয়া পড়ে। অধ্যাপক বসু মহাশয়ের এই আবিষ্কার ডার্ব্বিন্ বা ফ্যারাডের আবিষ্কার অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। মার্কিণ প্রভৃতি দেশ অধ্যাপক বসু মহাশয়ের যশোভাতিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। জড়ে চৈতন্য, উদ্ভিদে চৈতন্য, প্রাচীন হিন্দুদিগের এই যে সিদ্ধান্ত উপহাসে উড়াইয়া দিবার বিষয় নহে। তিনি সেই প্রাচীন সিদ্ধান্তের সারবত্তা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকসমাজেও সপ্রমাণ করিয়াছেন। আশা করি, তিনি দিন দিন তাঁহার যশোভাতি সমস্ত সভ্যজগতে বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন।

আচার্য্য বসু "প্ল্যাণ্ট অটোগ্রাফ" নামক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রটি আপনা আপনিই কলে চলে। গাছের যে কোনও অংশের

সহিত ইহার সংযোগ করিয়া দিলেই আপনা আপনি রেখাপাত করিয়া—গাছের তৎকালীন সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করায়। এই আবিষ্কারটি তাহার অন্যান্য পূর্ব্ব আবিষ্কারগুলির ভিত্তির উপর ন্যস্ত।

আচার্য্য বসু অচেতন, অর্দ্ধ চেতন পদার্থ গুলির কার্য্য ক্রমশঃ যন্ত্র সাহায্যে স্ফুটতঃ দেখাইতেছেন। তিনি প্রথমে "জড় ও জীবের সাড়া দিবার ক্ষমতা"—"Response in the living and the non-living" দেখাইলেন।

দ্বিতীয় পুস্তকে উদ্ভিদের সম্বন্ধে এই তত্ত্ব বিশিষ্টভাবে অনুশীলন (Plant Response) করিয়া বুঝাইলেন।

অবশেষে উদ্ভিদের আভ্যন্তরিক তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্ত্তনের অবস্থা সাধারণে জ্ঞাপন করিলেন।

বিশদরূপে যন্ত্র সংযোগে আপনা আপনি রেখাপাত করিয়া বৃক্ষাদির স্ববৃত্তিগুলি আঁকিয়া দেখানই এই যন্ত্রটির মুখ্য উদ্দেশ্য। সারাদিন সারারাত্রি কেহ ছোঁয় নাই, কেহ দেখে নাই, কেহ শুনে নাই—কাগজে আপনিই রেখাপাত হইয়া রহিয়াছে।

কোষ পরম্পরার সঙ্কোচ হইতেই গাছে রস সঞ্চালন হয়—এইটি ঠিক যেন প্রাণী দেহেরই রক্ত সঞ্চালনের মত—কেবল প্রভেদ এই যে, মানব দেহের বৃহৎ এক কেন্দ্র হৃদয় হইতে রক্ত সমুদয় শরীরে পরিচালিত হয়। উদ্ভিদের প্রতি কোষ এক একটি ছোট ছোট হৃদয়ের মত।

কোনও প্রকার উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগে গাছের অভ্যন্তরে যে উত্তেজনা হয়—তাহা একটি অল্প বিস্তর উর্দ্ধ রেখা দিয়া অনুসূচিত হয়।

তেমনি অবসাদের রেখা নিম্ন দিকে যায়। মদিরা সিঞ্চনের উত্তেজনায় উদ্ভিদের রেখা অসংযত হইয়া মাতালের মত টলমল্ করে। আর অতিরিক্ত বিষ প্রয়োগে উদ্ভিদের সাড়াসূচক রেখাটি ক্রমে কমিয়া যায় ও পরে হঠাৎ অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া চিরকালের মত সাড়া দিবার ক্ষমতা হারায়। এইটিই উদ্ভিদের মৃত্যুরেখা। ঠিক যেন জীব জগতে—মৃত্যুকালে দেহের শিরা সঙ্কুচনের মত।

এই সকল জ্ঞান কর্ম্মজগতেও আমাদের কত সাহায্য করিতে পারে। জমিতে তড়িৎ চালনা করিলে বা গাছের গোড়ায় গরম জল দিলে উদ্ভিদের আরও শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। শুধু তাই নয়—জীবজন্তু ও মানব দেহে ও মনেও ঐ সকল আবিষ্কারের কত প্রয়োগ হইতে পারে। মানবদেহে স্নায়ুবিকারে ও পাগলামী ইত্যাদি মানসিক বিকারেও এই আবিষ্কারের অনেক সদ্ব্যবহার হইতে পারে। শিশুশিক্ষা শাস্ত্র সম্বন্ধে শিশুর দেহ, মনের উত্তেজনা, অবসাদ, ক্লান্তি প্রভৃতি মানসিক অবস্থা এই যন্ত্রে

এমন সুন্দরভাবে স্থাপন করা যায় যে, সেটি শিশুশিক্ষা কার্য্যে অতিশয় সাহায্য করে। অযথা শিশুর শক্তি অপচয় হয় না।

এই সকল বিশাল তত্বগুলি ভারতে নিতান্ত নূতন না হইলেও কেহ বড় তত্ব লইত না। ঋগ্বেদ প্রভৃতি নানা ধর্ম্মশাস্ত্রে ও দর্শন শাস্ত্রে, বিশেষতঃ কবিদের উচ্চ কল্পনায়—এই সকল কথা বহু পুরাকালে ব্যক্ত হইলেও ইহা পুঁথিগতই ছিল ও কল্পনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত বলিয়া কেহই এই তত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। আচার্য্য বসুর এই সকল যন্ত্র. বিশেষতঃ "Plant Autograph" নামক যন্ত্রে, তাহা আপনা আপনিই প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

সম্প্রতি অধ্যাপক বসু মহাশয় উদ্ভিজ্জজাতিসম্পর্কে তাঁহার আবিষ্কারসম্বন্ধে অপূর্ব্ব তথ্য সকল যন্ত্রসাহায্যে সপ্রমাণ করিয়াছেন। এতদিন বৈজ্ঞানিকদিগের বিশ্বাস ছিল যে, কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস উদ্ভিদ্‌দিগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। জগদীশ বাবু সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উহাতে উদ্ভিদ্‌গণের শ্বাসরোধ ও প্রাণান্ত হয়। তবে রবি-কিরণের প্রতিক্রিয়া ফলে উক্ত বিষের ক্রিয়া কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তিনি যে এই অতি আবশ্যক যন্ত্র উদ্ভাবিত করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিজগতের বিশেষ উপকার দর্শিবে। উহার সাহায্যে উদ্ভিদ্‌গণের অতি সামান্য বৃদ্ধিও অতি অল্পক্ষণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়; কোন্ প্রকার সার দিলে উদ্ভিদ্‌-দিগের দেহের উপর কিরূপ ক্রিয়া হয়, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যেই জানিতে পারা যায়। আজ কাল জমিতে সার সম্বন্ধে অনেক ভিন্ন মত আছে। এইবার অধ্যাপক বসুর যন্ত্রসাহায্যে কোন্ প্রকার সার দিলে কোন্ ফসলের কিরূপ উপকার বা অপকার হয়, তাহা অতি সহজেই জানিতে পারা যাইবে। ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে এইরূপ যন্ত্রের আবিষ্কার যে প্রভূত উপকার সাধক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি কৃষিপ্রধান জাতির মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, কৃষি জাতি তাঁহার নিকট চিরকাল ঋণী থাকিবে।

পত্রাদি

শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার, পাবনা পোঃ, শালগাড়িয়া

কাঁচিলা ঘাস—চন্দন পুরস্থ শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায় মহাশয় কাঁচিলা ঘাসের অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার অবগতির জন্য লিখিতেছি ঐ ঘাস বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ এতদঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রায় সব সময়েই উহা পাওয়া যায়, তবে বর্ষাকালে খুব বেশী। এখানে উহা প্রায় বাড়ীর প্রাঙ্গনে ও রাস্তার পার্শ্বে জন্মিয়া থাকে ও সাধারণ লোকের মধ্যে উহার ব্যবহারও চলিত আছে। রায় মহাশয় শুধু যকৃৎ ব্যায়রামেই উহার ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন কিন্তু এতদঞ্চলে উহা সর্ব্বপ্রকার ফোড়া ও ক্ষতের জন্যও ব্যবহৃত হইয়া থাকে ও অধিকাংশ সময়েই আশ্চর্য্য জনক ফল পাওয়া যায়।

সাধারণের অবগতির জন্য উহার ব্যবহার প্রণালী নিম্নে লিখিত হইল,

প্রথমতঃ কাঁচিলা ঘাসের কতকগুলি শিকড় বাঁটিয়া লইতে হইবে। পরে উহা এক খণ্ড কদলী পত্রের উপর রাখিয়া আর এক খণ্ড কদলী পত্র দ্বারা ঢাকা দিতে হয়। পরে যে খণ্ড পীড়িত স্থানে লাগাইতে হইবে অর্থাৎ নীচের পত্রের স্থানে স্থানে কয়েকটী ছিদ্র করিয়া পীড়িত স্থানে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার ক্ষত অবিলম্বে আরাম হয়। ডাক্তারেরা যে সমস্ত ক্ষত দুরারোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাও এই ঔষধে দুই তিন দিনের মধ্যে আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ক্ষত যতই পচা হয়, ইহার কার্য্যও তত শীঘ্র হইতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বপ্রকার ফোড়াতেও ইহার উক্ত প্রণালী অনুসারে ব্যবহার করিয়া আশাতীত ফল পাইতে দেখা যায়। এমন কি পৃষ্ঠাঘাত প্রভৃতি ফোড়াতে ইহা মন্ত্রবৎ কার্য্য করে। দুই এক দিন ব্যবহার করিলেই ফোড়াতে পূঁয সঞ্চার হয় ও মুখ হয়। যদি নিতান্তই মুখ না হয়, তবে একখণ্ড কচু পাতা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া অপর একখণ্ড কচু পাতার উপরে রাখিয়া নীচের কচু পাতার গাত্রে কয়েকটী ছিদ্র করিয়া ফোড়ার উপরে দুই ঘণ্টা কাল লাগাইয়া রাখিলে তৎক্ষণাৎ মুখ হয় ও ফোড়া ফাটিয়া ক্লেদ নির্গত হইয়া যায়। তখন কাঁচিলা মূল পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যবহার করিলে ক্ষত অবিলম্বে নিরাময় হইয়া থাকে।

এতদ্দেশে জনসাধারণ ও বৃদ্ধাদিগের মধ্যে এই মহৌষধের যথেষ্ট প্রচলন আছে ও অধিকাংশ সময়েই আশাতীত ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা এখনও ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়াতে স্থান পায় নাই বলিয়া ভদ্রলোকগণের মধ্যে ইহার প্রচলন দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক—সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিমিয়ার খনিতে একখণ্ড হীরক আবিষ্কৃত হইয়াছে। জহুরীদের মতে ইহাই পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক। এত বড় হীরক নাকি ইতিপূর্ব্বে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। এই হীরক খণ্ডের ওজন প্রায় সতর তোলা হইবে। ইহা দেখিতে একটী কুক্কুট ডিম্বের ন্যায়। হীরকখণ্ডের উপরে কৃষ্ণবর্ণের রেখা আছে, কিন্তু জহুরীরা বলিতেছে, ইহার ভিতরে ওরূপ কোন চিহ্ন নাই। এই নবাবিষ্কৃত হীরকখণ্ডের মূল্য কত, তাহা আজ পর্য্যন্তও কেহ স্থির করিতে পারে নাই। এই হীরক আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্ব্বে যে হীরকখণ্ড পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, তাহার মূল্য ৩০০০০০০৲ ত্রিশ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। উহাও দক্ষিণ আফ্রিকায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ট্রান্সভাল গভর্ণমেণ্ট ঐ হীরকখণ্ড সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জকে উপহার দিয়াছিলেন। উহা একাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মুকুটে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে।

শিল্প ও ব্যবসা—ভারতে দিয়াশলাইর কাট্‌তি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েক বৎসর যাবৎ জাপানী ও সুইজারলণ্ড দেশীয় দিয়াশলাইতে খুব প্রতিযোগিতা চলিতেছে। কিন্তু বাজারে জাপানী দিয়াশলাই প্রাধান্য লাভ করিতেছে, কারণ বিলাতী দিয়াশলাই হইতে জাপানী দিয়াশলাই বেশী সস্তা।

সার-সংগ্রহ

মোম চীনা বা গাছ মোম

বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যে কত যে আশ্চর্য্য কাণ্ড পরিলক্ষিত হইয়া থাকে তাহার নির্ণয় নাই। প্রাণীজগতে যে সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, আমরা অনেক সময় উদ্ভিদ জগতে সেই সকল পদার্থ বিদ্যমান দেখিতে পাই। সকলেই অবগত আছেন নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মৌমাছি যে মধুচক্র প্রস্তুত করে, তাহা হইতে মোম প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু এই মোম আবার বৃক্ষ হইতেও পাওয়া যায়। চীন ও জাপান দেশে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার বীজ হইতে এক প্রকার ঘন চর্ব্বির ন্যায় নির্য্যাস বাহির হয়, যাহা মধুমক্ষিকার মোম হইতে কোন প্রকারে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না। এই গাছ চীন ও জাপান দেশে প্রধানতঃ জন্মে বলিয়া উহার

বীজ নির্গত মোম, মোম চীনা বা জাপান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মৌমাছির মোম অতিশয় দুর্মূল্য বলিয়া মোম ব্যবসায়ীরা সুলভে বিক্রয় করিবার জন্য তাহার সহিত এই জাপান মিশ্রিত করিয়া থাকে। পাশ্চাত্য উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞেরা ইহাকে Sapium Sebiferum বা Vegetable Tallow বলেন।

চীন, জাপান ব্যতীত এই মোমপ্রসূত বৃক্ষ কোচিন-চীন, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকাতেও জন্মিয়া থাকে। মধ্য ইউরোপে ও দক্ষিণ ফ্রান্সেও এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের যুক্ত প্রদেশে ও পঞ্জাবের অনেক স্থানে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। কুমায়ুনের গাড়োয়াল নামক স্থানে ও কাংড়া অধিত্যকায় এই গাছ বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ছোট নাগপুরে এই গাছ প্রথম রোপণ করা হয়। ১৮৪৯ সালে তথাকার কর্ণেল উসলি (Colonel I. R. Ouseley) সাহেব কলিকাতার Agricultural Horticultural Societyতে জ্ঞাপন করেন যে, ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে মোমচীনা গাছের যে বীজ প্রেরিত হইয়াছিল তাহা হইতে ৫০।৬০টি গাছ তৈয়ারী হয়। এই গাছ গুলি সত্বর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং উহা প্রায় ১২ ফুট উচ্চ হইয়াছিল।

ডাক্তার রক্স বর্গ তাঁহার Flora Indica গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই গাছ কলিকাতায় যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অল্পদিনের মধ্যে ইহা অনেক স্থানে রোপিত হইয়াছে। লোকে কেবল বাগানের শোভার জন্যই ইহা রোপণ করিয়া থাকেন। ইহার বীজ হইতে যে চর্ব্বির মত পদার্থ বাহির হয়, তাহা অতি যৎসামান্য ও নিকৃষ্ট এজন্য ইহার রোপণ দ্বারা বিশেষ কোন ইষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই। দীপ জ্বালাইবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা নারিকেল তৈল ভাল বলিয়া বোধ হয়। শীতকাল ভিন্ন অন্য ঋতুতে এই মোম আদৌ জমে না, তদ্ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে ইহার গন্ধ বড়ই উগ্র ও অম্লবৎ অনুভূত হইয়া থাকে। কিন্তু ম্যাগোয়ান (Dr D. I. Macgowan) ডাক্তার রক্সবর্গের এই মত সমর্থন করেন না। তিনি বহু বৎসর চীন দেশে বাস করিয়া এই বৃক্ষ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি ইহার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৫০ সালে তিনি Agri-Horticultural Societyতে এই বৃক্ষ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ডাক্তার রক্সবর্গের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এই বৃক্ষ হইতে কেবল যে মোম উৎপন্ন হয় তাহা নহে, ইহার পাতা হইতে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ রঙ প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ইহার কাণ্ড বিশেষ দৃঢ় ও মজবুত বলিয়া ইহা হইতে মুদ্রাঙ্কণের জন্য কাষ্ঠফলক সকল (Printing Blocks) প্রস্তুত হইয়া থাকে ও আরও অনেক প্রয়োজন সাধিত হয়। উহার বীজ হইতে মোম বাহির করা হইলে যে সিটা পড়িয়া থাকে, তাহাতে জমির সার প্রস্তুত হয় ও জ্বালানী কাষ্ঠরূপে ব্যবহৃত হয়। বীজ হইতে নির্য্যাস বাহির করা

হইলে তাহা যখন পাকান হয়, তখন ঐ সিটা কাষ্ঠের কার্য্য করে। উহা একবার জ্বালাইলে সমস্ত দিবস জ্বলিতে থাকে।

মোমচীনার গাছগুলি পরিষ্কার ও পিচ্ছিল। উহা উর্দ্ধে ২৪ হইতে ৩০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার ত্বক শ্বেতাভ ধূসরবর্ণের এবং পাতাগুলি সবুজ। কিন্তু গাছ হইতে পাতা খসিয়া পড়িবার সময় উহা লাল হয়। কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে ইহার ফুল ফুটিয়া থাকে। বীজগুলি ডিম্বাকৃতি, গাঢ় চর্ব্বির মত পদার্থে আবৃত এবং উগ্রগন্ধ বিশিষ্ট।

মোমচীনার গাছ বীজ হইতেও যেরূপ জন্মে, সেইরূপ উহার ডাল কাটিয়া বসাইলেও সচ্ছন্দে বৃদ্ধি পায়। ফাল্গুন, চৈত্র মাসেই ডাল কাটিয়া তাহা অন্যত্র রোপণ করিবার প্রশস্ত সময়। যে সকল গাছের বেড় অন্ততঃ নয় ইঞ্চি মোটা হইয়াছে, তাহারই শাখা কাটিয়া রোপণ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে ভিজা সেঁতসেঁতে জায়গায় ইহা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; নদীর তীর অথবা খালের উচ্চ পাহাড়, এই গাছ রোপণ করিবার উপযুক্ত স্থান, পলী বা দোয়াট মাটিতে, বেলে মাটিতে ও পর্ব্বতাদির সানুদেশেও ইহা বেশ জন্মে। ভারতবর্ষের বন বিভাগের একজন পুরাতন কর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে মোমচীনার গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই গাছ বহুকাল বাঁচিয়া থাকে। চীনদেশে বহুশত বৎসরের মোমচীনার গাছ দেখিতে পাওয়া যয়। অনেক গাছ হেলিয়া পড়িয়াও ফল প্রসব করিয়া থাকে। ইহার আবাদ করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার কারতে হয় না। যে স্থানে এ গাছ জন্মে তাহা অত্যন্ত রমণীয় ও শোভাসম্পন্ন হয়।

মোমচীনার বীজ হইতে যে চর্ব্বি ও তাহা হইতে যে মোমবাতি প্রস্তুত হয়, তাহা সাধারণতঃ শ্বেতবর্ণ এবং কখন কখন ঈষৎ রক্তাভ শ্বেতবর্ণ দেখা যায়, মৌমাছির মোমবাতি কিছুদিন ঘরে রাখিলে অল্পদিন পরে যেমন তাহার রঙ খারাপ হইয়া যায়। জাপান্ বা মোমচীনায় তৈয়ারী বাতির রঙ সেরূপ নষ্ট হয় না। ইহা বহুদিন ধরিয়া সুন্দর শাদা থাকে। আমাদের দেশের ন্যায় চীন ও জাপান দেশে দেবমন্দির ও দেবমূর্ত্তির সম্মুখে চর্ব্বির বাতি জ্বালান নিষিদ্ধ, এই জন্যই তথায় মোমচীনা মিশ্রিত বা খাটি মোমবাতি ব্যবহৃত হয়। চীনদেশের লোকের পোষাক মোমচীনার দ্বারা পালিশ করা হয় এবং সাবানের সহিতও ইহা মিশ্রিত করা হয়। দশ ভাগ মোমচীনাতে তিন ভাগ মক্ষিকার মোম মিশাইয়া বাতি প্রস্তুত করা হয়। চীনদেশ হইতে যে মোমচীনা আমদানী হয় তাহা টালি ইটের আকারে পুরু করিয়া চাইবাধা। ইহার এক একখানি চাই ওজনে এক মণ হইতে সওয়া মণ পর্য্যন্ত হয়। বীজ হইতে ঘন চর্ব্বির মত পদার্থ ব্যতীত আর এক প্রকার পীতাভ তৈল বাহির হয়। এই তৈল দীপে জ্বালান হয় এবং ছাতির কাপড় পালিস করিবার জন্য যে বার্ণিস

তৈয়ারী হয় তাহাতেও ব্যবহৃত হয়। বার্ণিসে এই তৈল মিশাইলে, উহা যাহাতে মাখান যায় তাহা শীঘ্র শুষ্ক হয়। চীনদেশে প্রবাদ আছে এই তৈল মাথায় মাখিলে চুল কখন শুক্লবর্ণ হয় না।

বীজ হইতে কি প্রণালীতে মোম বাহির করা হয়, এক্ষণে তাহা আমরা বিবৃত করিতেছি। শীতকালের মাঝামাঝি ফলগুলি পাকিলে তাহা সংগ্রহ করিয়া চূর্ণ করা হয়। চূর্ণ করা হইলে ফলের খোষাগুলি বাছিয়া স্বতন্ত্র করা হয় এবং একটী কাঠের সছিদ্র নলে পূরিয়া তাহা কটাহে বা অন্য উষ্ণ জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া তাপ দেওয়া হয়। ইহাতে ঐ চর্ব্বিময় পদার্থ নরম হয়। তৎপরে আস্তে আস্তে ঐ নলে ঘা মরিয়া বীজের গাদ হইতে মোমচীনা স্বতন্ত্র করিয়া বাহির করা হয়। দেড় মণ বীজ হইতে প্রায় পাঁচ সের মোমচীনা বাহির হয়। তদ্ব্যতীত যথেষ্ট তৈলও বাহির হইয়া থাকে। চীনদেশের কোথাও কোথাও পাথরের হামামদিস্তাতে বীজ চূর্ণ করিয়া তাহার তরল শাঁস গরম জলে ফুটান হয়। কিছুক্ষণ ফুটিলে উহার চর্ব্বিময় পদার্থ জলের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে। তখন আস্তে আস্তে উহা পাত্রান্তরে ঢালিয়া জমান হয়। যেরূপ প্রথায় মক্ষিকার মোম গালান হয়, ইহা অনেকটা সেইরূপ। কেহ কেহ মেটে তৈল ও অন্য দ্রাবক পদার্থের দ্বারাও মোমচীনা গালাইয়া থাকেন।

পঞ্জাব প্রদেশে যে মোমচীনার গাছ আছে তাহা হইতে মোম বাহির করিয়া ১৮৬৪ সালের লাহোর প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা হইয়াছিল। যাহাতে এদেশে ইহার ব্যবসা আরম্ভ হয় সেই উদ্দেশ্যেই ইহা করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে সাধারণের তাদৃশ অনুরাগ আকৃষ্ট হয় নাই। সম্প্রতি কাংড়া প্রদেশ হইতে কোন ব্যক্তি এই মোমের ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব গভর্ণমেণ্টের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন। ভারতের পণ্য দ্রব্যের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় উহার একটিতে শতকরা ৬২ ভাগ চর্ব্বির ন্যায় পদার্থ আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবং তাহা ৩৯ ডিগ্রী উত্তাপে গলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ইহার ব্যবসা কতদূর চলিতে পারে সে বিষয়ে তিনি কোন উল্লেখ করেন নাই। চীন ও জাপান হইতে ইহা যে অন্য দেশে ও আমাদের দেশে চালান হয় ইহা আমরা জানি। ১৮৮৯ সালে চীনদেশ হইতে ৫১৭ টন মোমচীনা রপ্তানি হইয়াছিল। সিংহল, মালদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও ১৯০০ সালে ৫২,৫৩৩ পাউণ্ড মোমচীনা আমদানী হইয়াছিল এবং ৯১,৯০০ পাউণ্ড রপ্তানি হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। যাহা আমদানী হইয়াছিল তাহার দশ আনা ভাগ জাপান হইতে আমদানী হয়, বাকী ব্রহ্মদেশ হইতে গিয়াছিল। চীনদেশ হইতে ১৮৯৫ সালে ৬৮,৫৪৮ পিকল*, ১৮৯৬ সালে ২০,৬১১ পিকল, ১৮৯৯ সালে ২৩,৪৯০ পিকল, ১৯০১ সালে ১১১,৩১২ পিকল এবং ১৯০২ সালে ১৪০,৬৮ পিকল

* এক পিকলের ওজন ১৩৩⅓ পাউণ্ড।

রপ্তানি হইয়াছিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, মোমচীনার ব্যবসা মৌমাছির মোম অপেক্ষা নিতান্ত কম নহে। কলিকাতার বাজারে উহা যথেষ্ট বিক্রয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইহার মূল্য মৌমাছির মোম অপেক্ষা সুলভ বলিয়া ইহা তাহার সহিত মিশ্রিত করা হয়। এই জাপান বা মোমচীনা খাঁটি মোমের সহিত মিশাইলে উহা খুব সাদা হয়। এদেশে যখন মোমচীনার গাছ আছে, তখন উহা হইতে মোম বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, তাহাতে ব্যবসা চলিতে পারে কিনা। আমাদিগের বিশ্বাস এ ব্যবসা বেশ চলিতে পারে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান—তরমুজ, খরমুজ, শসা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যে সকল দেশী সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপানটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষিক্ষেত্র—ছোলা, মটর, যব, সরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এত দিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র সকল চষিয়া ভবিষ্যতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ গুলির তদ্বির না করিলে জলদি ফুল ফুটিবে না। জলদি ফুল না ফুটিলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

টব বা গামলার গাছ—এই সময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ ফুল ও বাহার গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা থাকিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়া আছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে, এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদূরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়। ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোঁড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ খণ্ড। | ফাল্গুন, ১৩১৯ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

খেজুর চাষ

খেজুর গাছ পৃথিবীর মধ্যে বহু প্রকার জন্মিয়া থাকে। আমাদের দেশে খেজুর (Phoenix Sylucstries) গাছের রসে তাড়ী হয় তাহা বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিকেই বহুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বঙ্গদেশের উপরোক্ত খেজুর গাছ হইতেই কেবল খেজুর গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। যশোর, খুলনা, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া প্রভৃতি জেলাতেই প্রধানতঃ অত্যুত্তম খেজুর গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানানুসারে খেজুর জাতীয় গাছগুলি (Phoenix) এক কাণ্ড বিশিষ্ট (Monocothydon) গাছ। ইহারা তাল বা পামিরা (Palmyra) জাতীয় নহে। এই জাতীয় গাছ ২০ হইতে ৩৫ উত্তর ল্যাটিটুডের অন্তর্গত প্রদেশ সমূহে বহুল জন্মিয়া থাকে এবং ইহাদের উৎপত্তি স্থান পশ্চিম স্পেন এবং পূর্ব্ব ভারতবর্ষের অন্তর্গত ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমূহ। মিশর, সুদান, মরক্কো, আলজিরিয়া, নীলনদের উভয় পার্শ্বস্থ উর্ব্বর প্রদেশ সমূহ, মম্বাসা, উগাণ্ডা, আরব, নুবীয়া, আবিসিনিয়া, পারস্য উপসাগরের উপকুলস্থিত প্রদেশ সমূহ, আরবহিন্টারল্যাণ্ড, মেসোপোটামিয়া, এসিয়া মাইনর, বেলুচিস্থান, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বিহার, বঙ্গ, উড়িষ্যা, মাঙ্গালোর, বম্বাই প্রদেশ, গুজরাট্, মান্দ্রাজ, ছিন্দুয়ারা, ছোটনাগপুর, গড়বল, প্রভৃতি দেশে এই গাছের জন্মস্থান হইলেও বেলুচিস্থান হইতে পশ্চিম স্পেন পর্য্যন্ত খেজুর গরিব লোকের মধ্যে প্রধান খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আরব, মিশর প্রভৃতি দেশে ইহার আদর ও যত্ন অতি প্রাচীনকাল হইতে দেখা যায়।

৬৩২ খৃষ্টাব্দে খালিফ্ আবু বেকার যখন ওসামার নেতৃত্বে সিরিয়া দেশে যুদ্ধের অভিযান পাঠান তখন তিনি এই আদেশ প্রচার করেন যে "সেনাপতি, ওসামা আমার এই আদেশ মানিয়া কার্য্য করিও যে কোন সামাগত দপি সামান্য খেজুর

বৃক্ষের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত বা কোনরূপ আঘাত করিও না, কিম্বা অস্ত্রদ্বারা বা অগ্নিদ্বারা উচ্ছেদ করিও না, যেহেতু ইহা পশু ও মনুষ্য এই উভয় জাতির খাদ্যসামগ্রী।" আমরা ইহা ('Sir W. Moirs' Annals of the Early Caliphate) নামক পুস্তকের ১০ পৃষ্ঠা হইতে অবগত হই। অতএব দেখা যাইতেছে যে অন্যূন দ্বাদশ শতাব্দীর ও অধিককাল পূর্ব্বে আরব দেশে খেজুর বৃক্ষের প্রতি বিশেষ যত্ন ও আদর প্রদর্শন করা হইত। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (West India Islands) কালিফর্ণিয়া, ফ্লোরিডা, ইণ্ডিয়ানা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশেও আজকাল খেজুর চাষের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে। খেজুর একটি উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী। বিলাতি গোলআলু, কপি, কড়াইশুঁটি আমাদের দেশের প্রাচীন দেবগণ ভোজন করেন না, কিন্তু মুসলমানের দেশ জাত ফল হইলেও তাঁহারা ইহা ভোজন করিতে কোনরূপ বাধা বিবেচনা করেন না। খেজুর সকল দেবেরই ভোগের নৈবেদ্যতে স্থান পাইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত রসনা তৃপ্তিকর বলিয়া নাকি? হিন্দুর ইতু, শুভাচণ্ডী, মনসা, ওলা, ষষ্ঠী, দুর্গা, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেব দেবীগণ খেজুর গুড়ের সন্দেশের আস্বাদনে বঞ্চিত হইলেও ছোয়াড়া বা খেজুরের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। দিন দিন আমাদের দেশে এহেন খেজুর বৃক্ষের চাষের অবনতি হইতেছে, তাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। ভারত ও আরব এই দুই দেশের খেজুর (Phoenix) বৃক্ষ একজাতীয় হইলেও এক পরিবার ভুক্ত নহে। আরবীয় খেজুর ড্যাক্‌টিলিফ্রা (Doctylifra); আমাদের দেশের খেজুর সাইলসট্রিস্ (Syluestris)। বিহার প্রদেশে অনেক খেজুর গাছ আছে কিন্তু এদেশের লোকেরা এত অজ্ঞ যে তাড়ী কাটা বই গুড় প্রস্তুত প্রণালী ইহারা আদৌ জানে না। কাজেই ব্যবসায়ের এক অত্যন্ত লাভজনক পথ রুদ্ধ রহিয়াছে। দেশী খেজুরের মাতৃ বৃক্ষের গোড়া হইতে চারার উদ্গম হয় না। কিন্তু পারস্য, মিশর এবং আরবি খেজুরের গাছের গোড়া হইতে চারা নির্গত হয় এবং বীজ দ্বারাও গাছ জন্মিয়া থাকে। খেজুর চাষ ও গুড় প্রস্তুত সম্বন্ধে পর পর যথাস্থানে সবিস্তার আলোচনা করিব। খেজুর বৃক্ষের সম্বন্ধে ডাঃ ইবোনেভিয়া প্রভৃতি মহোদয়গণ বিস্তৃত গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের লিখা হইতে আমি বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমি স্বয়ংও সিন্ধু, বিলোচিস্থান, পারস্য উপকূল এবং ভারতের বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া খেজুর গাছ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। তাহারও সবিশেষ অংশ অত্র প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিতে ত্রুটী করি নাই।

খেজুর গাছ স্ত্রী এবং পুং জাতীয় হইয়া থাকে। আরবিয় খেজুর গাছের রস কাটা না হইলেও যে তাহাদের রস হয় না তাহা বলিতে পারি না। ঐ সকল দেশে

খেজুরের চাষ ফলের জন্য সমধিক মাত্রায় করা হইয়া থাকে। ঐ সকল ড্যাক্‌টিলিফ্রা জাতীয় গাছের রস কাটিলে ফল কম হইয়া থাকে। পুং এবং স্ত্রী জাতীয় খেজুর বৃক্ষের নির্ব্বাচন ফুল হইতে হইয়া থাকে। পুং গাছগুলির ফুল কিছু বেশী লাল এবং স্ত্রী গাছের ফুলগুলি কিছু বেশী সাদাটে হইয়া থাকে। যদি স্ত্রী বৃক্ষের নিকট ২।১টি তেজস্কর পুং বৃক্ষ না থাকে তাহা হইলে স্ত্রীগণ ফল ধারণে সক্ষম হয় না। সেইজন্য খেজুর বাগানের মধ্যে দুই একটি পুং বৃক্ষ রাখা প্রয়োজন। একটি পুং বৃক্ষের পরাগ অন্যূন একশত স্ত্রী বৃক্ষের ফলোৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে। নপুংসক খেজুর বৃক্ষ প্রায় দৃষ্ট হয় না। গত বৎসর প্রবাসী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ ও তাহার একটি নকল বিগত মাসের কৃষক প্রত্রিকায় দেখিয়া অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়াছিলাম যে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় ঐ প্রবন্ধে পাইব। কিন্তু আমার সে আশা ঐ সকল প্রবন্ধ পাঠে ফলবতী হয় নাই। উহাতে অনেক বাজে কথা বলিয়া কৃষকের পাতা ভরান হইয়াছে। কাজেই আমাকে United States Department of Agriculture for 1904, Bureau of Plant Industry Section দ্বারা প্রচারিত ৫৪ নং বুলেটীন পাঠ করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়। বঙ্গীয় খেজুর গাছ সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ মিঃ S. H. Robinson এবং ডাঃ E. Bonavia পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের লেখা হইতে আমি এই বিষয়ে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। খেজুর বৃক্ষের জন্ম ও বৃদ্ধির পক্ষে সূর্য্যের কিরণ বিশেষ এবং সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজন এবং এঁটেল (loancy) এবং বালুকাযুক্ত মৃত্তিকা ইহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলিয়া উদ্ভিদ তত্ত্ববিদগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাপমান যন্ত্রে যে স্থানের উত্তাপ ৭০ হইতে ১০০ ডিগ্রি সেইস্থানে এই গাছ খুব ভালরূপ জন্মিয়া থাকে, এবং সেইজন্য ভারতের সকল স্থানে খেজুর গাছ সামান্য যত্নে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আলজিয়ার্স, বিশ্‌ক্রা, আয়াটা (আলিজিরিয়া), টুঙ্গো (Algesid), আলেক্‌জান্দ্রিয়া, কাইরো, বর্বার (Berber) এবং বগদাদ (Bagdad) প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট খেজুর ফলের বিখ্যাত বাজার বা বিপনী আছে। এই সকল স্থান হইতে উত্তম খেজুর বিলাত এবং আমেরিকায় বহুল পরিমাণে নীত হয়। বেলে মাটীতে উত্তম সার দিয়া উত্তম জাতীয় পরিপক্ক বীজ রোপণ করিলে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া থাকে। ইহার চাষের কথা পরে বিবৃত হইতেছে।

খেজুর বৃক্ষ বীজ এবং চারা হইতে উৎপন্ন (propagation) হইয়া থাকে। বীজ অপেক্ষা চারার গাছগুলি খুবই তেজস্কর হইয়া থাকে। উসর বা রেহড়া (Alkaline) জমিতে খেজুর গাছ পুঁতিবে না। উসর জমি খেজুর গাছের বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ হানি জনক। বীজ বুনিবার পূর্ব্বে জমিতে বেশ সার দিবে।

অর্থাৎ প্রথমে মাটী ৫।৭ চাষ দিয়া মই দিয়া ঢেলাভাঙ্গিয়া আকের খেতের মত মাটী প্রস্তুত করিবে যাহাতে মাটী ধুলাতে পরিণত হয়। প্রত্যেক একারে ১০ টন গোশালার সার (Stable or farm yard manures) এবং রেড়ী বা সরিসার খইল চারিশত পাউণ্ড একত্রে মিশাইয়া জমিটি প্রস্তুত করিবে। কৃষকের ইহা দেখা প্রয়োজন যে খেজুর গাছের উপযোগী জমি যেন "মিঠেন" হয় এবং কদাচ যেন উসর বা রেহ্‌ড়া জমি না হয়।

জমি তৈয়ার হইলে মার্চ্চ এবং এপ্রেল মাসে জমিটিতে উত্তমরূপে জল সেচন করিবে। পরে দুই তিন দিন বাদে অত্যন্ত পরিপক্ক ও পরিপুষ্ট বীজ এক বা দুই ইঞ্চি গর্ত্তে ৪ ফিট হইতে ৬ ফিট অন্তর জুলি (যাদা বা ম্বস) করিয়া বুনিবে। প্রত্যেক লাইন ৮ ফিট অন্তর পুতিবে। প্রথম প্রথম প্রত্যেক দুই বা তিন দিন অন্তর জল সেচন করিবে তিন বা চারি মাস পর্য্যন্ত এইরূপ করিবে। তাহার পর পরবর্ত্তী তিন বা চারি মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক সপ্তাহে জল সেচন করিবে। তাহার পর গ্রীষ্মকালে মাসে একবার এবং শীতকালে প্রত্যেক দ্বিমাস অন্তর একবার জল সেচন করা বিধি। গাছগুলি তিন বৎসর বয়স্ক হইলে অথবা গাছগুলির পুষ্পোদগম হইলে এপ্রেল হইতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে চারাগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া যথাস্থানে রোপণ করিবে। পুষ্পোদগমের পরে গাছগুলি তুলিবার কারণ এই যে এই সময়ে পুং এবং স্ত্রী চারা বেশ করিয়া দেখিয়া নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে এবং পুং বৃক্ষগুলিকে নষ্ট করা যাইতে পারে। যে গাছগুলি বৃদ্ধ গাছের গোড়া হইতে বাহির হয় (off shoots) তাহারা ছয় বৎসর বয়স্ক হইয়া পুষ্প উদ্গম করিলে তাহাদের মধ্যে পুং বা স্ত্রী নির্ব্বাচন করিয়া স্থানান্তরিত করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের ভারতবর্ষের অবস্থা স্বতন্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এপ্রেল মাহায় চারা (off shoots) বা বীজ জাত গাছ (Seedling) গুলি যথা স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া ২৫ ফিট অন্তর এবং তিন ফিট্ গর্ত্তে রোপণ করিবে। এই গর্ত্তের অর্দ্ধটুকু গোশালার সার (farm yard manure) এবং ৪ বা ৫ পাউণ্ড রেড়ীর বা সরিষার খৈল দিয়া মিশ্রিত দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে চারাটিকে পুঁতিবে। চারা পুতিয়া চতুর্দ্দিকে থল্ বা জুলি কাটিয়া দিয়া তাহার দ্বারা জল সেচন করিবে। চারা পুতিয়া প্রথম মাসে প্রত্যহ জল সেচন করিবে; দ্বিতীয় মাসে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া জল দিবার ব্যবস্থা করিবে; এবং তাহার পর হইতে এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত মাসের মধ্যে একবার করিয়া জল সেচন করিবে। নবেম্বর হইতে মার্চ্চ মাহা পর্য্যন্ত চারাগুলির বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য যাহাতে শীত বা তাপ লাগিয়া তাহাদিগের জীবনের হানি না হয়। সেইজন্য চারাগুলিকে চট বা মাদুর বা খড় দিয়া মুড়িয়া দিবে।

বীজজাত গাছ হইতে চারাগুলি বেশী তেজস্কর হইয়া থাকে এবং অধিক ফল উৎপাদন করে তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। খেজুর পাকিলে তাহাদিগকে "খুরমা" বলা হয়। ফলগুলি পাকিলে পক্ক ফল গুলিতে খুব সুমিষ্ট রস জড় হয়। এই রস গুলি সঞ্চয় করিয়া ঐ রসে ডুবাইয়া "খড়ক্" খেজুর প্রস্তুত হয়। খড়ক্ খেজুরের আমদানি করাচিবন্দরে এবং বম্বাই প্রদেশে বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। খেজুর সচরাচর জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে আশ্বিন মাসের মধ্যে পাকিয়া থাকে। পারস্ত দেশের মধ্যে বুশিয়ার খেজুরের একটি প্রসিদ্ধ বাজার (market)। এই খানে নিম্ন লিখিত জাতীয় খেজুর বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়ঃ—কানিজি, কব্‌কাব্, নাগুী. সাকার, গুঁতার, হেলো, মাক্‌তুম্, শেরিনি, নিরিধিনি, শাহুনী, সিশি, বাশ্‌ ইত্যাদি। (ক্রমশঃ)

শর্করা বা চিনি

শর্করা বা চিনি—ইক্ষুর সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এবং বোধ হয় ইক্ষুর নাম হইতে (Saccharum officinarum) শর্করা নামের সৃষ্টি হইয়াছে। ইক্ষুর আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষে এবং ভারত হইতে ইক্ষু নানা দিক দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কথিত আছে যে মহাবীর আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়কালে গ্রীকেরা ইক্ষু দণ্ডের মধ্যে মধুরস আস্বাদন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল।

কেবল ইক্ষু হইতে শর্করা জন্মে এমন নহে, বিট, খর্জ্জুর, তাল, নারিকেল, মহুয়া, ভূট্টা, নীল এমন কি নিম্ব হইতেও শর্করা উৎপাদিত হইতে পারে। খনিজ আলকাতরা হইতেও চিনি পাওয়া যাইতেছে তাহার নাম সাকারীণ (Saccharin) ইউরোপ খণ্ডে শর্করার প্রধান উপাদান বীটমূল, উত্তর আমেরিকায় মেপ্‌ল বৃক্ষের নির্য্যাস হইতে এবং দক্ষিণ আমেরিকা, জবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, চীন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে ইক্ষু হইতে শর্করা উৎপন্ন হয়। ভারতে শর্করার প্রধান উপাদান ইক্ষু, খর্জ্জুর রস, তালের রস। মরিসস্ প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে, ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞান পরিচালিত প্রথায় ইক্ষু চাষ, ইক্ষুরস নিষ্কাষণ ও চিনি প্রস্তুত হয় বলিয়া আজ বাজারে চিনির এত সুলভ দর এবং এত উৎকৃষ্ট দানাদার চিনি মিলিতেছে। সর্ব্বপ্রকার চিনি অপেক্ষা ইক্ষু চিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইক্ষুরস, তাহা হইতে গুড়, গুড় হইতে পাটালি, বাতাসা, চিনি, অবশেষে মিছরি ইত্যাদি ইক্ষু রসের ক্রম বিকার। প্রত্যেকটিই ক্রমশঃ গুণাধিক, পিত্তনাশক ও বলকারক। খুব দানাদার কাঁচ খণ্ডের মত শুভ্র, বিলাতী বীট বা ইক্ষু চিনি দেখিতে সুন্দর হইলেও দেশী চিনি মিছরির মত উপকারী নহে। হাড়ের কয়লার জলদ্বারা চোলাই করা হয় বলিয়া

তাহাদের অপকারিতাও প্রত্যক্ষ করা যায়। পাটা শেওলাদ্বারা পরিষ্কৃত চিনি কোন প্রকারে দুষ্ট নহে। মিঃ হাদধর প্রণালীতে ঘূর্ণায়মান হাঁড়িতে দেশী গাছ গাছড়ার বর্ণদ্বারা অতি সহজে অতিশীঘ্র শুভ্র চিনি প্রস্তুত হইতে পারে। কিন্তু ঐ চিনি বিলাতী প্রণালীতে প্রস্তুত চিনির মত কাঁচ খণ্ডের ন্যায় দানাদার হইবে না। প্রসিদ্ধ ডাক্তারগণ বলেন যে দেশী চিনি. দানাদার শুভ্র চিনি অপেক্ষা গুণে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইক্ষু দণ্ড চিবাইয়া রস পান করিলে তাঁহাদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়।

ভারতের সরস জমিতেই ইক্ষুর চাষ হয়। কিঞ্চিৎ এঁটেল মাটিতে, রসবহুল স্থানে চাষ করিলে আখের আবাদ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু চাষ কারকিৎ গুণে এবং নদী, খাল, বিল, কূপের জলের সংস্থান করিয়া লোকে এক্ষণে সরস, নিরস, দোয়াঁস, বালিয়ান, ও এঁটেল মাটিতে সমান ভাবে ইক্ষু চাষের যোগাড় করিতেছে ও সফলকাম হইতেছে। মূল সূত্র সার ও জল। যেখানে মাটি খুব সরস, যেখানে জল হাওয়া আর্দ্র তথায় রসবহুল আখ জন্মিল কিন্তু কঠিন ত্বক রসের আখ গুলিতে প্রায় যতরস ততগুড় এবং চিনির মাত্রাও সমধিক। আবার দেখিতে পাইবে যে কঠিন ত্বক চিবড়াবহুল আখের অনেক গুণ আছে তাহারা অনাবৃষ্টিতে সহজে মরে না, ধ্বসা ও পোকা লাগিয়া তাহাদের বড় কিছু ক্ষতি করিয়া উঠিতে পারে না। আখের উপর লোভ অনেক জন্তু জানোয়ারেরও আছে। শৃগাল, বরাহ, ভল্লুক, হাতী কে না আখ খাইতে চায় এবং সকলেই আখ চুরির লোভ সামলাইতে পারে না। কিন্তু কঠিনের কাছে বড় সহজে কেহ যায় না কোমলত্বক সরস ইক্ষু পাইলে তাহাদের যত আনন্দ হয় কঠিন ত্বক ইক্ষু চিবাইয়া অল্প রস পাইতে এতটা পরিশ্রম করা তাহারা বড় যুক্তিযুক্ত মনে করে না সেইজন্য কঠিন আকগুলি টিকিয়া যায় আর কোমল, কোমলত্ব হেতু প্রাণ হারায়।

ভারতবর্ষে বহু জাতীয় ইক্ষু জন্মে আমরা কয়েকটি প্রধান জাতীয় ইক্ষুর পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিয়াছি—বঙ্গদেশে প্রচলিত শামসাড়া, খড়িই প্রধান। ভারতের ইক্ষু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে তাহাতে—

জল	... ...	৬৬ ভাগ,
চিনি	... ...	১৭৷৷০ „
ছিবড়া (Fibrous matter) ...		১৬৷৷০ „
		১০০

শামসাড়া—উচ্চ দোয়াঁস জমিতে ভাল জন্মে। ইহার দণ্ড স্থূল, রসবহুল, ত্বক নাতি দৃঢ় নাতি কোমল, রঙ ফিকা হরিদ্রাবর্ণ। ত্বক্ সহজেই বিচ্ছিন্ন করা যায়।

পুঁড়ী আখের ন্যায় ইহাতে রস প্রচুর, রস সুমিষ্ট, বিঘাতে সাধারণতঃ ৪০ মণ গুড় পাওয়া যায়। স্থান বিশেষে বিশেষ সার প্রয়োগে ৫০ মণ হইতে ৬০ মণ গুড় পাওয়া অসম্ভব নহে। বাঙলায় ইহার চাষ অধিক।

খড়ি—এই ইক্ষু বঙ্গদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বত্রই ভাল জন্মে। রঙ ফিকে ফিকে সব্জে, পাকিলে হরিদ্রাভ হয়। অত্যন্ত দৃঢ়ত্বক, কঠিন প্রাণ ইহাতে সহজে রোগ ধরে না। ইহার চাষে দোয়াঁস জমির আবশ্যক। রসে মিষ্টতা সমধিক সুতরাং চিনির মাত্রা অধিক এবং ইহা বঙ্গদেশে চাষের উপযুক্ত। বিঘাতে ২০।২২ মণ গুড় উৎপন্ন হয়। ইহার আকার নাতি স্থূল, নাতি দীর্ঘ এবং ইহা শীঘ্র বাড়ে।

কাজ্‌লা—রঙ বেগুণে। শামনাড়া অপেক্ষা কোমল ত্বক্, রসের পরিমাণ অল্প, কিন্তু রসে মিষ্টতার মাত্রা অধিক ৫।৬ হাত দীর্ঘ হয়। শামনাড়ার মত তত মোটা নহে। নদীয়া, যশোহর, বর্দ্ধমানে ইহার চাষ বিস্তর। এই সকল স্থানে নীলের সিটি, গবাদির গোবর সার ও উদ্ভিজ্জ সার দেওয়া হয়। বিঘা প্রতি ২৫ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর এক রকম কাজ্‌লা আখ আছে তাহাকে বলে কাজলী—রাজসাহীতে ইহার চাষ হয়। ইহা কাজলারই মত তবে রঙটা অল্প লাল্‌চে কাজ্‌লা অপেক্ষা কিছু সরু ও ছোট, রসের মাত্রা কম বিঘাতে ১৫ মণের অধিক গুড় হয় না। দক্ষিণ বেহারেও ইহার চাষ দেখা যায়।

পৌণ্ড্র—ইহাকে গ্রাম্য কথায় পুঁড়ী বলে—মালদহে ইহার চাষ অধিক। বোধ হয় পৌণ্ড্র দেশ উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে পৌণ্ড্র। রঙ ফিকা হল্‌দে, পাকিলে রঙ গাঢ় হয়। স্থূলকায়, রস বহুল তাদৃশ কঠিন ত্বক নহে। চাষে অধিক সারের প্রয়োজন,—বিঘাতে ২৫ মণ গুড় জন্মিতে পারে। খুব দীর্ঘ হয়, আট হাতের উপরও বাড়িতে দেখা যায়। ইহাতে চিনির মাত্রা সমধিক। চিবাইতে নরম বলিয়া গুড় করা অপেক্ষা কাঁচা খাইবার জন্য অধিক ব্যবহার করা হয়।

বোম্বাই—শামসাড়ার ন্যায় স্থূলকায়; কোমল ত্বক, রঙ লাল্‌চে হল্‌দে, শামসাড়ার মত দীর্ঘ হয়। চিবাইতে খুব নরম। কাঁচা খাইবার জন্য অনেকেই পসন্দ করেন।

লাল ইক্ষু—আসামে জন্মিয়া থাকে, রঙ লাল। অত্যন্ত কঠিন ত্বক, একবার জন্মিলে সহজে মরে না। ইহাতে রসের পরিমাণ সমধিক, রস খুব মিষ্ট সুতরাং অধিক মাত্রায় চিনি উৎপন্ন হয়। নিচু জমিতে ভাল জন্মে।

লাল গেণ্ডারি—পশ্চিমাঞ্চলে জন্মে, রঙ ঘোর লালবর্ণ, ইক্ষু স্থূল, কোমলত্বক। বেতিয়া, চম্পারণ অঞ্চলে উচ্চ দোয়াঁস মাটিতে ভালরূপ জন্মে। ইক্ষু চিবাইতে নরম বলিয়া স্থানীয় লোকে কাঁচাই অধিক ব্যবহার করে নতুবা গুড় করিলে ইহাতে সুন্দর গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়।

ধানী—গাছ সরু কিন্তু দীর্ঘ, ত্বক খুব কঠিন—পশ্চিমাঞ্চলে সাজাহানপুরের দিকে জন্মে। তথায় ইহা এঁটেল নিচু জমিতে হয়। রস পরিমাণে অল্প হইলেও খুব মিষ্ট—খুব ভাল গুড় হয়।

চীনা—এই বিদেশীয় ইক্ষু এদেশে বেশ জন্মিতেছে—অতি বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টিতে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। যেখানে অন্য আখ জন্মে না তথায় ইহার চাষ চলিতে পারে। বিহারে নীলকরেরা ইহার চাষ করিতেছেন। ইহার ত্বক কঠিন সুতরাং শৃগালাদি পশু বা কীট পতঙ্গ হইতে ক্ষতির আশঙ্কা নাই। দ্বারবঙ্গে ইহার চাষ খুব বাড়িয়াছে।

মরিসস্—মরিসস্ দ্বীপেই ইহার চাষ অধিক। মালাবার উপকুলে ইহার চাষ প্রথমে আরম্ভ হয়। ইক্ষু খুব বড় ও মোটা—এক একটি বংশদণ্ডের ন্যায় হয়। রস অত্যন্ত মিষ্ট। ইহার চাষ সমুদ্র উপকুলে বা দ্বীপ সমূহে ভাল হয়। এদেশে এই আখে বড় পোকা লাগে।

আখের চাষ সম্বন্ধে বহুবার কৃষকে আলোচনা করা হইয়াছে। স্বর্গীয় নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শর্করা বিজ্ঞানে ইক্ষু চাষের ও ব্যবসায়ের যাবতীয় খবর পাওয়া যায়। তবে মোটামুটি জানিয়া রাখা ভাল যে, সার ও জলের যোগাড় থাকিলে ভালমন্দ, উঁচু, নিচু, সরস বা অপেক্ষাকৃত রসশূন্য, দোয়াঁস বা এঁটেল সর্ব্বপ্রকার মাটিতে ইক্ষু জন্মান যায়। বালুকালেশশূন্য এঁটেল মাটিতে বা নিভাজ বেলে মাটিতে আখ জন্মে না।

আখ রোপণের সময়—আশ্বিনের শেষ হইতে ফাল্গুনের মধ্যে ইক্ষুর আবাদ করিবার সময়।

আখের বীজ—সুপুষ্ট ইক্ষু, বীজের জন্য বাছাই করিয়া লইতে হয়—বীজ আখ রোগা হইবে না বা তাহাতে পোকা থাকিবে না। প্রত্যেক গাছা আখের নিম্নার্দ্ধ বাদ দিতে হয়। বীজের জন্য উপরার্দ্ধ হইতে কটিং বা টাঁক কাটিবার সময় প্রত্যেক টাঁকে তিনটি গাঁট থাকিবে এবং চোখ থাকিবে। আলুর চোখগুলি যেমন মাটিতে বসাইবার সময় উপরদিকে বা পাশের দিকে থাকে, আখেরও তাই। একটি অনতি গভীর গর্ত্তে আখের টুক্‌রাগুলি রাখিয়া উপর নিচে ভিজা বিচালি দিয়া ঢাকিয়া তাহার উপর ঘন গোবরজল ঢালিয়া দিলে আখের চোক খুব সহজে বাহির হয়।

আখের বীজের পরিমাণ—ক্ষেতে লম্বালম্বী নালী বা প্রণালী করিয়া ২×২৷৷০ ফুট অন্তর ৬ ইঞ্চি গভীর গর্ত্তে অঙ্কুরিত বীজ ইক্ষু বসান হয়। ইহাতে প্রতি বিঘায় দুই কাহন বা ২৫৬০টা টাঁকের আবশ্যক। নালী কাটিবার জন্য দুইটি পাখাযুক্ত লৌহ লাঙ্গল ব্যবহার করা উচিত।

আখের সার—নীলের সিঠি, গোবর, হাড়ের গুঁড়া, রেড়ির বা সরিষার খৈল, উদ্ভিদ সার, রক্ত ইত্যাদি কত প্রকার সার দিবার বিধান আছে তাহার গণনা করা যায় না। সূক্ষ্মতত্ব ধরিয়া বিচার করিয়া স্থির হইয়াছে, আখের ক্ষেতে এক একর বা ৩।৷৹ বিঘা জমির জন্য ২৪ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৭০ পাউণ্ড পটাস, গ্রহণোপযোগী ফস্ফরিক্ এসিড ৬০ পাউণ্ড প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই কয়টির জন্য এক একর জমিতে ২০০ মণ গোবর, ২০।২৫ মণ রেড়ীর খৈল এবং ৩০ সের কিম্বা এক মণ সোরা প্রদান করা উচিত। য়ুরোপে ও আমেরিকায় ইক্ষু ক্ষেতে হাড়ের গুঁড়া অথবা বোণ সুপার ব্যবহার করা হইয়া থাকে। খৈল সারটা ইক্ষু বসাইবার সময়ে দেওয়া চলে কিন্তু হাড়ের গুঁড়া বা গোবর ইক্ষু বসাইবার দুই তিন মাস আগে প্রদান করিলে ভাল হয়।

আখ রক্ষা—পোকার হাত হইতে আখের আবাদ রক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ আখের বীজ বাছাই করিয়া লইতে হয়। তুঁতের জলে টাঁকগুলি কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া রোপণ করিলে আখে পোকা লাগে না। এক পোয়া তুঁতেতে আধমণ জল তৈয়ারী হয়। আখে রেড়ীর খৈল দিলে ক্ষেতে বড় সহজে পোকা লাগে না। ধসা ধরিলে সোডার জলে আখের দণ্ডগুলি ধুইয়া ফেলিতে হয়। মাঝে মাঝে বর্দো মিশ্রণের জল দিলে আখের আবাদ পোকায় নষ্ট করিতে পারে না। "ফসলের পোকায়" আখের পোকা বা তাহার প্রতিকার জানা যায়। বর্দো মিশ্রণের বিবরণ তাহাতেই পাইবেন।

ইক্ষুদণ্ডগুলি আখেরই পাতা দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিয়া দিলে আখগুলি বেশ রঙদার হইয়া সুপুষ্ট ও কোমল হইবার অবসর পায় নচেৎ রোদপোড়া ও নিরস হইয়া পড়ে। এইরূপে বাঁধা থাকিলে কতকগুলি পোকারও উপদ্রব কমে। আখের চারিটি হিসাবে ঝাড়গুলি পরস্পর পাতা জড়াইয়া বাঁধিয়া দিলে আখগুলি একটু বাতাসে ভূমিসাৎ হয় না। এই রকম ক্ষেতে শৃগাল, শূকর বড় বেশী অনিষ্ট করিতে পারে না।

আখ কাটিবার সময়—আশ্বিন হইতেই আখ কাটার সময় আরম্ভ হয়—ফাল্গুনে শেষ হয়। এই সময় হইতে আখ মাড়াই ও গুড় প্রস্তুতের কার্য্যও আরম্ভ হয়। আখ মাড়াই কল অনেক হইয়াছে। ইহার মধ্যে (Burn) বরণ কোম্পানীর তিন রোলারযুক্ত বিহিয়া মিল ভাল। আখের রস জ্বাল দিবার জন্য ৬ কিম্বা ৮ ইঞ্চি গভীর চিটুকে কড়া ব্যবহার করা ভাল। আখের রসে অম্লরস নিবারণের জন্য রস জ্বাল দিবার

সময় চুণের জল ব্যবহার করিলে অম্লরস কাটিয়া গিয়া গুড় ভাল হয়। অম্লরস থাকিলে গুড়ে অধিক মাত হয়। এই মাতটা সব বাদ দিলে গুড় হইতে চিনি হয়। কলসী তলা ফুটা করিয়া দিলে কলসীর মধ্যে ভুরা চিনি প্রস্তুত হয়। এই ভুরা চিনিকে পাটা শেওলা, শিমুলের ছালের রস প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ সংযোগে পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়।

এদেশে এক বিঘাতে আখের চাষে ২০ মণ গুড় উৎপন্ন হইতে পারে। ২০ মণ গুড়ে ১২ মণ চিনি প্রস্তুত সম্ভব।

ভারতে গোজাতির অবনতি

আকার গঠন ইত্যাদি

ভারতীয় গোজাতির পাগুলি লম্বা লম্বা হয় এবং উরুদেশ পাশ্চাত্য গোজাতির ন্যায় মাংসল না হইয়া মাংসহীন হইয়া থাকে। সেইজন্য পাগুলি লম্বা দেখায় ইহাদের পঞ্জর-অস্থি ১৪টি করিয়া প্রত্যেক পার্শ্বে থাকে; কিন্তু বিলাতি গাভির পঞ্জরাস্থি ১৩টি করিয়া থাকে। ভারতীয় গোজাতির বক্ষঃস্থল খুব বিশাল এবং চৌড়া হইয়া থাকে। ইহাদের পঞ্জরাস্থি মোটা, গোল এবং বলব্যঞ্জক হয়। ভারতীয় গোজাতির বংশও প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন জাতি ক্ষুদ্র এবং কোন জাতি দেশ, কাল ও জল-বায়ু ভেদে বৃহৎ হইয়া থাকে। এই আকার ও গঠন, দেশভেদে খাদ্য ও জল বায়ুর উপর নির্ভর করে। বিলাতি গোজাতির পশ্চদ্ভাগটি পৃষ্ঠের সহিত সমরেখায় সোজা থাকায় গাভীগুলির চতুষ্কোণ (Square) আকৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু জেবুর পশ্চাদ্‌পদ গুলি সম্মুখের পদ দ্বয় অপেক্ষা ছোট হয় বলিয়া ইহাদের পিছন গুলি একেবারে ঢালু হইয়া থাকে। (invariably short & abruptly drooping backwards) ঘাড়ের বা স্কন্ধের উপর ইহাদের মাংসপিণ্ড বৃদ্ধি পাইয়া "কুকুদ্" রূপে শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকে। সেইজন্য ইহারা মস্তক অপেক্ষা ঘাড় হেঁট করিয়া সচরাচর চলিতে বাধ্য হয়। এই কুকুদ দ্বারাই ভারতীয় গোজাতি পরিচিত হইয়া থাকে। গাভী অপেক্ষা ষাঁড়ের মধ্যে এই "কুকুদ" পরিবর্দ্ধিত ভাবে পরিদৃষ্ট হয়। কুকুদ বড় হইলেই এই মাংসপিণ্ড একপার্শ্বে ঝুলিয়া পড়ে। ইহার দ্বারায় পশুর বলব্যঞ্জক ক্ষমতাটির পরিমাণ করা হইয়া থাকে। সুরাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে এক বংশীয় গোজাতির দুইটি করিয়া কুকুদ দেখা যায় সাহেবগণ লবণাক্ত কুকুদ মাংস অত্যন্ত উপাদেয় সামগ্রী বলিয়া রসনার তৃপ্তিসাধন

করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যদেশে রসনার তৃপ্তিসাধন জন্য গো হনন করা হইয়া থাকে। আমেরিকার পশ্চিম প্রদেশগুলিতে; বিশেষতঃ কালিফর্ণিয়া, মিচিগান, ওহিও, কেণ্টকি প্রভৃতি দেশে বিস্তীর্ণ 'পেরি' বা মাঠ পড়িয়া আছে। চাষীগণ এই গুলিকে বেড়িয়া সীমাবদ্ধ করিয়া তদভ্যন্তরে ব্যাঞ্চিং দ্বারা হনন জন্য গোচার করে। এই গোমাংস তাহারা আমেরিকা প্রদেশের "মিটট্রাষ্টের" হস্তে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকে। ভারত সম্বন্ধে কিন্তু কথাটী স্বতন্ত্র। অত্রদেশে মাংসের জন্য গো চাষ করা হয় না। এই বিশাল প্রদেশে যে যে খণ্ডে কৃষির উন্নতি-সাধনের কোনরূপ অন্তরায় দৃষ্ট হয়, সেই সেই স্থানের অধিবাসিগণ গোজননের প্রতি অধিক মনঃ সন্নিবিষ্ট করায় কালে আমরা ২ ৪টী অতি বৃহৎ আকারের দুগ্ধবতী এবং অত্যুৎকৃষ্ট গোজাতি পাইতে সমর্থ হইয়াছি। অস্মদ্দেশের গোজাতির ললাট-পট্টটী কূর্ম্মপৃষ্ঠ বৎ ন্যুব্জ এবং বিলাতি জাতির ন্যায় লোমাবৃত (shaggy) নহে।

ইহাদের ঝুল টুঁটীর বা গলার নিম্নভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া পিধান বা পুট—(sheath) পর্য্যন্ত দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে। বিলাতে টরবাইনদের চক্ষুগুলি বড়, গোল এবং জ্যোতিঃব্যঞ্জক বলিয়া হোমার তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ইলিয়র্ড পুস্তকে "জুনোর" বর্ণনাস্থলে "ox-eyed" জুনো বলিয়া উল্লেখ করিতে ত্রুটী করেন নাই! ইহাদের শিঙ সম্মুখদিকে প্রায়ই বাঁকা হয়। কেবল মহীশূর এবং অপরাপর দুই এক বৃহৎ জাতির শিঙ ঊর্দ্ধগামী এবং cylindrical হইতে দেখা যায়। ভারতীয় জেবুর শৃঙ্গের গঠন প্রায় ইয়াকোর শিঙের মত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের গোজাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের হয় এবং ইহাদের শিঙ সম্মুখ দিকে ঝুঁকিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে বর্দ্ধিত হইয়া চক্ষুর কোণায় বসিবার আশঙ্কা হয়। কৃষকগণ এই গুলি বিশেষ বর্দ্ধিত হইলে চক্ষু নষ্ট হইবার ভয়ে করাত-সাহায্যে ছেদন করিয়া থাকে বিলাতি গোজাতির বিশেষতঃ—চ্যানেলবংশীয়গণের শিঙ বড়ই সুন্দর এবং অর্দ্ধগোলাকৃতি ভাবে মস্তকের শোভা অধিকতর বর্দ্ধন করিয়া থাকে। কোন কোন ভারতীয় গোজাতির, বিশেষতঃ বোম্বাই প্রদেশের গোবংশের, মস্তকের মধ্যখানের হাড় হইতে একটী অস্থিখণ্ড বর্দ্ধিত হইয়া মস্তকের অধিক শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকে। ইহাকে চলিত ভাষায় 'নিম্বুরি' বলে। গো-জাতির চারিটী বাঁট আছে। ইহাদের লেজ সোজা এবং শেষভাগ একটি গুচ্ছে পরিণত হইয়াছে। দেশী গরু মুখড় (muffle) বড় অর্থাৎ লম্বা চৌড়া হইয়া থাকে। গোজাতির খুর চেরা (cloven)। ভারতীয় গোজাতি অপেক্ষা টরবাইনদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি খুব মানান সই (neatly formed) এবং লম্বা হয়। গায়ের লোম রেশমের মত চকচকে এবং বড় হইয়া থাকে। ভারতীয় গোজাতির চর্ম্মের বর্ণ প্রায়ই কাল হয় এবং ইহাদের গাত্রে বিরল লোম হয়; কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে পার্ব্বত্যজাতিগণের

গায়ের লোম বিলাতি টরবাইনগণের মত অর্থাৎ বেশী ও মোটা বা ঘন লোমযুক্ত হইয়া থাকে। বিলাতি গাভিদের মুখড় (muzzle) প্রায়ই সাদা হয় কিন্তু ভারতীয় গোজাতির মুখড় সচরাচর কৃষ্ণবর্ণের হয়। দেশী গাভির সাদা মুখড় হইলে কৃষকগণ তাহাদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া থাকে। কিন্তু এই অন্ধ বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। বিলাতি গাভিগণের বর্ণ একরঙা কদাচ হয় না। ইহারা প্রায়ই গাঢ় ধূসর, বাঘাটে, কালান্দী, চিত্রিত, বহুবর্ণাভ হইয়া থাকে। শুদ্ধবসান বর্ণ বিশিষ্ট গাভিগুলিকে শঙ্কর বলিয়া জানিবে কিন্তু যাহাদের অবিশ্রিত শোণিত শিরায় প্রবাহমান তাহারা খাঁটি (purebred are usually whole coloured.) বিবেচনা করিবে।

ভারতীয় গোজাতির বিভাগ

পাশ্চাত্যদেশের সুসভ্য অধিবাসীগণ যাহাই করেন তাহা অত্যন্ত মনোহর এবং সুন্দর। বিলাতে বা য়ুরোপীয় মহাদেশে বা আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গো দেশভেদে উৎপাদিত হইয়া থাকে। তাহাদের ক্রমিক ইতিহাস ও বিবরণ আমি ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। গার্নসী, জার্সী, হোল্‌ষ্টীন্ ফ্রিজীয়ান, আঙ্গস, কেরী, বুটনী, আরশিয়ার, ডিভন, ডচবেল্টেড প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গো জাতির উন্নতি ও সমীকরণ জন্য ভিন্ন ভিন্ন সমিতি আছে। এই সমিতিতে এক এক প্রকার গোজাতির উন্নতি বিধান কল্পে শিক্ষা দেওয়া হয়, পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচিত হইয়া পঠিত হইলে পর কৃষকগণকে জ্ঞান বিস্তার জন্য বিতরিত হইয়া থাকে। ইহাদের ষ্টড বুক আছে, রেজিষ্ট্রী আছে। কিন্তু আমাদের হতভাগ্য দেশে যেখানে গোজাতির এককালে এত আদর ছিল সেখানে আমাদিগের নিজেদের অধঃপাতে যাইবার কারণ সবই লোপ পাইয়াছে। অদ্যাবধি কেহই সমগ্র ভারতের গোজাতির বর্গ বিন্যাস করেন নাই। কাজেই আমাদের পক্ষে ইহা করা অতীব গুরুতর কার্য্য হইয়া উঠিয়াছে; মিঃ পীজ, ক্রক, ওয়ালেশ রিচার্ড ব্রাণ্ডফোর্ড, শেল্‌বন, গ্রেটাব, ইউয়াট্, সানসন, মেয়ো, এবং জয়দত্তস্থর প্রভৃতি গোতত্ত্ববিদ্‌গণ ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গোজাতির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু কেহই তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করেন নাই। সেইজন্য বহু যত্নে ও কষ্ট স্বীকার করিয়া পরে ভারতীয় সমুদয় গো-জাতি পরিদর্শন করিয়া উপরোক্ত মহাত্মাদিগের পুস্তকের সহিত মিলাইয়া গণীকরণ বা বর্গ-বিন্যাস করিতে চেষ্টা এই নূতন বলিতে হইবে।

বিলাতের মত এদেশে গবাদি পশু শ্রেণীবিভাগ পুস্তক (Herd Book) নাই। কাজেই এই নূতন কাজে হস্তক্ষেপ করা কিছু কঠিন।

সরকারী কৃষি সংবাদ

পঞ্জাবে ইক্ষুর আবাদ—১৯১২

বর্ত্তমান বর্ষে ইক্ষুর আবাদি জমির পরিমাণ ২৮৪,৮০০ একর। দেখা যাইতেছে যে, ইক্ষুর আবাদি জমির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার কারণ বিগত দুই এক বৎসর ইক্ষু রোপণের সময় আবহাওয়া অনুকুল ছিল। গত বৎসর তুষার পাতে অনেক বীজ আক নষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ইক্ষু গুড়ের দামও অধিক। অনুকুল আবহাওয়ায় এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় ইক্ষুর পক্ষে বড়ই উপকার হইয়াছে। এ বৎসরের ফসল অন্যান্য বৎসরের তুলনায় গড়ে অধিক জন্মিবে বলিয়া অনুমান করা যায়। অমৃতসর, গুজরানওয়াল, শিয়ালকোট্, গুজরাট এবং সাপুর প্রভৃতি স্থানে পশু খাদ্যের অভাব হওয়ায় কতক পরিমাণে ইক্ষু পশুখাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে শিয়ালকোটে শতকরা ৭০ ভাগ হিসাবে এবং সাপুরে শতকরা ৫০ ভাগ হিসাবে ইক্ষু পশুখাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা সত্বেও মোট গুড়ের পরিমাণ ২৫৫,৭১৭ টন। (১ টন=২৭ মণ ১৪ সের) অনুমানে বলা যায় যে, বিগত বর্ষ অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে দ্বিগুণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছে।

পঞ্জাবে তুলার চাষ—১০১২

ইহাতে প্রকাশ যে, পঞ্জাবে তৃতীয় বিবরণী পূর্ব্বে যাহা অনুমান করা হইয়াছিল তদপেক্ষা কম জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। অনুমান তুলার জমির পরিমাণ ১,৪৪২,১০০ একর।

বর্ত্তমান বর্ষে অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাসের আবহাওয়া তুলা চাষের অনুকুল ছিল। পঞ্জাবে বৃটীশাধিকৃত প্রদেশ সমূহে মোট ২৯৫,৯২০ গাঁট তুলা উৎপন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। গত বৎসর অপেক্ষা মোটের উপর শতকরা ৪৫ গাঁট হিসাবে বেশী তুলা পাওয়া যাইবে আশা করা যায়। অম্বালা প্রদেশে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। দেশীয় রাজ্য সমূহে মোট উৎপন্ন তুলার পরিমাণ ৫০,৫৪৬ গাঁটের অধিক হইবে না। নিম্নে ১৩১৭ এবং ১৩১৮ সালের উৎপন্ন তুলার একটী হিসাব দেওয়া গেল।

১৩১৭ সালে উৎপন্ন তুলা মোট ...	...	১,৪৬৬,৭১৮ মণ
দেশীয় কলে খরচ	৮৮,৯০৭ মণ	
রেলযোগে রপ্তানি	১,৩৫৭,২০০ মণ	
	১,৪৪৫,১০৭ মণ	১,৪৪৫,১০৭ মণ
	বাকি	২১,৬১১ মণ

দেশীয় লোকের ঘর খরচে লাগিয়াছে।

১৩১৮ সালে উৎপন্ন তুলার পরিমাণ মোট	...	১,১৮৪,৫২৬ মণ
দেশীয় কলে খরচ	৮০,৫৭০ মণ	
রেলযোগে রপ্তানি	১,৩৬৪,৯৯৮ মণ	
	১,৪৪৫,৫৬৮ মণ	১,৪৪৫,৫৬৮ মণ
	বাকি	২৬১,০৪২ মণ

দেশী লোকের ঘর খরচায় ব্যয়িত হইয়াছে।

আসামে হৈমন্তিক ধান্য—১৯১২-১৩

কেবল মাত্র দুই একটী জেলায় শস্য ভালরূপ জন্মায় নাই। ঐ সকল জেলা ভিন্ন অন্যান্য সকল জেলারই আবহাওয়া ভাল ছিল। বিশেষ তদন্তে জানা যাইতেছে যে ধানের আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসরের তুলনায় বর্ত্তমান বর্ষে ৪৫,৩০০ একর ধানের জমি বৃদ্ধি হইয়াছে। কোন কোন জেলায় অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা গড়ে অধিক ফসলের আশা করা যায়, আবার কোন কোন জেলায় আবাদ আরম্ভের সময় আবহাওয়া প্রতিকুল থাকায় মামুলি ফসল জন্মিয়াছে। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের অনুমান যদি ঠিক হয়, তবে বলিতে পারা যায় যে, আসামে ৩,২৬১,০০০ একর জমিতে বর্ত্তমান বর্ষে ধানের আবাদ হইয়াছে।

ফাল্গুন, ১৩১৯ সাল।

সেওলা বা সেওলার মূল

ইহজগতের কোন জিনিষটাই অকেজো নহে। গাছের গোড়া সরস রাখিবার জন্য মস্ বা সেওলা দিলে বিনা জল সেচনে অনেক দিন গাছ বেশ সতেজ রাখা যায়। মস্‌গুলি একবার ভিজিলে অনেক দিন সরস থাকে এবং তৎসংলগ্ন বস্তু ঠাণ্ডা থাকে। যেখানে বৃষ্টিপাত অধিক, জমি খুব রসাল থাকে, সেখানে মাটিতে পাহাড়ের গায়ে সেওলা বা মস্ জন্মে। একস্থানে পাহাড়ের গায়ে মস্ স্তরে স্তরে জমিয়া খুব পুরু হইয়া উঠে। বাঙলার উত্তরে দারজিলিঙ পাহাড় আছে ইহা হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর এক অংশ এই পর্ব্বত গাত্রে এক প্রকার সেওলা রাসান হয় হরিণ শিঙা মস্ (Staghornmoss) বলে ইহা লতাইয়া যায় এবং পর্ব্বত গাত্রে যেখানে একটু সামান্য জল বা পাহাড়ের ধোয়াট মাটি পায় সেই স্থানে ইহা শিকড় বিস্তার করে। গাছের গায়ে ও মাটির উপরও সেওলা হইয়া থাকে। সেলি মাটিতে সেওলার বাড় বেশী। এই সকল সেওলা শুষ্ক হইয়া একপ্রকার আঁশ বহুল পদার্থে পরিণত হয়। জলে পানা, পাটা সেওলা ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের মূল পচিয়া ও শুষ্ক হইয়া ঐরূপ পদার্থে পরিণত হয়। পচা পাতা গুঁড়াইলেও ঐ একই রকমের আঁশাল মাটি প্রস্তুত হয়। ইহা প্রকৃত মৃত্তিকা না হইলেও ইহাতে মৃত্তিকার কার্য্য হয়। অনেকেরই ধারণা মাটি না হইলে উদ্ভিদ জন্মে না। ঐ সকল পাতা পচা, পানা পচা, সেওলা পচা পদার্থগুলিকে মাটি ধরিয়া লইলে আর কোন গোল থাকে না। বাস্তবিক এ গুলি কিন্তু মাটি নহে। ইহাতে মাটির ন্যায় নাইট্রোজেন, পটাস্, ফস্ফরিক অম্ল চূর্ণ আছে সত্য কিন্তু মাটিতে যেমন বালি, য়্যালুমিনিয়াম, লৌহ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ থাকে, ইহাতে তাহার কিছুই নাই, অথচ গাছের আহার যোগান চলে এমন মূল পদার্থ

গুলি আছে। ইহা মাটি অপেক্ষা খুব হাল্‌কা সুতরাং অধিক দূরে গাছ পাঠাইতে হইলে গামলায় এই প্রকার উদ্ভিজ্জ সার পদার্থ ব্যবহার করাই বিশেষ যুক্তিযুক্ত।

য়ুরোপে দিন কতক বিনা মাটিতে গাছ জন্মায় বলিয়া হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার তথ্য এতদ্বারা বেশ বুঝা যায়। এই প্রকারের উদ্ভিজ্জ সারে পট বা গামলা গুলি পূর্ণ করিয়া তাহাতে গাছ বসাইলে গাছ বেশ শিকড় ছাড়িয়া বাড়িতে থাকে। গাছগুলির শোভাও বেশ হয়। তাই বলিয়া শাল, সেগুণের গাছ বা আম, নিচুর গাছ এই প্রকারে রোপণ করিয়া অনেক দিন গামলায় রাখা যায় না। জাপানীরা কিন্তু বিশেষ কৌশলে গাছের ডাল ও শিকড় ছাঁটিয়া ছাঁটিয়া অতি প্রকাণ্ড মহীরুহ গুলিকে বহুকাল ধরিয়া ছোট ছোট গামলায় বাঁচাইয়া রাখে এবং তাহাতে ফল ও ফুল উৎপাদন করায়। য়ুরোপ খণ্ডে ঐ প্রকার উদ্ভিজ্জ গলিত সারের নাম "যাদু ফাইবার" (Jadoo Fibre) ইহাতে কোন প্রকার খনিজ সার তরল অবস্থায় মিশান যাইলেও যাইতে পারে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা মৃত্তিকা নহে। য়ুরোপীয় কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা এই সার পদার্থে ছোট ছোট স্থায়ী বা মরসুমী ফুলের গাছ জন্মাইয়া অনেক লোককে চমৎকৃত করিয়াছেন। সুইট্ পি বা অন্য মটর বা সীম, কপি, টমাটো প্রভৃতির গাছে ফল ফুল উৎপাদন করিয়া কত শত মেলার নূতন শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। লিলি, কচুজাতীয় গাছগুলি এই রকম উদ্ভিজ্জ গলিত সারে অতি শীঘ্র বাড়ে। লিলি ও কচু জাতীয় গাছ এই উদ্ভিজ্জ সার পূর্ণ গামলায় কেমন হইয়াছে, কাচের গামলার ভিতর হইতে তাহাদের শিকড়বিন্যাস কেমন সুন্দর দেখাইতেছে, নিচের ছবি দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে।

আর এক জাতীয় গাছ আছে তাহারা আদৌ মাটিতেই জন্মে না—ইহাদের নাম বায়ুভূক দেওয়া হইয়াছে, ইহাদিগকে ইংরাজিতে Arives বলে—ইহার অপর নাম অর্কিড (Orchid)। গাছের গায়ে যেখানে জল বসে, যেখানে একটু কুটিকাটি পচা সার আসিয়া জমে সেইখানেই দেখা যায় অর্কিড জন্মিয়াছে। ঐ গাছগুলির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এই প্রকার। গায়ে ছিদ্রযুক্ত টবে নারিকেল ছোবড়া দিয়া দুই চারি টুক্‌রা ঝামা দিয়া অর্কিড বসাইলে বেশ হয়। নারিকেল ছোবড়া গুলিতে জল বেশ সঞ্চিত থাকে। একবার ভিজিলে অধিকক্ষণ যাবৎ শুকাইতে জানে না। আবার নারিকেল ছোবড়ার গায়ে যে এক প্রকার মাংসল জিনিষ থাকে তাহা পচিয়া ক্রমে সারে পরিণত হয় এবং উদ্ভিদমূলে রসরূপে খাদ্য প্রদান করিতে থাকে।

বৃক্ষাদি দূরদেশে পাঠাইতে হইলে নারিকেল ছোবড়া গোড়ায় দিয়া প্যাক করিয়া পাঠাইলে গাছ বেশ সতেজ অবস্থায় বহুদূরে পৌঁছায়। কাঠের গুড়াও ঐ রকমের একটি পদার্থ। কাঠের গুঁড়া ভিজাইয়া প্যাক করিলেও গাছের গোঁড়ায় রস

এই চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, কচু কিম্বা লিলি জাতীয় গাছগুলি খাদ্য খাইবারে কেমন আপনাদের শিকড় বিস্তার করিয়াছে!

সঞ্চিত থাকে। দূরদেশে কোন ফলের বীজ পাঠাইতে হইলে নারিকেল ছোবড়ার গুঁড়া বা কাঠের গুঁড়ার সহিত সামান্য পরিমাণে কাঠের কয়লা গুঁড়া করিয়া মিশাইয়া তাহাতে বীজগুলি প্যাক করিয়া পাঠাইলে রাস্তায় যাইতে যাইতে ১০।১৫ দিনের মধ্যে কলা বাহির হইয়া তৈয়ারি হইয়া যায়। কোন সময় বীজ নারিকেল এই প্রথায় পাঠাইয়া দেখা গিয়াছে যে, ফল খুব সন্তোষজনক হইয়াছে। এই হাল্‌কা উদ্ভিজ্জ গলিত সারে যখন গাছ হয় ও ইহাতে যখন এত সহজে বীজ অঙ্কুরিত হয় তখন ইহা উপেক্ষা করিবার জিনিষ নহে। মাটি হইতে হাল্‌কা

বলিয়া যথেচ্ছা ইতস্ততঃ লইয়া যাওয়া যায়। এই সার পদার্থে বীজ বপন করিলে একটা বীজও নষ্ট হয় না। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল বীজগুলি ভারি মাটিতে জন্মায় না—ফুল বা অন্য কোন প্রকার সূক্ষ্ম বীজের জন্য এই সার পদার্থ একান্ত প্রয়োজনীয়।

এতক্ষণ আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে এই উদ্ভিজ্জ সার জিনিষ কি বুঝিবার পক্ষে আর ব্যাখাত ঘটিবে না। আমরা এইবার বুঝিবার চেষ্টা করিব যে মাটির পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহারে কতটা উপকার পাওয়া যায়।

এমন অনেক জায়গা আছে যে, প্রাণে ফুলের সখ জাগিয়া উঠিলেও মাটির অভাবে সেখানে ফুল গাছ জন্মান যায় না। যদি বা মাটি মেলে—না হয় এক রকম মাটি মিলিল। কিন্তু সব মাটিতে সব রকম গাছ হয় না—কত রকমের মাটি যোগাড় করা যাইবে। উপরোক্ত মাটিতে কিন্তু সব রকম ফল ফুল হয়। ইহা হাল্‌কা, গাছ যাহা চায় তাহা ইহাতে আছে এবং ইহা গাম্‌লা ছাড়া ঝুড়িতে ভর্ত্তি করিয়া গাছ জন্মান যায়।

দ্বিতীয় সুবিধা এই যে, এই সার ব্যবহার করিলে দুর্গন্ধযুক্ত অপর কোন সার ব্যবহারের আবশ্যক হয় না। ঘরের ভিতর টেবিলের উপর এই সার পরিপূর্ণ গাম্‌লা বসাইয়া রাখিলে বা এই সার রাখিলে স্বাস্থ্যহানীর সম্ভাবনা নাই। হঠাৎ ঘরের মেঝেতে একটা টব ভাঙ্গিয়া গেলেও ঘর বিশেষ অপরিষ্কার হয় না।

এই পদার্থ স্পঞ্জের মত নরম ও সছিদ্র বলিয়া ইহাতে অধিকক্ষণ রস সঞ্চিত থাকে সুতরাং অধিক অন্তর অন্তর জল সিঞ্চন করিলে চলে।

ইহাতে গাছ জন্মিলে গাছের অঙ্গসৌষ্টব সুগঠিত হয়। পাতাগুলির বাহার হয় এবং ফুল ফুটিলে ফুলের রঙ অপেক্ষাকৃত অধিক সুন্দর হয়। ইহাতে গাছ জন্মাইয়া গাছে ফুল ফুটাইতে আরম্ভ করিলে ইচ্ছামত সেই ফুল সমেত গাছ অপর পাত্রে নাড়িয়া বসান যায়, তাহাতে গাছের বা ফুলের কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

এখন দেখা যাউক কি কি গাছ এই প্রকার উদ্ভিজ্জ সারে বেশ ভাল হয়। চন্দ্র-মল্লিকা, প্রিমিলো, সিগায়েরিয়া, নার্শিসস্ প্রভৃতি ফুলের গাছ এই সারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুল প্রদান করে।

বেগোনিয়া, এরম বা কচু জাতীয় গাছ, ড্রেসিনা, কলিউস প্রভৃতি গাছ এই সারে পড়িলে তাহাদের বাহার অতুলনীয় হয়। ক্রোটন গাছ এই আঁসাল সারে জন্মাইতে পারিলে তাহাদের পাতার রঙ শতধা বাড়িয়া উঠে। ইহা গাছের পক্ষে মাটির প্রতিনিধি এবং সঙ্গে সঙ্গে একটী মহত উপকারী সার।

এই প্রকারের সারে য়ুরোপের লোকে শসা ফলাইয়াছে, ক্যামেলিয়া ফুটাইয়াছে। বহুতর পামের বীজ, গ্রিভিলি প্রভৃতি ওক্ জাতীয় কঠিনত্বক বীজ ইহাতে সহজে অঙ্কুরিত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে গোলাপ ফুটাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, টমাটোর কথাই নাই, টবে এই সারে কলা বসাইয়া কলা ফলান হইয়াছে।

রাস্তার ধারে ধারে গাছ—সহর বাদ দিয়া গ্রাম ও পল্লীর মধ্য দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে তাহাতে ছায়া করিয়া দিবার জন্য গাছ বসান হইয়া থাকে। বৃক্ষ, বন জঙ্গল একেবারে অকেজো নহে, বৃক্ষলতাদি না থাকিলে আবহাওয়ার সমতা রক্ষা হয় না। বৃক্ষাদি শূন্য প্রান্তর শীতের সময় অত্যন্ত শীতল এবং গ্রীষ্মের সময় রৌদ্রে অতিশয় গরম হয়। এই সকল স্থানে বৃষ্টিপাত কম হয়। এই কারণে গ্রামে গ্রামে বন জঙ্গল যত পরিষ্কার করা হইতেছে, সমতা রক্ষার জন্য রাস্তায় গাছ বসাইবার প্রবৃত্তি তত বাড়িতেছে। ছায়ার হিসাবে ধরিতে গেলে অশ্বত্থ, বট ও পাকুড় গাছের তুল্য আর গাছ নাই। এই গাছ সহজে মরে না, একবার ধরিয়া গেলে বিশেষ পাইটের কোন অপেক্ষা রাখে না—আপনা আপনি অতি সহজে বাড়িয়া উঠে। কিন্তু এই সকল গাছ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন আয় হয় না। আজকাল সকল বিষয়েই আয়ের দিকে নজর। কয়েক জাতীয় শিরিষ গাছ আছে, গাছগুলি বেশ সহজে বাড়ে, গাছে বেশ ফুল হয়, ফুলে গন্ধ আছে, শিরিষের কাষ্ঠও ভাল, তবে এই গাছের একটা দোষ আছে, মাঘ ফাল্গুন মাসে সব পাতা পড়িয়া গিয়া গাছ ডাঁটাসার হইয়া যায় এবং রাস্তা অতিশয় অপরিষ্কার হইয়া থাকে। রাস্তার ধারে বসাইবার পক্ষে বকুল গাছ বেশ গাছ। বৎসরের সকল সময়ই গাছে পাতা থাকে—বেশ ছাওয়া দেয়, তবে এই গাছের কাষ্ঠ জ্বালানি ভিন্ন বিশেষ কোন কাজে লাগে না। ফুল হইতে কিছু আয় হইতে পারে, কিন্তু কলিকাতার মত মহানগর হইতে দূরে কোন আদর নাই।

আয়ের দিকে নজর রাখিয়া জনৈক ইঞ্জিনিয়ার কলিকাতা হইতে যে রাস্তা বারুইপুর অভিমুখে গিয়াছে, তাহার ধারে ধারে আম কাঁটালের গাছ বসাইয়া গিয়াছেন। এই সকল গাছে রাস্তায় পথিকের ছায়া প্রদান করে অথচ আম কাঁটাল হইতে কিছু আয় হয়। এই আয় কিন্তু বড় অনিশ্চিত, রাস্তার ধারের গাছে যে সুযোগ পায় ফল পাড়িয়া খায়। পাকা ফলের লোভ সামলান কিছু কঠিন। এইহেতু গাছগুলি জমা ধরাইবার সময় ডাক তেমন অধিক হয় না। প্রত্যেক গাছ হইতে বার্ষিক চারি আনা আয় হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। আবার আম কাঁটালের ডাল পল্কা তজ্জন্য ঝড় বাতাসে বড় ভাঙ্গে সুতরাং মাঝে মাঝে চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে।

বড় ঝাউ রাস্তার পক্ষে বেশ গাছ, কিন্তু ইহার ছায়া তাদৃশ ঘন নহে। গাছ খুব শক্ত, কাঠে মোটামুটি কার্য হইতে পারে। গাছ হইতে অন্য কোন আয়ের সম্ভাবনা নাই। ফল পড়িয়া রাস্তা অপরিষ্কার হইবার সম্ভাবনা। ফলগুলি খুব শক্ত। পথিকের পায়ে বাজিতে পারে। খুব চওড়া রাস্তা হইলে ইহাতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না। শক্ত কাঠ হিসাবে তেঁতুল গাছ বেশ গাছ—ঘন পাতা সুতরাং ঘন ছায়া। এককালে সব পাতা ঝরিলেও সঙ্গে সঙ্গে পাতা বাহির হইয়া

অচিরে যে ছায়া সেই ছায়া সম্পাদন করে। আম কাঁঠালের মত তেঁতুল চুরি যাওয়ার তত আশঙ্কা নাই। তেঁতুল গাছ হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের আশা করা যাইতে পারে। বিলাতী তেঁতুল এক রকম আছে, তাহার গাছও খুব শক্ত, ঝড় বাতাসে তাহার বড় কিছু করিতে পারে না। ইহার ফুলে গন্ধ না থাকুক, ফুলগুলি দেখিতে সুন্দর। ইহা শাস্ত্রোক্ত ইঙ্গা ডল্‌সিস্ (Inga dulcis), গাছের গায়ে খুব কাঁটা। খুব ছোট অবস্থায় দুই এক বৎসর রক্ষা করিলেই তারপর গরু বাছুর কাঁটার ভয়ে কেহ ধারে ঘেঁসিবে না। সুতরাং ইহার জন্য ঘেরার খরচ বিশেষ কিছু লাগে না। আপাততঃ আয় অপেক্ষা ভবিষ্যতে একটা মোটামুটি আয়ের পন্থা করা মন্দ নহে। সেই হিসাবে মেহগ্নি, শিশু গাছ রাস্তার পক্ষে খুব ভাল গাছ। ইহার দোষ এই যে গাছগুলি অতিশয় ধীরে ধীরে বাড়ে। সুতরাং ইহার সঙ্গে সঙ্গে শীঘ্র বাড়িবার মত শিরিষ বা কৃষ্ণচূড়ার গাছ বসাইতে হয়। কৃষ্ণ-চূড়ার গাছ খুব পল্‌কা, ঝড়ের আগে ভয়ে ভাঙ্গিয়া পড়ে। মেহগ্নি বা শিশুর কাঠ ব্যবহারোপযোগী হইতে ১৫০ বৎসর লাগে। রাস্তায় বৃষ্টির পক্ষে (Rain tree) বর্ষণ বৃক্ষ মন্দ নহে। গাছের বাড় মধ্যবিত, গাছ খুব বড় হয়। খুব রস আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া ইহাকে বৃষ্টি-বৃক্ষ বা বর্ষণ-বৃক্ষ বলে।

নির্দ্দিষ্ট আয়ের জন্য রাস্তার ধারে তাল, নারিকেল, খেজুর গাছ বসান যাইতে পারে। এই সকল গাছের দ্বারা ছায়ার আশা করা যায় না। ছায়ার জন্য মাঝে মাঝে অন্য গাছ বসান উচিত। অপ্রশস্থ রাস্তায় তাল বসান নিষেধ, কারণ পথি-কের মাথায় তাল পড়িতে পারে।

বাঙলায় গ্রাম ও পল্লীসমূহ প্রায়ই ম্যালেরিয়ার আকর। যে সকল গাছ খুব জলশোষক ও বায়ু পরিষ্কারক সেইগুলি বাছিয়া রাস্তার ধারে বসান উচিত। নিম গাছ, নিষিন্দা গাছ, ইউকালিপ্‌টস্ গাছ গুলির বায়ু পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা আছে এবং অত্যধিক আর্দ্রভুমিকে অপেক্ষাকৃত শুষ্ক করিতে বিশেষ সাহায্য করে। তেঁতুল গাছের যেমন হাওয়া খারাপ বলিয়া অখ্যাতি আছে—অপর পক্ষে নিম্ব, নিষিন্দা, ইউকালিপ্‌টস্ গাছের হাওয়া ভাল বলিয়া খ্যাতি আছে।

ইউরোপখণ্ডের রাস্তার ধারে ওক গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ওক গাছের কিন্তু পাতা সারা বরষ থাকে না। তবে সিল্‌ভার ওক (Grevillia Robustor) বেশ সুদৃশ্য গাছ। গাছের ছায়া নিতান্ত কম ঘন নহে। গাছগুলি দেখিতে সুন্দর, কাঠ শক্ত ও কাজের কোন না কোন উপকারে আসে। অনতি দীর্ঘ রাস্তায় এই গাছ বসান সম্ভব। শত শত মাইল রাস্তায় কেবল এই গাছ বসান ব্যয়সাধ্য।

একেসিয়া—বাবুল জাতীয় গাছ। রাস্তার পক্ষে সাধারণ বাব্‌লা তত ভাল নহে—কিন্তু ইহা বেশ আয়ের গাছ। এক বাবলা গাছ হইতে ২০ বৎসরে চারি টাকা

কাষ্ঠ বিক্রয় দ্বারা পাওয়া যাইতে পারে। খদির গাছে (Acacia Culider) ছায়া ঘন—গাছও বেশ ঝাঁকড়া হয়। বাবুলের মধ্যে এই গাছই রাস্তার জন্য অধিকতর পসন্দ সহি। বাঙলার সর্ব্বত্র এই গাছ অবাধে হয়।

আর এক গাছ রাস্তায় বসান যায়—উহা দেবদারু, ইহা শীঘ্র বাড়ে, ছায়াও মন্দ হয় না। তবে পাতা পড়িয়া দিন কতক ছায়া থাকে না। গাছ কিন্তু বড় পক্কা। কাঠ সামান্য সামান্য কাজে লাগে। অনেকে বড় ঝাউ ও মাঝে মাঝে দেবদারু গাছ রাস্তার ধারে বসাইয়া রাস্তার শোভা বর্দ্ধন করে। দেবদারু গাছের এক বিঘ্ন আছে যে, বীজ ঝরিয়া তলায় অসংখ্য চারা হয় এবং তাহাতে জঙ্গল হইয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব থাকে।

যে সকল গাছের নাম করা হইল, সকলগুলিই বাঙলার সর্ব্বত্র হয় এবং দোয়াঁস মাটিতে সবগুলিকেই জন্মিতে দেখা যায়।

পত্রাদি

মিঠা পান ও নাস্‌পাতি ফল

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার, গাইবান্ধা, রঙপুর।

মিটে পান ও নাসপাতি ফলের আবাদ সম্বন্ধে জানিতে চান।

পত্র প্রেরকের যেটি যখন মুখপ্রিয় বোধ হইতেছে, তাহার চাষ জানিতে তখন তিনি উৎসুক হইতেছেন, তাঁহার পত্রের ভাবে ইহাই বুঝা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কাজে নামিবেন কিনা সন্দেহ। যাহা হউক সংক্ষেপে কিছু বলিয়া তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করা আবশ্যক।

মিঠে পান—সাধারণ পানের ন্যায় ইহার চাষ, অনাবৃত স্থানে পর্নি চাষ হয় না, পাকাটি ও উলু দিয়া ছাউনী করিয়া ঘর তৈয়ারী করিতে হয়। হিমপ্রধান বা শৈত্যপ্রধানস্থানের গাছগুলি গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে রাখিতে হইলে উলুর ছাউনী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া রাখিতে হয় এই ঘরে বাহিরের বাতাস অবাধে প্রবেশ করিতে না পারিলেও বায়ু চলাচলের পথ থাকা আবশ্যক এবং এই ঘরের ভিতর সূর্য্যের প্রখর রশ্মি অপ্রতিহত ভাবে প্রবেশ লাভ করিতে না পারিলেও যেন অল্প অল্প সূর্য্যালোকে ঘর আলো করে। ঘরটি বেশ ঠাণ্ডা রাখাই উদ্দেশ্য ও আধ আলো আধ ছায়া যাহাতে থাকে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। মুষলধারে ঘরের ভিতর বৃষ্টির জল না পড়ে অথচ ফিন্‌ফিন্ করিয়া বৃষ্টিকণা সারা ঘরটা সিক্ত করিয়া তুলিবে

পানের গাছ ঘরটাত এই রকম—একই উদ্দেশ্য এবং একই কার্য্য। ঐরূপ ঘরকে পানের বরজ বলে। আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত পানের ডগা বসান হয়। দুই পাশে দুইটি হিসাবে মাদা, মাঝখানে গমনাগমনের পথ। ডগা গজাইলে কাটি বা পাকাটি বসাইয়া তাহাতে পানের ডগাগুলি উঠাইয়া দিতে হয়। বিঘা প্রতি ৫ হইতে ৬ হাজার কটিং বা পানের লতা কাটা বসান যাইতে পারে। আট মাসে চর্ব্বনের উপযোগী পান তৈয়ারী হয়। পানের জমি হাল্‌কা দোয়াঁস, পানের সার পুরাতন পাঁকমাটি ও সরিষার খৈল। চাষ সম্বন্ধে অন্যান্য খরচ "কৃষকে" কৃষি-সহায় ও দেখিবেন।

নাস্‌পাতি—চারা রোপণের সময় আষাঢ় শ্রাবণ বা আশ্বিন কার্ত্তিক। ইহার গুল বা দা কলম হয়। গাছ ১৫।২০ ফিট পর্য্যন্ত উচু হয়। সেই জন্য চারা ২০ ফিট অন্তর রোপণ করাই ভাল। বাঙলায় নিম্ন ভূমিতে ভাল হয়। বেলে দোয়াঁস, তাহাতে কাঁকর থাকে এমন মাটি হইলেই ভাল। পঞ্জাব, পাটনা, ভগলপুর, নাগপুর, রাঁচি প্রভৃতি স্থানের মাটিতে (Laterite soil) বেশ হয়।

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুণমণি চক্রবর্ত্তী, তারাস পোঃ, পাবনা।

"কৃষকে" শ্রীযুক্ত জগৎপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের লিখিত "কাঁচিলা ঘাস" আমার বাগানে পাওয়া যায়।

এই প্রকার ঘাস ঘুঘুডাঙ্গা বাগানবাটী সমূহে বিশেষতঃ ঘুঘুডাঙ্গা রাজ বাটীতে বিস্তর হয়।

শ্বেতকুঁচের গাছও এদেশে পাওয়া যায়—তবে খুব কম—চেষ্টা সাপেক্ষ। বিদিতার্থে লিখিলাম। ইতি—

বাজার পসন্দ গোলাপ—

শ্রীননীলাল সরকার, হাওড়া।

খুব সৌখীন গোলাপ চাই না লিখিয়াছেন। আপনার কথা সত্য যে সৌখীন গোলাপগাছ বড় তেজস্বী হয় না এবং যথা তথা প্রচুর ফুল ফুটে না। সাধারণতঃ পল নিরোঁ, মন্টিক্রিষ্টো, ব্লাকপ্রিন্স, সারওয়াল্টার স্কট, মার্শাল নীল—লাল ও হলদে, প্রেসিডেণ্ট মাস্, প্যাডিলিয়ম ডি প্রেগ্নি, পিয়ার নটিং, এগিভইভার্ট ও গ্লোরি ডি ডচার এই সকল গোলাপের গাছ খুব সুতেজ হয়, ফুল অপরিয্যাপ্ত হয়, ফুলও নানা রঙের ও সুন্দর গন্ধ আছে, বড় তোড়া, ছোট বোকে এবং বাস্‌কেট সাজাইতে ভাল।

তামাক সুমাত্রা—

টি, পি, মজুমদার, নলহাটী।

চুরুটের জন্য যে তামাক তাহার পাতা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া হওয়া আবশ্যক। চুরুটের বাহির আবরণ যাহাতে ভাল হয়, সেই তামাকের তত আদর। তামাক পাতা পাতলা না হইলে চুরুটের আবরণ হয় না। সুমাত্রা তামাক আমাদের দেশের মতিহার তামাকের মত চওড়া পাতা, ইহার পাতা পাতলা এবং পাতার মধ্য শির ও অন্য শিরাগুলি সূক্ষ্ম—শিরাগুলি মোটা হইলে তামাক পাতা ভাল জড়ান যায় না। সুমাত্রা হইতে ইহার বীজ আসে না। আমেরিকায় সুমাত্রা তামাকের চাষ হইয়া তথা হইতে বীজ সংগ্রহ হইতেছে।

আকন্দ সূতা—

শ্রীমনিলাল দাস, কলিকাতা।

আকন্দ গাছের ডাল হইতে ছাল ছাড়াইয়া তাহা হইতে শাঁসাল অংশটুকু বাদ দিতে পারিলেই সূতা বাহির হইয়া পড়ে। ছাল অতি সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, সেই সূতা বাহির করা কিছু কঠিন। রিয়া গাছ হইতে আঁস বাহির করার উপায় যেমন, ইহারও তদনুরূপ। পাটের মত পচাইয়া আঁস বাহির করা চলে না, কাঁচার আঁস বাহির করিতে হয়। ইহাদের আঁস বাহির করিতে স্বতন্ত্র যন্ত্রাদির আবশ্যক। রিয়ার আঁস বাহির করিবার যন্ত্র আছে। যন্ত্রের দাম পাঁচ শত টাকারও অধিক। বহু ব্যয়ে আকন্দ গাছের আঁস বাহির করায় বিশেষ কোন লাভ নাই। পাট, শণ, মুর্গা, আনারস, কলা ফেলিয়া রাখিয়া আকন্দের কেহ অধিক আদর করিবে না।

চীনা বাদাম বা মাট বাদাম—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার, ঢেরিয়া, সাহাবাদ।

বপনের সময়—মাঘ হইতে ফাল্গুন মাস.—হাল্কা দোয়াঁস মাটি উপযুক্ত।

ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে ইহার আবাদ চলিয়া আসিতেছে, ইহা বেশ লাভজনক কৃষি। ইহা খাইতে বেশ মুখরোচক। আজকাল চীনা বাদামের তৈল সর্ষপ তৈলের সহিত ভেজাল জন্য তৈল ব্যবসায়ীগণ বহু পরিমাণে আমদানী করিতেছেন। ভেজাল দেওয়া ছাড়া ইহার খাঁটি তৈল বেশ ভাল হয়। অনেক জায়গায় খাঁটি তৈল রন্ধনকার্য্যে লাগে ও জ্বালানি হয়। খোল হইতে উত্তম সার হয়, গবাদি পশুকে খাওয়াইলে তাহারা বলিষ্ঠ হয়, গাভীর দুগ্ধ বেশী হয়।

চাষের প্রণালী সহজ—পৌষ, মাঘ মাসে লাঙ্গল দিয়া মাটি আল্গা করিয়া রাখিতে হইবে, শিশির এবং রৌদ্র খাইয়া জমি বেশ তেজস্কর হইবে, তাহার পর ফাল্গুন মাসে একটা বৃষ্টি পাইলেই তাহাতে মৈ দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া লইয়া দেড় হাত অন্তর এক একটি জুলি কাটিতে হইবে। ঐ জুলিতে এক হাত অন্তর এক একটি পুষ্ট চীনা বাদামের শুঁটি বপন করিয়া দুই ইঞ্চি পরিমাণ মাটি চাপা দিতে হইবে। এই সকল কার্য্য মাটির যো থাকিতে থাকিতে করা আবশ্যক, নতুবা জল দিয়া যো করিয়া লইতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।

অঙ্কুরিত হইবার পর গাছ যত বাড়িতে থাকিবে, ইহার গোড়ায় ক্রমশঃ পাশ হইতে অল্পে অল্পে মাটি টানিয়া চাপা দিতে হইবে এবং আবশ্যক মত মধ্যে মধ্যে সেচ দিতে হইবে। গাছ লতানিয়া ধরণের ইহার অধোদেশের প্রত্যেক গাঁট হইতে শিকড়ের মত ঝুরি নামিতে থাকে ঐ ঝুরি আল্গা মাটি দ্বারা চাপা দেওয়াতে প্রত্যেক ঝুরি হইতে মাটির নিম্নে বাদাম ধরিতে থাকে। ঐ সময় ক্ষেত্রে আগাছা না জন্মিতে পারে, এই জন্য এবং মাটি আল্গা রাখার জন্যও মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হয়, কিন্তু এই ফুল হইতে কলাই শুঁটীর মত বাদাম ফলে না। গাছের গোড়ায় ফল হয়। গাছগুলি নিস্তেজ হইয়া আসিলে বাদাম তুলিয়া ফেলা যাইতে পারে। ইহার চাষে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, কারণ ইহা শুঁটীধারী শস্যের অন্তর্ভুক্ত।

বিঘায় ছয় কিম্বা সাত সের বীজ বপন করিতে হয়। বাঙলার বীজ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, ইহা খাইতে সুস্বাদু ও দানা সুপুষ্ট। মান্দ্রাজি দানা অপেক্ষাকৃত লম্বা, দানা তত সুপুষ্ট নহে, খাইতে তত সুস্বাদুও নহে। মান্দ্রাজি বীজ হইতে এলাহাবাদে মাট বাদামের খুব উন্নতি হইয়াছে। তথায় এক একটা শুঁটি দুই ইঞ্চি লম্বা ও বাঙ্গালাদেশের শুঁটী অপেক্ষা তিন গুণ মোটা হয়।

বিঘায় চল্লিশ মণ কচিৎ ফলে, একরে ৪০ মণ সচরাচর ফলিতে দেখা যায়।

মোটা চাউল—হাটে বাজারে নুতন চাউলের আমদানী হইয়াছে। টাকায় মোটা চাউল ১১ সের দরে বিক্রীত হইতেছে।—নীহার-কাঁথী।

শস্যে কীট—প্রকাশ, হাজিগঞ্জ অঞ্চলে ধান্যক্ষেত্রে এক রকম কীট দেখা দিয়াছে। ইহাদের উৎপাতে নাকি বহু অপক্ক ও পক্ক ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্র একেবারে শস্য হীন হইয়া পড়িতেছে। তথাকার চাউলের বাজারও ক্রমশঃ চড়িতেছে দেখিয়া সাধারণ শ্রেণীতে ভাবী দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক দেখা দিয়াছে।

শস্যের হানি—মফঃস্বলের অনেক স্থানেই শস্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ইহা যে কারণে সংসাধিত হইয়াছে, চলিত ভাষায় তাহাকে "বাউ" লাগা বলে। ময়ানপুর ষ্টেশনের পশ্চিমে প্রায় ১০।১২ মাইল স্থানে অনেক পক্ক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রই এই "বাউ" লাগায় একেবারেই শস্যহীন হইয়া পড়িয়াছে। চান্দলা প্রভৃতি গ্রাম হইতেও শস্যনাশের এইরূপই দুঃসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কৃষককুলের ভাবী অন্নচিন্তার ত্রাস দেখা দিয়াছে।—"ত্রিপুরা হিতৈষী"।

আলুর মাশুল—বোম্বাইয়ের লোকেরা যে গোল আলু ভক্ষণ করিয়া থাকেন, তাহার সমস্তই ইয়ুরোপ হইতে আমদানি করা হয়। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে রেলপথে দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে এত অধিক মাশুল দিতে হয় যে, ইয়ুরোপ হইতে আহাজে তাহার অপেক্ষা খুব কম খরচ পড়ে। যাহাতে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়, রেলপথ স্থাপনের উহা এক প্রধান হেতু। কিন্তু ভারতের রেলপথে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না। আমাদিগের মনে হয়, এইরূপ অতিরিক্ত মাশুল অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উহাতে কর্তৃপক্ষের লাভ ব্যতীত লোকসানের সম্ভাবনা নাই।

মাংস-বৃক্ষ—ইউরোপে মাংসের দর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। হোটেল সমূহে আহারাদির পর ভদ্রলোকেরা যে বিল প্রাপ্ত হন, তাঁহাতে তাঁহাদের সখের ভোজনলিপ্সা কয়েক দিনের জন্য ঘুচিয়া যায়। কি উপায়ে মাংসের দর হ্রাস করা যাইতে পারে, সেইজন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদেরা চেষ্টা করিতেছিলেন। আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশে একপ্রকার বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এই বৃক্ষ মাংস প্রসব করিবে। বৃক্ষের গাত্রে অবশ্য মেষ-মাংস বা ছাগ-মাংস জন্মিবে না। বিজ্ঞান-বিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, মাংসে যে সকল পদার্থ থাকে, এই বৃক্ষের ফলে সেই সকল পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। ফলগুলি আমাদের দেশের বার্ত্তাকুর ন্যায়। মেক্সিকোর অধিবাসীরা গৃহপ্রাঙ্গণে এই গাছ রোপণ করিয়া থাকে—অনাদরেই গাছগুলি বাড়িয়া থাকে। তাহারা এই ফল খাইয়াই অনেক সময়ে জীবন ধারণ করে। এই গাছ অন্যত্র নাই। বিজ্ঞানবিদেরা এই গাছ অন্যান্য স্থানে প্রভূত পরিমাণে রোপণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সকল দেশেই এই গাছ জন্মিলে নিরামিষাশিগণ মাংস-আহারের ফল ভোগ করিতে পারিবেন।

সার-সংগ্রহ

পুষ্পের বর্ণ ও উহার উৎপত্তি রহস্য

বিবিধবর্ণে রঞ্জিত কৃত্রিম চিত্র দর্শন করিয়া লোকে কতই না আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে! সূর্য্যাস্ত সময়ে যিনি আকাশ-পটে বিচিত্র বর্ণের লীলা একদিনের জন্যও অবলোকন করিয়াছেন তাঁহার নিকটে কিন্তু চিত্রকরের নকলচিত্র কতই হীন, কতই তুচ্ছ! বসন্তকালে যিনি পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া বহুবিধ ঋতুপুষ্পের শোভা সন্দর্শন করিয়াছেন, তিনিই জানেন ফুলের কি মনোহারিণী শক্তি! আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই গোলাপের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। যে অপূর্ব্ব রূপ দর্শনে কীটপতঙ্গাদিও বিমোহিত বিশ্বশিল্পীবিরচিত সেই অতুলনীয় রূপের মোহিনী শক্তিতে মানুষ যে ভুলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

প্রকৃতির কোন কার্য্যই ত নিরর্থক নহে। সুতরাং কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং কিরূপে পুষ্পের এই বিচিত্র বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকের মনে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। সাধারণতঃ পুষ্পের ৪টি অঙ্গ থাকে—স্ত্রী বা গর্ভকেশর পুংকেশর, ফুল-দল ও কুণ্ড। পুং ও স্ত্রী কেশরই পুষ্পের প্রধান অঙ্গ। উহাদিগকে ঝড়, বৃষ্টি ও কীট-পতঙ্গাদির অত্যাচার হইতে রক্ষা করার প্রয়োজন, এই সুকুমার অঙ্গ দুইটিকে প্রথমে কোমল-দল (Corolla) বা পাপ্ড়ী সমূহ ও পরে অপেক্ষাকৃত শক্ত কুণ্ড (Calyx) বা বৃতিসমষ্টি দ্বারা আবৃত রাখা হয়। সুতরাং পাপ্ড়ী ও বৃতি, পুষ্পের প্রধান অঙ্গ দুইটীর আবরণমাত্র।

পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর রক্ষা করা একমাত্র উদ্দেশ্য হইলে পাপ্ড়ী এবং অনেক স্থলে বৃতিসমূহ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হয় কেন? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বহুবিধ পরীক্ষা ও ভূয়োদর্শন দ্বারা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে ফল উৎপাদনে সাহায্য করাই বর্ণের প্রধান অভিপ্রায়। স্ত্রী-পুরুষের মিলনে যেরূপ জীবের উৎপত্তি হয় উদ্ভিদ সমাজেও সেইরূপ হইয়া থাকে। পুংকেশরের মস্তকে যে থলি দেখা যায় তাহার মধ্যে ধূলিকণার ন্যায় অসংখ্য রেণুকণা বিদ্যমান থাকে। খেজুর বা অন্য কোন ফুলের একটি পরিপুষ্ট পুংকেশর স্পর্শ করিলে উহা বেশ দেখা যায়। স্ত্রীকেশরের (Pistil) নিম্নস্থিত স্ফীতথলি বা গর্ভ (ovary) মধ্যে অপুষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দেখা যায়। উহাদিগকে বীজাণু কহে। অতি সূক্ষ্ম হইলেও পুংকেশরের রেণুকণার মধ্যে ও স্ত্রীকেশরের বীজাণুর কোষ (cell) থলির অভ্যন্তরে পঙ্কবৎ একপ্রকার তরল পদার্থ থাকে। উহাকে কোষপঙ্ক (Protoplasm) বলা যাইতে পারে। রেণুকণার কোষপঙ্ক কোনও উপায়ে একটি বীজাণুর কোষপঙ্কের

সহিত মিলিত হইতে পারিলে তবে বীজাণুটি ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া পরিপুষ্ট হয় ও বীজে পরিণত হইতে পারে। বীজাণু ও রেণুকণার এইরূপ মিলনকে সংক্ষেপে ফুলের নিষেক ক্রিয়া বলা হয়। আপন ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন মনুষ্য সমাজে যেরূপ হেয় বলিয়া বিবেচিত, উদ্ভিদ সমাজেও সেইরূপ বংশলোপকর ঈদৃশ অস্বাভাবিক পরিণয়কে যথাসাধ্য পরিহার করিবার জন্য চেষ্টা হইয়া থাকে। একই পুষ্পের পুংকেশর সেই পুষ্পের স্ত্রীকেশরকে নিষিক্ত করে না; তবে নিরুপায় স্থলের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। এক ফুলের রেণু ঐ জাতীয় অপর ফুলের বীজাণুর সহিত মিলিত হইবার জন্য চেষ্টার ক্রটি করে না। কিন্তু গতিশক্তি বিহীন রেণুকণার পক্ষে স্বয়ং পুষ্পান্তরে গমন করা একান্ত অসম্ভব। সুতরাং রেণুকণা যাহাতে সহজে অথচ নিঃসন্দেহে অন্য পুষ্পের স্ত্রীকেশরের সহিত সংলগ্ন হইতে পারে এরূপ কোন উপায়ের বিশেষ প্রয়োজন। ধূলিকণা বায়ুবেগে স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে। রেণুকণাও ঐ উপায়ে পুষ্পান্তরে গমন করে। কিন্তু ইহা প্রশস্ত উপায় নহে। কেন না বায়ুচলিত রেণুকণা স্বজাতীয় পুষ্পের উপরে না পড়িয়া কর্দ্দম, জল, পত্র বা ঐরূপ অনুপযুক্ত স্থানে পড়িতে পারে। ভুট্টা, খেঁজুর, তাল প্রভৃতি উদ্ভিদের মধ্যে রেণুকণার এইরূপ অপব্যয় হয়। কোন কোন জলজ উদ্ভিদের রেণু স্রোতের সহিত অন্যত্র নীত হইয়া থাকে। অনেক পিপীলিকা রেণুকণা ভক্ষণ করে। সেইজন্য খাদ্য সংগ্রহের অভিপ্রায়ে উহাদিগকে নানাফুলে ভ্রমণ করিতে হয়। উহাদিগের পদ-সংলগ্ন রেণুকণা এই উপায়ে পুষ্পান্তরে গমন করিবার অবসর পায়। প্রজাপতি, ভ্রমর, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি পতঙ্গেরা অত্যন্ত মধুপ্রিয়। এমন কি মধু না পাইলে উহাদের অনেকেরই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। ফুল-দল বা পাপড়ির মূলদেশে মধু সঞ্চিত থাকে বলিয়া অনেক পতঙ্গকে নানাফুলে মধু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে হয়। এই সুযোগে এক পুষ্পের রেণু পতঙ্গের শুঁড় ও অন্যান্য অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া পুষ্পান্তরে গমন করিয়া থাকে। অতএব পুষ্পের পক্ষে পতঙ্গের আগমন অত্যন্ত আবশ্যক। গরজ বড় বালাই। এইজন্যই অনেক পুষ্প মধুর ন্যায় উৎকৃষ্ট খাদ্য পতঙ্গদিগকে প্রদান পূর্ব্বক প্রলোভিত করিতে কাতর হয় না। এরূপ স্থলে দূর হইতে যাহাতে পতঙ্গের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হইতে পারে—যাহাতে উহারা সহজে জানিতে পারে যে ঐ স্থানে মধু লুকায়িত আছে—এইরূপ একটা উপায় থাকাই পুষ্পের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। ফুল-দলের উজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণ এইকার্য্য অতি উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকে। অনেক কীট পতঙ্গ রাত্রিতে দূর হইতে প্রদীপের নিকট আসিয়া আত্মবিসর্জ্জন করে। দীপশিখার উজ্জ্বল বর্ণই এই আকর্ষণের কারণ। অতএব দেখা গেল বীজোৎপাদনের জন্য নিষেক-ক্রিয়ার সাহায্য করাই পুষ্পের বর্ণ বৈচিত্র্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কিরূপে বর্ণের উৎপত্তি ও বিচিত্রতার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে? কৃষ্ণ-কলির (সন্ধ্যামণির) একই গাছের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় হলদে, শাদা, লাল অথবা ঐ তিন বর্ণের অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত রংবিশিষ্ট ফুল ফুটিতে দেখিয়া বর্ণের উৎপত্তি রহস্য জানিবার জন্য সহজেই কৌতূহল জন্মে। তবে এই বিষয়টি সম্যক অবগত হইতে হইলে উদ্ভিদ-বিষয়ক রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করা যে আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য। জীবদেহের পুষ্টি বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য শরীরের অভ্যন্তরে সর্ব্বদাই নানাবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। একই দুগ্ধ হইতে শিশুদেহের অস্থি, মাংস, মেদ ও মজ্জা—ফলতঃ সর্ব্ববিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়। যে উপায়ে খাদ্য দ্রব্য পাকনালীর অভ্যন্তরে রূপান্তরিত হইয়া রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতিতে পরিণত হয় তাহাকে সংক্ষেপ শারীর কার্য্য (Physiological action) বলা যাইতে পারে। জীবদেহের ন্যায় উদ্ভিদ শরীরের অভ্যন্তরেও নানাবিধ রাসায়নিক ক্রিয়া ও শারীরকার্য্য চলিয়া থাকে। এইজন্যই ক্ষুদ্র বীজ বটবৃক্ষের ন্যায় মহীরূপে পরিণত হইতে পারে।

বংশরক্ষার জন্য সন্তানলাভ করা জীবের ন্যায় উদ্ভিদ সমাজেরও আকাঙ্ক্ষা। এইজন্য উদ্ভিদের কতকগুলি পত্র ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া বৃতি, দল, পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরে পরিণত হইয়া থাকে। কদলীপত্র যে ক্রমে ক্ষুদ্র হইয়া পরিশেষে রঙিন "মোচার খোলার" আকার ধারণ করে তাহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মোচার পুষ্টির যে পরিমাণ উপাদানের আবশ্যক কদলীপত্রে সেই পরিমাণ সামগ্রীর অভাব হয়। সেইজন্যই দেখা যায় যতই মোচা ক্রমে পুষ্ট হইয়া উঠে পাতাও সেই অনুপাতে ক্ষুদ্র হইতে থাকে। কেবলমাত্র কদলীবৃক্ষে যে এইরূপ ঘটে তাহা নহে। অন্যান্য উদ্ভিদের মধ্যেও এইরূপ লক্ষ্য করা যায়। রজনীগন্ধা পরীক্ষা করিলেও এই সত্যটি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। জীবজগতেও এই নিয়মের ব্যত্যয় হয় না। গর্ভস্থ শিশু যতই পরিপুষ্ট হইতে থাকে মাতার দেহও পুষ্টিকর উপাদানের অভাব-বশতঃ ততই রুগ্ন ও দুর্ব্বল হইয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ফুলের সম্যক বৃদ্ধির জন্য পত্রের কতকটা সামগ্রী ব্যয়িত হইয়া থাকে। ফুলের উদ্দেশ্য ফল উৎপাদনে সাহায্য করা। সুতরাং ফলের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে ফুলের কতকটা সামগ্রী ব্যয়িত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

উদ্ভিদের দেহভ্যন্তরস্থ নানাবিধ রাসায়নিক ও শারীরক্রিয়ার ফলেই পুষ্পের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে পত্র হইতেও পাপ্ড়ীতে এই রাসায়নিক কার্য্য অধিকতর দ্রুতবেগে সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। আমরা নিশ্বাসের সহিত বায়ু হইতে অক্সিজেন (অম্লজান) গ্যাস গ্রহণ করি। ঐ অক্সিজেন আমাদের রক্তের সহিত মিলিত হইয়া উহার বিশুদ্ধি রক্ষা করে ও এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে দেহের অভ্যন্তরে তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফুলদলেও এইরূপ অক্সিজেন গ্রহণ-

কার্য্য প্রবলবেগে সম্পন্ন হয়। ঘর্ম্মের আকারে জলীয় বাষ্প আমাদের শরীর হইতে বহির্গত হইয়া যায়। পত্র অপেক্ষা ফুলদল হইতে এই বাষ্পোৎসেক কার্য্য সময়ে সময়ে দ্রুতবেগে চলিয়া থাকে। রস চলাচলের জন্য পত্রের মধ্যে যে পরিমাণ শিরা ও শাখাশিরা থাকে ফুলদলে তত থাকে না। ফুলদল বা পাপড়ীর পরিপাক শক্তি (assimilative power) সাধারণতঃ অনেক কম। এইজন্য কার্টেল (Curtel) নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন যে যথোপযুক্ত পুষ্টির অভাবেই ফুলদলের অভ্যন্তরে হরিৎকণা (chloaophyll) জন্মিতে পারে না ও বৃদ্ধি পায় না। অসংখ্য লোহিত কণিকা রক্তে বিদ্যমান থাকায় রক্ত যেরূপ লাল দেখায় ঐরূপ অগণ্য হরিৎ-কণা বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই উদ্ভিদপত্রকে সবুজ মনে হয়। এই কণার অভাবেই অশোক, অশ্বত্থ প্রভৃতি উদ্ভিদের কচি কচি পাতা প্রথমে সবুজ থাকে না পরে উহারা যতই বড় হইতে থাকে ও হরিৎ-কণার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ততই উহাদের বর্ণ সবুজ হইয়া উঠে। আবার এই কণার অভাবেই অনেক ফুলের পাপ্‌ড়ি শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। কদলী, পেঁপে প্রভৃতি উদ্ভিদের পক্কপত্র ঝরিয়া পড়িবার পূর্ব্বে ক্রমে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। হরিৎ কণার অভাবই এই বর্ণ পরিবর্ত্তনের কারণ।

ফুলদলই প্রধানত বিবিধবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। সুতরাং উহারই মধ্যে লাল, নীল, প্রভৃতি বর্ণোৎপাদক মূল উপাদান অধিকতর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদের শিকড়, কাণ্ড বা পত্রে যে পরিমাণ মূলবর্ণ পাওয়া যায়, উহা ফুলদলস্থ বর্ণের সহিত তুলনায় অতি সামান্য মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে পাপ্‌ড়ীর মধ্যে হরিৎ-কণা উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু কমলা বা গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের মূল-উপাদান ক্যারোটিন (carotin) নামক পদার্থ উৎপন্ন হইবার অবসর পায়। অবশ্য মূল-উপাদানের ন্যূনাধিক্যবশতঃ কখন কমলা, কখন বা হরিদ্রাবর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

একজাতীয় জবা ও অন্যান্য অনেক ফুলের পাপ্‌ড়ীর বর্ণ লাল এবং অনেক অপরাজিতার দল নীল। কিরূপে এই দুই বর্ণের উৎপত্তি হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন যে ফুলদলের পরিপাকশক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হওয়ায় উহার কোষপঙ্কের বর্জ্জন ক্ষমতা অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক। পরিপাক যন্ত্র দুর্ব্বল হইলে মলের ভাগ অধিক হয় না কি? ফুলের সহিত দল, কাণ্ড ও মূলের রাসায়নিক উপাদানের তুলনা করিলেই পুষ্পের কোষপঙ্কের অত্যধিক বর্জ্জনশক্তি (de-assimilation) স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই বর্জ্জন-শক্তির আধিক্যই লাল ও নীলবর্ণ উৎপাদনের মূল কারণ।

বহুসংখ্যক পুষ্পের রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা কিগ্যান (Keegan) নামক জনৈক পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে কোন কোন জাতীয় ফুল স্বভাবতই বিশুদ্ধ উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু দল, কাণ্ড ও মূলে লাল এবং নীলবর্ণের মূল-উপাদান (tannin chromogen) মাত্রা সাধারণতঃ অত্যন্ত অধিক থাকে। এইজন্যই মনে হয় লাল ও নীলবর্ণের মূল উপাদান প্রধানতঃ পাপ্ড়ীতেই উৎপন্ন হয় ও ঐ স্থানেই বৃদ্ধি পায়। বৃক্ষের অন্যান্য অঙ্গ এই কার্য্যে ফুলকে বিশেষ সাহায্য করে না। বাব্লা, গাব, হরিতকী, ভেলা প্রভৃতি বৃক্ষের ফলে ট্যানিন্ নামক পদার্থ যথেষ্ট দেখা যায়। ঐ সকল ফলের কষ যে ঈষৎ লাল দেখায় উহা এই ট্যানিন্ নামক পদার্থেরই গুণে। এই (ট্যানিন্) পদার্থ অত্যধিক রাসায়নিক বিশ্লেষণের (de-assimilation) ফলে উৎপন্ন হয়। সুতরাং গাছের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা পাপ্ড়ীর মধ্যেই অবশ্য এই বিশেষ প্রক্রিয়া অতি প্রবলবেগে চলিয়া থাকে, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ প্রণালীতে এই কার্য্য চলে এবং এই বিশেষ শক্তির প্রকৃত কারণই বা কি ?

ফুলদলের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল বলিয়াই উহার বর্জ্জন ক্ষমতা সেই অনুপাতে অধিক বটে কিন্তু কেবল ইহাই একমাত্র কারণ নহে। কোন কোন পাপ্ড়ীর কতকগুলি কোষের এই বর্জ্জন ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। উহারাই কার্য্য করিয়া থাকে, আর নিকটস্থ অপরাপর কোষসকল উহাদের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করে মাত্র। একজন খাটিয়া মরে, আর পাঁচজন বসিয়া খায়। পিপীলিকা ও মধুমক্ষিকাদিগের মধ্যেও এইরূপ নিয়ম দেখা যায়। পাপ্ড়ীর কোষ সমূহ যে সকল পদার্থ (albuminoids) উৎপন্ন হয় এই উপায়ে পুংকেশর ও স্ত্রী কেশরের অভাব পূরণের জন্যই উহাদের কতকটা ব্যয় হইয়া যায়। হংস ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শ্বেত দ্রব্য ও মসুর অরহর প্রভৃতি ডাল জাতির পুষ্টিকর সার পদার্থকেই (albuminoid) বলে। ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে নাইট্রোজেন নামক পদার্থ বিশেষের মাত্রা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। ডিম্বের কুসুম বা ভ্রূণ ঐ শ্বেত দ্রব্য আহার করিয়া বৃদ্ধি পায় ও একটি পক্ষীশাবকে পরিণত হইয়া থাকে অসহায় "উদ্ভিদশিশু" যাহাতে খাদ্যাভাবে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত না হয় তজ্জন্য বীজ মধ্যে ভ্রূণ বা অঙ্কুরের উভয় পার্শ্বে বীজ-দল বা ডালের আকারে পুষ্টিকর যথেষ্ট খাদ্য সঞ্চিত থাকে। বলা বাহুল্য বীজোৎপাদন করিতে হইলে ঐ খাদ্যসার প্রস্তুত করা অবশ্য প্রয়োজনীয়, কেন না রেণু ও বীজাণুর পুষ্টির জন্য ঐ দ্রব্যের যথেষ্ট আবশ্যক। সময়ে সময়ে পুং ও স্ত্রীকেশরের অত্যধিক অভাব পূরণের জন্য ফুলদলের অভ্যন্তরস্থ ঐ সকল পদার্থের অতিরিক্ত ব্যয় একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। তাহাতে ঐ সকল দ্রব্যের উপাদান পৃথক্ হইতে বাধ্য হয়। এই বিশ্লেষণের

ফলে নাইট্রোজেনের অংশ পুংকেশর ও স্ত্রী কেশরের কোষ সমূহে আবশ্যক মত চলিয়া যায়। সুতরাং অধিকাংশ স্থলে লাল ও নীলবর্ণের মূল উপাদান দলের মধ্যেই পড়িয়া থাকে। বহুসংখ্যক পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়া গিয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন ফুলে এই ট্যানিন্ অল্পাধিক পরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া লাল ও নীলবর্ণ উৎপাদন করে। মটরে এই রূপান্তরের মাত্রা অত্যন্ত অধিক। কোন কোন গোলাপেও প্রায় এই রূপই দেখিতে পাওয়া যায়। একই জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে কোন শ্রেণীর গাছে স্বভাবতই লাল, আবার অপর শ্রেণীর গাছে নীলবর্ণের ফুল জন্মিয়া থাকে। কিন্তু উভয় শ্রেণীর মধ্যেই মূল-বর্ণের (chromogen) উপাদানগত কোন পার্থক্য দেখা যায় না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ফুলে বর্ণোৎপাদনের শক্তি ন্যূনাধিক মাত্রায় থাকিবেই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে; নতুবা বর্ণের পার্থক্য ঘটিতে পারে না। যে সকল উদ্ভিদের ফুল সাধারণতঃ নীল বা ঈষৎ লালের আভাযুক্ত নীল সেই সকল উদ্ভিদই এ বিষয়ে উন্নত বুঝিতে হইবে। এই সকল উদ্ভিদেরই জননশক্তি বিশেষ প্রবল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে জাতীয় উদ্ভিদের হলুদে ফুল হয় কোন কৃত্রিম উপায়েই সেই জাতির কোন শ্রেণীর গাছে নীল ফুল জন্মান যায় না; তবে লাল বা শাদা ফুল জন্মান যাইতে পারে। এইরূপে আবার নীল ফুলের বর্ণ কোন উপায়েই পরিবর্ত্তিত করিয়া হরিদ্রাভ করা যায় না। বলা বাহুল্য যে অনেক পুষ্পোদ্যানে গোলাপ জিনিয়া প্রভৃতি একই শ্রেণীর উদ্ভিদ হইতে বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প উৎপাদন করতঃ পুষ্পজীবিগণ ক্রেতার মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। শরীর কার্য্যের সুবিধার জন্য কলমী, অপরাজিতা প্রভৃতি অধিকাংশ উদ্ভিদের ফুলদল ও ভুঁইচাঁপা প্রভৃতি অনেক ফুলের বৃতি এবং পদ্মজাতীয় অনেক পুষ্পের আবরণ-পত্রের কোষ মধ্যে নাইট্রোজেনসংশ্লিষ্ট পদার্থের যতই অভাব ঘটে, ঐ সকল পাপ্‌ড়ী, বৃতি প্রভৃতির বর্ণও ততই লাল অথবা নীল হইতে থাকে। ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত পদার্থের (albuminoid) ন্যূনাধিক্যই বর্ণ বৈচিত্র্যের কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

অতএব দেখা গেল বংশরক্ষার জন্য অনেক উদ্ভিদেরই পক্ষে ফল বা বীজের প্রয়োজন এবং এই বীজোৎপাদন জন্যই পুংকেশর ও স্ত্রীকেশরের আবশ্যক। এই দুই অঙ্গের উৎপত্তি ও পুষ্টির জন্য যে সমুদায় উপাদানের প্রয়োজন হয় উহাদের অধিকাংশই পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। কাজেই পত্রের মধ্যে সারপদার্থের যতই অভাব হইতে থাকে পত্রও ততই ক্রমে ক্ষুদ্র ও রূপান্তরিত হইয়া বৃতি ও পাপ্‌ড়ীতে পরিণত হয় এবং নীল, পীত লোহিতাদি বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়।

বাগানের মাসিক কার্য্য ।

চৈত্র মাস ।

সব্জীবাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী-চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স ও স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সেগুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদি ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র। এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউশ ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটী ও সার দিতে হয়। এখানে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটী, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটী দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অরহর, আউশ ধান বুনিতে হয়।—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল, গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিঘোনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্ট, পপি, ষ্টারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু যাহা এই সময় পাকিতে পারে, সেই লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৩শ খণ্ড। } চৈত্র, ১৩১৯ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

ফসলে পোকা ও পোকা নিবারণোপায়

জনৈক কৃষিবন্ধু লিখিত

ফসলে পোকা লাগিলে পোকার আচরণ দেখিয়া অনেক সময় প্রতিকারের উপায় স্থির করা যায়। তবে যে কোন উপায়ে সাধারণতঃ বাছিয়া মারা ভিন্ন আর গতি নাই। হাতে এক একটী করিয়া বাছা তত সহজ নয় হাত জাল ব্যবহার করা যাইতে পারে। মাছ ধরা ছাকুনি জাল যেমন এ জালও তদ্রূপ। চারিহাত বা পাঁচ হাত বাঁশের কঞ্চি বা বেতকে বাঁকাইয়া মশারীর কাপড় বা যে কোন সছিদ্র কাপড় সেলাই করিয়া সহজেই এই রকম হাত জাল প্রস্তুত করিতে পারা যায়। আবশ্যক হইলে একটা বাঁট বাঁধিয়া লইতে হয়। বড় ক্ষেত বা ময়দানের উপর টানিবার জন্য "ফসলের পোকা" নামক পুস্তকের ২৪ চিত্রের মত কাপড়ের জাল বেশ সুবিধা জনক। দুই ধারের দড়িতে দুইটী সরু বাঁশ বাঁধিয়া এক জনেই এই রকম জাল টানিতে পারে। আবশ্যক হইলে ছোট বা বড় জাল করিতে পারা যায়। জাল বড় হইলে মুখে চারি কোণা বাঁশের ঠাট বাঁধিয়া বা সেলাই করিয়া দিতে হয়। জাল ব্যবহার করিবার সময় কেরাসিন তৈলে ভিজাইয়া লইলে ভাল হয়। জালের ভিতর যেমন পোকা ধরা পড়ে অনেক পোকা কেরাসিন থাকাতে সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায়। ঐরূপ হাত জালে পোকা ধরিয়া কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া কিম্বা মাটীতে পুঁতিয়া মারিয়া ফেলিতে হয়। ফড়িং ইত্যাদিকে জালের ভিতরেই পাক দিয়া বা চাপ দিয়া মারা সহজ।

অনেক পোকা রাত্রিতে খায় এবং দিনের বেলা এখানে ওখানে লুকাইয়া থাকে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে কতকগুলি করিয়া পাতা বা ঘাস রাখিয়া দিলে এই সব পোকা

পাতা ও ঘাসের ভিতর থাকিয়া লুকায়। মাঝে মাঝে পাতা ঘাস উল্টাইয়া পোকাদিকে ধরিতে হয় ও কেরাসিন তেল মিশ্রিত জলে বা গরম জলে ফেলিয়া মারিতে হয়।

অনেক পতঙ্গ আলো দেখিলে আলোর কাছে উড়িয়া আসে। আলোক ফাঁদে ইহাদিগকে মারা সহজ। আলোক ফাঁদ আর কিছুই নয় একটা সাধারণ লণ্ঠন। জ্বালিয়া রাখিয়া লণ্ঠনের নীচে একটা বড় গামলায় কতকটা জল রাখিতে হয়। জলে একটু কেরাসিন তেল ঢালিয়া দিতে হয়। লণ্ঠনটা এ রকম ভাবে রাখিতে হয় যেমন জলে আলো পড়িয়া জলটা চক্‌চক্ করে। দুই ধারে দুইটা টিনের পাত্ বাঁকাইয়া রাখিলেও হয়। পোকারা উড়িয়া আসিয়া জলে পড়িবে এবং মরিবে। এইরূপ লণ্ঠন দ্বারা আলোক ফাঁদের পরিবর্ত্তে ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে আগুন জ্বালাইলেও আরও অধিক কাজ হয়। উজ্জ্বল আলো দেখিয়া পতঙ্গগুলি ছুটিয়া আসিয়া প্রবল অগ্নি শিখায় প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়।

সুবিধা মত ধোঁয়া দিতে পারিলে অনেক উপকার হয়। ধোঁয়াতে একটু গন্ধ হইলে ভাল হয়, ধুনা মিশাইয়া দেওয়া চলে অনেক গাছের ও পাতার ধোঁয়াতে প্রায়ই এক রকম গন্ধ থাকে। ধোঁয়া লাগিলে পোকা আসে না এবং থাকিলেও উড়িয়া পালায়।

ক্ষেতের উপরের মাটী নিড়াইয়া দেওয়া ও উল্টাইয়া দেওয়া ভাল, অনেক সময় অনেক পোকা ও পোকার পুত্তলি ইহাতে বাহির হইয়া পড়ে, তখন পোকাদিগকে বাছিয়া মারিতে পারা যায়। এই সময় পাখী ইত্যাদিতেও অনেক খাইয়া নাশ করে। বিলাত ও আমেরিকায় ফসলে পোকা লাগিলে বিষ ছিটাইয়া পোকা মারে। বিষ দুই রকমের হয় (১) যে সব পোকা পাতা কাটিয়া খায় তাহাদের জন্য পাতার উপর এমন কোন বিষ ছিটাইয়া দিতে হয় যাহা পাতার সঙ্গে ইহাদের পেটে যাইয়া ইহাদিকে নাশ করে। (২) যাহারা শোষক পোকা; পাতা কাটিয়া খায় না কেবল শুঁড় দ্বারা রস চুষিয়া খায় তাহাদের জন্য গাছের রসে বিষ মিশান সম্ভব হয় না। ইহাদের গায়ে এমন বিষ ছিটাইয়া দিতে হয় যাহাতে ইহারা মরিয়া যায়। প্রথমকে পেটের বিষ এবং দ্বিতীয়কে গায়ের বিষ বলা যায়।

যে বিষই হোক হাতে করিয়া জল তড়্‌তড়ার মত ছড়াইলে কোন কাজ হয় না। পেটের বিষ পাতার সব যায়গায় সমান ভাবে পড়া আবশ্যক। কারণ পোকা পাতার কোন স্থানটী খাইবে বলা যায় না। আর গায়ের বিষ এরূপে ছিটান উচিত যাহাতে সব পোকার সমস্ত দেহ বেশ ভিজিয়া যায়। শুধু হাতে এরূপে বিষ ছিটান সম্ভব হয় না। বিষ শুকান ও গুঁড়া হইলে কাপড়ের থলির ভিতর রাখিয়া পাতার উপর থলিটা নাড়িয়া নাড়িয়া বা ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া ছিটান চলে।

বিষ যদি জলে মিশান হয় তাহা হইলে এমন পিচ্‌কারী আবশ্যক যাহা দ্বারা বিষমিশ্রিত জল অনেকটা জায়গার উপর গুঁড়ি গুঁড়ি ভাবে পড়ে। এইরূপে বিষ ছিটাইবার জন্য আজ কাল অনেক রকম ঝারি পিচ্‌কারী ও দমকল হইয়াছে। সাধারণ কৃষকের পক্ষে মাঠের ফসলে বিষ ছিটাইয়া পোকা নাশ করা সম্ভব হইবে না। বিষ ও বিষ ছিটাইবার যন্ত্র কিনিতে পয়সা খরচ হয়।

যাহারা সব্জী বাগান করে এবং সব্জী বাগানে কপি বেগুণ ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া রোজ রোজ সহরে বা হাটেবাজারে বিক্রয় করে তাহারা কম মূল্যের ঝাঁঝরি পিচ্‌কারী দ্বারা সাধারণ দুই একটা বিষ মিশ্রিত আরোক ব্যবহার করিয়া লাভবান্ হইতে পারে। কোন রকমে গাছ বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেই তাহাদের লাভ রোজ বিক্রয়ের দ্বারা পয়সা আসিবে। কমদামী টিনের ঝাঁঝরি পিচ্‌কারী আছে, যে কোন টিনের কারিকর সহজেই ইহা প্রস্তুত করিতে পারে। তবে ইহাতে জল কম ধরে এবং ইহা ছোট খাট সব্জী বাগানেরই উপযোগী।

আর এক রকম অল্প মূল্যের দম কল পিচ্‌কারী আছে। পিচকারির মত পাম্প করিলে গাছের গায়ে সহজে জল ছিটান যায়। একটা কেরাসিনের টিনে বিষ গুলিয়া যেখানে ইচ্ছা এই টিন হইতে বিষ ছিটান চলে। ইহার দাম ১৬৲ টাকার অধিক হইবে না। সাবধানে ব্যবহার করিলে অনেক দিন চলে। মধ্যে মধ্যে রবারের নল বদল করিয়া লইতে হয়।

বড় দমকল পিচ্‌কারী দ্বারা দুইটা লোকে একদিনে ৫।৬ বিঘা জমির উপর আরোক ছিটাইতে পারে। একটু যত্ন করিয়া রাখিলে ইহা অনেক দিন চলে। মধ্যে মধ্যে রবারের নল বদল করিয়া দিতে হয়। ইহার দাম ৪৬৲ টাকা। ইহাতে একটা কেরাসিন তৈলের টিনের সমান পরিমাণ জল ধরে। ইহাতে এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে একজন লোকই পীঠে করিয়া এক হাতে করিয়া কল চালাইতে পারে এবং এক হাতে করিয়া নলের মুখ ধরিয়া যেখানে আবশ্যক বিষ ছিটাইতে পারে। ইহার নাম "ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার।"

উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় পোকার পেটের ও গায়ের বিষের উল্লেখ করা গেল

সেঁকো বিষ

ইহাই উত্তম পেটের বিষ, খুব কম পরিমাণ খাইলেই পোকা মরে। গাছের উপর যে পরিমাণ জল মিশাইয়া ছিটান যায় তাহাতে এক এক যায়গায় খুব কম পরিমাণ বিষ থাকে। বিষ ছিটান পাতা গরু বাছুরে একটু খাইলেও কিছু ক্ষতি হয় না। তবে সাবধান হওয়া উচিত গরু বাছুর বা মানুষে যেন সে পাতা কোন রকমে না খায়। লেড্ আর্সিনিয়েট নামক যে সেঁকো বিষ বাজারে পাওয়া যায়

তাহাই উত্তম। ইহাতে সেঁকো ছাড়া আরও অন্য জিনিষ মিশান আছে। লেড্ আর্সিনিয়েট দুই রকম পাওয়া যায় এক রকম গুঁড়া যাহাকে লেড্ আর্সিনিয়েট পাউডার বলে। আর এক রকম জল মিশান যাহাকে লেড্ আর্সিনিয়েট পেষ্ট বলে। জল মিশান অপেক্ষা শুষ্ক গুঁড়ারই তেজ বেশী। দুইই জলে মিশাইয়া সেই জল ছিটাইতে হয়। চুণ ও গুড়ের সঙ্গে মিশাইলে ইহার তেজ আরও বেশী হয়। বলা বাহুল্য যে কম বিষ মিশাইলে জলের তেজ কম হয় এবং বেশী বিষ মিশাইলে তেজ বেশী হয়।

লেড আর্সিনিয়েট প্রস্তত প্রণালী ফসলের পোকা নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

পোকার গায়ের বিষ কেরাসিন মিক্‌চার

আমরা সচরাচর যে কেরাসিন তেল জ্বালাই ইহা অতি উত্তম পোকার গায়ের বিষ। এই পুস্তকের অনেক যায়গায় কেরাসিন মিশ্রিত জলের সঙ্গে মিশে না; জলে ঢালিয়া দিলে উপরে আসিয়া ভাসে। কতকটা জলে এমন পরিমাণ কেরাসিন তেল ঢালিয়া দিতে হয় যাহাতে জলের উপর এক পর্দ্দা তেল ভাসে, সামান্য তেল দিলেই হয়। এই রকম জলকেই কেরাসিন মিশ্রিত জল বলা হইয়াছে।

কেরাসিন তেলে পোকার দেহ ভিজাইয়া দিতে পারিলে পোকা মরিয়া যায়। কিন্তু গাছের ডালে বা পাতায় যেখানে কেরোসিন তেল লাগিবে সেস্থান জলিয়া যাইবে। সেইজন্য কেরাসিন তেল গাছে ছিটান চলে না, জলের সঙ্গেও ইহা মিশে না। যদি কেরাসিন মিক্‌চার করিয়া সেই মিক্‌চার জলে মিশাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পোকাও মরে এবং গাছেরও ক্ষতি হয় না। কেরোসিন মিক্‌চার জলের সঙ্গে বেশ মিশে।

কেরোসিন মিশ্রণ প্রস্তুতের নিয়ম "ফসলের পোকা" পুস্তকে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। তামাক পাতার জল পোকার বিষের বিশেষ কাজ করে।

১ সের তামাক ৫ সের আন্দাজ জলে একদিন এক রাত্রি ভিজাইয়া রাখ বা অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য সিদ্ধ করিয়া লও, দুই ছাটাক বার সোপ বা বার সাবান এই জলে গুলিয়া লও, তাহা হইলেই তামাকের জল প্রস্তুত হইল। এই তামাকের জল সাত গুণ জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করা চলে।

স্যানিটারী ফ্লুইট যাহা মিউনিসিপ্যালিটি ড্রেন প্রভৃতিতেও ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা পোকার গায়ের বিষ। দুর্গন্ধময় স্থানে যেখানে পোকা বেশী সেই পোকা মারিবার জন্য ইহা ব্যবহার হয়। তিন ছটাক আন্দাজ একটিন জলে গুলিয়া ব্যবহার করিলে পোকা মারার কাজ সুসম্পন্ন হয়।

শিল্প শিক্ষা

আজ কাল শিল্প শিক্ষা লইয়া বর্ত্তমান ভারতে বহু জল্পনা কল্পনা হইতেছে। কঃ পন্থা বিচার্য্য বিষয় এইটি। এ বিষয়ে নানা মত আছে তাহার আর সন্দেহ নাই। আমাদের এখন কর্ত্তব্য কি, কোন্ কাজটা আমাদের করায়ত্ত, কতদূর আমাদের শক্তি, শক্তির অল্পতা হইলে শক্তি সঞ্চয়ের উপায় কি আমাদিগকে এখন এই সকল ভাবিতে হইবে। এই সম্বন্ধে আমরা নিজের ভাষায় বেশী কথা না বলিয়া পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ইতি পূর্ব্বে লিখিত "শিল্প শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধটি এস্থলে সন্নিবেশিত করিলাম।

শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে! চাকরী ক্রমেই দুর্ল্ভ হইয়া উঠিতেছে। সে কালের মত ভদ্র-সন্তানের যে কৃষাণ দ্বারা চাষ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, সে উপায় এখন নাই। কারণ, মজুরের মজুরী এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে চাষে এখন আর লাভ হয় না। ভদ্রসন্তানদিগের নিমিত্ত সেই জন্ম বড়ই ভাবনা হইয়াছে। পেটের দায়ে ভদ্র-সন্তানদিগকে এখন কি কুলিবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে? কোমরে পৈতা গুজিয়া, সদ্‌বংশজাত ব্রাহ্মণের ছেলেকে কি পাটের কলে চট্ বুনিতে হইবে?

শিক্ষা লাভ করিয়া স্বজাতি ও পুত্র পৌত্রদিগের মঙ্গল বিষয় চিন্তা করিবার নিমিত্ত যাঁহাদের শক্তি হইয়াছে, তাঁহাদের স্কন্ধে বিষম দায়িত্ব স্থাপিত আছে। এখন্ তাঁহারা যেরূপ বীজবপন করিবেন, তাঁহাদের পুত্র-পৌত্রগণ সেইরূপ ফলভোগ করিবে। মৃত্যুর পর শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে এইরূপ প্রশ্ন করা হইবে,—"ভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া, পশু অপেক্ষা তোমার অধিক জ্ঞান হইয়াছিল। পশুগণ নিজের উদর-পূর্ত্তি ও সন্তান প্রতিপালন করিয়া জীবন অতিবাহিত করে। তাহা অপেক্ষা তুমি কি কিছু অধিক করিয়াছিলে? না,—পশুদিগের স্যায় তুমিও কেবল উদর-পূর্ত্তি ও সন্তান প্রতিপালন করিয়া জীবন যাপন করিয়াছিলে?" পেটে অন্ন না থাকিলে, ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই করিতে পারা যায় না। যে কাজে সহস্র সহস্র লোকের অন্ন হয়, পুরুষ-পুরুষানুক্রমে লোক সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে, সে কাজের চেয়ে আর ধর্ম্ম কি আছে?

আমাদিগকে এখন সেই সমুদয় কার্য্যের সূত্রপাত করিতে হইবে। আর কিছু না হউক, আমি সকলকে এখন এই বিষয়ের চিন্তা করিতে বলি। প্রথম চিন্তা—তাহার পর কাজ আপনা হইতে আসিয়া যায়। চিন্তার বিষয় এই যে, আমাদের

দেশে নানা দ্রব্য বিদেশ হইতে আনীত হইতেছে। সে সকল দ্রব্য কি,—তাহা, নিজের দেশে, নিজের ঘরে, বাহিরে, হাটে, বাজারে, সকল স্থানেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। সেই সমুদয় দ্রব্যের বিনিময়ে আমাদের দেশ হইতে কোটি কোটি টাকার কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। আমাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্য লইয়া, অন্য দেশের লোক ধনবান্ হইতেছে। আর আমাদের লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। যাহারা এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করে, তাহারা মানুষ; আর আমরাও মানুষ। আমরা কি সেই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারি না। যদি না পারি, তাহা হইলে কি কারণে আমরা পারি না। বিদেশ হইতে আনীত নানারূপ দ্রব্যাদি দেখিয়া, আমাদের এইরূপ চিন্তা করা আবশ্যক।

বিদেশ হইতে আনীত দ্রব্যাদি কেন আমরা প্রস্তুত করিতে পারি না, তাহার প্রধান কারণ যে, সেই সমুদয় বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নাই। অল্প দিন পূর্ব্বে এই বঙ্গবাসীতে কাচ প্রস্তুত বিষয়ে এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। লেখক বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে কাচের কারখানার কথা মনে করিয়া—"এখনও আমার মনে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতেছে। মনে এরূপ ধিকি ধিকি আগুন প্রজ্বলিত না রাখিয়া কেন বঙ্গদেশে কাচের কারখানা চলিল না, সেই বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। যে সমুদয় দ্রব্য সংযোগে কাচ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা এদেশে সুলভ ব্যয়ে মিলিতে পারে কি না, প্রথম স্থির না করিয়া ও কি প্রকারে কাচ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার বিন্দু বিসর্গ না জানিয়া, আমি যদি কাচ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে তাহার ফল কি হয়? কিছু মাত্র না জানিয়া, যদি মন্ত্রবলে কাচ প্রস্তুত হইত, যদি না শিখিয়া ঘরে বসিয়া সকল দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইত, তাহা হইলে আর ভাবনা ছিল না। তাহা হইলে, মারহাটি ব্রাহ্মণ বাগলে কাচ প্রস্তুত শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বিলাতে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেন না। ফল কথা দুই শত তিন শত বৎসর একরূপ কাজ করিয়া বিদেশের লোক সেই কাচ প্রস্তুত সম্বন্ধে নানারূপ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে। সে জ্ঞানটী কোনরূপে তাহাদের নিকট হইতে লইতে হইবে। নিজের অন্ন মারিয়া সে জ্ঞান সহজে কেহ অন্যকে প্রদান করেন না। সেইজন্য ব্রাহ্মণ বাগলেকে কাচ নির্ম্মাতাদিগের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইয়াছিল।

এক একটী লোকের আত্ম-বিসর্জ্জনের ফলে এইরূপে অনেক দেশে সহস্র সহস্র লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে। বিলাতে রেশমের কারখানা এইরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল। রেশমের কাপড় পূর্ব্বে ইতালিদেশ হইতে বিলাতে আমদানি হইত। সেই দ্রব্যের বিনিময়ে বিলাতের অনেক ধন ইতালি দেশে চলিয়া যাইত। বিলাতের লোকে চিন্তা করিতে লাগিল,—"আমরা কি এই রেশমের কাপড় প্রস্তুত করিতে

পারি না? আমরাও মানুষ, ইতালি দেশের লোকও মানুষ। তবে আমরা রেশমের কাপড় প্রস্তুত করিতে পারি না কেন?" লোকের মনে প্রথম এইরূপ চিন্তা হইল, তাহার পর চেষ্টা হইল। রাঁড়ী-ভুড়ির টাকা লইয়া, বিলাতের দেশ-হিতৈষীগণ কল পাঠাইবার নিমিত্ত ইতালিতে পত্র লিখিলেন না। পত্রের উত্তরে ভাঙ্গাচোরা অকর্ম্মণ্য কল আসিয়া উপস্থিত হইল না। কিছুমাত্র না জানিয়া, বিলাতের দেশ-হিতৈষীগণ রেশমের কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিলেন না। তাঁহারা এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া পরের টাকায় ব্যবসায় আরম্ভ করেন নাই। না,—এইরূপ করিয়া তাঁহারা দেশ-হিতৈষীদিগের উপর লোকের বিশ্বাসের মূলে একেবারে কুঠারাঘাত করেন নাই।

তাঁহারা প্রথম চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, কেন এরূপ কাজ করিতে পারি না। যে জিনিস ইতালির লোকে আমাদের দেশে আনিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করে, সে জিনিস আমরা প্রস্তুত করিতে গেলে, খরচ অধিক পড়িয়া যায়। ইহার কারণ কি? ঘরে বসিয়া পুস্তক খুলিয়া তাঁহারা এ তত্ত্বের মীমাংসা করিলেন না। তাঁহারা ইতালি দেশে গমন করিয়া, এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তথাপি এ বিষয়ে সন্ধান লাভ করা সহজ হয় নাই। নিজের অর্থোপার্জ্জনের ফন্দি সহজে লোকে বলে না। যাহা হউক, অনেক কষ্টে, ইংরাজগণ জানিতে পারিলেন যে, ইতালির লোক অনেক দিন রেশমের কাজ করিয়া, ভাল একটী কল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেই কলের সহায়তায় অতি অল্প খরচে তাহারা রেশমের কাপড় বুনিতে সমর্থ হয়। অতএব, হয় এইরূপ কল আমাদিগেকে আবিষ্কার করিতে হইবে, আর না হয় ইতালি হইতে এই কল নির্ম্মাণের কৌশলটি আমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। দুই শত বৎসরের অভিজ্ঞতা-ফলে ইতালি দেশে যে কল আবিষ্কৃত হইয়াছে, আজ একদিনে বিলাতে সে কল আবিষ্কৃত হইতে পারে না। অতএব, ইতালির নিকট হইতে কলের কৌশলটী কোনরূপে জানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইতালির কারখানা স্বামীগণ কলের ভিতর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না। কিরূপ কল, তাহা জানিবার কিছুমাত্র উপায় ছিল না।

ব্রাহ্মণ বাগদের মত আমাদের দেশে অতি অল্প লোক আছে; কিন্তু বিলাতে এরূপ অনেক লোক আছে। বিলাতের নরউইচ নামক নগরে লম্ব নামক এক যুবক ছিল। যুবক ধনবান্ লোকের পুত্র; ধন ঐশ্বর্য্যের তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। তথাপি সেই যুবক প্রতিজ্ঞা করিল যে, যেমন করিয়া পারি, ইতালির রেশমের কল আমি আমার দেশে আনিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যুবক ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ইতালি দেশের লেগহর্ণ নামক নগরে গমন করিল। বড় লোকের ছেলে নানারূপ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে, লেগহর্ণনগর

অধিবাসীদিগের নিকট যুবক সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইল। যুবক যখন ইতালির সকল বিষয় দেখিতে আসিয়াছে, তখন লেগহর্ণ নগরের রেশমের কারখানা পরিদর্শন করা কিছু আশ্চর্য্য কথা নহে। অতি কষ্টে যুবক কারখানা-স্বামীর নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইল। কিন্তু কারখানা-স্বামী কোন বিষয় তাহাকে ভাল করিয়া দেখাইলেন না। কারখানায় প্রবেশ করিবামাত্র যুবককে তিনি দ্রুতবেগে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইলেন। এক স্থানে কিছুক্ষণের নিমিত্ত দাঁড়াইতে দিলেন না। সে জন্য যুবকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। কল সম্বন্ধে সে কিছুমাত্র জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইল না।

ইংরেজ যুবক কিন্তু হতাশ হইবার পাত্র নহে। সে ভাবিল, এরূপ উপায়ে আমি কলের বিষয় কিছুই জানিতে পারিব না। অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া সেই ধন-কুবেরের পুত্র স্বজাতির উপকারের নিমিত্ত ভিখারীর বেশ ধারণ করিল। ছিন্নবস্ত্রপরিহিত ও ধূলি-ধূসরিত হইয়া, সে লেগহর্ণ নগরের পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভিক্ষা করিতে করিতে একদিন সে সেই রেশম-কারখানা-স্বামীর পুরোহিতের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল। বিদেশ-বিভূমিতে সে নিঃসহায় অনাথ এই বলিয়া তাঁহার নিকট সে পরিচয় দিল। পুরোহিত ধর্ম্ম যাজক ব্যক্তি। বিদেশী যুবকের দুঃখে সহজেই দয়া হইল। কিন্তু এ দেশের পুরোহিতগণ কেহ সংসারী নহেন। সুতরাং নিজের কাছে তিনি তাহাকে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার ধনবান যজমান রেশম কারখানার স্বামীর নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন।

পুরোহিতের অনুরোধে কারখানার স্বামী তাহাকে রেশম-কলে সামান্য কুলি-গিরির কাজ দিলেন। গরীব ভিখারী! রাত্রিতে যে পড়িয়া থাকে, এমন একটু স্থান তাহার নাই। সামান্য অজ্ঞ একটা কুলিকে কলের বাটির ভিতর রাত্রি যাপনের নিমিত্ত একটু স্থান দিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই। কারখানা-স্বামী যুবককে কলের ভিতর সামান্য একটী গুদামে শয়ন করিতে অনুমতি দিলেন।

অজ্ঞ কুলি আপনার নিকট কাগজ, পেনসিল, বাতি ও চকমকি রাখিয়াছিল। রাত্রিকালে উঠিয়া বাতিটী জ্বালিয়া সে কলের প্রণালীটী আঁকিয়া লইত। লেগহর্ণ নগরে এই সময়ে, গ্রোভার এবং অনুউইন নামক ইংরেজ বণিকের আফিস ছিল। যুবক সেই অঙ্কিত কাগজ দেখিয়া, একটু একটু করিয়া, কলের ছোট একটী কাঠের নকল করিতে লাগিল। তারপর ক্রমে ক্রমে সেই নকল বিলাতে প্রেরিত হইল। বিলাতে সেই নকল দেখিয়া, বড় লৌহনির্ম্মিত কল প্রস্তুত হইল। তখন হইতে ভাল কলের সহায়তায় ইংলণ্ডের লোক রেশম কাপড় বয়ন করিতে লাগিল। ইতালি হইতে এই দ্রব্য আমদানি সেই সময় হইতে বন্ধ হইয়া গেল। বিলাতের ধন বিদেশে আর প্রেরিত হইল না। সেই ধনে সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল। যুবক লম্বের চেষ্টায় আজ পর্য্যন্ত সেই কার্য্য করিয়া সহস্র সহস্র লোক প্রতিপালিত হইতেছে। ইংরেজ যুবকের যখন অভীষ্ট সিদ্ধ হইল তখন কারখানা হইতে পলায়ন করিয়া, সে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। তাহার দেশের লোক তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিল? অতি সমাদরে দেশের লোক তাহাকে গ্রহণ করিল; সকলেই তাহার পূজা করিতে লাগিল। আজ পর্য্যন্তও লোকে তাহার গুণ-গান করিতেছে।

তামাকের চাষ

শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস, বি,এ, লিখিত

গ্রন্থকার রঙপুর জেলার যে গভর্ণমেণ্টের বুড়িরহাট-তামাক-কৃষিক্ষেত্র আছে, সেই কৃষিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধারক। সুতরাং তিনি দেশী বিদেশী নানা জাতীয় তামাক চাষ, তামাক পাতা প্রস্তুত ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের প্রচুর অবকাশ পাইয়াছেন, এই পুস্তক খানি তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল।

উৎকৃষ্ট তামাক উৎপন্ন করিবার খ্যাতি বুড়িরহাট ক্ষেত্রের আছে। চুরুট কিম্বা সিগারেটের জন্য তামাক পাতা কি প্রকারে শোধন ও প্রস্তুত করিতে হয় তাহা ইনি বিশেষরূপ জানেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে এই কার্য্য এরূপ সহজে ও দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইতেছে তাহা বোধ হয় ব্যয় বহুল উপায়ে বা—বিদেশীয় বিশেষজ্ঞ-গণের তত্ত্বাবধানেও হওয়া সম্ভব নহে।

তামাকের জমি প্রস্তুত ও আবাদ প্রণালী হইতে আরম্ভ করিয়া কি প্রকারে তামাক পাতা "জাত" দিতে হয় কিরূপ ঘরে তামাক পাতা শুকাইতে হয়, তামাক

শুকাইবার গরম ঘর, চুরুট ও সিগারেটের জন্য তামাক পাতা বিচার, অবশেষে তামাকের ব্যবসা সম্বন্ধে এই ছোট খাট পুস্তকখানিতে যতদূর সম্ভব খবর দিয়াছেন। তামাক চাষে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিগণের এরূপ একখানি পুস্তকের আবশ্যক। পুস্তকখানি ডবলক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মায় ১৬৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহাতে দেশী বিদেশী তামাকের অনেকগুলি প্রতিকৃতি আছে। তামাক পাতা শোধন ও প্রস্তুত সম্বন্ধে অনেক কৌশল ছবিতে দেখান হইয়াছে। গ্রন্থকার তামাকের বিষয় অনেক প্রবন্ধ হইতে পূর্ব্বে "কৃষকে" লিখিয়াছেন। সেগুলি আগ্রহ সহকারে পঠিত হইত সুতরাং আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, গ্রন্থকারের এই পুস্তকখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে এবং বাঙলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পুস্তক শ্রেণীতে স্থান পাইয়া বাঙলা ভাষার কলেবর পুষ্টি করিবে।

আমরা স্থানান্তরে গ্রন্থকারের স্বহস্ত লিখিত "তামাকের উন্নতি চেষ্টা" শীর্ষক প্রস্তাবনাটি সন্নিবেশিত করিলাম।

তামাকের উন্নতি চেষ্টা

১৮৭৪ সালে মিষ্টার জে, ই, ও কনোর ভারতীয় তামাকের আবাদ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট মহামান্য পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভায় দাখিল করিয়াছিলেন, উহা পাঠ করিলে জানা যাইবে যে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ১৭৮৬ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত এদেশীয় তামাকের উন্নতির জন্য অধ্যবসায় সহকারে বারংবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন; এই সালে কর্ণেল কিড্ কলিকাতা উদ্ভিদ বাগিচা (বোটানিকেল গার্ডেন) স্থাপনের প্রস্তাব করিবার সময় যাহাতে সাহেব ও দেশীয় লোকদের চেষ্টায় এদেশে ইয়ুরোপে রপ্তানির উপযুক্ত তামাক উৎপাদন করা যায় তাহারই চেষ্টা করা আবশ্যক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৮২০ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মহামান্য কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের হুকুমে এদেশে এ সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান পরীক্ষা করা হয়; একারণ মেরিলাণ্ড ও ভার্জিনীয়া তামাকের আবাদ প্রণালী সম্বন্ধে কাপ্তেন বেসিল হলের বিবরণ সহ এই উভয় জাতীয় তামাকের বীজ প্রেরণ করা হয়। ইহা অতি সাবধানে চাষ করা হয় এবং লণ্ডনে নমুনা পাঠান হয়; এই তামাক প্রতি সের ৸০ আনা হইতে ১৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রীত হইতে পারে বলিয়া বিলাত হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরীক্ষার্থে যখন কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে চালান করা হইল তখন উহা বিক্রয় করিয়া কোনও লাভ দাঁড়াইয়া ছিল না।

ভারতীয় তামাক সম্বন্ধে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দোষারোপ করা হইয়া থাকে:—

(১) চালান করিবার সময় পথে ছাতা ধরিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া থাকে কিম্বা

এত শুষ্ক অবস্থায় বস্তা বাঁধাই করা হয় যে ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যায় এবং নস্যে ব্যবহার ব্যতীত অন্য কিছুই প্রস্তুত হইতে পারে না।

(২) ইহা এত কড়া, বিবর্ণ ও মোটা যে চুরুট কিম্বা সিগারেট প্রস্তুত হইতে পারে না।

(৩) ইহা সুগন্ধ ও সুস্বাদযুক্ত নহে; ইহাতে মৃত্তিকার গন্ধ এবং পচা বদ্ধ জলের গন্ধ থাকে।

১৮৭০ সালে আগ্রা ও অযোধ্যার যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত গাজিপুরে গভর্ণমেণ্ট একটি তামাকের কারখানা স্থাপন করেন; অল্পকাল পরেই ইহা মেসর্স বেগ ডানলপ্ এণ্ড কোম্পানীর নিকট পত্তন করা হয়; এই সময় এই কোম্পানী দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত পুষাতেও অপর একটী কারখানা স্থাপন করেন; এই স্থানে বর্ত্তমান পুষা কৃষিপরীক্ষা কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানী অতিশয় উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য আরম্ভ করেন এবং আমেরিকা হইতে ক্রমাগত অভিজ্ঞ লোক আনয়ন করতঃ তামাকের চাষ করেন। ১৮৮৯ সাল পর্য্যন্ত যথেষ্ট তামাক উৎপাদন করিয়া ইউরোপে বিক্রয়ার্থ রপ্তানি করেন; এই তামাক আমেরিকার নিকৃষ্ট তামাকের দরে কিয়ৎপরিমাণে বিক্রীত হইয়াছিল; কিন্তু ইহা দ্বারা আবাদের খরচ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

গাজিপুরের ন্যায় পুষার কারখানাতে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। বেহারের মধ্যে পুষা একটি সর্ব্বপ্রধান তামাক আবাদের স্থান; ইহা সরিষা পরগণার মধ্যে অবস্থিত এবং এই স্থানের তামাক ত্রিহুত তামাক বলিয়া বিখ্যাত। এই তামাকের উন্নতি করিতে পারিলে এদেশের একটি বিশেষ উপকার সাধিত হইত সন্দেহ নাই।

১৯০৯-১০ সালের ভারতীয় কৃষি-উন্নতি সম্বন্ধে মিঃ বি, কভেন্ট্রী লিখিত পুস্তক পাঠে জানা যায় পুষা কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে পুনর্ব্বার তামাকের উন্নতির জন্য পরীক্ষা করা হইতেছে; এই বৎসর সিগারেটের তামাকের উন্নতির জন্য মুঙ্গেরের পেনিনসুলা কোম্পানীর যোগে স্থানীয় ও আমেরিকার সিগারেটের তামাক উৎপাদন করা হয়, কিন্তু উহাতে বিশেষ কোনও ফল পাওয়া যায় নাই। এপর্য্যন্ত স্থানীয় তামাক হইতেই ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

১৮৭৮-৭৯ সালে বঙ্গদেশের অন্তর্গত কুচবেহার করদমিত্র রাজ্যে তামাক উন্নতি করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়, একারণ মেসর্স পেটারসন ও মেসর মণ্টফোর্ড নামক তামাকাভিজ্ঞ দুইজন সাহেব উত্তরোত্তর পরীক্ষা করেন কিন্তু কোনও ফল করিতে পারেন নাই। ইহারা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পদ্ধতি অনুসারে তামাক শুষ্ক ও জাত করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখা তামাক এইরূপ নিয়মে উৎপাদন করিয়া

প্রতি মণ ৫৲।৬৲ টাকার অধিক বিক্রয় করিতে পারেন নাই। এই দর স্থানীয় কৃষকদের তামাক অপেক্ষাও অনেক কম।

মিসটার পেটার্সন্ পুষা কারখানায় কতক কাল কার্য্য করিয়াছিলেন, পরে কুচবেহারে আইসেন; কিন্তু মিঃ সেনর মন্টফোর্ড ম্যানিলা তামাকের আবাদ জানিতেন; ইহাকে ৩৩ বিঘা আয়তনে একটি কৃষি পরীক্ষা ক্ষেত্র দেওয়া হইয়াছিল।

এইরূপ ক্রমাগত ২ বৎসর কাল পরীক্ষা দ্বারা এই ষ্টেটের প্রায় ২০,০০০৲ টাকা লোকসান্ হয় কিন্তু কোনও ফল না পাওয়ায় এই পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

গত ২।৩ বৎসর যাবৎ এই ষ্টেটে আগুনে শুষ্ক আমেরিকার সিগারেট তামাক উৎপন্ন হইতেছে; ইহা একটু কড়া বটে কিন্তু ইহার মধ্যে পীতবর্ণ তামাকও বেশ পাওয়া যাইতেছে। ৭৫ বিঘা আয়তনের একটি পরীক্ষা ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর ১৫০/০।১৭৫/০ মণ করিয়া তামাক উৎপাদন করা হইতেছে এবং প্রতি মণ গড়ে ৩৫৲ দরে বিক্রয় করা হইয়াছে। এইক্ষণ পর্য্যন্ত সুমাত্রা কিম্বা তুরস্ক দেশীয় তামাকের কোনও উৎকর্ষ সাধিত হয় নাই। ১৯০৫ সাল হইতে এই পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ষ্টেটের নায়েব আহিলকার শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত ভৌমিক এম্,এ, বি,এল্, মহাশয় ইহার জন্য বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে কার্য্য করিয়াছিলেন। গত বৎসর হইতে মিষ্টার ইন্দ্রভূষণ দে মজুমদার (এম,এস,এ, ইউ,এস,এ, আমেরিকা) এই ষ্টেটের কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ হইয়াছেন; ইনি আমেরিকা ও তুরস্ক দেশের তামাক আবাদ প্রণালী শিক্ষা করিয়াছেন; বিশেষতঃ কুচবিহারের প্রিন্স ভিক্টর ও আমেরিকা হইতে তামাক আবাদ প্রণালী শিক্ষা করিয়া এইক্ষণে ষ্টেটের কৃষি-বিভাগের ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় ক্রমান্বয়ে এই ষ্টেটের তামাকের আরও অধিকতর উন্নতি হইবে।

১৮৮৩-৮৭ সালে বম্বে প্রেসিডেন্সিতে কইরা জেলার অন্তর্গত নদীয়াদে তামাক সম্বন্ধে বিস্তৃত পরীক্ষা করা হইয়াছিল; এই ক্ষেত্র প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন; পরে রাও বাহাদুর সরদার বেচার্ডাস বেহারী দাস চালাইয়াছিলেন। তিনি উত্তরোত্তর ২।৩ জন আমেরিকার অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়া তামাকের আবাদ আরম্ভ করেন। কিন্তু কোন ফল পাইলেন না। এই কার্য্যে রাও বাহাদুর প্রায় ১৪০,০০০৲ টাকা লোকসান দিয়াছিলেন।

রাও বাহাদুরের ভ্রাতা গোপাল দাস, বিহারী দাস দেসাই কুচবেহারের রজনী বাবুর নিকট এই কারখানার যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে বর্ণনা করা গেল:—

তামাকের উন্নতিকল্পে বম্বে গভর্ণমেণ্ট মিষ্টার জোনস্ নামক জনৈক সাহেবকে নিযুক্ত করেন; এই সাহেব সুমাত্রা দ্বীপে কিয়ৎকাল থাকিয়া তথাকার তামাক

আবাদ করার পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় কৃষকদের আবাদীয় কাঁচা তামাক ক্ষেত্র হইতে খরিদ করিয়া মিষ্টার জোনস্ কর্ত্তৃক শুষ্ক ও জাত করতঃ ইউরোপ ও আমেরিকায় নমুনা পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু উত্তম মূল্য সাব্যস্ত না হওয়ায় দুই বৎসর পরে এই কার্য্য বন্ধ করিয়া দেন যাহা হউক মিঃ জোনস্ সরদার রাও বাহাদুরকে এই পরীক্ষা চালাইতে প্রলোভন দেখান এবং তামাক আবাদ আরম্ভ করেন। কিয়ৎকাল পরে এই সাহেব চলিয়া যান; পরে জর্ম্মন দেশীয় লাটস্কী নামক জনৈক সাহেবকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়; ইহার পরামর্শ ক্রমে বহু মূল্যের সিগারেটের কল খরিদ করা হয়; কিন্তু কিয়ৎকাল পরে তিনিও চলিয়া গেলেন। পরে অপর একটি সাহেবকে নিযুক্ত করা হয় এবং বম্বেতে একটি দোকানও খোলা হয়; কিন্তু বিক্রয়ের কোনও সুবিধা দেখা গেল না। গোপাল দাস দেসাই বলিলেন যে এই সমস্ত ক্ষতির প্রধান কারণ এই যে দায়ীত্ববিহীন কয়েকটি সাহেবের কথায় প্রণোদিত হইয়া কলকারখানা খরিদ তামাক শুষ্ক ও জাত করিবার ঘর প্রস্তুত করিতে বহু অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য হইয়াছিল; এই সমস্ত সাহেবদিগকে প্রথমতঃ বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল কিন্তু পরে তাঁহাদের কার্য্য কর্ম্ম দেখিয়া তাহারা তামাকের কার্য্য ভালরূপ জানিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল না।

বর্ত্তমান সময়ে বম্বে গভর্ণমেণ্ট তামাক উন্নতি করিবার জন্য পুনর্ব্বার প্রয়াশ পাইয়াছেন এবং নদীয়াদ ফারমের কার্য্য বিশেষ অধ্যবসায় ও যত্নের সহিত পরিচালিত হইতেছে; এই স্থানীয় তামাক অতিশয় পুরু, তৈলাক্ত ও তীব্র। অল্প কয়েক বৎসর গত হইল এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে বৈদেশিক উৎকৃষ্ট অনেক জাতীয় চুরুট ও সিগারেটের তামাক আবাদ করা হয়, ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক জাতি সর্ব্ব প্রধান:—

(১) টালার্ড; (২) হেভানা; (৩) জাভা, পি; (৪) জাভা, ডি; (৫) ফ্লোরিডা; (৬) সুমাত্রা।

ইহারা স্থানীয় মৃত্তিকায় বেশ জন্মিয়াছিল, কিন্তু পত্রভাগ পাতলা, ও স্থিতিস্থাপক না হওয়ায় এবং স্বাদ তীব্র হওয়ায় চুরুট ও সিগারেটের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; পক্ষান্তরে ইহারা ক্রমান্বয়ে স্থানীয় তামাকের গুণ প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আবাদকালে স্থানীয় সূর্য্যোত্তাপ অধিক হওয়ায় পাতা অধিক পুরু হয় এই সন্দেহে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত ফ্লোরিডার ন্যায় ছায়ার মধ্যেও তামাকের আবাদ করা হইয়াছিল; কিন্তু উহা অতিশয় পাতলা ও ভঙ্গপ্রবণ হওয়ায় এবং ফলন অত্যন্ত কম হওয়ায় এ পরীক্ষা দ্বারাও কোনও সুবিধা হইল না। ক্রমাগত এযাবৎ পরীক্ষার ফলে ইহা সিদ্ধান্ত

করা হইয়াছে যে এই স্থানীয় মৃত্তিকা নরম স্বাদযুক্ত পাতা চুরুটের তামাক উৎপাদনের উপযোগী নহে; কিন্তু পাইপ ও সিগারেটের তামাক উৎপাদন করা যাইতে পারে; এইরূপ বিশ্বাসে আমেরিকা হইতে তামাকের বীজ আনয়ন করতঃ আবাদ আরম্ভ করা হইয়াছে; তামাক শুষ্ক করার জন্য অনেক অর্থ ব্যয়ে ঘর উঠান হইয়াছে; ইহার নিম্নভাগের কিয়দংশ মৃত্তিকা মধ্যে অবস্থিত; কিন্তু এইরূপ ঘরেও জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ও তাপ ঠিক ভাবে পরিচালিত হইতে না দেখায় ১৯১০ সালে একটি বাষ্পীয় কল স্থাপন করা হইয়াছে। নদীয়াদের তামাক ভালরূপ জ্বলে না; ইহাতে সোরাজানের অংশ অতিশয় কম; এ কারণ অধিক পরিমাণে এই সার প্রয়োগে কিরূপ ফল পাওয়া যায় তাহারও একটি পরীক্ষা চলিতেছে। বম্বের মধ্যে, বেলগাও ও কইরা জেলায়ই অধিক তামাকের আবাদ হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ ক্রমাগত নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও উদ্যমের সহিত পরীক্ষা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

১৮৮৮-৯০ সাল পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট তামাক উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; একারণ মিষ্টার কেইন নামক জনৈক সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়; ইনি পুসাতে কিয়ৎকাল তামাকের কার্য্য করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সাহেব প্রথমতঃ সমগ্র মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে পরিভ্রমণ করিয়া স্থানীয় তামাক আবাদের পদ্ধতি ও দোষগুণ নির্ণয় করেন; পরে মাদুরা জেলার অন্তর্গত দিন্দিগালে থাকিয়া তামাক স্বয়ং আবাদ করেন এবং স্থানীয় কৃষকদের তামাক শুষ্ক ও জাত করেন। আমেরিকার ন্যায় ঘরের মধ্যে তামাক শুষ্ক ও জাত করিয়া যাহাতে ইহার উৎকর্ষ সাধন করা যায় তাহারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত তামাক স্থানীয় কৃষকদের আবাদীয় উসিকাপাল তামাকের দর হইতে শতকরা ৮১০ কম দরে বিক্রীত হইয়াছিল, একারণ গভর্ণমেণ্ট তখন এই পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেন। ইহার পরও সময় সময় গভর্ণমেণ্ট বৈদেশিক তামাক আবাদের পরীক্ষা করিয়াছেন; দিন্দিগালের মেসর্স স্পেন্সর এণ্ড কোংর সহিত একযোগেও কয়েক বৎসর তামাক উন্নতির চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনও ফল হয় নাই।

এতদ্ব্যতীত ককোনদায় মিঃ টি, এচ, বেরি নামক একটি সাহেব মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট হইতে ১০ বৎসর ম্যাদে জমি পাট্টা লইয়া সুমাত্রা প্রভৃতি তামাক আবাদ করিয়া পরীক্ষা করিতেছেন, এই পর্য্যন্ত কেবলমাত্র ভাল তামাকের গাছ হইতে দেখা গিয়াছে কিন্তু শুষ্ক ও জাত করার পরীক্ষা চলিতেছে।

১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশেও এইরূপ দুই একটি সাহেব দ্বারা কৃষকদের তামাক শুষ্ক ও জাত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোনও ফল না হওয়ায় এই পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। অল্প কয়েক

বৎসর যাবৎ কৃষিবিভাগ হইতে হেভানা ও ভার্জিনিয়া তামাকের বীজ কৃষকদিগকে সরবরাহ করা হইতেছে।

ইহা ইরাবতী নদীর উভয় পার্শ্বের বালুময় জমিতে বেশ জন্মে; এবং স্থানীয় কৃষকগণ ইহার বিশেষরূপ আবাদ আরম্ভ করিয়াছেন; এই উভয় জাতীয় তামাকের আবাদ বামোতে ও মবিন জেলায় অধিক। মবিনে বর্ম্মা চুরুটের জন্যও এই তামাক যথেষ্টরূপে ব্যবহৃত হইতেছে এবং ক্রমান্বয়ে লঙ্কা তামাকের আমদানী কম হইতেছে।

সরকারী কৃষি সংবাদ

বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে সরকারী ক্ষেত্রে ইক্ষু চাষের পরীক্ষা-১৯১১-১২

পরীক্ষা ফল দৃষ্টে বুঝা যায় যে আখের ক্ষেতে শুঁটিধারী শস্য জন্মাইয়া লইলে অনেকটা সারের খরচ বাঁচিয়া যায়। সবুজ সার দিলেও অনেক কম খরচে সারের কার্য্য সারিয়া লওয়া যায়। সালফেট অব এমোনিয়া সার দিলে আখের ফলন বাড়ে যথার্থ কিন্তু তাহাতে খরচ অধিক হয় বলিয়া একটা অসুবিধা। ১৫,০০০ হাজার পাউণ্ড গোয়ালের সারের মূল্য ৩০৲ টাকা। সেই কার্য্য সবুজ সারের দ্বারা অতি কম খরচে সম্পাদিত হইতে পারে। সেই কার্য্য সলফেট অব এমোনিয়া দ্বারা সম্পাদন করিতে হইলে ব্যয় অনেক হইয়া পড়ে এবং লাভের গুড় পিপ্ড়েতে না খাইয়া এ ক্ষেত্রে সারেই চলিয়া যায়।

ইক্ষুতে খণিজ সার—আখের ক্ষেতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করাই উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে সোরা, সলফেট অব এমোনিয়া প্রভৃতি খণিজ সার দিবার ব্যবস্থা কিছু মন্দ নহে। এই সকল সার প্রদানে, আখের ফলন বাড়ে, আখে গুড় অধিক হয়, তবে খরচ কিছু অধিক সেইজন্য সকলের পক্ষে ইহা সুবিধাজনক নহে। সলফেট অব এমোনিয়া অপেক্ষা, সোরা প্রয়োগে খরচ অধিক। ইহার একটা সুযুক্তি ঠিক হইয়াছে রেড়ীর খৈল ও সলফেট অব এমোনিয়া একত্র দিলে সব দিক বজায় হয়।

সলফেট অব এমোনিয়া বা সোরা প্রথমে বা এক কালীন না দিয়া, আখ গাছগুলি দুই তিন ফুট বড় হইয়া উঠিলে দুই বারে খৈলের সহিত মিশাইয়া আখের মাদাতে ছড়াইয়া দেওয়া ভাল—ইহাতে ফলন বাড়ে। উপরে ছড়াইবার সার গুলির মধ্যে সলফেট এমোনিয়া বিশেষ উপযোগী। খণিজ পটাস ও ফস্ফরিক অম্ল আখে দিয়া বুঝা যায় যে জমিতে পটাসের ভাগ অধিক হইলে ও উপযুক্ত মাত্রায় নাইট্রোজেন পড়িলে অতি সুন্দর আখ, ফসলের মাত্রাও খুব বাড়িয়া থাকে।

আখের রস জ্বাল দিবার সময় আখের পাতা ও আখের শুষ্ক দণ্ডগুলি জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হয়, এই ছাইয়ে পটাসের মাত্রা সমধিক এবং ইহাতে নাইট্রোজেনও আছে। গোয়ালের সারের দিন দিন যেরূপ অভাব হইতেছে তাহাতে এই ছাইগুলি আর উপেক্ষা করা যায় না।

যেখানে খালের জলের সেচ পাওয়া যায় তথায় সার খরচ কিছু কম করিলেও চলে। অনেক স্থলে একরে ২৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন সার দেওয়া হইয়া থাকে কিন্তু খালে জলের সেচের ব্যবস্থা থাকিলে ১৫০ পাউণ্ড নাট্রোজেন প্রদানে তুল্য ফল পাওয়ার সম্ভাবনা।

এতদঞ্চলে সার সম্বন্ধে আর একটি বিষয় প্রতিপন্ন হইয়াছে। এমন সলফেট সার দিলে গুড়ের রঙ ভাল হয়। মাছের গুড়া ও কুসুম বীজের খৈল সার প্রদানে গুড়ের রঙ খুব ঘোর হয়। রেড়ীর খৈল প্রয়োগে ইক্ষু দণ্ড খুব দৃঢ় হয়।

অধিকন্তু দেখা হইয়াছে যে কুসুম বীজ খৈলের সারে আখের রসে চিনির মাত্রা বাড়িয়া থাকে।

পুনাতে বীজ ইক্ষু—

এখানে ১২ ইঞ্চি লম্বা একগাছি আখের টুকরা বীজ রূপে ব্যবহার করা হয়। গোড়ার সামান্য অংশ বাদ দিয়া সমস্ত আখগাছা টুকরা করিয়া কাটিয়া বীজ তৈয়ারী করা হয়। কোথাও কেবল ডগাগুলি বীজের জন্য রাখা হয়। দুইয়েতেই গাছ সমান হয়। গোড়ার আখে চিনির ভাগ অধিক অতএব ডগায় কাজ হইলে গোড়ার আখ বীজের জন্য নষ্ট করা বিধেয় নহে। ডগা ব্যবহারে বরং লাভ এই ক্ষেতের গাছ শীঘ্র বাড়িয়া অল্পদিনে জমকাইয়া উঠে তাহাতে ফসলও ভাল দাঁড়ায়। এখানে পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, দুইসনী আখ হইতে বীজ তৈয়ারী করা অপেক্ষা নূতন আখই বীজের জন্য ব্যবহার করা ভাল। বাঙলার চাষীদের আরও একটি বিষয় শিখিবার আছে। বাঙলার চাষীরা বীজ ইক্ষু বাছাই করিতে জানে না—কিন্তু বাছাই করিয়া ভাল চোখ দেখিয়া বীজ ইক্ষু বসাইলে ভাল মন্দ বীজে কত তফাৎ বেশ বুঝা যায়।

পুনাতে আখ মাড়াই—

এখানে কলেই আখ মাড়াই হইয়া থাকে। তাহাতে শীঘ্র কাজ শেষ হয়। সত্তোর ভাগ রস পাওয়া যায়। আখ মাড়াই শীঘ্র শেষ হয় বলিয়া ডগা গুলি অল্প দিনের মধ্যে বসাইবার জন্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

পুনাতে আখের রস জ্বাল দিবার চুল্লী—

বাঙলা দেশের শিউলিয়া খেজুর রস জ্বাল দিবার জন্য পর পর সাত আট চুল্লী তৈয়ারী করিয়া জ্বাল দিতে থাকে, একটাতে কাঁচা রস, একটাতে তাতারসী, একটাতে আধগুড়ে, শেষকালে গুড়ে গিয়া সমাপ্ত। পুনাতেও সেই বন্দোবস্ত। এখানে প্রায়ই সব তিন মুখো চুল্লী। ইহাতে গুড় তৈয়ারী করিবার সময়ের আনুকুল্য হয়। আড়াই ঘণ্টা সময়ের স্থলে ১।৩০ এক ঘণ্টা ত্রিশ মিনিটে গুড় তৈয়ারী হইয়া যায়। জ্বালানি কাঠেরও খরচ কমে ১,১০০ পাউণ্ড রস জ্বাল দিতে ৩০০ পাউণ্ড মাত্র কাঠের আবশ্যক, তদ্বিপরীতে ৫০০ পাউণ্ড কাঠ খরচ হইত।

চৈত্র, ১৩১৯ সাল।

অনাবৃষ্টিতে বৃক্ষলতাদির অবস্থা

অতি বৃষ্টি বা অত্যধিক জলসিঞ্চন বৃক্ষাদির পক্ষে যেমন হানীজনক তেমনি অনাবৃষ্টি ও বা জল সেচনের অভাবে বৃক্ষলতার আয়ু সংশয় হইয়া থাকে। উদ্ভিদদেহে জলের পরিমাণ বুঝিয়া দেখিলে মনে হয় যে, জলই যেন উদ্ভিদের প্রাণ—উদ্ভিদের অর্দ্ধাংশ প্রায় জল। ধান, পাট, কলাই প্রভৃতি উদ্ভিদদেহ কাঁচা ও শুষ্ক অবস্থায় ওজন করিয়া দেখিলে একথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উদ্ভিদ-দেহে জলের যে কি আবশ্যকতা তাহা বুঝিয়া লইলে অধিক জলে বা জলাভাবে উদ্ভিদের কি ক্ষতি হয় তাহা সহজে অনুমান করিয়া লওয়া যায়।

জলের অভাব হইলে কোনও উদ্ভিদ জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেই জন্য যখনই জলের অভাব হয় তখনই জল সেচনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কখন কখন দেখা যায় যে মাটির উপরিভাগ খুব শুকাইয়া উঠিয়াছে কিন্তু তাহা দেখিয়া বিশেষ আতঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই, কেন না এমন অনেক সময় ঘটে যে উপর শুষ্ক হইলেও ভিতরে বেশ রস থাকে, কখন বা ভিতর উপর সমভাবেই শুকাইয়া যায়। এই কারণে জল সেচনে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। ধান, কলাই, সরিষা প্রভৃতি গুচ্ছমূলধারী শস্য সমূহ অল্পতাপে মরিয়া যায়, কিন্তু আম, লিচু, তাল, সুপারি প্রভৃতি লম্বমূলধারী উদ্ভিদ্ মাটির ভিতর অধিক দূর পর্য্যন্ত শিকড় প্রবেশ করাইতে পারে ও নিচু হইতে রসাকর্ষণে সমর্থ হয়।

উদ্ভিদের জলের আবশ্যকতা কি?

প্রাণীগণের যেমন জল আহার উদ্ভিদেরও তেমনি জল আহার, জল যেমন প্রাণীদেহে রস সঞ্চার করে তেমনি উদ্ভিদদেহেও রস যোগাইয়া থাকে। জল

প্রাণীদেহে পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে উদ্ভিদদেহেও ঐ কারণে জলের প্রয়োজন। অধিকন্তু জল উদ্ভিদের আহার বাহক। উদ্ভিদ হাতে তুলিয়া, মুখে চর্ব্বণ করিয়া কোন খাদ্য খায় না। আহার মৃত্তিকাস্থিত জলের সহিত মিশিয়া রস রূপে পরিণত হইয়া উদ্ভিদ শরীরে প্রবেশ করে এবং উদ্ভিদের দেহ বর্দ্ধন করে। উদ্ভিদদেহে মৃত্তিকাস্থিত জল আসিয়া রসরূপে পরিণত হয়। এই রসের অধিকাংশ পত্রমুখ দিয়া বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং রস ক্রমশঃ গাঢ় হয়। এই সময় পত্রস্থ ছিদ্রপথে প্রবৃষ্ট বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া উদ্ভিদের দেহ রক্ষার উপাদান সমূহ উৎপন্ন করে।

উদ্ভিদের দেহে জলের কার্য্য বুঝিলে জলের অভাব হইলে কি ক্ষতি হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝান যাইতে পারে। যদি জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ জল থাকে কিন্তু তাহা যদি অধিক নীচেতে থাকে, তবে দেখা যায়. যে উদ্ভিদের মৃত্তিকা মধ্যস্থিত শিকড়ের অগ্রভাগ গুলি জলপানের জন্য পিপাসিতের ন্যায় জলান্বেষণে ক্রমশঃ অধিক মাটির নীচে প্রবেশ করিতে থাকে। যতক্ষণ জলের নিকট না পৌঁছে ততক্ষণ তাহাদের বিরাম নাই। এমনও লক্ষ্য করা হইয়াছে যে গুচ্ছমূলধারী মরসুমী ফুলের গাছগুলি যাহাদের শিকড়গুলি সাধারণ অবস্থায় জমির মধ্যে ৩ হইতে ৬ ইঞ্চি মধ্যেই থাকে, সেগুলি মরুভূমিবৎ প্রান্তরে মাটির মধ্যে এক ফুট নীচেতেও শিকড় চালাইয়াছে। কখন বা মাটিতে কয়েক ফিট পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করে। ডাক্তার লিণ্ডলে বলিয়াছেন, বৃক্ষলতাদি গতিশীল না হইলেও তাহাদিগকে জলান্বেষণে শিকড়গুলির মুখ ফিরাইতে দেখা যায়। তিনি দেখিয়াছেন পপলার নামক একটি বৃক্ষ সমতল ভাবে ৩০ ফিট শিকড় চালাইয়া অবশেষে একটি বহু পুরাতন কূপের মধ্যে ১৮ ফিট শিকড় চালাইয়াছে। ভারতে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অশ্বত্থ জাতীয় বৃক্ষের চূণ বালির উপর সামান্য দেওলার মধ্যে জন্ম ও জলান্বেষণ এ দেওয়াল, ও দেওয়াল এ ফাটাল ও ফাটালের মধ্য দিয়া এক শত দুই শত ফুট লম্বা শিকড় চালাইয়া অবশেষে মাটিতে পৌঁছাইবার খবর অনেকেই অবগত আছেন। একটা শিকড় এই ভাবে চলিতে চলিতে যদি কোথাও একটু রস পায়, তবে সেখানে কেমন মাকড়সার জালের মত জাল বিস্তার করে, দেখিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। আমরা একটা শালগম গাছের শিকড় ক্ষেতের পাশে একটা পয়োনালাতে প্রবেশ লাভ হেতু তাহার ৬ ফিট লম্বা শিকড় দেখিয়াছি।

অভাবের ভয়ে অনেকেই সঞ্চয় করে। ইতর প্রাণী পিপীলিকাও সঞ্চয়ে তৎপর। বৃক্ষলতাদিরও জল সঞ্চয়ের ব্যবস্থা দেখা যায়। মরুভূমে, প্রান্তরে, যেখানে জলের বড়ই অভাব তথায় বৃক্ষলতাদি সূক্ষ্ম শিকড়েতে জল সঞ্চয় করিয়া রাখে। এইহেতু শিকড়ে আবের মত স্ফীতি লক্ষ্য করা যায়।

যখন শিকড় জলের সন্ধান পায় ও জলের নিকট পৌছে তখন তাহাতে সূক্ষ্ম-সূত্রবৎ শিকড় বড় বেশী থাকে না। পক্ষান্তরে জমিতে রস কম থাকিলে এই সকল সূক্ষ্ম শীকড়ের বৃদ্ধিপরিলক্ষিত হয়।

যে সকল প্রদেশের জমি সরস নহে সেখনকার বৃক্ষকাণ্ডের কাষ্ঠ খুব কঠিন হইয়া থাকে। মধ্য প্রদেশের শাল, আব্লুস, আসন কাষ্টের কাঠিণ্যই তাহার প্রমাণ।

কখন কখন উদ্ভিদদেহের কাণ্ডেই জল সঞ্চিত হয়। আফ্রিকাখণ্ডের মরুভূমে পাম্বপাদপ তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অর্কিড জাতীয় উদ্ভিদের গ্রন্থি স্ফীতির মধ্যে জল সঞ্চয় অন্য একটি দৃষ্টান্ত।

কঠিন মৃত্তিকায় কাঠ দৃষ্ট হয় ও কাঠের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় কিন্তু সরস মাটিতে সেই গাছই নধর ডাল পালায় পরিশোভিত হয়। নিরস প্রদেশের একটা অশ্বত্থ গাছের সহিত বাঙলার একটা অশ্বত্থ গাছের তুলনা করিয়া দেখিলে এই কথাটা বেশ ভাল করিয়া বুঝা য়ায়। বীরভূমের নিরস দেশের গাছ দেখিয়া আমরা একথা বুঝিয়াছি।

সেখানে পনেরো, বিশ বৎসরের, আমগাছ সমূহ ১০ কিম্বা ১২ ফিটের অধিক বাড়ে নাই। গাছগুলি আমের মুকুলে ভরিয়া গিয়াছে, গাছে ডাল পালা ও পাতা দেখিলে বোধ হয় এ গুলি বাঙলার ৫ বৎসরের চারা গাছ। মৃত্তিকা সরস কিম্বা নিরস তাহা গাছের পাতা দেখিয়া বলা যায়। নিরস প্রদেশের গাছের পাতা দেখিয়া চেনা যায়। নিরস প্রদেশের গাছের পাতা ছোট হয়। নিরস প্রদেশের গাছের শীকড় অগ্রভাগগুলি কঠিন ও সুচাগ্র হয়। শিকড়গুলি মাংসাল হয়—তাহার উদ্দেশ্য বোধ হয় জল সংরক্ষণ।

ফণী মনসা জাতীয় গাছ খুব অনাবৃষ্টি সহ। জলাভাবে তাহারা জীবন রক্ষা করিতে পারে। তাহাদের দেহে জল রক্ষার খুব সুব্যবস্থা আছে। তাহাদের দেহ মাংসল, শিকড় মাংশল। তাঁহাদের পত্র বিন্যাস নাই বলিলেই হয়। নিরস প্রদেশে ছোট গাছ হয়, ছোট পাতা হয়, ফলও ছোট হয়। গাছে পাতা নাই কিন্তু ছোট ফলে গাছ ভরা। গাছে তাই ফলের পরিমাণ কম। বাঙলার গাছের একটা ডাল ফলিলে সেই পরিমাণ ফলের আশা করা যায়। কিন্তু বাঙলার ফল ঘন পত্র বিন্যাসের মধ্যে লুকান থাকে।

মৃত্তিকার তল প্রদেশে অতিরিক্ত জল দাঁড়াইলে, সেই জল অনবরত কৈশিকার্ষণ প্রভাবে মৃত্তিকার উপরে উঠিয়া বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় এবং তদন্তর্গত দ্রব পদার্থ মৃত্তিকার উপরে একত্রীভূত হয়। ক্রমে এত অধিক দ্রব পদার্থ মৃত্তিকার উপরিস্তরে সঞ্চিত হয় যে, উহা তজ্জন্য ফসল বহনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া উঠে। উড়িষ্যাও

বিহার উভয় অঞ্চলে কাটি খাল হইতে অতিরিক্ত জলসেচনের এই বিষময় ফল ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যে সকল 'উষর' নামক মরুভূমির ন্যায় অনুর্ব্বরা ক্ষেত্র এক্ষণে দেখা যাইতেছে, তাহা বহুকালব্যাপী অতিরিক্ত জলসেচনের ফল স্বরূপ বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। এই কারণে গঙ্গার খাল ও যমুনার খাল এই দুই খালের পার্শ্বে অনেক উর্ব্বর ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব কাটিখাল দ্বারা ভূমিতে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিবার সঙ্গে সঙ্গে, তল-মৃত্তিকার অতিরিক্ত জল নির্গমের উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। কূপ অথবা পুষ্করিণী হইতে জল সেচন সম্বন্ধে এ ভয়ের বিশেষ কারণ নাই। কেন না কূপ ও পুষ্করিণী হইতে, অতিরিক্ত জল পাওয়াই সুকঠিন, এতদ্ভিন্ন কূপ ও পুষ্করিণী হইতে জল সিঞ্চন অধিকতর কষ্ট ও ব্যয়সাধ্য। সুতরাং ক্ষেতে অতিরিক্ত জলসেক দূরে থাকুক পর্য্যাপ্ত জল যোগানই কঠিন হইয়া উঠে।

সর্ব্বত্র বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না সেইজন্যই কৃত্রিম উপায়ে জল সেচের ব্যবস্থা। কিন্তু জলসেক বিধিপূর্ব্বক না হইলে অহিত হইয়া থাকে। অনাবৃষ্টিতে কতক শস্য লাভের আশা থাকে কিন্তু অতিবৃষ্টিতে বা অত্যধিক জল সিঞ্চনে শস্য সমূলে বিনষ্ট হয়।

পত্রাদি

এস্, ডি, ফিলিপ্, খান ইঞ্জিনিয়ার, কোড়াবুখা বাঙলায় উত্তর চাহিয়াছেন—

রেড়ীবীজ—ইহা হইতে রেড়ী তৈল (Castor oil) প্রস্তুত হয়। রেড়ীদানার খোসা ছাড়াইয়া পরিষ্কৃত বীজগুলি শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। অতঃপর সেই গুলি ছোট ছোট থলেতে পূর্ণ করিয়া দুই দিক হইতে চাপ দিলে তৈল বাহির হয় ও থলের মধ্যে খৈল এক খানা কেক্ আকারে থাকিয়া যায়। ইহাই রেড়ীর খৈল (Castor oil cuke)। ইহা নানা বিধ ফসলের বিশিষ্ট সার।

ধঞ্চে বীজ—Danichia যাহার সঁজী সার হয় তাহার বাঙলা নাম জানিতে চান—ইহার বাঙলা নাম ধঞ্চে বা ধনিচা। ইহা শুঁটীধারী উদ্ভিদ বলিয়া ইহারা ইহাদের শীকড় গ্রন্থিতে বহুসংখ্যক স্ফোটক বা গণ্ড উৎপন্ন করে। এই গণ্ড মধ্যে নাইট্রোজেন সার সঞ্চিত হইয়া ক্ষেত্রটি সারবান করিয়া তুলে। সেই সজীসার হিসাবে এই প্রকার উদ্ভিদের এত আদর। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, মাসে জমী

চষিয়া বীজ বপন করা হয়। ভাদ্র মাসের মধ্যে গাছগুলি পাঁচ ছয় ফুট লম্বা হয় তখন ক্ষেতে লাঙ্গল মৈ দিয়া জমির সহিত চষিয়া দেওয়া হয়। ডাঁটা পাতাগুলি জমিতে পচিয়া সারে পরিণত হয় এবং শিকড়েও যথেষ্ট সার পদার্থ সঞ্চিত হয়। বীজ চৈত্র, বৈশাখে এই সময় সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। বীজের খুচরা দর দুই আনা পাউণ্ড।

টেঁপারি—আশ্বিন কার্ত্তিকে বীজ বপন করিতে হয়। সতন্ত্র বীজ তলায় চারা তৈয়ারি করিয়া লইয়া চারা গুলি সময় মত ক্ষেতে নাড়িয়া বসান ভাল।

"চোকা"—এই লতা আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। ফল মটর শুঁটির মত বলিতেছেন—এদেশে সীম ব্যতীত অন্য কোন লতায় এপ্রকার ফল হয় না। সীম ব্যতীত এদেশে অন্য কোন শুঁটি একৈক প্রধান খাদ্য রূপে ব্যবহার হয় না। সীম কিন্তু বহু বীজ বিশিষ্ট। একটি ফলে একটি বীজ এমন কোন শুঁটি আমরা দেখি নাই।

প্রশ্ন মিমাংসার জন্য অর্থ গ্রহণ—ফিলিপ সাহেবের এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা সাধারণকেই জানাইতেছি যে কৃষি বিষয়ক কেহ কেহ কোন প্রশ্ন করিলে তাহারা যথাযথ উত্তর প্রদানে ও খরচ দানে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। তজ্জন্য কাহাকেও কোন অর্থ প্রদান করিতে হয় না। এই প্রশ্নের উত্তর গুলি "কৃষকে" সতন্ত্র প্রকাশিত হয় বলিয়া আমরা সকলকে "কৃষক" গ্রহন করিতে পরামর্শ দিই।

ইষ্ট, দুগ্ধ বিকৃতকারী উদ্ভিদাণু

উদ্ভিদাণু—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন কর, তমলুক।

উদ্ভিদাণু কি ও তাহার কার্য্য কি জানিতে চান। সামান্য পত্রে ইহার সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া সুকঠিন। কতকটা আভাসমাত্র দেওয়া যাইতে পারে। যাবতীয় পচন ক্রিয়া কোন কোন উদ্ভিদাণু দ্বারা সম্পাদিত হয়। বায়ুতে এই সকল উদ্ভিদাণু বর্ত্তমান থাকে। বায়ুশূন্য স্থানে কোন দ্রব্য পচে না। বায়ুতে এক প্রকার উদ্ভিদাণু থাকে যাহা দ্বারা দুধ দধিতে পরিণত হয়। "ইষ্ট" নামক উদ্ভিদাণু চিনিকে সুরায় পরিণত করে। গোময়, গোমুত্র কোন একটি গর্ত্তমধ্যে সংরক্ষিত হইলে তাহাতে বায়ুস্থিত উদ্ভিদাণু কর্ত্তৃক য়্যামোনিয়া উৎপাদিত হয়। আবার এই য়্যামোনিয়া প্রভৃতি অন্য এক প্রকারের উদ্ভিদাণু দ্বারা নাইট্রেট আকারে পরিবর্ত্তিত হয়। উদ্ভিদাণুর কার্য্য বিবিধ ও অসংখ্য। "কৃষি রসায়ন' নামক পুস্তকে কৃষি কার্য্যে উদ্ভিদাণুর কি সহায়তা তাহা জানিতে পারিবেন।

চুণ—মিঃ এস, বি, সিংহ, দোলত, শিরসা পোঃ মেদিনী পুর।

জমিতে চুণ খুব সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য কারণ প্রায় সকল জমিতেই অল্পধিক চুণ আছে। জমিতে চুণের মাত্রা অত্যধিক হইলে, সমস্ত শস্য চুণের তেজে জ্বলিয়া যাইতে পারে। চুণেপাথর গুড়া করিয়া জমিতে ব্যবহার করা উচিত নহে। চুণা পাথর পুড়াইয়া তাহাতে জল দিলে সে গুলি চূর্ণ হইয়া ছাতুর মত হইয়া যাইবে এবং গুঁড়া ময়দার মত হইবে তখন ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ও সহজ। ইহার মধ্যে দুই দশ খণ্ড প্রস্তর থাকে তাহা পুড়ে না বা গুঁড়া হইয়া যায় না। সে গুলি বাছিয়া ফেলিতে হয়।

কলে শস্য মাড়াই—শ্রীহৃদয়রঞ্জন খাঁ, আমগাছী, হাওড়া।

শস্য মাড়াই করিবার ছোট অল্প দামের কল আছে কি না, জানিতে চাহেন, ছোট কল নাই। খুব দাম কম হইলেও একটা কল বসাইতে অন্ততঃ চারি হইতে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হয়। সবে মাত্র তাঁহার ৬৫ বিঘা উচু ও নিচু জমির চাষ অন্ততঃ ৫০০ বিঘা ধান, গম, যৈ, যবের চাষ আছে তাহাতেই এইরূপ কল চালাইতে পারে। নতুবা বলদা দ্বারা মাড়াইয়া, বা বাঁশ বা কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া শস্য মাড়াই করা যাইতে পারে। ধানের এক একটি বিচালী তক্তার উপর আছাড়াইয়া শস্য ঝাড়াই করিবার বিধি আছে। সামান্য চাষে এই গুলিই প্রশস্ত উপায় বলিতে হইবে। কলে শস্য মাড়াই করিলে খড় বা বিচালি খারাপ হয়। হাতে ঝাড়িয়া লইলেও বিচালী ভাল থাকে বাঁশ বা কাঠের আঘাতে শস্য ঝাড়িলে বা বলদ বা মানুষ দ্বারা মাড়াই করিলে পল বা বিচালী বড় অপরিস্কার হইয়া পড়ে।

গোয়ালিয়রে মৃৎশিল্প—মিঃ ডি, সি, মজুমদার জাপানে হইতে মৃৎশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ পূর্ব্বক দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে গোয়ালিয়র দরবার এই যুবককে গোয়ালিয়রে মৃৎশিল্পের উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত করেন। মিঃ মজুমদারের অনুসন্ধান শেষ হইয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন, চীনাবাসন নির্ম্মিত হইবার মত মাটী গোয়ালিয়রে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া না গেলেও আর এক শ্রেণীর মাটী পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের ডাসেট ও ডিবনশিয়রে এক প্রকার মাটী পাওয়া যায়। ইহাতে খুব সুন্দর চিত্রবিচিত্র মাটীর জিনিষ ও টালা প্রস্তুত হইতে পারে। গোয়ালিয়রে এইরূপ মাটী খুব পাওয়া যায়। ইহা হইতে উৎপন্ন জিনিষ পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। গোয়ালিয়র দরবার, বর্ত্তমানে এই যুবকের তত্ত্বাবধানে মৃৎশিল্পের কারখানা খুলিলে দেশের প্রভূত মঙ্গল হইবে।

কমলালেবুর আবাদ—ভারতবর্ষে ৯ হাজার বিঘা জমিতে কমলালেবুর চাষ হয়, কিন্তু কত কমলা জন্মে, তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। আমেরিকার কালিফার্ণিয়াতে ৪॥০ লক্ষ বিঘাতে কমলালেবুর চাষ আছে। তথায় গত বৎসর ২৩৩ কোটী ৮৫ লক্ষ ৬০ হাজার কমলালেবু জন্মিয়াছিল। এই কার্য্যে ১॥০ লক্ষ লোক খাটিতেছে।

কালিফার্ণিয়া ব্যতীত ইটালী, স্পেন, পালেস্তাইন, জাপান, কিউবা, জামেকাতেও অনেক কমলালেবু জন্মে।

কৃত্রিম রেশম—বিংশ শতাব্দীর দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, এই দ্বাদশ বৎসরে বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষি ও শিল্পের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে। আলকাতরা হইতে রঙ ও সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে; কৃত্রিম উপায়ে মণিমুক্তা তৈয়ারী হইতেছে; উদ্ভিদের সূত্র হইতে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারী হওয়াতে আসল রেশমের আদর কমিতেছে। এখন প্রতি বৎসর ১,৮৭,৫০০ মণ কৃত্রিম রেশম তৈয়ারী হইতেছে।

য়ুরোপে চাষাবাদ ও পশুপক্ষী পালন—একযোগেই সম্পাদিত হয়। তাঁহাদের মতলব যে দিক দিয়া যাহা আসে। য়ুরোপীয়গণ বৈজ্ঞানিক, আমরা দার্শনিক, সুতরাং চিন্তামগ্ন সামান্য দুই চারিটা জিনিস কোথায় কি প্রকারে নষ্ট হইতেছে তাহার খোঁজ করিতে আমরা রাজী নহি। ছোট ছোট জিনিষগুলির দিকে নজর দিতে শিখিলেই বড় জিনিষের বড় বড় তত্বগুলি চোখের সামনে আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়।

য়ুরোপে কৃষিক্ষেত্রে প্রায়ই হাঁস, মুরগী প্রতিপালনের ব্যবস্থা থাকে। হাঁস, মুরগী ও তাহাদের ডিম বিক্রয় করিয়া বেশ লাভ হয়; উপরন্তু তাহাদের বিষ্ঠায় চাষের সারকার্য্য বিনা খরচে সম্পন্ন হয়। সেইরূপ ভেড়া, গরু, ছাগ প্রতিপালনে দুধ ও মাংস বিক্রয়ে অর্থ সঞ্চয় হইয়া তাঁহাদের মলমূত্রে বিনা ব্যয়ে সারটা লাভ হয়। লাভ কম নয়। আমেরিকায় কৃষিক্ষেত্রে ও ফুল ফলের বাগানে মৌমাছি পোষা হয়। মৌমাছিরা ফুলে ফুলে ঘটকালি করিয়া উত্তম ফলশস্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিয়া দেয় উপরন্তু তাহাদের চাকে উদ্যান স্বামির জন্য মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে।

নূতন-শর্করা বৃক্ষ—বার্লিনের "টেক্‌নিক্যান রিভিউ" নামক সংবাদপত্রে একপ্রকার শর্করা-বৃক্ষের সংবাদ আছে। উদ্ভিদবিদ্যায় এই বৃক্ষের নাম—"Eupatoram Rebundican." দক্ষিণ-আমেরিকায় এই বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে শর্করার অংশ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই, ইহাকে শর্করা-বৃক্ষ নামে অভিহিত করা যায়। ইহাকে বৃক্ষ না বলিয়া গুল্ম বলাই উচিত, কারণ ইহার উচ্চতা ৮ হইতে ১০ ইঞ্চ হইয়া থাকে। রসায়নশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মিঃ বারটনি বলেন যে, ইহার ব্যবসায় লাভজনক; কারণ ইহাতে শর্করার অংশ বড় বেশী। সাধারণ চিনি হইতে ইহা অনেক গুণ অধিক সুমিষ্ট; আরও বিশেষত্ব এই যে, শর্করা-বৃক্ষের রস কখনও পচিয়া (fermented) যায় না বলিয়া, ব্যবসায়ের হিসাবে বিশেষ সুবিধা-জনক। এসনেসান নামক দ্বীপস্থ কৃষি-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহা সাধারণ চিনির ২০ হইতে ৩০ গুণ অধিক সুমিষ্ট।

পূর্ব্ববঙ্গে সুপারির আবাদ—পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই সুপারি (গুবাক) গাছ জন্মিলেও ভোলা, পাইয়া-খালী, নোয়াখালী, চাঁদপুর, মাদারিপুর ও করিমগঞ্জই ইহার প্রধান উৎপত্তি স্থান। এই প্রদেশ হইতে প্রতিবৎসর প্রায় পাঁচলক্ষ মণ সুপারি অন্যত্র রপ্তানি হইয়া থাকে। ইহার শতকরা প্রায় ৮২ ভাগ বাখরগঞ্জ এবং ১৪ ভাগ ত্রিপুরা জিলার সুপারি। এই দুই স্থানে সুপারি চাষ হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলেও, অন্যান্য স্থানে অল্পাধিক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ফলে, গৃহস্থমাত্রেরই নিত্য প্রয়োজনীয় সুপারির দর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে সুপারির চাষ বিশেষ লাভজনক হইলেও, পূর্ব্বের মত সুপারির চাষে কাহারও মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে সুপারির চাষে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করিতে পারিলে, অল্পায়াসেই সুপারি ব্যবসায়ের আরও বিস্তৃতি ঘটিতে পারে।

আসামে রবার—১৯০৮—০৯ খৃঃ অব্দে, চরদুয়ার (তেজপুরের ১৮ মাইল উত্তরে) রবার 'প্ল্যানটেশনে', ৪১৭ একর বা প্রায় ১২৬০ বিঘা ভূমিতে এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ঐ স্থানে ৬৪২ একর বা প্রায় ১৯৩০ বিঘা ভূমিতে রবার উৎপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু ১৯০৮—০৯ খৃঃ অব্দে, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রবার পাওয়া গিয়াছিল। ১৯০৬—০৭ খৃঃ অব্দে, ৭৫৬০ পাউণ্ড বা কিঞ্চিদধিক ৯২ মণ (একর প্রতি ১৮·১ পাউণ্ড) এবং ১৯০৭—০৮ খৃঃ অব্দে, ৮৩৩৬ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১০২ মণ (একর প্রতি ১৩ পাউণ্ড) রবার পাওয়া

গিয়াছে। কামরূপের অন্তর্গত কুলসী প্ল্যানটেশনে, ১৯০৮—০৯ খৃঃ অব্দে, উৎপন্ন রবারের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ বৎসর কুলসীতে একর প্রতি ৩৯ পাউণ্ড এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে একর প্রতি ৪৬ পাউণ্ড রবার উৎপন্ন হইয়াছে। রবার গাছ বিদ্ধ (tapping) করিবার কাযে অনভিজ্ঞ কুলী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, ইহাই উৎপন্ন রবারের পরিমাণ হ্রাসের আরোপিত কারণ। উৎপন্ন রবার চয়দুয়ার ও কুলসীতেই, ২৷৵১ পাই পাউণ্ড দরে বিক্রয় করা গিয়াছে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দুই বৎসরে বিলাতের বাজারে, ২৷৭ পাই ও ২৷৶৪ পাই পাউণ্ড দরে, রবার বিক্রয় করা হইয়াছিল। লুসাই পাহাড়ে আসাম রবারে গাছের (Eicus elastica) চারা তুলিবার প্রণালী সুফলপ্রসূ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১৯০৮—০৯ খৃঃ অব্দে, ৫০,০০০ চারা উৎপন্ন করা হইয়াছিল ; তন্মধ্যে, ১৬,৪৪৯টী চারা লাগান হইয়াছে। স্থানীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আশা করেন, যথেষ্ঠ পরিমাণে সুবীজ প্রাপ্ত হইলে, তিনি প্রত্যেক বৎসরে, ১০০,০০০ চারা গাছ জন্মাইতে পারিবেন।

সার-সংগ্রহ

ভারতীয় প্রজার দারিদ্র্য

য়ুরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের প্রজা অপেক্ষা এদেশের প্রজাগণ যে দারিদ্র্য-পীড়িত তাহা বোধ হয় সর্ব্ববাদী সম্মত। শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় "প্রবাসীর" একটি প্রবন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা আলো আঁধারে চিত্রিত করিয়া এদেশের সেই দারিদ্র ছবিখানি বেশ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। তালিকাগুলি নিম্নে দেওয়া গেল—

কয়েক বৎসর হইতে আমি আমার নৈশবিদ্যালয় সমূহের শ্রমজীবি ছাত্র এবং কলেজের কয়েকজন ছাত্রের সাহায্যে বাঙলাদেশের একটি আদর্শ ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছি। বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে আমি অনেকগুলি পারিবারিক আয়ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। নিম্নে ইহাদিগের একটি নমুনা দেওয়া গেল—

পারিবারিক আয়ব্যয়ের তালিকা।

১।	স্থান—জেলা, গ্রাম, থানা।	চট্টগ্রাম, শ্রীপুর
২।	বৃত্তি (পেশা)—কৃষি, মজুরী, শিল্প, ব্যবসা, চাকুরী	কৃষি ও মজুরী
৩।	জাতি	হিন্দু, কায়স্থ,
৪।	বাড়ীর লোকসংখ্যা।	৬ জন

৫।	কয়টী ঘর	
	(ক) খড়	(ক) ৫
	(খ) খাপরা	
	(গ) ইট	
	(ঘ) টিন	
৬।	কয়জন উপার্জ্জন করে (যদি উপার্জ্জন না করে সংসারের কোন কাজ করে)	২ জন উপার্জ্জন করে বাকী ৪জন সংসারের কাজ করে।
	(ক) বালক	
	(খ) স্ত্রীলোক	৪ জন
	(গ) পুরুষ	২ জন
৭।	জমি (ক) কত বিঘা	১০ কাণি
	(খ) পতিত, আবাদী, বন, ঢড়াই, জলা,	পতিত ৩ কাণি, আবাদী ৫ কাণি, জলা ২ কাণি
	(গ) স্বত্বের বিবরণ লাখেরাজ, মৌরুষী, কর্ষা, কোর্ফা, ঠিকা,	লাখেরাজ, ব্রাহ্মত্তি
	(ঘ) জমিদারের খাজনা ও অন্য বাবদে জমিদারকে দেয়।	১৩৲ টাকা, ১৪ আড়ি ধান।
৮।	কৃষক (ক) কিসের আবাদ	বর্ষাকালে ধান্য, অন্য সময়ে মরীচ।
	(খ) কয়খান লাঙ্গল	২ খান লাঙ্গল
	(গ) জমীর জন্য বীজ, সার, মজুর অথবা অন্য খরচ	বীজ ৭॥ আড়ি, মজুরের খরচ ২৪৲ টাকা
	(ঘ) ফসল, নাড়া, বিচালি ইত্যাদি বিক্রয়ের লাভালাভ বিঘাপ্রতি।	
৯।	শ্রমজীবি, শিল্পী ও ব্যবসায়ী	
	(ক) শিল্পী ও শ্রমজীবির মজুরী অথবা চাউল প্রভৃতি দ্রব্য লইয়া কাজ করা।	মজুরী হইতে ২ জনের বার্ষিক প্রায় ৮০৲ টাকা উপার্জ্জন।
	(খ) দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ব্যবস্থা	
	(১) হাট কতদিন অন্তর	হাট চার দিন অন্তর, বাজার প্রতিদিন।

(২) মহাজনের নিকট দাদন লইয়া বিক্রয়, কত হারে সুদ।	বার্ষিক শতকরা ২৫৲ টাকা সুদ।
(৩) বৎসরে কত বিক্রয়, লাভালাভ।	
১০। স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন	—
(ক) ঘুঁটে অথবা জ্বালানি কাঠ বিক্রয়।	
(খ) ধান ভানা, গম পেষা	
(গ) সুতা কাটা	
(ঘ) মজুরের কাজ	
১১। বালকদিগের উপার্জ্জন	
১২। দুগ্ধ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি বিক্রয়।	
১৩। স্ত্রীলোকদিগের গহনা	
(ক) স্বামী বা পিতার নিকট প্রাপ্ত	স্বামীর নিকট প্রাপ্ত, প্রায় ৮০৲ টাকা
(খ) সোনা রূপা, পিত্তল কাঁসা, গিল্‌টি, শাঁখা, কাঁচ বা গালা।	১০৲ টাকা সোনা ৬৭৲ রূপা, ৩৲ শাঁকা
১৪। মজুত ধান, খড়, নাড়া, অথবা অন্য ফসলের পরিমাণ।	২০০ আড়ি মজুত ধান, ৫৲ নাড়া
১৫। ঘটী, বাটী, থালা	ঘটী ৮টা, বাটী ৬টা থালা ৫ খানা লোহার কড়াই ৩টা, আর সব কাঁসার।
(ক) পিত্তল, লোহা, কাঁসা	
(খ) মাটী, পাথর	
১৬। কর্জ্জ	১২০৲ টাকা কর্জ্জ
(ক) কত বৎসরের	চার বৎসরের
(খ) কি হারে সুদ	শতকরা ২০৲ বৎসরে
(গ) কি কারণে	চাষের জন্য
(ঘ) বাকী আসল এবং সুদ	
(ঙ) ধানের বাড়ি	
১৭। খরচের বিষয়	
(ক) চাউল, দিনে কয় বেলা	/৬ সের, দিনে দুই বেলা
(১) তেল, (২) মাছ, (৩) ডাল, (৪) দুধ, (৫) লবণ, (৬) শাকসুব্জী, (৭) চিনি অথবা গুড়	তেল ১৲, মাছ ২৲, ডাল ৩৲, দুধ ২৲, লবণ ॥০, শাকসব্জী ।৶, গুড়, চিনি ।০ মাসিক

(খ) কাপড় (বৎসরে কয় জোড়া)	১২ জোড়া
(গ) বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ (বৎসরে কয়বার)	বৎসরে একবার খরচ ৬০৲ টাকা
(ঘ) চিকিৎসা	১০৲ টাকা
(ঙ) শিক্ষা	
(চ) মামলা মোকর্দ্দমা	
(ছ) চৌকিদারী রাজকর	
(জ) মাদক দ্রব্য	
(ঝ) বিলাসের সামগ্রী, ছাতা, জুতা, জামা ইত্যাদি	ছাতা ২ খানা, জামা ৮টা, বার্ষিক ১৪৲ টাকা
১৮। উদ্বৃত্ত অর্থ, উহার প্রয়োগ।	
(ক) গহনা ক্রয়	
(খ) ধার দেওয়া	
(গ) ফসল ক্রয়	
(ঘ) সেভিংশ ব্যাঙ্কে অথবা অন্য লোকের নিকট গচ্ছিত রাখা	পরিবারের লাঙ্গল ২ খানা,
(ঙ) লাঙ্গল, বলদ, জমি, শিল্পীর অস্ত্রপাতি ক্রয়	বলদ ২টী, বৃষ ১টী এবং গাভী, একটী আছে
১৯। সংগ্রাহকের স্বাক্ষর এবং ঠিকানা।	

উপরে যে তালিকাটি দেওয়া গেল সেরূপ অনেকগুলি তালিকার সাহায্যে নিম্নে প্রদত্ত আদর্শ তালিকাটি গঠিত হইয়াছে,

	মজুর	কৃষক	সূত্রধর	কর্ম্মকার	দোকানদার	দীনমধ্যবিত্ত
১। খাদ্য	৯৫.৪	৯৪.০	৮৪.৫	৭৯.০	৭৭.৭	৭৪.০
২। বসন	৪.০	৩.০	১২.০	১১.০	৯	৪.৭
(১ ও ২)	৯৯.৪	৯৭	৯৬.৫	৯০.	৮৬.৭	৭৮.
৩। চিকিৎসা		১.০	১.০	৫.০	৫ ৯	৮.০
৪। শিক্ষা					১.০	৩.৩
৫। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	.৬	২ ০	২.৫	৪.০	৫.০	৮.০
৬। বিলাসের সামগ্রী			১.০	১.০	১.৪	২.০
মোট	১০০-০	১০০-০	১০০-০	১০০-০	১০০-০	১০০-০

ইউরোপ এবং আমেরিকার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার সহিত আমাদিগের অবস্থা তুলনা করিবার জন্ত এই দুইটী তালিকা দেওয়া হইল। এগুলি আমেরিকার শ্রমবিভাগের ৭ম বার্ষিক রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এক ডলারের মূল্য তিন টাকার কিছু বেশী।

	আয় (ডলার)	আয় (ডলার)	আয় (ডলাব)	আয় (ডলার)	আয় (ডলার)	আয় (ডলার)
আমেরিকা	২০০	৩০০-৪০০	৫০০-৬০০	৭০০-৮০০	৯০০-১০০০	১২০০
১। খাদ্য	৪৯.৫৪	৪৫.৫৯	৪৩.৮৪	৩৮.৮৯	৩৪.৩৪	২৮.৫৩
২। বসন	১২.৫৪	১৪.১৪	১৫:২৭	১৬.৩৩	১৬.৮৪	১৫.৭১
৩। আশ্রয়	১৫ ৪৮	১৪.৯৮	১৫.১৫	১৫.৫০	১৪.৯৬	১২.০৯
৪। ইন্ধন	৭.৪৭	৬.০৪	৫ ৬৩	৪.৪২	৪.০০	২.৫৭
৫। আলো	১.০১	.৯৮	.৯৭	.৮৮	.৭৪	.৪৫
৬। অন্যবিধ খরচ (চিকিৎসা, শিক্ষা, বিলাসের সামগ্রী)	১৩.৯৪	১৮.২৭	১৯ ১৪	২৩.৮৮	২৯.১২	৪০.০৫
ইউরোপ						
১। খাদ্য	৪৮.৩২	৪৯.৫৮	৫০.০৬	৪৪.০০	৪৬ ২৪	
২। বসন	১৯.০৮	১৪ ১৮	১৫.২১	১৮.৯৭	১৪.১৫	
৩। আশ্রয়	৯.৩৮	১১.৯৩	১০.২৬	৯ ৪৯	১০.৪৯	
৪। ইন্ধন	৫.৩৮	৫,৪৯	৩.৩২	৩.৯৭	৫.১৯	
৫। আলো	১ ৬৬	১.৫৯	১.৩৭	১.২০	১.৫৩	
৬। অন্যবিধ খরচ (চিকিৎসা, শিক্ষা, বিলাসের সামগ্রী)	১৬.১৮	১৭.২৩	১৯.৭৮	২২.৩৭	২২.৪০	

তালিকাগুলি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে আমেরিকা এবং ইউরোপে প্রত্যেক ব্যক্তিরই আয় হইতে অন্নাভাব পূরণের পর অর্দ্ধাধিক অংশ উদ্বৃত্ত থাকে। উহার ফলে ঐসব প্রদেশের জনসাধারণ শিক্ষা প্রভৃতি উচ্চবিধ অভাবগুলি মোচন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। আমাদিগের দেশের জনসাধারণের আয়ের এমন কি দশ ভাগের নয় অংশই অন্নাভাব মোচন করিবার জন্ত ব্যয়িত হয়, ইহাদিগের উচ্চবিধ অভাব মোচনের অধিক সুযোগ থাকে না,—সমস্ত শক্তিই শুধু ক্ষুধার প্রবল তাড়না নিবৃত্তি করিতে নিয়োজিত হয়। তাহার পর, আমাদিগর নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকলাপের দাবী চিকিৎসা এবং শিক্ষা অপেক্ষা যে অধিক প্রবল ইহা খুব দুঃখের বিষয়। আমাদিগের সমাজ যে কতকগুলি কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের জীবনযাত্রা অধিকতর দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। এইসকল কৃত্রিম অভাবের ভার না বাড়াইয়া দিয়া যদি সমাজ ইহার ব্যক্তিদিগের চিকিৎসা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিত তাহা হইলে বিশেষ মঙ্গল হইত সন্দেহ নাই।

বৈষয়িক জীবনের উন্নতির মূলভিত্তি শিক্ষা। শিক্ষার দ্বারা নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক কৃষি- এবং শিল্প-প্রণালী নিয়োগ করিতে পারিলে আমাদিগের দেশের কৃষি- এবং শিল্পজীবীগণ দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইতে পারিবে এবং প্রাথমিক অভাবগুলি মোচন করিয়া উচ্চবিধ অভাব পূরণের দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিবে। পাশ্চাত্য জগৎ বৈষয়িক উন্নতিকেই জাতীয় জীবনের চরম লক্ষ্য স্থির করিয়া প্রাথমিক অভাবগুলি মোচন করিবার সুন্দর পন্থা নির্ণয় করিয়াছে ; কিন্তু উচ্চ আদর্শের প্রতি অশ্রদ্ধার ফলে সেখানকার সমাজে কতকগুলি ভয়ানক ব্যাধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সমাজে অর্থলিপ্সা বৃদ্ধি পাওয়ায় ধনী এবং দরিদ্রদিগের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান খুব অধিক হইয়াছে এবং সমাজে ঘোর অশান্তি এবং বিপ্লবের সূচনা দেখা গিয়াছে। বাস্তবিকই আমাদের প্রভূত অর্থাভাব। আমাদের যে মানুষ মরে সে খাদ্যাভাবে নহে অর্থাভাবই তাহার কারণ। খাদ্য ও পরিধেয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে ক্ষতি ছিল না। ক্রয় করিবার অর্থ নাই তাহাতেই আমাদের কষ্ট। কিসে দেশের ধন বাড়ে তাহার উপায় করিতে হইবে। আমাদিগকে অনাবাদী জমির আবাদ পত্তন করিতে হইবে ; বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের সুব্যবস্থা করিতে হইবে জল সেচনের বিধি ব্যবস্থা করিয়া শস্যহীন ক্ষেত্র সমূহে শস্যোৎপাদন করিতে হইবে। পুরাতন শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে, নূতন নূতন শিল্পের সন্ধান করিতে হইবে, যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ব্যবসায়ে ইউরোপ কিম্বা আমেরিকার নূতন নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তবে অর্থাভাব ঘুচিবে। সঞ্চয়ের জন্য অর্থের আবশ্যক না হইলেও আমাদের প্রাণধারণের উপযুক্ত অর্থ আমাদের দেশে নাই সে অর্থে সংস্থান চাই প্রবন্ধ কর্ত্তার ভয় যে অর্থ সঞ্চয়ে অর্থের লোভ বাড়িবে, বিরাট বৈষয়িক অনুষ্ঠানে অভিভূত হইয়া আমাদিগকে দারুণ অশান্তিভোগ করিতে হইবে। কথা সত্য হইলেও সে কথার এখন অবসর নাই আগে জীবন রক্ষা হইলে তবে অর্থ বিজ্ঞানের কথায় আলোচনার সময় আসিবে।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

বৈশাখ মাস।

সব্জীবাগান।—মাখন সীম, বরবটি, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেপারি বীজ বসাইবার এখন সময় হয় নাই। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া রোপণ করে।

কৃষিক্ষেত্র।—বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আশুধান্য, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত-আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত। যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষ ভাগে গাছগুলি বড় হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ-ইক্ষু বা আখের টাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেতে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্যক হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময়ে বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

ফুল বাগান।—বৈশাখ মাসে কৃষকলি, আমারান্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমারান্থাস্ সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মার্টিনিয়াডায়াণ্ড্রা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেল ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপরিয্যাপ্ত ফুল ফুটিবে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সেগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।